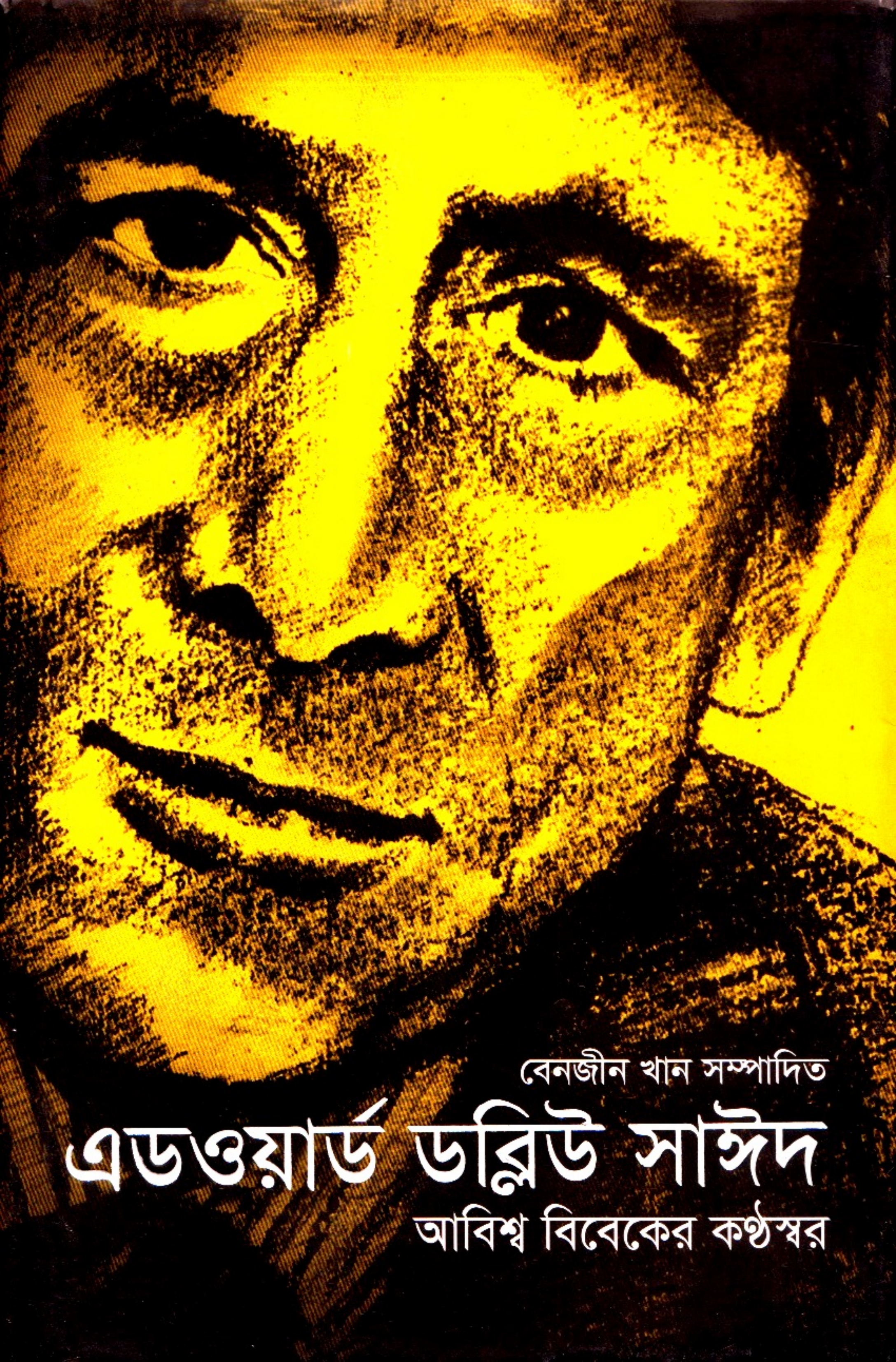

বেনজীন খান সম্পাদিত

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ

আবিশ্ব বিবেকের কণ্ঠস্বর

এডওয়ার্ড ওয়াদি সাঈদ (১৯৩৫-২০০৪) সাম্প্রতিক বিশ্বে বিবেকের কণ্ঠস্বর হিসাবে খ্যাতিমান একজন ব্যক্তিত্ব। এই খ্যাতির প্রধান উৎস তাঁর রচিত *ওরিয়েন্টালিজম* বইটি। প্রাচ্য সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ডিসকোর্সকে উন্মোচিত করেছেন তিনি এই বইয়ে। শক্তিমদমত্ত পাশ্চাত্য সমাজ প্রাচ্যকে হীন মনে করে। প্রাচ্য তাদের চোখে OTHER বা 'অন্য'। এই 'অন্য'দের কোনও ইতিহাস নেই, তারা বর্বর। তাদের কোনও সভ্যতা নেই। *ওরিয়েন্টালিজম* বইয়ে সাঈদ দেখিয়েছেন যে পাশ্চাত্যের এই প্রপঞ্চ কতটা মিথ্যা। পাশ্চাত্য সমাজের কতটা বলদর্পী মহাপরিকল্পনার অংশ এটি তা পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ এবং গভীর পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে তিনি তুলে ধরেছেন *ওরিয়েন্টালিজম* বইয়ে। পাশ্চাত্য সমাজের পাণ্ডিত্যের ভণ্ডামিকে উন্মোচন করে দিয়েছেন বিশ্বব্যাপী মানুষের সামনে।

পাশ্চাত্য সম্পর্কে তাঁর সুগভীর উপলব্ধি আরও সম্পন্ন হয়ে উঠেছে তাঁর রচিত বই *কালচার অ্যান্ড ইমপেরিয়ালিজম*-এ। এখানে তিনি দেখিয়েছেন পশ্চিমাদের এই উপলব্ধি যে, শুধুমাত্র বলদর্পিতার অস্ত্রেই উপনিবেশকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। উপনিবেশগুলোতে মানুষের মধ্যে হীনমন্যতা সৃষ্টি করতে না পারলে এবং নিজেদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে উচ্চ বলে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে তাদের পক্ষে দমন-পীড়ন করা সহজ হয়ে ওঠে না। গোটা পাশ্চাত্য সমাজেই প্রতিষ্ঠিত আছে এই ডিসকোর্স। স্যামুয়েল হান্টিংটন প্রাচ্য সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন তাও ছিল পাশ্চাত্যের ঐ ডিসকোর্সেরই প্রতিধ্বনি। এডওয়ার্ড ওয়াদি সাঈদ তাঁর পূর্বোক্ত বই দুটিতে পাশ্চাত্যের এই ডিসকোর্সকেই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

এটুকুতেই এডওয়ার্ড সাঈদের অবদান সীমাবদ্ধ নয়। তিনি একজন মহৎ সাহিত্য সমালোচক এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতের একজন রসিকও। পিয়ানো বাদক হিসাবে তিনি ছিলেন নিপুণ শিল্পী। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, কিংবা রাজনীতির একজন তাত্ত্বিক হলেও সবকিছুর ওপরে তাঁর সাফল্য একজন প্রাজ্ঞ দার্শনিক হিসাবে। বিশ শতকের দার্শনিকদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য। বহুতলস্পর্শী এই লেখকের চেতনাজগতকে অনুসন্ধান করে না দেখলে সমকালীন বিশ্বচেতনাকে যথার্থভাবে অনুভব করা যাবে না। দার্শনিক পরিচয়েই শুধু এডওয়ার্ড সাঈদকে চেনানো যায় না, কারণ তিনি একজন প্রতিবাদী দার্শনিকও।

লেখক-গবেষক বেনজীন খান একজন জ্ঞানতৃষ্ণ তরুণ। ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মননশীল বইয়ের লেখক হিসাবে তিনি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলা ভাষায় এডওয়ার্ড সাঈদকে নিয়ে বেশ কিছু লেখালিখি হয়েছে। অনেকেই তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। বেনজীন খান এই সাঈদ-চর্চাকে অনুসরণ করছেন দীর্ঘকাল ধরে। তাঁর সেই সাঈদানুসরণেরই এক প্রামাণ্য দলিল এই বই। পত্র-পত্রিকায় এডওয়ার্ড সাঈদকে নিয়ে প্রচুর লেখালিখি হলেও গভীরতা-সন্ধানী লেখা খুব বেশি নেই। বেনজীন খান বেশ যত্ন করে তার মধ্য থেকে গভীরতামুখি লেখাগুলোকে খুঁজে নিয়েছেন। এছাড়াও রয়েছে সাঈদের সাক্ষাৎকার। নিঃসন্দেহে সাঈদকে বুঝতে সহায়ক হবে এগুলো। সাঈদের নিজের কিছু লেখার অনুবাদও এখানে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এই সংকলনে এ এক মহার্ঘ পুরস্কার।

আহমাদ মাযহার

বেনজীন খানের অন্যান্য বই

বিজ্ঞান মানুষের জন্য
প্রকাশিত গদ্য
সালমান রুশদীদের 'সেফ হেভেন' এবং
একজন সম্মানিত বিবেক
দ্বন্দ্বে ও দ্বৈরথে
পশু কোরবানি : একটি বিকল্প প্রস্তাব (সম্পাদনা)
মান্দি ইতিবৃত্ত (প্রকাশিতব্য)
অন্ধকারের কথকতা (প্রকাশিতব্য)

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ

আবিশ্ব বিবেকের কণ্ঠস্বর

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ

আবিশ্ব বিবেকের কণ্ঠস্বর

সম্পাদনা

বেনজীন খান

সংবেদ

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ
আবিশ্ব বিবেকের কণ্ঠস্বর

সম্পাদক
বেনজীন খান
© সম্পাদক

সংবেদ প্রকাশনা ১

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৫
চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৪

প্রকাশক
পারভেজ হোসেন
সংবেদ, ৮৫/১, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
নীরু ও বাবলী

কম্পোজ
কুদ্দুস আলী খান
উয়ামি কম্পিউটার, মগবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ
সংবেদ প্রিন্টিং পাবলিকেশন, ৮৫/১, ফকিরেরপুল, ঢাকা

মূল্য : পাঁচশত টাকা

ISBN 984 32 1896 0

একমাত্র পরিবেশক
মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭৫২২৭, ৭১১৯৪৬৩

Edward W. Said (Recollection of Memoirs) by Benjin Khan, Published on February 2005, Published by : Parvez Hossain, Sangbed, 85/1, Fakirerpool, Dhaka-1000. Cover Design : Neeru & Bablee, Price : Tk. 500.00

www.pathagar.com

উৎসর্গ

জীবন নিবেদিত মুক্তির সংগ্রামে
গুলতি হাতে ফিলিস্তিনী
শিশুর স্বপ্নে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সম্পাদকের কথা

পশ্চিমের কোনও ইতিহাস নেই, অন্তত জানা কোনও লিখিত ইতিহাস; যে-টুকু আছে তার পুরোটাই বর্বরতার ইতিহাস। লুণ্ঠন আর হত্যাযজ্ঞ যাদের জীবনের ব্যাকরণ তারাই-কীনা আখ্যা দেয় অন্যরা অসভ্য! আসলে মিথ্যাচারের ছায়াতলে বড়জোর অন্ধকার জন্ম নেয়, আলোর অঙ্কুরোদগমন সেখানে ঘটবে কী ভাবে? অতঃপর অন্ধকার জন্ম দেয় *'আমি'*, *'আমরা'* উবে যায় অভিধান থেকে। অহংকারি *'আমি'* তখন বয়ান করে *'অন্যরা'* মিথ্যা।

পশ্চিম পুঁথি রচনা করে, যার আয়াত হলো- 'কলম্বাস আবিষ্কার করেছে আমেরিকা' (১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ)।

অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, খ্রিস্টের জন্মেরও ৪০ হাজার বছর পূর্বে প্রাচ্যের মঙ্গলীয়রা-ই সেখানে গড়ে তুলেছিল মানুষের সমাজ (*Feudal Society and Its Culture,* Chapter VII, page-207, Progress Publishers, Moscow)।

পশ্চিম তাদের পুঁথিতে বলে, জ্ঞানের পিঠস্থান গ্রীস কিন্তু এ-কথাও সত্য, গ্রীক দর্শনের সূত্রপাত আইওনিয়া রাজ্যের মাইলেটাস নগরে (খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ বছর)। আর পাশ্চাত্য দর্শনের জনক থেলিস, এনাক্সিম্যাণ্ডরসহ এই মাইলেসীয় দার্শনিক সম্প্রদায় যাঁরা বস্তাভর্তি সূর্য নিয়ে গিয়েছিল পিরামিডের মিশর থেকে। পশ্চিম এ-ও জানে না, ইলিয়াড-ওডেসি'র তথ্যসূত্রও মিশর।

ওরা বলে, ইউরোপের রেনেসাঁর গর্ভভূমি ইতালি, কিন্তু ব্যাখ্যা করেনা যে, ইতালির জনক স্পেন, স্পেনের কর্ডোভা; আল ফারাবি, ইবনে খালদুন, ইবনে রুশদ, ইবনে সিনহা তথা ফালাসিফা সম্প্রদায়।

আর জানে না, গ্রীসের প্লেটো মারা গিয়েছিল আরো কিছুটা সময় আগে। অতঃপর আরবীয় আফলাতুনই তাদের জাগিয়েছিল।

ওদের একটা উগারীট বা রাশ শামরা (Ugarit-Ras Shamra) কোথায়? বিবলস, একরন, আই, জেরিকো, কেনান, খোর্শাবাদ, নিনেভে, নিমরুড, আক্কাদ, ব্যাবিলন, উর, সুমের, এরিডু, সুসা-ইলাম, কিরকুক, আলেকজান্দ্রিয়া তথা ফিনিশিয়া-আনাটোলিয়া-এসিরিয়া-মেসোপটেমিয়া কোথায়? (যার বয়সকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৬০০০ বছর)। ওদের একটা হরপ্পা নেই, নেই মহেঞ্জোদারো (খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ বছর)। বহু কষ্টে এ পর্যন্ত যা কিছু পাওয়া যায় তাতো ওলমেক, মায়া, টেওটিহুয়াকান, টোলটেক, আজটেক, চাভিন, চিমু ও ইনকা। আর এ সব গুলিই অবস্থিত লাতিন আমেরিকায়। কেবলমাত্র ওলমেক (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ বছর) ছাড়া সবগুলিরই উৎপত্তি আনুমানিক ৩০০ থেকে

www.pathagar.com

১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। যা প্রাচ্যের তুলনায় খুবই সেদিনের। আর আবিষ্কৃত নিদর্শনসমূহ প্রমাণ করে প্রাচ্যের আদলে তা নির্মিত। সন্দেহ করা যায় এরও জন্ম মঙ্গলীয়দের তথা পূর্বের হাতে। তা হলে থাকল কী! কেবলমাত্র জায়ওনিজম আর খ্রিস্টানিটি ছাড়া; *ওল্ড টেস্টামেন্ট* আর *নিউ টেস্টামেন্ট* ছাড়া। অতঃপর মোজেস আর যীশু যার সবটুকুই 'ওরিয়েন্ট'!!

পশ্চিমের একটা কোরান কোথায়? জাতক অথবা ত্রিপিটক, বেদ, গীতা, জিন্দাবেস্তা, মরু সাগরের পুঁথি অথবা গিলগামেসের মহাকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত, অর্থশাস্ত্র, কামসূত্র, আরব্য রজনী, শাহানামা অথবা আরো কিছু— পিরামিড, অপরূপা অজান্তা, ইলোরা, তাজমহল।

ওদের নেই মমি, আয়ুর্বেদ, নেই আকুপ্রেসার, আকুপাংচার।

আর নেই কালঅতিক্রমি চরিত্র– আদম, হাওয়া, নূহ, ইব্রাহিম, কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ, জরাথুস্ত্র, কনফুসিয়াস, তাও, মুসা, ইসা, মোহাম্মদ ও শিন্তু।

অথচ তাদের পুথিতে লেখা হয়– ভূমিষ্ঠ মাত্র সভ্য মোরা! অতঃপর লেখেনা, যাযাবর পশু মানুষ হয়েছিল লেবানন-প্যালেস্টাইনে। আর সেইতো শুরু, মানুষের পথ চলা।

অথচ এরা (প্রাচ্য) 'ওরিয়েন্ট' অসভ্য বর্বর, এদের নাকি ইতিহাস নেই! পশ্চিম সে কথাই বলে আর রচনা করে তাদের পুথি-পদ্য। আর এ সবকিছুই পাশ্চাত্যের মহা পরিকল্পনার অংশ। এ পরিকল্পনা তাদের নিজেদের সভ্যতার মতই পুরাতন। 'ভাগ কর এবং শাসন কর' রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এটাই তাদের সব থেকে বড় আবিষ্কার। তাদের প্রতিভা নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি, যে-কীনা ছাপার অক্ষরে বলতে পারে, কী ভাবে অন্যের ওপর প্রভুত্ব বজায় রাখতে সর্বাগ্রে তাদের ঐতিহ্য, অহমবোধ তথা সভ্যতা ধ্বংস করতে হবে! *(The Prince)* এবং এতকাল তারা করেছেও তাই। 'ভারতের সাধনা' বিষয়ক পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন,

> "পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসে দেখি, যেখানে সে গিয়েছে সেখানেই স্থানীয় পুরাতন সভ্যতাকে ধ্বংস ও নির্মূল না করে সে তৃপ্ত হয়নি। এই ধ্বংসের ব্যাপার যে শুধু সংস্কৃতিতে অনগ্রসর অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডে ঘটেছে, তা নয়; আমেরিকার সুসভ্য 'মায়া' ও 'আজতেগ' সভ্যতারও উচ্ছেদ না করে সে নিবৃত্ত হয়নি" (*ভারতের সংস্কৃতি*)।

আজও আফগানিস্তান, প্যালেস্তাইন ও ইরাক যেন সেই ধ্বংসযজ্ঞেরই ধারাবিবরণী। জগতে আর কোথাও ঠিক এমনতরোটি দেখা যায় না। যেখানে এক সংস্কৃতি অন্য সব দুর্বল সংস্কৃতিকে মেরে ফেলে সমস্যা সোজা করে নিয়েছে। এই সহজ পথ প্রাচ্যের নয়। প্রাচ্য সবসময়ই মায়াময়। অথচ পাশ্চাত্য কখনই প্রাচ্যের স্বজন হতে পারেনি, যদিও প্রাচ্য দরজা খোলা রেখেছে অসীম কাল থেকে; কেননা 'অতিথি নারায়ণ', 'ভক্তিতে মুক্তি' এ-ই তার জীবনী শক্তি। কিন্তু পাশ্চাত্য এসেছে তস্কর হয়ে কারণ তার দেয়ার কিছু নেই। হয়তবা এসব কারণেই, কথা প্রচলিত আছে 'অধিক উর্বর এবং অধিক অনুর্বর জমি মানব মনের জন্য সমান ক্ষতিকর'। হয়তবা অধিক উর্বর জমি মানব মনকে অবাস্তব (অতি মাত্রায় আবেগি) করে তোলে আর অধিক অনুর্বর জমি মনকে করে তোলে মমতাহীন। হয়তবা সে কারণেই কোমল এবং কঠিন, দয়া এবং হৃদয়হীন আত্মীয় হতে পারেনি কখনই। তাইত পশ্চিম বিভেদ করে— বিভেদ ওদের সাধনা, কেননা ওখানেই

www.pathagar.com

ওদের অস্তিত্ব এবং এই-ই ওদের ইতিহাস। ওরা সর্বত্র শত্রু খোঁজে। না পেলে তৈরি করে। ব্যক্তি না পেলে রাষ্ট্র, রাষ্ট্র না পেলে সভ্যতা। শত্রু তবু চাই-ই!

এই সভ্যতারই উত্তরাধিকার স্যামুয়েল হান্টিংটন। আমেরিকার রাষ্ট্র বিজ্ঞানী, তাত্ত্বিক পণ্ডিত। ১৯৩৩ সালে তিনি *The Foreign Affairs* পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখলেন The Clash of Civilization? (সভ্যতার সংঘাত?) শিরোনামে। এর তিন বছর পর এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্যকে বিস্তৃত করে হান্টিংটন একটি বই লেখেন: *The Clash of Civilizations and the Remaking of World order.* সেখানে তাঁর মূল বক্তব্য ছিল,

> 'আন্তর্জাতিক রাজনীতির এক নতুন পর্ব শুরু হয়েছে। এই পর্বে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিশ্বের পুরনো বিভাজন আর প্রাসঙ্গিক নয়, প্রাসঙ্গিক নয় ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্রের সংঘাত, এবার মানবজাতির অভ্যন্তরীণ বিভেদ হবে চরিত্রে, সাংস্কৃতিতে, সেই বিভেদই হবে সংঘাতের মূল উৎস; বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভুত্ব বিস্তার করবে সভ্যতার সংঘাত।'

ছটি বা সাতটি প্রধান সভ্যতার উল্লেখ করেছেন হান্টিংটন— চিনা, জাপানি, হিন্দু, ইসলামি, পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে অন্যান্য সভ্যতার সংঘাত। এবং এই অন্যান্য সভ্যতার তালিকায় আবার প্রথম ও প্রধান হল 'ইসলামি সভ্যতা'। আর পশ্চিমী সভ্যতা বলতে তিনি বোঝেন মূলত পশ্চিমী-খ্রিস্টীয় সভ্যতা, যার নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

অর্থাৎ হান্টিংটনের মতে, শ্রেণী সংগ্রাম নয়, রাজনৈতিক আদর্শের দ্বন্দ্ব নয়, দুনিয়ায় এখন মূল সংগ্রাম একটাই— 'আধুনিক' পশ্চিমী বনাম 'মধ্যযুগীয়' ইসলাম। এর বিরুদ্ধে যিনি প্রথম লিখিত জবাব দিলেন তিনিই এডওয়ার্ড সাঈদ। সাঈদের বক্তব্য হল,

> 'স্যামুয়েল হান্টিংটন একটি ধারণা প্রচার করতে আসরে নেমেছেন, যে ধারণাটিকে তিনি আগেই সত্য বলে স্থির করে নিয়েছেন। হান্টিংটন মোটেই নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন সভ্যতার তুলনামূলক বিচার করেননি, তিনি নিজেই একটি পক্ষের হয়ে লড়াই করছেন, একটি সভ্যতাকে অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে মহত্তর প্রমাণের জন্য ওকালতি করছেন।'

আর একথা ঠিকই 'এটা করতে গিয়ে হান্টিংটন বেছে নিয়েছেন ফাঁকির সহজ পথ। একটি জটিল এবং বহুমাত্রিক বিষয়কে তিনি নিজের সুবিধে মতো তরল করে নিয়েছেন সাথে কিছু চালাক-চালাক কথা তত্ত্বের আকারে পেশ করেছেন, 'সভ্যতার সংঘাত' তেমনি একটি চালাকি।

হান্টিংটন কি হঠাৎ কোন ভুঁইফোড় চিন্তার ধারক? না। বরং পাশ্চাত্যের মহা ডিসকোর্সের অংশ। সাঈদ ঐ ডিসকোর্সেরই বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন আমৃত্যু। তিনি তাঁর স্বচ্ছ চিন্তা আর লাগাতার লেখনীর দ্বারা দেখিয়ে গেছেন প্রতীচ্যের তুলনায় প্রাচ্যকে যে ভাবে হীন ভাবা হতো, বর্বর বলা হতো, প্রাচ্য সেই অর্থে হীন বা বর্বর নয়। পশ্চিমই বরং পূর্বকে বর্বর আখ্যা দিয়েছে, হীন বানিয়েছে, আর তা বানিয়েছে নিজেদের প্রয়োজনেই। এবং এ পথে তাদের টেনে আনে সাম্রাজ্যবাদী জিঘাংসা। পশ্চিমের মানুষেরা এরকম জ্ঞানেরই জন্ম দিয়েছে এতকাল, যে-জ্ঞানের মূল সুরটা হলো প্রাচ্য অসভ্য-বর্বর।

সাঈদ পর-পর বলে গেছেন, কোনওকালেই 'প্রকৃত' কোনও প্রাচ্য ছিল না, প্রাচ্যকে বানানো হয়েছে। বানানো এই প্রাচ্যকে কেন্দ্র করেই প্রাচ্যবাদের আবির্ভাব ঘটে। তিনি মনে করেছেন,

www.pathagar.com

> 'কোনও লেখা বা রচনা নিজের মধ্যেই তার বাস্তবতাকে ধরে রাখে। তাতে থাকে নানা পক্ষের কথা। লেখাটি পড়ার সময় বা বিশ্লেষণের সময় এটা দেখার দরকার নেই যে কোন পক্ষ তাতে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে, পাঠকের বা সমালোচকের সংগ্রাম হবে সম্ভাব্য সবগুলো পক্ষকে ওই লেখার মধ্যে খুঁজে বের করা এবং তাদের মধ্যকার আন্তসম্পর্ক বিচার করে দেখা। এখন আমরা যে উত্তর-ঔপনিবেশিক রচনা লিখছি বা বয়ান (ডিসকোর্স) করছি, সমালোচকের সংগ্রাম হবে তার মধ্যে কী রকম কোন কোন ধরনের পক্ষ আছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা। বাস্তবতা কী, আর লেখক আদতে কোন বাস্তবতার কথা বলছেন, বিচার করে দেখতে হবে এই দুয়ের সম্পর্ক।'

সাথে সাথে এটিও বিবেচনায় আনতে হবে যে পশ্চিম তাদের ডিসকোর্স নির্মাণে সফল হয় কেন? এবং আমরা কেন অবরুদ্ধ হই।

সালমান রুশদীর সাথে এক আলাপে সাঈদ বলেছেন,

> 'আমাদের ক্ষেত্রে বাস্তব ব্যাপার হল আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা, এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতির দিকে দৌড়াতে চাই। আমরা যাযাবরের মত, এবং সম্ভবত আমরা শংকর জাতিভুক্ত মানুষ ছাড়া নিজেদের ভাবতেই পারি নাই। আমাদের অবরুদ্ধতাকে আমাদের এই প্রবণতাই আরও বেশি দীর্ঘায়িত করে রেখেছে।'

আমাদের একালের কথিত শিক্ষিত আধুনিক মানুষগুলোর ভাবনার ইতিহাস আর চিন্তার বর্তমান দেখলে বোঝা যায় এ-যেন সেই যাযাবরদেরই ছোটাছুটি। যাদের আর নিজের বলে কিছুই অবশেষ নেই। তারা বয়ান করে। নাগরিকের নতুন সংজ্ঞার ব্যাখ্যা দেয়। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি জপে। তাদেরই ভাবনা লালন করে। চিন্তা প্রয়োগ করে। এমনকি তাদের দুর্গন্ধকেও সুন্দর জ্ঞান করতে লজ্জা পায় না- কেননা তারা'ত তিনশত বছরের কলোনির দান ভুলতে পারে নি।

ভারতীয় চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী তাঁর '*ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব*' গ্রন্থে তাই উল্লেখ করেছেন,

> 'রাষ্ট্রশাসন, বাদশাহি এবং বিজয় ও আধিপত্য, দু'প্রকার : প্রথমটি মানসিক ও নৈতিক আধিপত্য, আর দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক ও বস্তুগত। প্রথম শ্রেণীর আধিপত্য হলো, কোনো জাতি যখন চিন্তা, গবেষণা আবিষ্কার ও মানসিক শক্তিতে বিপুলভাবে উন্নতি লাভ করে, তখন অন্যান্য জাতি স্বভাবতই তার চিন্তাদর্শের প্রতি ঈমান পোষণ করে। তার ধ্যান ধারণা, ধর্ম বিশ্বাস ও মতাদর্শ তাদের মন মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে ফেলে; তারই ছাঁচে তাদের মানসিকতা গড়ে ওঠে। তার সভ্যতাই তাদের আপন সভ্যতায় পরিণত হয়। তার জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই তারা নিজস্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করে নেয়। এমনকী, তার ভালোমন্দও সত্যাসত্যের মানদণ্ড বলে বিবেচিত হয়।
>
> দ্বিতীয় প্রকার আধিপত্য হলো, কোনও জাতি যখন বস্তুগত সমৃদ্ধির দিক থেকে অতীব শক্তিশালী হয়, তখন তার মোকাবিলায় অন্যান্য জাতি নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সামগ্রিকভাবে কিংবা আংশিকভাবে অন্যান্য জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর জেঁকে বসে।'

মওদুদী আরো উল্লেখ করেছেন,

> 'পক্ষান্তরে গোলামি বা পরাধীনতাও দু'প্রকার : প্রথমটি মানসিক আর দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক। উপরে আধিপত্য প্রসঙ্গে দু'টো শ্রেণীর যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে,

www.pathagar.com

গোলামির এ দু'টো শ্রেণী ঠিক তার বিপরীত।

এক হিসেবে আধিপত্যের এই দু'টো শ্রেণী সম্পূর্ণ আলাদা। কোথাও মানসিক প্রাধান্য বিস্তৃত হলে রাজনৈতিক আধিপত্যও প্রতিষ্ঠিত হবে, এমনটি অনিবার্য নয়। কিংবা রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে মানসিক প্রাধান্যও কায়েম হয়ে যাবে, এরও কোনও বাধা-ধরা নিয়ম নেই। তবে প্রকৃতির নিয়ম এই যে, কোনও জাতি চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা এবং জ্ঞান সাধনা ও তথ্যানুসন্ধানের পথে অগ্রসর হলে, মানসিক উন্নতির সাথে সাথে বৈষয়িক অগ্রগতিও সে অর্জন করে। পক্ষান্তরে কোনো জাতি চিন্তা জ্ঞান-গবেষণার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়লে মানসিক অবনতির সাথে সাথে তার বৈষয়িক অধঃপতনও শুরু হয়ে যায়। পরন্তু আধিপত্য, শক্তিমত্তা আর পরাধীনতা দুর্বলতার পরিণতি বিধায় মানসিক ও বৈষয়িক দিক থেকে দুর্বল ও নির্বীর্য জাতিগুলো তাদের দুর্বলতার পথে এগিয়ে চলে, সেই অনুপাতেই তারা গোলামি ও পরাধীনতার শিকার হতে থাকে; আর এই উভয় দিক থেকে শক্তিমান জাতিগুলো তাদের মন-মগজ ও দেহ-সত্তার ওপর কর্তৃত্বশীল হয়ে বসে।'

বহু বছর পর এডওয়ার্ড সাঈদ আরো বিস্তৃতভাবে এসব কিছুই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন আবিশ্ব বিবেককে। তাঁর এই ক্ষুরধার চিন্তার জন্য কথিত মুক্ত চিন্তার দেশেও তাঁকে নিন্দা করা হয়েছে 'প্রফেসর অব ভায়োলেন্স'রূপে; যদিও *সময়* এই মহানকে আখ্যা দিয়েছে যুগের মেসাইয়া, ত্রাতারূপে। সাঈদ ছাপিয়ে গেছেন প্যালেস্টাইন, মধ্যপ্রাচ্য তথা সমগ্র প্রাচ্য হয়ে আবিশ্ব মানবীয় বিবেকের কণ্ঠস্বররূপে। বর্তমান সংকলন পশ্চিমি জ্ঞানের বিরুদ্ধে সাঈদের সেই মহালড়াইয়ের সামান্য পরিচিতি মাত্র।

পাঠক চিত্তে এই পরিচিতি সৃষ্টিতে গ্রন্থটি যদি কিঞ্চিত ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় তাহলেই অধম সম্পাদক তৃপ্ত হওয়ার আয়োজ রাখে।

আর একটি বিষয় জানানো খুবই জরুরি যে, এই বিশাল সংকলনে যাঁদের লেখা গ্রহণ করা হয়েছে তাঁদের অনেকেরই রয়েছে নিজস্ব বানান রীতি যা আমি রক্ষা করার চেষ্টা করেছি।

পূর্বেই বলেছি, এটি শুধুই সাঈদ নামক একটি বিশাল ক্যানভাসের পরিচিতি মাত্র। সে কারণে এর রয়েছে পৃথক পৃথক কয়েকটি অধ্যায় যেমন :

সাঈদ সম্পর্কে লেখা

সাঈদের বই আলোচনা

সাঈদের সাক্ষাতকার এবং

সাঈদের নিজের বহুমাত্রিক লেখা।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই প্রচেষ্টায় বহু ত্রুটি রয়েছে। বিশ্বাস করি, যা পাঠক ক্ষমার চোখে দেখবেন নিশ্চয়!

এখন আমি আরও কিছু কথা বলতে চাই, যা আমার বিশ্বাস। জগতে মনুষ্য সৃষ্ট কোনও ঘটনাই ব্যক্তি মানুষের সৃষ্টি নয় বরং তা নানামাত্রিক সমগ্রের চেষ্টার ফসল। এই সংকলনটিতেও তেমনি রয়েছে অসংখ্য জনের সংযুক্তি। আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ ওই সমস্ত লেখক ও অনুবাদকদের কাছে যাঁরা কালির স্রোত হয়ে বহমান রয়েছেন এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায়। আমি ঋণী কবি, চিন্তাবিদ ফরহাদ মজহারের কাছে যিনি আমাকে সাঈদ

www.pathagar.com

চিনিয়েছেন। আমি চির ঋণী তাঁদের কাছে যাঁদের অনুপ্রেরণা আমাকে গতি ও সাহস যুগিয়েছে। বিশেষত সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নৃ-বিজ্ঞানী রেহনুমা আহমেদ, নিউইয়র্ক ভিত্তিক মিডিয়া এক্টিভিস্ট নাঈম মোহাইমেন, আরিফ আহমেদ এবং আমার বন্ধু মহল– ফরিদ আহমেদ, রাজনীতিক মেহেদুর রহমান টুটুল, অধ্যাপক পাভেল চৌধুরী, লেখক আহমাদ মাযহার, ভোরের কাগজের সাহিত্য সম্পাদক অনু হোসেন, নবযুগ প্রকাশক অশোক দা, কবি সাখাওয়াত টিপু, লেখক সারফুদ্দিন আহমেদ প্রমুখের কাছে।

আর যাঁর ঋণ এই অধমের পক্ষে শোধ সম্ভব নয় তিনি আমার প্রিয় রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমর যিনি তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে এই সংকলনের ভূমিকা রচনা করে দিয়েছেন। আর অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই প্রকাশক গল্পকার পারভেজ হোসেনকে যিনি এই সংকলনকে মানব দরবারে উপস্থাপন করেছেন।

বেনজীন খান
৩১৬/৪, জাফরাবাদ, পুলপাড়
পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৭।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা
ভূমিকা : বদরুদ্দীন উমর

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ সম্পর্কে

এডওয়ার্ড সাঈদ কেন গুরুত্বপূর্ণ ২৮
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
তত্ত্বের সীমানাভাঙ্গন এবং এডওয়ার্ড সাঈদ ৫৪
ফকরুল আলম
অনুবাদক : শহীদুল ইসলাম ও ইফতেখার উদ্দিন
একবাল আহমদ, এডওয়ার্ড সাঈদ ও 'ইসলাম' ৬৫
ফরহাদ মজহার
অসম্পূর্ণ আধুনিকতা উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদের সহচর
এডওয়ার্ড সাঈদের সাহিত্যভাবনা ৮৪
বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর
এডওয়ার্ড সাঈদ : একজন বুদ্ধিযোদ্ধার প্রতিকৃতি ৯১
খোন্দকার আশরাফ হোসেন
এডওয়ার্ড সাঈদ : গণবুদ্ধিজীবীর দায় ৯৭
রাশিদ আসকারী
এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ : মননযোদ্ধার শেষ বাক্য ১০১
সিরাজ কাজী
এডওয়ার্ড সাঈদ : লেখা যখন সক্রিয়তা ১০৭
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
এডওয়ার্ড সাঈদ : তাঁর প্রয়াণে ১১৪
আবু দায়েন
এডওয়ার্ড সাঈদ ও পশ্চিমের প্রাচ্য দর্শন ১১৮
বখতিয়ার আহমেদ

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক অতিপ্রকাশ ও সাম্রাজ্যবাদী বাসনার ইতিবৃত্ত ১২৪
আ-আল মামুন
এডওয়ার্ড সাঈদ : এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের বিদায় ১৩৩
এনামুল হক
নির্বাসিতের বেদনা : এডওয়ার্ড সাঈদের চিন্তাজগৎ ১৩৮
ফাহমিদ-উর-রহমান
এডওয়ার্ড সাঈদ : নিপীড়িতের কণ্ঠস্বর ১৪৬
নাদিম হক মণ্ডল
বুদ্ধিজীবী এবং মুক্তির উচ্চারণ, প্রসঙ্গ : এডওয়ার্ড সাঈদের চিন্তা-ভাবনা ১৫০
আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
এডওয়ার্ড সাঈদের প্রাচ্যভাবনা ১৫৩
শফি আহমেদ
এডওয়ার্ড সাঈদ ১৫৯
সুজাত ভদ্র
এডওয়ার্ড সাঈদ : খ্যাতিমান ফিলিস্তিনি বোদ্ধা ও যোদ্ধা ১৬৩
সাঈফ ইবনে রফিক
এডওয়ার্ড সাঈদ : এক ফিলিস্তিনি কণ্ঠস্বরের বিদায় ১৬৬
রবার্ট ফিস্ক
অনুবাদক : তৌফিক আজিজ
বিশ্বস্ত বন্ধুকে হারালাম ১৬৯
আহদাফ সৌফ
এডওয়ার্ড সাঈদ ও ওরিয়েন্টালিজম ১৭১
জাকারিয়া শিরাজী

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের বই সম্পর্কে

একটু দূরে থাকুন, একটু নির্জনে ১৮৪
অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়
'বাসভূমের বাইরে': এডওয়ার্ড সাঈদের আত্মজীবনী ১৯৬
সালাহউদ্দীন আইয়ুব
'ঘরেরও নয় পারেরও নয়' : এডওয়ার্ড সাঈদের **আউট অফ প্লেস** ২০৮
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড সাঈদ-এর *ওরিয়েন্টালিজম* : ভিন্ন পাঠ ২২১
ফাহ্‌মিদ-উর-রহমান
এডওয়ার্ড সাঈদের বিশ্বখ্যাত বই : *দ্য কোয়েশ্চেন অব প্যালেস্টাইন* ২২৭
সেলিম ওমরাও খান

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের লেখা

ওরিয়েন্টালিজম-এর ভূমিকা ২৩২
অনুবাদক : জাকারিয়া শিরাজী
জ্ঞান এবং তাফসীর ২৫৩
অনুবাদক : রেহনুমা আহমেদ
উপনিবেশিত'র পরিবেশন : নৃবিজ্ঞানের আলাপচারীগণ ২৬৩
অনুবাদক : রেহনুমা আহমেদ
সার্ত্রের সঙ্গে আমার বিরোধ ২৮৭
অনুবাদক : সারফুদ্দিন আহমেদ
আমার গুরু ২৯৬
অনুবাদক : শরীফ আতিক-উজ-জামান
নাগিব মাহফুজ ও উত্তরসাহিত্য ৩০৬
অনুবাদক : দিলীপ কুমার দত্ত
অপবাদ, সংশোধনবাদী রীতি ৩১৭
অনুবাদক : শরীফ আতিক-উজ-জামান
সাদ্দাম হোসেনের চালের পশ্চাদপট ৩২২
অনুবাদক : মানস চৌধুরী
গোলকায়নের সংকট ৩২৬
অনুবাদক : মোস্তফা জামান
সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃণ্য যুদ্ধ ৩৩৭
অনুবাদক : মশিউল আলম
ইসলাম এবং পাশ্চাত্য অসম্পূর্ণ ছায়াতল ৩৪০
অনুবাদক : বরকত উল্লাহ্ মারুফ
মার্কিন মুলুকে মুসলমানদের প্রতি বৈষম্য ৩৪৪
অনুবাদক : সাহাদত হোসেন খান
আমরা কখন প্রতিবাদী হবো ? ৩৪৯
অনুবাদক : মাসুদা ভাট্টি
বেঁচে থাকার পর কি ঘটবে? ৩৫৪
অনুবাদক : মশিউল আলম

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের সাক্ষাতকার

ফিলিস্তিনিদের পরিচয় সন্ধানে
এডওয়ার্ড সাঈদের সঙ্গে সালমান রুশদীর বাক-বিনিময় ৩৫৯
অনুবাদক : সাখাওয়াত টিপু ও সারফুদ্দিন আহমেদ
দি প্রোগ্রেসিভ পত্রিকার সাথে এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের কথোপকথন ৩৭৪
ডেভিড বার্সামিয়ান
অনুবাদক : সালমা রহমান শুভ্রা
'ক্লাস নেয়ার সময়ই আমি জ্ঞানলাভ করেছি' ৩৮০
দময়ন্তী দত্ত
অনুবাদক : শেখ আবদুর রহমান
'পশ্চিমারা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে আরবদের কোণঠাসা করেছে' ৩৮৪
তারিক আলী
অনুবাদক : সারফুদ্দিন আহমেদ

পরিশিষ্ট

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ : জীবন ও গ্রন্থপঞ্জি ৩৮৯
বেনজীন খান

www.pathagar.com

ভূমিকা

এডওয়ার্ড সাঈদের ওপর অনেকের রচনা এবং সাঈদের নিজেরও কিছু রচনার অনুবাদ এই স্মারক গ্রন্থটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রচনাগুলোর কোন পর্যালোচনা অথবা সাঈদের অসামান্য পাণ্ডিত্য ও কর্মময় জীবনের ওপর কোন সাধারণ আলোচনাও এই ভূমিকার উদ্দেশ্য নয়। এখানে আমি তাঁর চিন্তা-ভাবনা, রচনা ও কর্মজীবনের নির্দিষ্ট কয়েকটি দিক সম্পর্কেই সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করবো।

এডওয়ার্ড সাঈদের Orientalism এবং Culture and Imperialism বলা চলে সম্পূরক (Complementary) গ্রন্থ। এদের পারস্পরিক যোগসূত্র খুব স্পষ্ট। যদিও দ্বিতীয় গ্রন্থটি লেখা হয়েছে প্রথমটির কিছু পরে। অপেক্ষাকৃত বিখ্যাত Orientalism-এ সাঈদ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য চর্চা ও গবেষণার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে অসংখ্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন সেগুলোর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের, বিশেষতঃ বৃটিশ, ফরাসী ও সেই সাথে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ যে প্রতিফলিত হয়েছে এতে সন্দেহ নেই। এই স্বার্থের বিষয়টি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেও জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য চর্চা ক্ষেত্রে ঠিক কি কারণে সাম্রাজ্যবাদী গবেষক ও সাহিত্যিকদেরকে এ কাজ করতে হয়েছে তার কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা Orientalism-এ নেই। এই ব্যাখ্যাই তিনি দিয়েছেন তাঁর Culture and Imperialism গ্রন্থে। ডেভিড বারসামিয়ানের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলছেন, "Orientalism did something fairly limited, although it covered a lot of ground. I was interested in Western perceptions of the Orient and in the transformation of those aims into Western rule over the Orient." (David Barsamian, The Pen and the Sword, Common Courage press. 1994, P. 63) । অন্য বইটি সম্পর্কে তিনি বলছেন, "Culture and Imperialism is in a certain sense a sequel to that..." (ঐ)। এর পরই তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হলো, "I think one of the main flaws in the enormous literature in economics and political science and history about imperialism is that very little attention has been paid to the role of culture in keeping an empire maintained." (ঐ P. 65-66)।

সংস্কৃতির এই ভূমিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এ বিষয়ে নিজের উপলব্ধি সম্পর্কে তিনি যা বলছেন সেটা একটু বিস্তারিতভাবে এখানে উদ্ধৃত করা দরকার। "But what we need to understand is how very often the force of, say, the British army in India was very minimal in a way, considering the vast amount or territory that they administered and held. What you have instead is a programme of ideological pacification whereby, for example, in India the system of education, which was

www.pathagar.com

promulgated in the 1830's, was really addressing the fact that the education of Indians under the British should teach the Indians the superiority of English culture over Indian culture. And of course when there was a revolt, as in the case of the famous so-called Indian Mutiny – 1857, then it was dealt with force, mercilessly, brutally, definitively. Then the facade could be re-erected and you could say, 'we're here for your sake and this is beneficial for you. So it was force, but much more inportant in my opinion, than force, which was administered selectively, was the idea inculcated in the minds of the people being colonized that it was their destiny to be ruled by the West" (ঐ P 67-68)। শাসন ক্ষেত্রে সংস্কৃতির যে ভূমিকার কথা এখানে এডওয়ার্ড সাঈদ বলেছেন, এ ভূমিকা শুধু সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে যেখানেই সংখ্যালঘু সম্পত্তি মালিকরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে, সেখানেই সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসিত মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তারা সাংস্কৃতিক আধিপত্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রাচীন ইতিহাসে এই সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মুখ্য রূপ ছিল ধর্মের শাসন। এ কারণে প্রাচীন ও মধ্য যুগে পুরোহিত, পাদ্রী ও মোল্লারা এবং আধুনিক যুগে প্রধানতঃ বুদ্ধিজীবীরা, ঐতিহাসিকভাবেই এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় বরাবরই অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। এদের এই ভূমিকা ছাড়া শুধু অস্ত্র বা সামরিক শক্তির জোরে সব সময়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষকে অল্প সংখ্যক সম্পত্তি মালিকের পক্ষে নিজেদের অনুগত ও পদানত রাখা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অস্ত্রের ব্যবহার অর্থাৎ বলপ্রয়োগ করা হয় বিশেষ অবস্থায় যখন সাংস্কৃতিক আধিপত্য বা চিন্তা ক্ষেত্রে দাসত্বের বিরুদ্ধে মানুষ বিদ্রোহ করে। শাসন পরিচালনা ক্ষেত্রে সংস্কৃতিকে যতই সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা হোক, এই বলপ্রয়োগের ক্ষমতা যদি শাসক শ্রেণীর না থাকে তাহলে তারা শাসনের অযোগ্য হয়, শাসন ক্ষমতা থেকে তারা উচ্ছেদ হয়ে যায়। এ কারণে বলপ্রয়োগকারী সংগঠন পুলিশ, সামরিক বাহিনী ইত্যাদি সশস্ত্র শক্তি শাসক শ্রেণী ও রাষ্ট্রের এক অপরিহার্য অঙ্গ।

যে কোন দেশের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে এ ব্যাপারে যা সত্য সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রেও একই কারণে, সেটা সত্য। বলা চলে, আরও বেশী সত্য। কারণ দেশীয় শাসন ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণী সংখ্যালঘু হলেও দেশে তাদের একটা সামাজিক ভিত্তি থাকে, নানা প্রকার সম্পর্কের সূত্র সমাজে মূলের মত বিস্তৃত থাকে। কিন্তু বহিরাগত সাম্রাজ্যবাদীর ক্ষেত্রে সেটা থাকে না। কাজেই যারা শুধু লুটপাট করে চলে না গিয়ে অন্য দেশে নিজেদের শোষণ-শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখতে চায় তাদেরকে সাংস্কৃতিক বিষয়ে মনোযোগ দিতেই হয়। ভারতে সুলতান মাহমুদের লুটপাটের সাথে মোগল শাসনের তুলনা করলে এটা সহজেই বোঝা যায়। শুধু মোগলরাই নয়, যে মুসলমান শাসকরা ভারতবর্ষ আক্রমণ ও জয় করে শাসক হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তারা এ দেশে জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করার কাজে নিযুক্ত ছিল। মোগল আমলে এসে এই প্রচেষ্টার একটা পরিণত রূপ দেখা যায়। এ কাজ করতে গিয়ে আকবরকে 'দীন এলাহী' নামে একটি নোতুন ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা পর্যন্ত করতে হয়েছিল। এছাড়া ফার্সী ভাষার মাধ্যমে এক বড় রকম সাংস্কৃতিক প্রভাব ভারতীয় জনগণের শিক্ষিত অংশের ওপর ছিল

www.pathagar.com

হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে। এ কারণে বৃটিশ শাসন শুরুর দীর্ঘদিন পরও, এমনকি ১৮৩০-এর দশকেও বাঙলাদেশের শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে ফার্সী ভাষা ও মুসলিম সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়, রামমোহন রায় থেকে নিয়ে দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় পর্যন্ত।

নিছক লুটপাটকারী, গজনীর সুলতান মাহমুদ, নাদির শাহ বা আহমদ শাহ আবদালীর মত রাজপুরুষ ছাড়া অন্য যারাই স্থিতিশীল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে তারা একটা অতি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে সংস্কৃতির ব্যবহার করেছে, ঐ ব্যবহারের মধ্যে ব্যাপক অর্থে ধর্মের ব্যবহারও বরাবর অন্তর্ভুক্ত থেকেছে। আকবর কর্তৃক নোতুন ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা এরই এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর Orientalism এবং Culture and Imperialism নামক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ দু'টিতে প্রাচ্যের প্রতি পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আদর্শ ক্ষেত্রে এই নীতি তারা কিভাবে কার্যকর করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, যে বিবরণ সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে মানুষের চোখ খুলে দেওয়ার মতই ব্যাপার। কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থায় সংস্কৃতির ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর ধারণা Culture and Imperialism লেখার সময় যতখানি স্পষ্ট হয়েছিল Orientalism লেখার সময় ততখানি স্পষ্ট ছিল বলে মনে হয় না। এই অস্পষ্টতার কারণে Orientalism গ্রন্থে এমন বেশ কিছু কথা তিনি বলেছেন এবং তার মধ্যে এমন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আছে যা তাঁর সামগ্রিক বক্তব্যের গ্রাহ্যতা কিয়দংশে খর্ব করে। এ বিষয়ে পরে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাবে।

শাসন ক্ষেত্রে সংস্কৃতির ব্যবহার ও ভূমিকা সম্পর্কে ১৯৬০-এর দশক থেকে আমি নিজে বেশ কিছু লিখেছি। প্রগতিশীল ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে জনগণের সাংস্কৃতিক ও চিন্তাগত পশ্চাৎপদতা কতখানি বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং এই পশ্চাৎপদতা শাসক শ্রেণী কিভাবে ও কত প্রকারে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে এ বিষয়েও আমি বিস্তারিতভাবে লিখেছি। এ কথা এখানে উল্লেখ করার প্রাসঙ্গিকতা এই যে, এই অসুবিধের কারণে শুধু যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাধার সম্মুখীন হয় তাই নয়, ঔপনিবেশিক যুগের অবসানের পর দেশীয় শাসক শ্রেণীর আমলেও জনগণের ওপর নানাভাবে সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ জারী রেখে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় জনগণকে পদানত রাখা হয়। দেশীয় শাসক শ্রেণী কর্তৃক তাদের সাথে এমন ব্যবহার করা হয় যা তারা ঔপনিবেশিক শাসকদের থেকে পেতো। বিদেশীর পরিবর্তে দেশীয় প্রভুর আবির্ভাবই সারা বিশ্বে ঔপনিবেশিক যুগের অবসানের পর দেখা গেছে। জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব এবং সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার সাথে এই পরিস্থিতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

জাতীয় রাষ্ট্রের নামে এই ধরনের দেশীয় শাসকদের আবির্ভাবের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে সাঈদ বলছেন, "One of the great tragedies is what happened in the Third World, the onset of nationalism... what interests me a great deal is that when nationalism is triumphant and independence is achieved, too often nationalism can sink back down into a kind of tribalism, atavism, statism, and along with that becomes, for example in many parts of the Arab world today, a neo-imperialist state, still controlled by outside powers and in which the ruling elite are in

www.pathagar.com

effect agents and clients of one of the dominant powers." (ঐ P. 79) ।

এই পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হতে পারে সে জন্য অনেকেই এর বিরুদ্ধে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। এ রকম একজন হলেন ফ্রানজ্ ফ্যানোঁ। তাঁকে কিছুটা উদ্ধৃত করে এডওয়ার্ড সাঈদ বলছেন, "For example, Fanon says, We aren't going to fight this revolution against the French in order to replace the French policeman with an Algerian policeman. That's not the point. We are looking for liberation, liberation is much more than becoming a mirror image of the white man whom we've thrown out and just replacing him and using his authority. So I am very interested in that distinction, between liberation and a kind of mindless nationalism". (ঐ P 79-80) ।

এখানে সাঈদ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশীয় বুর্জোয়াদের জাতীয়তাবাদকে "mindless nationalism" বললেও "mindless nationalism" বলে কিছু নেই। এই জাতীয়তাবাদ হলো সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ও দালাল দেশীয় বুর্জোয়াদের জাতীয়তাবাদ, যার একটা নির্দিষ্ট শ্রেণী ভিত্তি আছে। যেহেতু এডওয়ার্ড সাঈদ শ্রেণী বিশ্লেষণ করেন না এবং বলেন, "I can't really generalize in terms of class." (ঐ 77) সে কারণে একে তিনি আখ্যায়িত করতে পারেন "mindless nationalism" নামে যা একটা ধোঁয়াটে ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। এই জাতীয়তাবাদের যারা ধারক বাহক তাদের একটা শ্রেণী ভিত্তি তো থাকেই, উপরন্তু এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তাদের একটা সাংস্কৃতিক এবং আদর্শগত অবস্থানও থাকে।

এই অবস্থানকে এডওয়ার্ড সাঈদ যে একেবারে অস্বীকার করেন তা নয়, তবে এর প্রকৃত চরিত্র, শ্রেণী চরিত্র নিয়ে তিনি কোন কথা বলেন না। কাজেই এ প্রসঙ্গে তিনি অন্য ভাবে কথা বলতে গিয়ে বলেন, "In any society not totalitarian, then, certain cultural forms predominate over others just as certain ideas are more influential than others; the form of this cultural leadership is what gramsci has identified as hegemony, an indispensable concept for any understanding of cultural life in the industrial West". (Edward W. Said, Orientalism, Penguin Books, 1995. P. 7) ।

এক ধরনের ভাবনা অন্য ধরনের ভাবনাকে প্রভাবিত করে এবং এই প্রভাবশালী ভাবনা বা সাংস্কৃতিক নেতৃত্বকেই গ্রামচি বলছেন, 'hegemony' বা 'আধিপত্য'। এখানে লেনিনের মত গ্রামচি স্পষ্ট করে বলছেন না যে, এই আধিপত্য মূলতঃ শ্রেণী আধিপত্য, এই আধিপত্য যারা বিস্তার করে তারা বস্তুতঃপক্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক এবং তারাই হলো শাসক শ্রেণী। লেনিন স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, যে কোন সমাজে ও রাষ্ট্রে শাসক শ্রেণীর সংস্কৃতির প্রাধান্য থাকে, অন্যদের ওপর তা প্রাধান্য বিস্তার করে। এই প্রাধান্য তারা প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাদীক্ষা, ধর্ম, প্রচার মাধ্যম ইত্যাদির দ্বারা। কাজেই বুর্জোয়া রাষ্ট্রে জাতীয় সংস্কৃতির অর্থই হলো, তাতে শাসক শ্রেণীর সংস্কৃতির প্রাধান্য থাকা। গ্রামচি তাঁর hegemonyর কথা বলার সময় যেহেতু এর শ্রেণী চরিত্র অস্পষ্ট রাখেন সে জন্য তিনি Civil Society ও Political Societyর মধ্যেও এমন পার্থক্য করেন যাতে মনে হয় এরা পরস্পরের থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন। এদিক দিয়ে মার্কসের সিভিল সোসাইটির ধারণা থেকে গ্রামচির সিভিল সোসাইটির ধারণার অনেক পার্থক্য। গ্রামচির মতে সংস্কৃতি হলো,

www.pathagar.com

Civil Societyর ব্যাপার এবং Political Societyর কাজ হলো সরাসরি শাসন করা। কিন্তু এই সরাসরি শাসকরাই যে নিজেদের শ্রেণী অবস্থানের ওপর দাঁড়িয়ে সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার করে ও বজায় রাখে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি গ্রামচির তত্ত্বে আড়াল থাকে। যেহেতু এডওয়ার্ড সাঈদ শ্রেণী বিশ্লেষণের দিকে যান না, এ জন্য লেনিনের খুব স্পষ্ট সূত্রায়নের থেকে গ্রামচির এই ধরনের ধোঁয়াটে তত্ত্বের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ। শুধু তাই নয়, এই একই কারণে গ্রামচির এই ধরনের বক্তব্য পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণভাবে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী মহলেও যথেষ্ট সমাদৃত।

Orientalism এ এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ব্যবহার করে যথার্থভাবেই দেখিয়েছেন কিভাবে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা প্রাচ্যকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে সেখানকার জনগণকে বিকৃতভাবে উপস্থিত ও চিত্রিত করেছে এবং নানা প্রকারে প্রাচ্যের সংস্কৃতির বিকৃতি ঘটিয়েছে। তিনি বলছেন, "For Orientalism brings one up directly against that question-that is-to realizing that political imperialism governs an entire field of study, imagination, and scholarly institutions - in such a way as to make its avoidance an intellectual and historical impossibility. (Orientalism P. 13-14)।

Orientalism-এ এই দিকটির ওপর শুধু জোর দেওয়া নয়, এর অন্য কোন দিক এ গ্রন্থটি লেখার সময় তাঁর দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় অথবা ঠিকমত না হওয়ায় তিনি একে এমন এক বিষয় হিসেবে দেখেছেন যার দ্বারা পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরা বলা চলে স্থূলভাবে শুধু নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থই উদ্ধার করেছে।

এডওয়ার্ড সাঈদের মূল বক্তব্য এ ক্ষেত্রে সঠিক হলেও Culture and Imperialism এ সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের যে ভূমিকা তিনি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করেছেন সেটা তিনি তাঁর Orientalism এ লক্ষ্য করেন নি। কাজেই ওপরের বক্তব্যের ঠিক পরই তিনি বলছেন, "Yet there will always remain the perennial escape mechanism or saying that a literary scholar and a philosopher, for example, are trained in literature and philosophy respectively, not in politics or ideological analysis. In other words, the specialist argument can work quite effectively to block the larger and, in my opinion, the more intellectually serious perspective." (Orientalism P. 14)

এখানে দুটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। প্রথমতঃ সাঈদ বলছেন যে সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি যাই তারা চর্চা করুক, যে বিষয়েই গবেষণা ইত্যাদি করুক, তারা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা করা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে তা করেছে বা করছে এমন মনে করা সঙ্গত নয়। উপরন্তু তা মনে করলে এই সব চর্চার আধিমানসিক (intellectual) পরিপ্রেক্ষিৎ-এর পরিচয়ই আড়াল করা হবে।

মোটা দাগে একথা সত্য হলেও, এ বিষয়ে সাঈদ যেভাবে সাধারণীকরণ করেছেন সেটা সঠিক মনে করার কারণ নেই এ জন্য যে, প্রত্যেক পশ্চিমা সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিকের মূল্যায়ন এভাবে করলে বলতে হয় যে তাদের কারও মধ্যেই আধিমানসিক সততা বলে কিছুই ছিল না ও নেই, প্রত্যেকেই মতলববাজ। এই দৃষ্টি থেকে দেখলে মেকলে ও কিপলিং-এর সাথে সকলকেই এক করে দেখতে হয়। তাছাড়া মানুষ যে সত্যিকারভাবে জ্ঞান চর্চা এবং গবেষণার উদ্দেশ্যেও কিছু করতে পারে এ

www.pathagar.com

ধারণারও বিরোধিতা করতে হয়। কিন্তু বাস্তবতঃ দেখা যায় যে, প্রাচ্যবিদদের মধ্যে সকলে মেকলে ও কিপলিং এর কাতারের লোক নন। এঁরা অনেকেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই প্রাচ্য বিদ্যা চর্চা করেছেন, গবেষণার মাধ্যমে প্রাচ্যের অনেক হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন গ্রন্থ শুধু উদ্ধার করেন নি, তার অনুবাদ করেছেন, তার টীকা ভাষ্য তৈরী করেছেন। ঋগ্বেদ পানিনির সময়েই প্রায় দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছিল। সায়নাচার্য খৃস্টীয় চোদ্দ শতকে তার একটা ভাষ্য (সায়ন ভাষ্য) তৈরী করেন। কিন্তু পরে ইউরোপীয়, বিশেষতঃ জার্মান পণ্ডিতরাই সম্পূর্ণ বেদ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন এবং তার দুর্বোধ্য অংশগুলির অর্থ বোঝার চেষ্টা করেন। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন তো বলা চলে, ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের পরিশ্রম এবং অনুশীলনের মাধ্যমেই ভারতীয় এবং অন্যদের হাতে এসেছে। এদিক দিয়ে জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্স মূলারের মত ব্যক্তিকে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে নিযুক্ত গবেষক বলে আখ্যায়িত করা একেবারেই যথার্থ নয়। শুধু দর্শনই নয়, ভারতের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও বৃটিশ এবং ইউরোপীয়দের অবদান বিশাল। তারাই নিজেদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভারতবর্ষের ইতিহাসের, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন। তাঁদের এ প্রচেষ্টা না থাকলে ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে আমরা অনেকদিন পিছিয়ে থাকতাম। এ কথা ঠিক যে, এই ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে তারা অনেকভাবে ইতিহাস বিকৃত করেছে এবং ইতিহাস চর্চা ক্ষেত্রে জেম্স্ মিলের মত বিভ্রান্তিও সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এ সব হিসেবে রেখেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের, দার্শনিক, ইতিহাসবিদদের অবদান আমাদের দেশের জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে অসামান্য।

এছাড়া ভারতবর্ষের মত উপনিবেশে বৃটিশ শাসকদের জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার অন্য একটি দিকও আছে যে বিষয়ে এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর Culture and Imperialism গ্রন্থে আলোচনা করেছেন এবং যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। এ দিকটি হলো, অধিকৃত দেশের জনগণের মধ্যে এমনভাবে শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চার ব্যবস্থা করা ও বিকাশ ঘটানো যার ফলে তারা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসক শক্তিকে নিজেদের জীবন, জীবিকা, শিক্ষা, সংস্কৃতির জন্য প্রয়োজনীয় মনে করে এবং স্বেচ্ছায় তাদের অধীনস্ত থাকে, যাতে তারা শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে। মেকলের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দেরকে এমন শিক্ষা দেওয়া যাতে শারীরিক দিক দিয়ে তারা ভারতীয় হলেও চিন্তা-ভাবনা, সংস্কৃতির দিক দিয়ে তারা আর ভারতীয় থাকবে না, তারা হবে তাদের পশ্চিমা শাসকদের মতই।

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রাচ্যকে নানাভাবে ব্যবহার ও প্রাচ্যের অনেক কিছুই বিকৃত করার বিষয় চিন্তা ও আলোচনা করতে গিয়ে এডওয়ার্ড সাঈদ এমন একভাবে সীমা-লঙ্ঘন করেছেন যার কোন প্রকৃত ব্যাখ্যা তাঁর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মধ্যে পাওয়া যায় না। এটা দাঁড়িয়ে যায় শুধু পাশ্চাত্যের এমন প্রাচ্য বিরোধিতায় যাকে মনে হয় এক ধরনের জাতিগত ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে Orientalism সম্পর্কে সাঈদের নিজের ধারণা বা সংজ্ঞার বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। তিনি Orientalism গ্রন্থটির একেবারে শুরুতেই পর পর Orientalism-এর তিনটি সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন যা একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে স্ববিরোধী।

প্রথম সংজ্ঞা : Anyone who teaches, writes about, or researches the Orient - and this applies whether the person is an anthropologist, sociologist, historian, or

www.pathagar.com

philologist either in its specific or its general aspects, is an Orientalist, and what he or she does is Orientalism. (Orientalism P. 2)

দ্বিতীয় সংজ্ঞা : Orientalism is a style of thought based upon an ontological and epistemological distinction made between "the Orient" and (most of the time) "The Occident". Thus a very large mass of writers, among whom are poets, novelists, philosophers, political theorists, economists, and imperial administrators, have accepted the basic distinction between East and West as the starting point for elaborate theories, epics, novels, social descriptions, and political accounts concerning the Orient, its people, customs, "mind", destiny, and so on. This Orientalism can accommodate Aeschylus, say, and Victor Hugo, Dante and Karl Marx. (Orientalism P. 2-3) ।

তৃতীয় সংজ্ঞা : Taking the late eighteenth century as a very roughly defined starting point Orientalism can be discussed and analyzed as the corporate institution for dealing with the Orient – dealing with it by making statements about it, authorizing views of it, describing it, by teaching it, settling it, ruling over it : in short, Orientalism as a western style for dominating, restructuring, and having authority over the Orient. (Orientalism P. 3) ।

আঠারো শতককে ধরে তিনি যে কাজ শুরু করেছিলেন সেটাই তাঁর গ্রন্থ Orientalism-এর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান দিক। কিন্তু নিজের Orientalism-এর ধারণার বিস্তার ঘটাতে গিয়ে তিনি এমন সব কথাবার্তা বলেছেন যার মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমনকি, এ কাজ করতে গিয়ে তিনি নিজেও অন্যদের অনেক মহা মূল্যবান কাজের বিকৃতি- ঘটিয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে কার্ল মার্ক্সের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি দিতে গিয়ে তিনি বলছেন, যে বহু সংখ্যক লেখক, তাত্ত্বিক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ প্রভৃতি "have accepted the basic distinction between East and West as the starting point for elaborate theories..." । অর্থাৎ তাঁরা শুরুতেই ধরে নিয়েছেন যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। মার্কস্-এর সমস্ত তাত্ত্বিক কাজের মধ্যে এই "মৌলিক পার্থক্য" কিভাবে সাঈদ চিহ্নিত করলেন এটা এক মহা বিস্ময়ের ব্যাপার!

এ প্রসঙ্গে তিনি মার্কসের বক্তব্যের যে অংশটিকে মূলতঃ অবলম্বন করে তাঁর বক্তব্যের আকাশচুম্বী সাধারণীকরণ করেছেন সেটি হলো, ভারতে বৃটিশ শাসন বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত একটি প্রবন্ধের নিম্নলিখিত অংশ : "England, it is true, in causing a social revolution in Hindostan, was attracted only by the vilest interests, and was stupid in her manner of enforcing them. But that is not the question. The question is, can England fulfill its destiny without a fundamental revolution in the social state of Asia? If not, whatever may have been the crimes of England she was the unconscious tool of history in bringing about that revolution." Marx-Engels Selected Works, vol, one, Progress Publishers, Moscow, 1969, P. 493)

বৃটেন ভারতবর্ষ দখল না করলে ইতিহাসের গতি যে থেমে থাকতো না একথা নিশ্চয়ই ঠিক। তাছাড়া পরবর্তীকালে বৃটিশ শাসন ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

যে সব বাধা সৃষ্টি করেছিলো সে বিষয়ে এখন আমাদের ধারণা অনেক স্পষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কস্ যে সময়ে এ কথা লিখেছিলেন তখন প্রাচীন ভারতের সমাজে বৃটিশ শাসন ভাঙন সৃষ্টি করে সমাজ বিকাশের একটা ধারা যে সৃষ্টি করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এ ক্ষেত্রে মার্কসের এই বক্তব্যের সীমাবদ্ধতার সমালোচনা মার্কসবাদীদের মধ্যেও অনেকে করেছেন। এটা এক কথা, কিন্তু মার্কসের এই বক্তব্যের কারণে তাঁকে imperial administrators অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সাথে এক কাতারে রেখে Orientalist বলার মধ্যে ঐতিহাসিক যুক্তির কি ভূমিকা তা বোঝা মুস্কিল।

ওপরে উল্লিখিত Orientalism-এর তিনটি পৃথক সংজ্ঞা এবং মার্কস এর বিষয় নিয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু এই ভূমিকায় সেটা করার কোন অবকাশ নেই। তবে এ প্রসঙ্গে এটুকু অবশ্যই বলা দরকার যে, আঠারো শতক থেকে ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের প্রাচ্য নীতি এবং তাদের প্রাচ্যবিদ কবি, লেখক, সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ, ইতিহাসবিদ প্রভৃতি সম্পর্কে খুবই প্রয়োজনীয় ও শিক্ষণীয় আলোচনা করতে করতে এডওয়ার্ড সাঈদ যেভাবে নিজের Orientalism এর-ধারণার বিস্তার ঘটিয়েছেন সেই বিস্তার সামাল দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে এসকিলাস, দান্তে প্রভৃতিকে পর্যন্ত এই আলোচনার পরিধিভুক্ত করে তিনি সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এমন এক দৃষ্টিভঙ্গীগত বিভাজন করেছেন যার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

গ্রীকরা বিদেশীদেরকে barbarian বলতো, প্রাচীন ভারতীয়রা, এমনকি তার সূত্র ধরে, বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত, বিদেশী ও মুসলমানদেরকে যবন ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করতেন। এই সব আখ্যা হলো বিদেশী অথবা যে কোন অন্য সম্পর্কে বিরূপ, এমনকি বিদ্বেষ ভাবাপন্নতার দৃষ্টান্ত। কিন্তু যে অর্থে আঠারো শতক থেকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের Orientalism-এর কথা এডওয়ার্ড সাঈদ বলেছেন, তার সাথে বিদেশীদেরকে এই ভাবে আখ্যায়িত করার সম্পর্ক নেই। সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদির Orientalist চরিত্রের যে কথা সাঈদ বলেছেন, তার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। দান্তে হজরত মহম্মদকে তাঁর Divine Comedy তে Inferno-এর নয়টি বৃত্তের (circle) অষ্টম বৃত্তে নিক্ষেপ করলেও আবার মুসলমান ইবনে সিনা, আবু রুশদ ও সালাহউদ্দীনকে এবং সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটলকে একই সাথে নিক্ষেপ করেছেন নরকের একেবারে নিম্ন মার্গে, প্রথম বৃত্তে। এখানে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কোন প্রশ্ন নেই। কেন দান্তে এ কাজ করেছিলেন তার ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র।

এক্ষেত্রে এডওয়ার্ড সাঈদের মূল দুর্বলতার জায়গাটি হলো, কাল ও ব্যক্তি নির্বিশেষে পাশ্চাত্যের প্রত্যেককে 'Orientalist' হিসেবে খাড়া করার চেষ্টা। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কতকগুলো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণে পাশ্চাত্যও মানব সভ্যতার এক বড়ো প্রতিনিধি। বৃটেন ও ফ্রান্সসহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় শক্তির হাজারো অপকীর্তি সত্ত্বেও একথা সত্য। তাই তাদের মধ্যে যদি সকলকেই সেই প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত জেমস মিল, মেকলে, কিপলিং এর মত সাম্রাজ্যবাদী প্রাচ্য বিদ্বেষী ও মতলববাজ হিসেবে ধরে নেওয়া হয় তাহলে সভ্যতার স্বরূপ কি দাঁড়ায়? এর মূল্যই বা কি থাকে? এটাও তো তাহলে দাঁড়ায় এমন এক ধরনের Occidentalism যা

www.pathagar.com

অনেকটা Orientalism এর মতই সমালোচনার যোগ্য। এডওয়ার্ড সাঈদ Orientalism এর ১৯৯৫ সালের পুনর্মুদ্রণে একটি নোতুন After word এ এই লাইনের সমালোচনার জবাব দিয়েছেন। এ সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে, কারণ এই জবাব যে সন্তোষজনক, এমন নয়।

যাই হোক, এ বিষয়টি লক্ষ্য করে আইজাজ আহমদের মন্তব্য যথার্থ। তিনি বলেছেন, "These ways of dismissing entire civilizations as diseased formations are unfortunately far too familiar to us, who live the other side of the divide, from the history of imperialism itself." (Aijaz Ahmad, In Theory, Oxford University, Press, Delhi 1996, P. 182)

এডওয়ার্ড সাঈদের Orientalism গ্রন্থটির এই সব সমালোচনার অর্থ তাঁর এই অতি মূল্যবান গ্রন্থটির গুরুত্ব কোন অংশে খর্ব করা নয়। এই গ্রন্থে তাঁর বিশাল সাহিত্য পাঠ ও পাণ্ডিত্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা প্রকৃতই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। ইউরোপীয় সাহিত্যের সাথে এই পরিচয়ের কারণে তিনি যে শুধু Orientalism বিষয়েই তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন তাই নয়। উচ্চ মানের এক সাহিত্য সমালোচক হিসেবে তিনি নিজের আলোচনাকে এই বৃত্তের বাইরেও নিয়ে গেছেন। শুধু সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাচ্য বিদ্বেষই যদি এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হতো তাহলে এটি ইউরোপ আমেরিকায় এত ব্যাপকভাবে ছাত্র ও সাধারণ পাঠকদের দ্বারা পঠিত ও সমাদৃত হতো না। এ কারণে একবাল আহমদ যথার্থই বলেছেন যে, "Orientalism is virtually a classic" (Pen and the Sword P. 7)

প্যালেস্টাইনের জনগণের মুক্তি আন্দোলনের সাথে এডওয়ার্ড সাঈদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। শুধু তাই নয়, তিনি দীর্ঘদিন ফিলিস্তিন ন্যাশনাল কংগ্রেসেরও সদস্য ছিলেন। ইয়াসির আরাফাতের সাথে তাঁর মত ও পথের পার্থক্য, বিশেষ করে কয়েক দফায় ইসরাইল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আরাফাতের ক্ষতিকর আলোচনা ও চুক্তির কারণে তাঁদের উভয়ের সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটে। Question of Palestine সাঈদের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি। এতে তিনি প্যালেস্টাইন সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা ও বাস্তব ক্ষেত্রে কাজের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

মধ্য প্রাচ্যের আরব দেশগুলোতে যে সব সন্ত্রাসী তৎপরতা এবং প্রতিরোধ সংগ্রাম চলছে, সেগুলিতে ধর্মীয় প্রভাবের বৃদ্ধি যেভাবে ঘটছে, সে বিষয়ে এডওয়ার্ড সাঈদের বক্তব্য খুব উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, "Last and most important, the Islamic revival in the Arab world largely occurs in countries where democracy had been abrogated by virtue of the priorities of the national security state. Here Israil plays a very important role. This is often forgotten. The presence of Israil, a theocratic, military state, a Sparta, that is imposed upon the region – I'm not talking just about the Palestinians, whose sanctity it destroys, its country, its land, it's been in occupation for over twenty five years – but also its invasions, its incursions in Lebanon, in Jordan, in Syria, in Tunisia. It has overflown Saudi Arabia many times. It has attacked Iraq. Israil is a regional superpower. This sense of Israil and the United States as victimising at will the Arab heartland has forced people to go back to nourishing roots in the native culture, which is Islamic." (Pen and the Sword P. 86)

www.pathagar.com

মধ্য প্রাচ্যের আরব দেশগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের যে অবস্থান ও ভূমিকার কথা এখানে বলা হয়েছে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে আরব দেশগুলোসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে যে সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা এবং প্রতিরোধ সংগ্রাম দেখা যাচ্ছে তার ব্যাখ্যা এর মধ্যেই পাওয়া যাবে। আফগানিস্তান, ইরাক প্রভৃতি দেশে নব্বই-এর দশক থেকে এই তৎপরতা ও সংগ্রাম যেভাবে বিস্তৃত ও গভীর হয়েছে ও যে কারণে হয়েছে সে বিষয়ে আমি নিজেও অনেক লিখেছি যা একাধিক প্রবন্ধ সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা ও প্রতিরোধ সংগ্রাম হলো, সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাস ও জাতীয় নিপীড়নেরই নিশ্চিত প্রতিক্রিয়া। সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং ইসরাইল যেভাবে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে শোষণ লুণ্ঠন নির্যাতন উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে নিচ্ছে এবং দেশগুলোর সব রকম সম্পদ, বিশেষ করে তেল, গ্যাস লুণ্ঠনের জন্য যে আক্রমণ চালাচ্ছে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই মার্কিনসহ অন্য সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হচ্ছে। এই অঞ্চলগুলো যেহেতু প্রধানতঃ মুসলমান অধ্যুষিত সে কারণে মুসলমানরাই এই সাম্রাজ্যবাদী প্রতিরোধের নেতৃত্বে আছে। এই নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটেছে আরও যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণে তা হলো, প্রথমতঃ এই দেশগুলোর শাসক শ্রেণী ও তাদের সরকারগুলোর পদানত অবস্থা এবং দ্বিতীয়তঃ সেই সাথে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট এবং অন্য প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তিশালী উপস্থিতির অভাব। এই অভাবের কারণে এই দেশগুলোর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ধর্মীয় আদর্শের দ্বারাই মূলতঃ প্রভাবিত। এই প্রভাবের ওপর দাঁড়িয়েই ইসলামী মৌলবাদীরা তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী তৎপরতা জারী রেখেছে। কিন্তু শুধু মুসলমান প্রধান দেশগুলোতেই নয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অন্য অসংখ্য দেশের সম্পদ লুণ্ঠনের জন্যও তাদের ওপর নানা প্রকার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ভেনেজিওলা এই মুহূর্তে এর এক দৃষ্টান্ত। কিন্তু সে দেশের জনগণ মুসলমান না হওয়ার জন্য সেখানে প্রতিরোধের আদর্শগত চরিত্র অন্য প্রকার। এডওয়ার্ড সাঈদের এই স্মারক গ্রন্থটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে এখানে মাত্র কয়েকটি বিষয়েই খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো। তাঁর রচনা ও কর্মজীবন সম্পর্কে আলোচনার আরও অনেক কিছু আছে যার মধ্যে কিছু এই গ্রন্থটিতেও করা হয়েছে। এটি সম্পাদনা ও প্রকাশের জন্য বেনজীন খান যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাকে ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রশংসা করি এবং অভিনন্দন জানাই।

বদরুদ্দীন উমর

ঢাকা

১৩.৯.২০০৪

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ সম্পর্কে

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড সাঈদ কেন গুরুত্বপূর্ণ

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ (১৯৩৫-২০০৩) গুরুত্বপূর্ণ একাধিক কারণে; তিনি সফল অধ্যাপক, অত্যন্ত উঁচু ও মৌলিক মানের সাহিত্যসমালোচক, এবং সেই সঙ্গে লেখক। সাঈদ কেবল সাহিত্যসমালোচনা রচনা করেননি, তাঁর গ্রন্থ আছে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে, এমনকি সঙ্গীত সম্পর্কেও; আত্মজীবনী ও ভ্রমণবিবরণেও তিনি অনবদ্য। সাহিত্যিক হিসাবে তিনি যদি নোবেল পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হতেন তবে তা বিস্ময়ের কারণ হতো না। কিন্তু তাঁর মূল পরিচয় সাহিত্যিক বা সাহিত্যসমালোচক হিসেবে নয়। সেটা হলো এই যে, তিনি একজন বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিজীবী বলেই তিনি সাহিত্যিক, বিপরীতটা সত্য নয়।

কাকে বলবো বুদ্ধিজীবী? এ বিষয়ে আন্তনিও গ্রামসির বক্তব্য সুপরিচিত, এবং প্রাসঙ্গিক, কেননা সাঈদ সে- বক্তব্যটি মানেন, এবং গ্রামসির দ্বারা তিনি প্রভাবিতও বটে। গ্রামসি তাঁর *প্রিজন নোটবুকস্*-এ (১৯২৬-৩৭) বলেছেন, 'বলতে গেলে সব মানুষই বুদ্ধিজীবী, কিন্তু সমাজে সবাই যে বুদ্ধিজীবী হিসাবে কাজ করেন তা নয়।' বুদ্ধিজীবীর কাজটা কি? সেটা ঠিক পুরোহিতের কাজ নয়, তবে প্রচারকের ঠিকই, সেই প্রচারকের পৃথিবীটাকে যিনি বুদ্ধি দিয়ে বোঝেন এবং যা তিনি বোঝেন তা অন্যদের কাছে প্রচার করতে সচেষ্ট থাকেন। এডওয়ার্ড সাঈদ ঠিক তাই করেছেন, জগৎকে তিনি তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেই ব্যাখ্যাকে নিরন্তর অন্যের কাছে উপস্থিত করেছেন। তাঁর জীবনে আলস্য বলে কিছু ছিল না।

গ্রামসি দু'ধরনের বুদ্ধিজীবীর কথা বলেছেন। প্রথাগত (traditional) এবং সাংগঠনিক (organic)। যাঁরা মোটামুটি রক্ষণশীল; যেমন শিক্ষক, লেখক, শিল্পী, পুরোহিত, যাঁরা চিন্তা করেন, প্রচারও করেন; কিন্তু সমাজ-প্রগতিকে এগিয়ে নিতে তেমন একটা ভূমিকা রাখেন না, তাঁরা হলেন প্রথাগত বুদ্ধিজীবী। অন্যদিকে যাঁরা মৌলিক পরিবর্তনের পক্ষে কাজ করেন, সমাজে যে শ্রেণীটি অগ্রসরমান তাকে বিজয়াভিমুখে এগিয়ে যেতে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সাহায্য করেন তাঁরা হচ্ছেন সাংগঠনিক বুদ্ধিজীবী। বলাবাহুল্য, গ্রামসি নিজে ছিলেন এই সাংগঠনিকদের দলে; তিনি শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে লড়েছিলেন, মুসোলিনীর আমলে ইটালীর কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন, কারাভোগ করেছেন, কারামুক্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছেন। সাঈদ অবশ্যই প্রথাগত বুদ্ধিজীবী নন, অপরদিকে তিনি সমাজ বিপ্লবের জন্য যে কাজ করছিলেন তাও কিন্তু নয়। তাঁর অবস্থান উদার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীর। এ প্রসঙ্গটিতে আমরা পরে ফিরে আসবো।

www.pathagar.com

তবে উদারনীতিক বলেই গ্রামসির মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অবস্থানটি যে তিনি নেবেন না, এটা অনিবার্যই ছিল। সাঈদের কালে, বিশেষ করে সত্তরের দশকে অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন মিশেল ফুকো (১৯২৬-৮৪)। সময়টা ছিল সংশয়ের, সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব তেমনভাবে আর এগুচ্ছিল না, যেভাবে এগুবে বলে আশা করা গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর ষাট দশকে ইউরোপে, বিশেষ করে প্যারিসে প্রবল ছাত্র আন্দোলন হয়েছে, যে আন্দোলনে ফুকো নিজেও অংশগ্রহণ করেছেন, কিন্তু ওই আন্দোলনের পরিণতিতে সমাজে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আসেনি, বরঞ্চ তরুণদের মনে অবসাদ ও বিষণ্ণতা দেখা দিয়েছে। ফুকো এই প্রজন্মের মনোভাবকেই দার্শনিকভাবে প্রতিভাত করেছেন। তিনি বললেন, ক্ষমতা কোনো এক জায়গায় থাকে না, শিরা-উপশিরা ধরে বহমান রক্তপ্রবাহের মতো সমাজদেহের সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। কাজেই এতকাল যে ইতিহাস ও জ্ঞানতত্ত্বে মহাকাহিনী (গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ) রচনার প্রয়াস চলছিল সেটা ভ্রান্ত। দ্বিপাক্ষিকতার পরিবর্তে তাই চাই বহুপাক্ষিকতা। সাধারণীকরণের চাইতে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে বিবেচনায় এনে নির্দিষ্টরূপে কথা বলা ভালো। ঐক্যের তুলনায় পার্থক্য অনুসন্ধান অধিক জরুরী। সেটা করতে গিয়ে বিবেচ্য বস্তুটিকে যদি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করতে হয় তবে সে বিভক্তিকরণে ক্ষতি নেই, বরঞ্চ মঙ্গল রয়েছে। কেননা ওইভাবে না দেখলে দেখাটা যথার্থ হবে না।

ফুকোর পাণ্ডিত্য ও ইতিহাস-অনুসন্ধান ছিল অসামান্য। সাঈদ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হবেন। ওটা ওই দিক থেকেই ছিল স্বাভাবিক। ফুকোর বহুপাক্ষিকতা তো বটেই, তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল ক্ষমতার অভিনব তত্ত্বটি। জ্ঞান মানুষকে ক্ষমতা দেয়, এ সংবাদ ইউরোপীয় রেঁনেসাস একসময়ে দিয়েছে, ফুকো দেখালেন ক্ষমতা কিভাবে তার নিজস্ব প্রয়োজনে জ্ঞানকে ব্যবহার করে। সমাজ চায় মানুষকে 'স্বাভাবিক' করবে, এটা করতে গিয়ে ব্যক্তিকে সে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং নিয়ন্ত্রিত হতে যারা অসম্মত হয় তাদেরকে শাস্তি দেয়। এটা যে কেবল বলপ্রয়োগ করে ঘটে তা নয়। প্রতিনিয়ত ঘটছে হাসপাতাল, বিদ্যালয়, পাগলাগারদ, জেলখানার মতো আপাত-শান্ত প্রতিষ্ঠানে।

নিয়ন্ত্রণের এই বিষয়টাকে গ্রামসিও খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হলো এই যে, রাষ্ট্র নাগরিকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে দু'ভাবে–এক, বলপ্রয়োগ করে; দুই, সম্মতি আদায়ের মধ্য দিয়ে আধিপত্য (হেজিমনি) প্রতিষ্ঠা করে। নাগরিকদের মুক্তির জন্য রাষ্ট্রের ওই কর্তৃত্ব ও আধিপত্য দুটোই ভাঙতে হবে, সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা চাই জনগণের শাসন, যার জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন। ফুকো কিন্তু গ্রামসির মতো বিপ্লবের কথা বলেন না, সংগঠিত প্রতিরোধও সম্ভব বলে তিনি মনে করেন না। ক্ষমতা যেহেতু খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, তাই তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জায়গাটা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে থাকবে না, থাকবে সর্বত্র। ব্যক্তিকেই লড়তে হবে শেষ পর্যন্ত। বলা বাহুল্য, এই মতবাদ উত্তর-আধুনিকতা বলে পরিচিত এবং এককালে এনজিও ব্যবস্থার যে বিপুল উত্থান তা এর দ্বারা বেশ ভালোভাবেই সমর্থিত। গ্রামসির সঙ্গে ফুকোর মৌলিক পার্থক্যটি এখানেই যে, গ্রামসি হলেন পুরোপুরি রাজনৈতিক, ওদিকে ফুকোর যাত্রা রাজনীতিবিমুখতার অভিমুখে। রাষ্ট্র ও সমাজে গ্রামসি শাসক ও শাসিতের, বিত্তবান ও বিত্তহীনের দ্বিপাক্ষিক দ্বন্দ্ব দেখতে পান, সেখানে দুই বিরুদ্ধপক্ষ পরস্পরের মুখোমুখি

www.pathagar.com

দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফুকোর বহুপাক্ষিকতা এই বড় ব্যাপারটাকে দেখতে পায় না, ফুকো অরাজনৈতিক হতে পছন্দ করেন।

সাঈদ গ্রামসির অনিবার্য রাজনৈতিক সক্রিয়তার অনুরাগী নন ঠিকই; কিন্তু তাই বলে তিনি যে ফুকোর বি-রাজনীতিকীকরণ প্রক্রিয়াকে মেনে নেবেন সেটাও ছিল অসম্ভব, কেননা সাঈদের কাছে এ বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না যে, বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ মানুষের সংস্কৃতিকে অনমনীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। আর সেই নিয়ন্ত্রণ মূলত রাজনৈতিক। ফুকোর ক্ষমতাতত্ত্ব ও বহুপাক্ষিকতা সাঈদের পছন্দ ঠিকই,কিন্তু ফুকোর অরাজনৈতিকতা নয়, যে-কথা তিনি স্পষ্ট করেই তাঁর বিভিন্ন লেখায় বলেছেন, বিশেষ করে *কালচার এ্যান্ড ইমপিরিয়ালিজম* গ্রন্থে (১৯৯৩)। আরো একটি ধারণার জন্য তিনি ফুকোর কাছে ঋণী, সেটা হচ্ছে প্রতর্ক বা ডিসকোর্স। (ডিসকোর্সকে জ্ঞানভাষ্য বলা যাবে কি?) ডিসকোর্স কতগুলো উক্তির সমাহার নয়, এ হচ্ছে একটি সংঘবদ্ধ সমগ্র, যা বাস্তবতার একটি নিজস্ব বিবরণ তৈরি করতে চায়। বাস্তবতার ছবি তুলে ধরাটা অত্যন্ত কঠিন কাজ, ভাষা সেটা করতে গিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যায়, কেননা ভাষার মধ্যে রয়েছে ক্ষমতার ব্যবহারজনিত নানা অস্পষ্টতা ও অসুবিধা। ডিসকোর্স বাস্তবতাকে উপস্থিত করার জন্য একটা ব্যবস্থা দাঁড় করায়, যে-ব্যবস্থাটা অবশ্যই নৈর্ব্যক্তিক ও নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য, এবং বাস্তবতাকে ওই উপস্থাপনার প্রয়োজনে ডিসকোর্স নিজেই কতগুলো ধারণাও তৈরি করে নেয়। ডিসকোর্স কেবল যে জ্ঞানের সৃষ্টি করে তা নয়, জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনাও করে থাকে। ডিসকোর্সের নিজের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক ইচ্ছা কার্যকর থাকে, কিন্তু ডিসকোর্সের কোনো নৈতিকতা নেই। বুদ্ধিজীবী হিসাবে সাঈদের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে প্রাচ্যবাদ (অরিয়েন্টালিজম), যাকে তিনি একটি ডিসকোর্স বলে অভিহিত করেছেন। নারীবাদ বা ঔপনিবেশবাদের মতো প্রাচ্যবাদও একটি ডিসকোর্স।

বুদ্ধিজীবীর কাজ ও ভূমিকা সম্পর্কে সাঈদের ধারণার কথা তাঁর রচনাবলীর অনেক জায়গাতেই পাওয়া যাবে, বিশেষভাবে তা রয়েছে ১৯৯৩ সালে দেওয়া বিবিসি'র রীথ বক্তৃতামালাতে। এখানে তিনি *রিপ্রেজেনটেশনস্ অব ইনটেলেকচুয়ালস* বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব হচ্ছে প্রতিনিধিত্ব করা, তিনি বিশেষভাবে প্রতিনিধিত্ব করবেন তাদের, সমাজে যারা দরিদ্র, সুযোগবঞ্চিত, মূক, যাদের পক্ষে বলার কেউ নেই, যারা ক্ষমতাহীন। বোঝাই যাচ্ছে যে এই কাজটি রাজনীতিকরা করতে পারবেন না, বুদ্ধিজীবীদেরকেই করতে হবে। এটা করতে গিয়ে বুদ্ধিজীবীকে কেবল সমালোচক হলেই চলবে না, তিনি বিরোধিতাও করবেন, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর এক ধরনের বিরোধ একেবারেই অবধারিত। বুদ্ধিজীবীদের ক্ষমতা অনস্বীকার্য, এবং তিনি আর যাই হোন, কখনোই নিরপেক্ষ নন। নিজেকে তিনি খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন না, খাওয়াবেনও না। তাঁর আবেদন থাকবে জনগণের (পাবলিক) কাছে, যাদের সঙ্গে রইবে তার স্বাভাবিক যোগাযোগ, অবশ্য শিক্ষাদাতা হিসাবে নয়।

সাঈদ মনে করেন বুদ্ধিজীবী মানেই পাবলিক, প্রাইভেট বলে কোনো বুদ্ধিজীবী নেই। কিন্তু এই যে তিনি সকলের জন্য, কেবল নিজের জন্য নয়, এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটা সীমাও রয়েছে। বুদ্ধিজীবীর ব্যক্তিগত সত্তা বলে একটি নিজস্ব জগৎও থাকবে, যেখানে তাঁর অনুভূতিগুলো স্বতন্ত্র, এবং স্বতন্ত্র বলেই সর্বসাধারণের জন্য তিনি যা বলেন বা

www.pathagar.com

লেখেন তা তাৎপর্যপূর্ণ। যে মুহূর্তে একজন বুদ্ধিজীবী লেখেন এবং তা প্রকাশ করেন সেই মুহূর্তেই তিনি সকলের সামনে চলে আসেন, কিন্তু তাতে তাঁর নিজস্ব স্বরের বিশেষ ভঙ্গিটি যে হারিয়ে যায় তা নয়। বুদ্ধিজীবী অন্যদের প্রতিনিধিত্ব করেন, কিন্তু তাই বলে তিনি শুধু যে আন্দোলন, অবস্থান বা অভিযোগের প্রতীক বা মুখপাত্রই হবেন তা কিন্তু নয়, তিনি একজন ব্যক্তিও থাকবেন। তিনি সাধারণ মানুষের ঠিকই, কিন্তু সমগ্র জনগোষ্ঠী তাঁর শ্রোতা নয়, তিনি কথা বলেন বিশেষত বিশেষ গোষ্ঠী, পেশাজীবী ইত্যাদিকে লক্ষ্য করে, যারা জনমত গঠন করে। বুদ্ধিজীবী নিজে পেশায় থাকলেও ঠিক পেশাজীবী নন, বিশেষজ্ঞের খাপেও তাঁকে আটকানো যাবে না। ব্যবস্থায় সরাসরি পরিবর্তন আনা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, যে জন্য তাঁর অবস্থানটা অনেক সময় দাঁড়ায় ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব ঘটনার সাক্ষী হিসাবে। কিন্তু একটা কাজ বুদ্ধিজীবী কখনো করেন না, সেটা হলো প্রতিষ্ঠিতদেরকে আরামে থাকতে দেওয়া; তিনি বিপ্লবী নন ঠিকই, কিন্তু তাঁর মধ্যে একটি নাটকীয়তা, অভ্যুত্থানকারীর ভঙ্গি থাকা ভালো। তিনি অনেক সুযোগ হয়তো পাবেন না, কিন্তু যতটা পাবেন তার সদ্ব্যবহার করবেন, শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যবহার করবেন নিজের বৈদগ্ধ্য ও বিতার্কিক দক্ষতাকে। এই ধারণা ও দৃষ্টান্তের সঙ্গে ফুকোর কাছ থেকে সাঈদ এই শিক্ষাটিও নিয়েছেন যে, বুদ্ধিজীবীকে হতে হবে নিরলস জ্ঞানান্বেষী।

বুদ্ধিজীবীর ওই রেখাবয়বের ভেতর সাঈদ নিজে খাপ খেয়ে যান চমৎকারভাবে। তাঁর কাজটা মূলত ছিল ওই বুদ্ধিজীবীরই; তিনি স্বজাতি ফিলিস্তিনীদের পক্ষে সব সময়ে কথা বলেছেন, তবে তাদের দুর্বলতাগুলোকেও ক্ষমা করেননি। সাম্রাজ্যবাদের নষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর অবস্থানে থেকে সমসাময়িক কম বুদ্ধিজীবীই অমনভাবে বলেছেন। সাঈদ অনবরত লিখেছেন, বক্তৃতা করেছেন, গণমাধ্যমে উপস্থিত হয়েছেন এবং অবশ্যই ঈর্ষণীয় যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন তাঁর পেশাগত দায়িত্ব। তিনি ছিলেন অনমনীয় এবং অতুলনীয়। আর বুদ্ধিজীবী হিসাবে তাঁর সবচেয়ে বড় কাজটা হচ্ছে জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে পাশ্চাত্যের হাতে প্রাচ্যের যে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক লাঞ্ছনা ঘটেছে ও ঘটছে তার একটি ইতিহাসভিত্তিক রূপরেখা তুলে ধরা। এই লাঞ্ছনার নাম হচ্ছে প্রাচ্যবাদ।

২

প্রাচ্যবাদ জিনিসটি সাঈদের *প্রাচ্যবাদ* (১৯৭৮) নামে গ্রন্থ রচনার আগেও বিদ্যমান ছিল, যেমন কার্ল মার্কসের আগেও শ্রেণী ছিল। শ্রেণীর ক্ষেত্রে মার্কস যেমন ইতিহাসে শ্রেণীর ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেখিয়েছেন, প্রাচ্যবাদের বেলাতে সাঈদের কাজটাও ওই রকমেরই, তিনি প্রাচ্যবাদের ঐতিহাসিক প্রকৃতি ও তাৎপর্যকে তুলে ধরেছেন, যার ফলে প্রাচ্যবাদ এখন একটি প্রতর্ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

প্রাচ্যবাদকে সাঈদ সংজ্ঞায়িত করেছেন, 'সৌন্দর্যতাত্ত্বিক, বিদ্যাভিত্তিক, অর্থনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক রচনাতে (টেক্সট) প্রাচ্য সংক্রান্ত ভূ-রাজনৈতিক সচেতনতার বিবরণ' বলে। ব্যাপারটা সাংস্কৃতিক, কিন্তু কেবল সাংস্কৃতিক নয় আদর্শিকও

www.pathagar.com

বটে। এবং অতি অবশ্যই রাজনৈতিক। বস্তুত রাজনীতির ব্যাপারটাই প্রধান। কেননা প্রাচ্যবাদের সঙ্গে ক্ষমতার প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত। ঔপনিবেশিক শাসকেরা চেয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ক্ষমতা; যার সঙ্গে ঔপনিবেশিক রাজনীতি অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত।

তাই বলে প্রাচ্য আর প্রাচ্যবাদ কিন্তু মোটেই এক বস্তু নয়; প্রাচ্য হচ্ছে জীবন্ত, আর প্রাচ্যবাদ হচ্ছে সেই জীবন্ত সত্তার একটি চিত্রনির্মাণ; যে-নির্মাণ পরিপূর্ণরূপে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, এবং সেই কারণে বিকৃত। উদ্দেশ্যটা জ্ঞানতাত্ত্বিক নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানকে শাসনকার্যে ব্যবহার করা। শাসনের কাজটা সরাসরি কর্তৃত্বের মধ্য দিয়ে যেমন ঘটবে, তেমনি ঘটবে অপ্রত্যক্ষ সম্মতি আদায়ের ভেতর দিয়েও। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কর্তৃত্ব করে বলপ্রয়োগের সাহায্যে, আর ওই রাষ্ট্রের সহযোগীরা শাসিতদের কাছ থেকে অধীনে থাকবার ব্যাপারে সম্মতিআদায় করে নেয় সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সাহায্যে-বিশেষ করে বই লিখে। প্রাচ্যবাদী লেখক-গবেষকরা মনের দিক থেকে ঔপনিবেশিক, তাঁরা প্রাচ্যের ওপর বুদ্ধিবৃত্তিক,সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান, এবং সেই উদ্দেশ্যে জ্ঞানকে ব্যবহার করেন। প্রাচ্যের ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষা, সংস্কৃতি পাঠ করে এবং ভ্রমণে এসে প্রাচ্যবাদীরা যেসব 'তথ্য' লাভ করেছেন তার ভিত্তিতে মনগড়া প্রাচ্যবাদী তত্ত্বের সাহায্যে তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, প্রাচ্য হচ্ছে পশ্চাৎপদ, অলস, ইন্দ্রিয়বিলাসী; প্রাচ্যবাদীরা মানুষ হলেও ঠিক মানুষ নয়, তারা নিজের কথা নিজেরা বলতে পারে না। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব প্রাচ্যে প্রমাণিত, এই অর্থে যে বিবর্তনের একটা স্তরে এসে প্রাচ্যের মানুষ আটকে গেছে, তাই তারা আর এগুতে পারছে না, পারবেও না। সব প্রাচ্যবাদী যে একভাবে কথা বলেন তা নয়, স্বরে কিছুটা ভিন্নতা থাকে, কিন্তু সেটা পরিমাণগত, গুণগত নয়। গুণগতভাবে প্রাচ্যবাদীদের ধারণা একটাই, সেটি এই যে, প্রাচ্যের নিজের মঙ্গলের জন্যই পাশ্চাত্য তাকে শাসন করছে। সাঈদ উল্লেখ করেননি, কিন্তু আমরা স্মরণ করতে পারি যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বড় চাকরি নিয়ে ভারতে এসে মেকওলে দু'টি ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করে গেছেন, দু'টিই প্রবর্তনা; একটি হলো পেনাল কোড (অপরাধবিধি) অন্যটি হচ্ছে ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থা; একটি ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রীয়, অপরটি সাংস্কৃতিক। বলা বাহুল্য, উভয় ব্যবস্থাপনাই উপমহাদেশে এখনো স্বমহিমায় বিদ্যমান।

প্রাচ্যবাদীদের মধ্যে উদারনৈতিকেরাও ছিলেন। যেমন ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল; তিনি ব্যক্তির স্বাধীনতায় এবং জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, সে-বিশ্বাসের কথা যুক্তি দিয়ে প্রচারও করেছেন; কিন্তু ওইসব তত্ত্ব ভারতবর্ষীয়দের বেলায় প্রযোজ্য বলে মনে করেননি। তাঁর হিসাবটি ছিল এই রকমের যে, ভারতবর্ষীয়রা সভ্যতার দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। প্রাচ্যের কোনো ইতিহাস নেই, এমন মত দার্শনিক হেগেল প্রচার করে গেছেন, কিন্তু হেগেলকে তো কেউ উদারনীতিক বলেন না; উদারনীতিক জন স্টুয়ার্ট মিল যে অন্তর্গত প্রাচ্যবাদের কাছে হেরে যান এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সাঈদ অবশ্য স্মরণ করেছেন যে, মিল অনেকটাসময় ইন্ডিয়া অফিসের কর্মচারী ছিলেন। এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, জন স্টুয়ার্ট মিলের পিতা ইতিহাসবিদ জেমস মিলও বিলেতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকরি করেছেন,

এবং ইতিহাসবিদ হিসাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের কালবিভাজনে হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ ও ব্রিটিশ যুগের (খ্রিস্টান যুগ নয় কিন্তু) ভেদরেখা টেনে অসাম্প্রদায়িক ইতিহাসচর্চাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে গেছেন।

সঙ্গতভাবেই সাঈদ সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, কলকাতায় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি কিম্বা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল অব অরিয়েন্টাল এ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজের প্রতিষ্ঠার পেছনে বুদ্ধিবৃত্তিক অনুপ্রেরণা ছিল বটে, কিন্তু প্রাচ্যবাদকে প্রসারিত ও গভীর করার ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্যও যে ছিল না, এমনটা যেন না ভাবি। প্রাচ্যবাদী জ্ঞানচর্চা রাজনীতি-নিরপেক্ষ তো ছিলই না, বরঞ্চ ছিল ঔপনিবেশিক রাজনীতিরই সম্প্রসারণ। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল ব্রিটিশ ও ফরাসীরা।

অরিয়েন্টালিজম গ্রন্থটির শুরুতে কথামুখ হিসাবে এডওয়ার্ড সাঈদ দু'জনের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন–একজন ইংরেজ লেখক বেনজামিন ডিজরেইলি অন্যজন কার্ল মার্কস; এঁদের মধ্যে অন্য কোনো দিক দিয়ে মিল খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। কিন্তু সাঈদ লক্ষ্য করেছেন যে, একটি ক্ষেত্রে এঁরা বেশ কাছাকাছি অবস্থানেই রয়েছেন; সেটা হলো ওই প্রাচ্যবাদ। ডিজরেইলি বলেছেন, প্রাচ্য হলো একটি পেশা (কেরিয়ার), যার অর্থ প্রাচ্যে ইংরেজদের জন্য, পশ্চিমের জন্যই আসলে,অফুরন্ত সুযোগ আছে পেশাগত সমৃদ্ধির। আর মার্কস বলেছেন, তারা (অর্থাৎ প্রাচ্য) নিজেদেরকে উপস্থিত করতে পারে না, তাই তাদেরকে উপস্থিত করাতে হবে। যার সরল অর্থ প্রাচ্য পশ্চাৎপদ, সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না, অন্যের সাহায্য আবশ্যক হয়। ডিজরেইলির অবস্থান ঠিকই আছে, তিনি বেশ রক্ষণশীল ছিলেন, কিন্তু গোপনে গোপনে মার্কসও যে প্রাচ্যবাদী ছিলেন এমন বক্তব্য মেনে নেওয়া কষ্টকর, আসলে অসম্ভবই, যা নিয়ে পরে আমরা আলোচনা করবো।

প্রাচ্যবাদের ইতিহাসটি দীর্ঘ। সাঈদ লক্ষ্য করেছেন ওই বোধ মহাকবি হোমারের মধ্যেও ছিল, নাট্যকার ইস্কিলাসের নাটকেও তাকে পাওয়া যায়, যায় দান্তের মহাকাব্যেও। তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রাচ্যবাদ ছিল ভৌগোলিক ও আদর্শিক। গ্রীকদের কাছে প্রাচ্য দূরের রহস্যময় দেশ, মধ্যযুগের খ্রিস্টানদের চোখে প্রাচ্য অধার্মিকদের বাসস্থান। আদর্শিক বিচারটা দান্তের মহাকাব্য *ডিভাইন কমেডিতে* বিশেষভাবে পাওয়া যাবে; সেখানে বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল সকলেই নরকে নিক্ষিপ্ত, তবে তাঁদের জন্য শাস্তিটা কম, কারণ তাঁরা ভ্রান্তপথের যাত্রী হলেও সেটা না হয়ে তাঁদের উপায় ছিল না, কেননা বেচারারা জন্মেছিলেন খ্রিষ্টের জন্মের আগে, আলোর সন্ধান পাননি, বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু ইসলাম ধর্মের নবী যেহেতু খ্রিষ্টের জন্মের পরে জন্মেও, চারদিকে 'আলো' থাকা সত্ত্বেও আলোর পথে যাননি তাই তাঁকে খারাপ নরকগুলোর একটিতে স্থান দিয়েছেন ওই মহাকবি। লক্ষণীয় যে প্রাচ্যে জন্মেও যীশু খ্রিষ্ট দিব্যি পাশ্চাত্যের হয়ে গেছেন, পাশ্চাত্য তাঁকে দখল করে নিয়েছে, গলার জোরেই, ক্ষমতার জোরে আসলে। আগের কালের প্রাচ্যবাদ কখনো নিরীহ, কোথাও-বা কৌতুককর, কিন্তু ক্ষতিকর যে প্রাচ্যবাদ তার যাত্রা শুরু হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে, যখন উপনিবেশ স্থাপন শুরু হয়। তখন প্রাচ্যবাদ সুস্পষ্ট রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে নেয়, এবং উপনিবেশের মানুষদেরকে এই জ্ঞান দেয় যে, তারা শাসিত হবার জন্যই জন্মেছে, কেননা জ্ঞান ও সংস্কৃতিতে তারা নিতান্তই পিছিয়ে-পড়া, তাদের পক্ষে

www.pathagar.com

স্বাধীন হবার দরকার নেই, স্বাধীন হলে তারা বিপদে পড়বে। এভাবে উপনিবেশের মানুষদের জন্য প্রাচ্যবাদী জ্ঞানের নতুন তত্ত্ব তৈরি হয়ে গেলো। তাদের চিন্তা, কল্পনা ও অনুভবকে আবদ্ধ করবার তৎপরতা সমানে চললো।

প্রাচ্যবাদ-এ সাইদ একটি ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর পদ্ধতিটা হেগেলের মতো নয়, ইতিহাসকে তিনি বর্ণনা করেন না, বরঞ্চ জিজ্ঞাসাবাদ করেন, যার খুব ভালো নিদর্শন ও পথপ্রদর্শন রয়েছে ফুকোর ইতিহাসচর্চার ভেতরে।

৩

এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর নিজের কথাও বলেছেন, দৃষ্টান্ত হিসাবে। তিনি নিজেও প্রাচ্যবাদের যে প্রতর্ক তার অধীনেই ছিলেন; কারণ জন্মসূত্রে তিনি আরব এবং যদিও, ধর্মে খ্রিস্টান বটে, কিন্তু জন্মেছেন ফিলিস্তীন পরিবারে। পরে অবশ্য চলে গেছেন আমেরিকায়, থেকেছেন সেখানেই, কিন্তু তিনি যে প্রাচ্যের মানুষ সেটা কখনো ভোলেননি, এবং প্রাচ্যের অবস্থান থেকেই পাশ্চাত্যের তৈরি প্রাচ্যবাদকে দেখেছেন, যে প্রাচ্যবাদ অতিকথনে তো বটেই, মিথ্যা কথনেও ভরপুর। আমরা জানি যে প্রাচ্যবাদের ওই বন্ধনকে তিনি ছিন্ন করেছেন নিজের প্রজ্ঞা ও আদর্শবাদের জোরে। অনেকেই তা পারেন না। অনেকে কেন বলছি, অধিকাংশের পক্ষেই সেটা সম্ভব হয় না। জ্ঞানকে ব্যবহার করে ক্ষমতা মানুষকে কাবু করে ফেলে, রবিনসন ক্রুশো যেমন কাবু করেছিল ফ্রাইডেকে, তারও আগে প্রসপেরো করেছিল ক্যালিবান ও এরিয়েলকে। বিদ্বান লোক আমাদের দেশেও কম জন্মান নি, কিন্তু তাঁরা অনেকেই উপনিবেশের বন্ধনকেই মুক্তির পথ বলে বিবেচনা করেছেন। যেমন ধরা যাক, নীরদচন্দ্র চৌধুরীর কথা। পাণ্ডিত্যে তিনি এডওয়ার্ড সাঈদের চেয়ে কম যান না, ইংরেজীটাও লেখেন ভালো, কিন্তু তিনি একজন স্বঘোষিত ও অসংশোধিতব্য সাম্রাজ্যবাদী। মনে করেন যে সাম্রাজ্যবাদ না এলে ভারতবর্ষের মানুষ এগুতে পারতো না। ভারতবর্ষে আর্যরা এসেছে, এসে উপকার করেছে; ইংরেজরা না এলে মস্ত মস্ত উপকার থেকে মানুষ বঞ্চিত হতো। মোগলদের কথা অবশ্য আলাদা, তাদের সাম্রাজ্যটা ছিল ভিন্ন ধরনের; তবে আগামী দিনে আমেরিকানরা যদি আরো নিবি-ড়ভাবে আসে তবে তাতে ভারতবর্ষের বড়ই উপকার হবে। ওই যে মোগলদেরকে বিবেচনায় আনলেন না, বাদ দিলেন, সেটাই ভেতরের কারণ, যে জন্য তিনিই এম ফস্টারের উপন্যাস *এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়ার* নায়কদের একজনকে, ডা. আজিজকে পছন্দ করেননি: স্মরণীয় যে আজিজ ছিলেন খুবই মোগলভক্ত। নীরদ চৌধুরী একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, এমনকি স্বাধীন ভারতেও আজিজের মতো লোককে তিনি তাঁর বাড়ির চৌকাঠ পর্যন্ত মাড়াতে দেবেন না; প্রবন্ধটি এনকাউন্টার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, ফস্টার সেটি পড়ে মন্তব্য করেছিলেন, আজিজের কপাল ভালো, তার যাবার জন্য অন্য বাড়ি আছে। নীরদ চৌধুরীদের সঙ্গে তুলনা করলে খুব সহজেই বোঝা যাবে এডওয়ার্ড সাঈদ কেমন অসামান্য, এবং বুদ্ধিজীবী হিসাবে তিনি কত বড় মাপের মানুষ।

অসামান্য ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও; নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর কালের সেরা বুদ্ধিজীবী ছিলেন। কিন্তু প্রাচ্যবাদী জ্ঞানতত্ত্ব তাঁকেও ক্ষমা করে নি; নইলে তিনি বলবেন কেন যে,

www.pathagar.com

'আমরা পরাধীন জাতি অনেককাল পরাধীন থাকিব', এবং তাঁর 'সাম্য' বইতেই বা এমন উক্তি আমরা কেন পাবো যে, "স্ত্রী পুরুষে যেরূপ স্বভাবগত বৈষম্য, ইংরেজ বাঙালীতেও সেইরূপ। ইংরেজ বলবান, বাঙালী দুর্বল, ইংরেজ সাহসী, বাঙালী ভীরু, ইংরেজ ক্লেশসহিষ্ণু, বাঙালী কোমল"।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাম্রাজ্যবাদকে জানতেন, ওই ব্যবস্থাপনাটিকে ধিক্কার জানাতে তিনি কখনোই দ্বিধান্বিত ছিলেন না, জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশের নৃশংসতার বিরুদ্ধে তাঁর মতো জোরালো প্রতিবাদ শিল্পী সাহিত্যিক মহলের তো নয়ই, রাজনৈতিক মহলেরও কেউ সেকালে করেননি, এবং জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে 'সভ্যতার সঙ্কট'-এ সাম্রাজ্যবাদের মুখচ্ছবি খুলে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু তিনিও যে প্রাচ্যবাদের সম্পূর্ণ বাইরে ছিলেন তা বলা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন অত্যাসন্ন, আনুষ্ঠানিকভাবে ওই পুরস্কার গ্রহণ করতে তিনি স্টকহোমে যান ১৯২৩-এ, সে-উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার কয়েকটি উক্তি প্রাচ্যবাদ প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বৈকি। যুদ্ধে নৃশংসরূপে-বিধ্বস্ত ইউরোপের পটভূমিকে স্মরণে রেখে ফিরে তাকালে হঠাৎ মনে হবে রবীন্দ্রনাথ কী পরিহাস করছেন, তাঁর উক্তিতে কী রয়েছে ব্যাজস্তুতি? যেমন তিনি বলছেন,

> And I felt a great desire to come out and come into touch with the Humanity of the West, for I was conscious that the present age belongs to the Western man with his super-abundance of energy.

রবীন্দ্রনাথ যাকে super-abundance of energy বলেছেন, সাঈদ তো বটেই অন্যরাও বলতে চাইবেন যে, সেটারই আগের নাম ছিল উপনিবেশবাদ, এখনকার নাম সাম্রাজ্যবাদ। ওই যে প্রাচ্যের মানুষ, the western man, একেই তো সাঈদ বলেছেন প্রাচ্যবাদী। প্রাচ্যবাদী ওই মানুষটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আরো প্রশংসা রয়েছে,

> He has got the power of the whole world, and his life is overflowing all boundaries and is sending out the message to the great future. And I felt that I must before I die come to the West and meet the man of the secret shrine where the Divine presence has his dwelling.

ওই Diving Presence কে Divine man হিসাবেও দেখছেন তিনি, এবং মনে করছেন সে বাস করে পশ্চিমেই,

> And I thought that the Divine man with all his powers and aspiration of life is dwelling in the West.

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, তিনি বিস্মিত ও সম্মানিত বোধ করছেন এটা দেখে যে,

> And it was a miracle to me who had lived for fifty years far away from activity, far away from the West, that I should be almost in a moment be accepted by the West as one of its own poets.

রবীন্দ্রনাথ সারাবিশ্বের কবি, যথার্থই বিশ্বকবি, কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান এবং পশ্চিমের অগ্রসরবর্তিতার কথাই বলেছেন তিনি তাঁর এই বক্তৃতাতে। তিনি বলেছেন তাঁর নিজের ভেতর যে পূর্ব আছে তাকেই তিনি তুলে দিয়েছেন পশ্চিমের হাতে, 'It is the East in me which I gave to the West'.

প্রাচ্যবাদের একটি কখনো সূক্ষ্ম, কখনো বা অতটা-সূক্ষ্ম-নয়, প্রচারণা হচ্ছে এই যে,

www.pathagar.com

পাশ্চাত্য পুরুষের মতো আর প্রাচ্য হলো নারীসুলভ, যে-বক্তব্যটা জাতীয়তাবাদি বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ধৃতিটির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি। রবীন্দ্রনাথও সে-রকম কথাই বলেছেন,

> For is not the East the mother of spiritual Humanity and does not the West, do not the children of the West amidst their games and plays when they get hurt, when they get famished and hungry turn their face to the serene mother, the East?

প্রাচ্যের যে-আধ্যাত্মিকতার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন সেটি প্রাচ্যবাদীদেরও পছন্দের বিষয়; তারা ওটির কথা বার বার বলেছে, কিন্তু কখনো পিঠ চাপড়ে, কখনো বা বিদ্রূপ করে। আবার এমনও স্বর শুনেছি আমরা যেটা করুণার নয়, বিদ্রূপেরও নয়; তীব্র ঘৃণার, যেমনটা রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল পুরস্কার পান তার কাছাকাছি সময়ে, ইউরোপের যুদ্ধের ভয়াবহতার ভেতরে থেকেই, যুদ্ধবাজদের হাতে পীড়িত হয়েও (বিশেষ করে তাঁর স্ত্রী জার্মান হওয়াতে) ডি এইচ লরেন্সের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে লরেন্স লিখছেন,

> I become more and more surprised to see how far higher in reality our European civilization stands than the Indian and Persian ever dreamed of. And one is glad to realize how the Hindus are humbly decadent and reverting to all forms of barbarism in all sorts of ways. We feel surer on our feet, then. But this fraud of looking up to them-this wretched worship-of-Tagore attitude is disgusting. 'Better fifty years of Europe' even as she is. (২৪ মে ১৯১৬)

এই কণ্ঠস্বর মেকওলের চেয়েও কর্কশ; বোঝা যায় লরেন্স বিশেষভাবে চটে গেছেন Tagore-কে নিয়ে হৈ চৈ করা হচ্ছে দেখে; পূর্বের প্রতি পশ্চিমের আগ্রহকে তিনি প্রতারণা বলছেন, নিতান্ত যে মিথ্যা বলেছেন তা নয়। এবং বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ যাকে প্রাচ্যের সবলতা বলছেন পাশ্চাত্যের মুখপাত্র লরেন্স তাকেই বলছেন বর্বরতা।

অস্ট্রেলিয়াতে যাবার পথে লরেন্স সিংহলে থেমেছিলেন। সিংহল ছেড়ে অস্ট্রেলিয়াগামী জাহাজ থেকে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন, 'Those natives are back of us-in the living sense lower than we.'। সিংহল সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, 'I did not like Ceylon. The East is not for me'. বলছেন, তিনি বুদ্ধকে পছন্দ করেন না। তাঁর পছন্দ যীশু খ্রিষ্টকে। প্রাচ্যে এসে লরেন্স জনপ্রাচুর্য দেখে অত্যন্ত পীড়িত বোধ করেছেন, ভয় পেয়েছেন ইংল্যান্ডের কথা ভেবে, ইংল্যান্ড বুঝি-বা তলিয়েই যায় এই জনবিস্তৃতির চাপে,

> They're going to swarm over us and suffocate us. We are, have been for five centuries, the growing tip. Now we're going to fall. But you don't catch me going back on my whiteness and Englishness and myself. (৩০ এপ্রিল ১৯২২)

অন্যত্র নিজেদের কর্মব্যস্ততার কথা বলতে গিয়ে বন্ধুকে লিখছেন, 'We have been working like niggars.' *এ্যারনস* রড উপন্যাসে আছে,

> I can't do with folks who teem by the billion, like the Chinese and Japs and Orientals altogether. Only vermins teem by the billion. Higher types breed slower.

নরনারীর সম্পর্ক এবং সাহিত্য বিষয়ে ধারণার ক্ষেত্রে লরেন্স অবশ্যই বিপ্লবী, কিন্তু প্রাচ্যবাদের ক্ষেত্রে তিনি খুবই সাধারণ, অত্যন্ত রক্ষণশীল। তিনি মানুষের বুদ্ধির তুলনায় রক্তের ক্ষমতার ওপর গুরুত্ব অধিক দিয়েছেন, যে-গুরুত্বদানের ভেতরে ফ্যাসিবাদী প্রবণতা আছে বলে অনেকে আশঙ্কা করেছেন, আর সে-আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক নয় প্রাচ্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে তার প্রমাণ রয়েছে।

লরেন্সের তুলনায় টি এস এলিয়ট কম বৈপ্লবিক; তিনি স্বঘোষিত রাজতন্ত্রী ও রক্ষণশীল। তাঁর লেখাতে প্রাচ্য সম্পর্কে কৌতুকপূর্ণ অবজ্ঞা থাকবে সেটা অপ্রত্যাশিত নয়: আর সেটা আছেও, যেমন তাঁর কাব্য নাটক *ফ্যামিলি রিইউনিয়ন* এবং *দি ককটেল পার্টি*-তে। ওই দুই নাটকের প্রথমটিতে হ্যারি সম্পর্কে খবর পাওয়া যাচ্ছে যে সে প্রাচ্যে যাবে, ধর্মপ্রচারক (মিশনারী) হয়ে। তাতে আত্মীয়দের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য। একজন মহিলা বলছেন, 'কিন্তু উষ্ণ দেশে বসবাস সম্ভব এমনটা তো সত্যি সত্যি ভাবা যায় না।' অপরজন, যিনি পুরুষ, তাঁকে দেখা যাচ্ছে অধিক বাস্তববাদী, তিনি বলছেন, যেতে হলে প্রথমে দরকার হবে চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান, তারপর জানতে হবে ভাষা, ভাষা নয় শুধু উপভাষাও, ওসব জানলে Natives দেরকে জানতে সুবিধা হবে, নানান ধরনের টিকা নিতে হবে, টিকা না নিয়ে তো যাওয়াই যাবে না।

অপর নাটক *দি ককটেল পার্টিতে* কথোপকথন চলছে এ্যালেক্স ও জুলিয়ার মধ্যে। এলেক্স বলছে, 'জুলিয়া, তুমি ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারোনি, ওখানে কোনো বাঘ ছিল না।' জবাবে জুলিয়া বলছে,

> Then what were you doing, up in a tree,
> You and the Maharaja?

মার্জিত এবং নারীবাদী লেখক ভার্জিনিয়া উলফের লেখাতেও প্রাচ্যবাদিতার নিদর্শন পাওয়া যাবে।

ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রাচ্যবাদী মনোভাবের প্রতিফলন কিভাবে ঘটেছে তার বিস্তৃত বিবরণ সাঈদ তাঁর বইতে দিয়েছেন। টমাস মানের *ডেথ ইন ভেনিস*-এ প্লেগের কথা রয়েছে; ঔপন্যাসিক জানাচ্ছেন যে, সেই প্লেগ এসেছে এশিয়া থেকে। ডস্টয়ভস্কির *ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট* উপন্যাসেও একটি প্লেগের উল্লেখ আছে; বাস্তবের নয়, স্বপ্নের। উপন্যাসের শেষে অসুস্থ রাসকলনিকভ একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছে। সে দেখেছে যে, পৃথিবী মস্ত এক অভিশাপের মধ্যে পড়েছে; একটি ভয়ঙ্কর, অপরিচিত মড়ক ইউরোপের দিকে ধেয়ে আসছে, আসছে এশিয়ার গভীর থেকে উত্থিত হয়ে।

চিলির কবি পাবলো নেরুদার সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অবস্থান প্রাচ্যবাদীদের থেকে একেবারেই আলাদা, তিনি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, এবং সে-বিরোধিতার কারণে তাঁকে দুর্ভোগও পোহাতে হয়েছে বৈকি। নেরুদার কথা সাঈদের *অরিয়েন্টালিজম*-এ না থাকলেও পরবর্তী বই *কালচার এ্যান্ড ইমপিরিয়ালিজম*-এ রয়েছে। কিন্তু প্রাচ্যবাদ প্রসঙ্গেও নেরুদা অপ্রাসঙ্গিক নন, বিশেষভাবে তাঁর *মেময়ার্স*-এ বর্ণিত একটি ঘটনার কারণে। ১৯২৯-এ নেরুদা সিংহলে যান; কিন্তু তাঁর কাছে ওই দ্বীপ ছিল লরেন্সের দ্বীপ

থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এটিকে তার মনে হয়েছে পৃথিবীর বৃহৎ দ্বীপগুলোর ভেতর সুন্দরতম। সেখানে তাঁর সময়টা ছিল নিঃসঙ্গতার, অতটা নিঃসঙ্গ তিনি আগে কখনো বোধ করেননি, কিন্তু ভেতরে একটা উজ্জ্বলতাও লাভ করেছিলেন তিনি, ওই সময়েই। আর তখনি ঘটে ঘটনাটি। একটি মেয়ে তাঁর বাংলো সংলগ্ন শৌচাগারের ময়লা পরিষ্কার করতো। খুব সকালে আসতো এবং চলে যেতো। তামিল সম্প্রদায়ের অতিদরিদ্র এক কিশোরী। অনিন্দ্যসুন্দরী সে। নেরুদা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন, সে সাড়া দেয় নি। কখনো কখনো তার পথে ছোটখাটো উপহার রেখে দিতেন, সিল্কের কাপড় কিম্বা কোনো ফল, কিন্তু মেয়েটি সেদিকে তাকিয়েও দেখতো না। একদিন তিনি মেয়েটিকে ধরে ফেললেন এবং জোর করে বিছানায় নিয়ে এলেন। হাস্য করা তো দূরের কথা, তামিল কিশোরীটি একটি শব্দও করেনি। চোখ মেলে সর্বক্ষণ তাকিয়ে থেকেছে, ঘৃণাভরে। কবি নেরুদা লিখছেন, নগ্নদেহ মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন দক্ষিণ ভারতের হাজার বছরের পুরাতন নারীমূর্তিগুলোরই একটি। এর আগে তার চলার ভঙ্গিতে তিনি দেখেছিলেন রাণীর রাজকীয় নিস্পৃহতা।

কিন্তু ওই যে রাণী দেখলেন, মানুষ না-দেখে; প্রস্তর মূর্তি দেখলেন এবং বলপ্রয়োগ করলেন এসব কাণ্ড ঘটাবার জোরটা তিনি পেলেন কোথা থেকে? পেলেন তো প্রাচ্যের নন, পাশ্চাত্যের লোক বলেই। পাশ্চাত্যের লোক বলেই চাকরি পেয়েছেন সিংহলে, বড় বাংলো পেয়েছিলেন থাকার। আর ওইসব কর্মের পেছনে যে মনোভাবটি কাজ করেছে, সেটাই বরঞ্চ অধিক তাৎপর্যপূর্ণ, সেখানে সাময়িকভাবে হলেও, ওই বিশেষ সময়টিতেই হয়তো বা, প্রাচ্যবাদীদের একজনই হয়ে গেছেন পাবলো নেরুদা, মোটেই স্বতন্ত্র থাকেননি। যদিও প্রাচ্যের দুর্ভাগ্যের প্রতি গভীর সহানুভূতির কথা তাঁর ওই আত্মস্মৃতির বইতেই আছে।

সাঈদ তাঁর রচনাতে উপরে আলোচিত দৃষ্টান্তগুলোর উল্লেখ করেন নি। সব ঘটনার তালিকা দেওয়া অবশ্যই সম্ভব নয়, দিলে তা বিশ্বকোষের মতো বৃহৎ হবার আশঙ্কা থাকতো; কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকটা সীমাও আছে। সাঈদের প্রাচ্যবাদের ভৌগোলিক সীমার ভেতর এশিয়া পড়ে অবশ্যই, কিন্তু অধিক গুরুত্ব পেয়েছে মধ্যপ্রাচ্য; যে জন্য, *অরিয়েন্টালিজম* এবং *কালচার এ্যান্ড ইমপিরিয়ালিজম* উভয় গ্রন্থেই ডি এইচ লরেন্স প্রাসঙ্গিক না হয়ে বরঞ্চ অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত অপর লরেন্স, টি ই লরেন্স গুরুত্বপূর্ণ হয়েছেন কেননা টি ই লরেন্স মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

৪

জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রাচ্যবাদ কিভাবে কাজ করে, কেমন ভাবে আওতাধীনদের মনোজগতকে প্রভাবিত করে তার অজস্র দৃষ্টান্ত আমাদের নিজেদের দেশে ও সংস্কৃতিতে পাওয়া যাবে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথই যদি বাইরে না থাকেন, তবে কার পক্ষে সম্ভব নিজেকে বহির্ভূত করা? শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই এককালে ওই বৃত্তের অধীনে ছিল, এখন যে নেই তাও নয়। বৃত্তটি পশ্চিম সৃষ্টি করেছে তার স্বার্থে, আমরা তার জালে বিলক্ষণ ধরা পড়েছি।

www.pathagar.com

আমার নিজের কথাটাই বলি না কেন। এডওয়ার্ড সাঈদ এবং আমি প্রায় সমবয়স্ক; দু'জনেই ইংরেজী সাহিত্য পড়েছি, এবং তিনি যখন আমেরিকায় পিএইচডি ডিগ্রির জন্য অভিসন্দর্ভ রচনা করছেন তার কাছাকাছি সময়ে আমিও ইংল্যান্ডে একই কর্তব্যপালনে নিয়োজিত ছিলাম : তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল যোসেফ কনরাড, ঘটনাক্রমে আমিও যে তিনজনের ওপর গবেষণা করছিলাম, তাঁদের মধ্যে কনরাডই ছিলেন প্রধান। পরবর্তীতে সাঈদও অধ্যাপনা করেছেন, আমিও করেছি। কিন্তু ওইখানেই মিলের শেষ এবং পার্থক্যের শুরু; আর বলাই বাহুল্য পার্থক্যটা অনেক গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ, সাদৃশ্যের তুলনায়। মনীষার ব্যবধান তো রয়েছেই, আমার ক্ষেত্রে সুযোগেরও অভাব ছিল। তার কারণ প্রাচ্যবাদের বৃত্তটা আমাদের জন্য ছিল আরো সঙ্কোচনকামী।

যেমন ধরা যাক, পাঠ্যসূচী। অবিশ্বাস্য মনে হবে, ভাবলে হাসিও পাবে যে, আমাদের পাঠ্যতালিকায় আমার পরবর্তী গবেষণার বিষয় যে তিনজন ঔপন্যাসিক তাঁদের কেউই ছিলেন না; আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের একটি পুরো পাঠ্যসূচী ছিল ঠিকই, কিন্তু তাতে কোনমতে জায়গা-করে-নেওয়া সংক্ষিপ্তাকারের এলিয়ট ও ইয়েটসের সঙ্গে ঔপন্যাসিক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সমারসেট মম ও অল্ডাস হাক্সলি। এমনকি শ্রেণীকক্ষে যে শেকস্‌পীয়র পড়বো তারও সুযোগ ছিল সঙ্কীর্ণ; চার বছরে আমরা মাত্র দু'টি শেকস্‌পীয়রীয় নাটক পড়েছি, একটি কমেডি অপরটি ট্র্যাজেডি। অনার্সে পুরো একটি পত্র ছিল এ্যাংলো-স্যাক্সন সাহিত্যের; সেখানে ১০০ বরাদ্দ নম্বরের ভেতর থেকে সর্বোচ্চ কৃতিত্ব সংগ্রহের জন্য এ্যাংলো-স্যাক্সন ব্যাকরণ ও ওই ভাষা থেকে আধুনিক ইংরেজীতে অনুবাদ (ভাগ্য ভালো আধুনিক ইংরেজী থেকে এ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষায় নয়) করার বাধ্যবাধকতা ছিল। আরো কিছু অবশ্য করতে হতো, ওই সাহিত্যের ওপর লিখতে হতো; তবে কোনোটাতেই শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দের কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না। অন্যদিকে অনুবাদে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান এবং আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যপাঠের সুযোগ আমরা পাইনি। এম এ ক্লাশের পাঠ্যসূচীতে একটি পত্রের ৭৫ নম্বর অপচয় করা হয়েছিল পরীক্ষার হলে বসে প্রবন্ধ রচনার জন্য বরাদ্দ করে। এলিজাবেথীয় যুগের অন্তত এমন একটি বই পাঠ্য করা হয়েছে যেটি আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বসে পড়ে নিতে হয়েছে।

এই পাঠ্যসূচী প্রণয়নের সঙ্গে দু'জন খুব ভালো শিক্ষক জড়িত ছিলেন বলে অনুমান করি, ১৯৪৭-এর পরে এঁরা উভয়েই এসেছিলেন ইংল্যান্ড থেকে, একজন চলে যাবার পরে অপরজন। দু'জনেই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পড়াশোনায় উৎসাহ দিতেন, এবং তাঁরা কেউই ঢাকাকে ভুলতে পারেননি; প্রফেসর এ জি স্টক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি নিয়ে একটি সুন্দর বই লিখেছেন, যেটি উপন্যাসের মতো সুখপাঠ্য, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ঢাকায় এসে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো দু'বছর অধ্যাপনা করে গেছেন। অন্যজন প্রফেসর জে এস টার্নার একাত্তর সালে কলকাতায় ছিলেন, বাহাত্তরে এসে তিনি আমাদেরকে দেখে গেছেন। কিন্তু আমার ধারণা উদারমনা উভয় শিক্ষকই নিজেদের অজান্তে হলেও প্রাচ্যবাদী ধারণার বশবর্তী ছিলেন; ঢাকা একটি শহর, সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, তার আবার ইংরেজী বিভাগ, সেখানে নিতান্তই মফস্বলীয় মানের চেয়ে উঁচু কোনো পাঠ্যসূচী কার্যকর করতে গিয়ে বেচারা শিক্ষার্থীদের জন্য অহেতুক পীড়ার কারণ

www.pathagar.com

হবেন এমন চিন্তাকে তাঁরা প্রশ্রয় দেননি। উপকার করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত অপকার করেছেন কিনা সেটা অবশ্য ভিন্ন বিবেচনা।

প্রাচ্যবিদ্যার সদম্ভাচার বাংলাদেশে এখন যে অত্যন্ত প্রবল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেবল ইংরেজী শিক্ষার উন্মত্ত ব্যগ্রতা বলে নয়, নিজেদেরকে পাশ্চাত্যের মাপে ওজনদার করবার চেষ্টার তো কোনো অবধি নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এক সময়ে বলা হতো প্রাচ্যের অক্সফোর্ড; এখন কেবল অক্সফোর্ড নয়, কেম্ব্রিজ ইটন হ্যারো লণ্ডন সবই স্কুলের নাম নিয়ে গলিতে গলিতে শোভা পাচ্ছে।

আর ভুল কারণে আমাদের প্রশংসা, সেটা আগেও শুনেছি, এখনো শুনছি। পুলিশের চাকরি নিয়ে এক ইংরেজ এসেছিলেন তখনকার বাংলায়, *জাস্ট মাই লাক* নামে তিনি একটি বই লিখেছেন, কিছুদিন আগে সেটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। স্থানীয় ইংরেজী দৈনিকে প্রশংসা শুনে বইটি পড়ে দেখলাম। ভদ্রলোক স্কুলের গণ্ডিও পার হননি, কিন্তু যেহেতু ইংরেজ তাই তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের সদস্য হতে; নিজেকে তিনি বলেছেন অকুণ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদী, এবং বাঙালীরা যে ভীরু এই অপবাদ অকপটে খণ্ডন করেছেন। তিনি লিখছেন,

> The Bengali has often been a subject of scorn for his alleged lack of daring and courage. This is completely unfair and unjustified. He is not the martial type like the Punjabi, the Rajput and other races who formed the backbone of the Indian army. But there are dozens of cases of courage of the Bengali Intelligence officer. etc.

কোন্ বাঙালীকে প্রশংসা করছেন তিনি সাহসী বলে? যারা দালালী করেছে, কাজ করেছে মীরজাফরের, রাজাকারের, তাদেরকে। তিনি যে কট্টর সাম্রাজ্যবাদী সে তো বলেছেন, বলেই নিয়েছেন, এবং সেই দৃষ্টিতেই দেখছি বিচার করছেন 'বীরত্বে'র। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা এসব পিঠচাপড়ানো বক্তব্যকে এখনো গুরুত্ব দিচ্ছি, এবং ওই লেখকও আশা করবার মতো ভরসা পেয়েছেন যে, তাঁর প্রশংসা শুনে আমরা উৎফুল্ল হবো। আসলে প্রাচ্যবাদ ততদিন খুবই বহাল তবিয়তে থাকবে যতদিন সাম্রাজ্যবাদ থাকছে। সাঈদও সে-কথাই বলেছেন, যে জন্য একই বিষয়ের ওপর লিখতে গিয়ে *অরিয়েন্টালিজম*-এর পরবর্তী গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন *কালচার এ্যান্ড ইমপিরিয়ালিজম।* [১৯৪৮ সালে স্বাধীন পাকিস্তানের কালে উপরে উল্লেখিত প্রাচ্যবাদী পুলিশ কর্মকর্তা যে পূর্ববঙ্গের সারদা পুলিশ প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হবার জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, এ খবর মোটেই চাঞ্চল্যকর নয়, কেননা নতুন রাষ্ট্রের কর্মকর্তারাও প্রাচ্যবাদের অধীনস্ত ছিলেন বৈকি। এখনও যে নেই তা নয়।]

৫

এডওয়ার্ড সাঈদ সাহিত্যসমালোচক হিসাবেও অসাধারণ। শুধু সাহিত্য সমালোচনাই যদি রেখে যেতেন, তবুও তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকতেন। তাঁর সাহিত্যসমালোচনা হৃদয়গ্রাহী। যুক্তি দিয়ে লেখেন, কখনোই উত্তেজিত হন না, বাগাড়ম্বর নেই, একটানা পড়া যায়, এবং পাতায় পাতায় মৌলিকত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটায়, আনন্দিত হতে হয়।

www.pathagar.com

সাঈদের মৌলিকত্ব সাহিত্যিক ও সাহিত্যিক রচনার বিচারে প্রকাশ পেয়েছে; বিশেষভাবে তা উজ্জ্বল দু'টি ক্ষেত্রে, একটি হচ্ছে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ, অপরটি সাহিত্যকে স্বয়ম্ভূ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞান না করে তাকে যুক্ত করে দেখা সংস্কৃতির সঙ্গে।

তুলনামূলক সাহিত্যসমালোচনা নতুন কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু সাঈদের ক্ষেত্রে অনেক তুলনা অভিনব। তদুপরি তুলনার ক্ষেত্রটিও অত্যন্ত বিস্তৃত। তিনি ফরাসী ও জার্মান সাহিত্য অভিনিবেশ সহকারে পড়েছেন, এবং সেই জ্ঞানকে অনায়াসে কাজে লাগিয়েছেন ইংরেজী সাহিত্যের বিবেচনায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পেশাগত জীবন শুরু করেন সাহিত্যের শিক্ষক হিসাবে, কিন্তু পরে নিয়োগ পান ইংরেজী ও তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে; এই নিয়োগ যে অত্যন্ত যথাযথ তাঁর প্রমাণ সাঈদের রচনার সর্বত্র পাওয়া যাবে।

কিন্তু তুলনামূলক পাঠের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সাংস্কৃতিক পাঠ। এক্ষেত্রে সাঈদ অনন্য। সাহিত্যের পেছনে যে সমাজ থাকে এটা তো স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু সমাজ নয় কেবল, সংস্কৃতি যে থাকে আরো নিবিড়ভাবে সেটা সাঈদ তাঁর রচনাতে সুন্দর করে দেখিয়েছেন। সংস্কৃতিতে সমাজ থাকে, থাকে রাজনীতি, নৈতিকতা, আদর্শ এবং সর্বোপরি ইতিহাস। সংস্কৃতির এই ধারণার জন্য সাঈদ গ্রামসির কাছে যে ঋণী সেটা ঠিক, কিন্তু সাহিত্যপাঠে সংস্কৃতির প্রয়োগের ব্যাপারে তাঁর নিজস্বতা অনস্বীকার্য। কাজটা তাঁর আগে রেমন্ড উইলিয়ামসও কিছুটা করেছেন, কিন্তু সাঈদ ওই কাজ আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁর নিজের মতো করে। সাঈদ মনে করেন বিবেচ্য রচনাটিকে (টেক্সট) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পাঠ করতে হবে এবং শুধু রচনার ভেতরে কি আছে তা নয়, যা ইচ্ছে করে দূরে রাখা হয়েছে কিম্বা অস্পষ্টভাবে রয়েছে তাকেও লক্ষ্য করতে হবে। কেননা অনুপস্থিতি অকারণে ঘটে না, যে গুপ্ত সেও এমনি এমনি গুপ্ত হয়নি, পেছনে নিশ্চয়ই সাংস্কৃতিক কারণ আছে।

পঞ্চাশের দশকেও সাহিত্যের সতর্ক ও বিশ্লেষণীপাঠের রেওয়াজ ছিল। প্র্যাকটিকাল ও টেক্সচুয়াল সমালোচনা তখন গুরুত্ব পেতো। কিন্তু ওই ধারার পেছনে এক রকমের একটা অভিজ্ঞান কাজ করতো যে, সাহিত্যের যে-রচনাটি আমার সামনে রয়েছে সেটাকে বিচার করাই যথেষ্ট, তার পেছনে বা আশেপাশে না তাকালেও চলবে। বিচারের এই পদ্ধতিকে চূড়ান্ত জায়গায় নিয়ে গেছেন দেরিদা, যাঁর বিনির্মাণ তত্ত্বের মূল কথাটাই হলো এই যে, পাঠ্য রচনাটিকে সঠিকভাবে পড়া চাই। কে পড়বেন? পড়বেন অবশ্যই পাঠক, কিন্তু ওই পঠনে লেখকের কোনো জবানবন্দীর আবশ্যকতা নেই, তাঁর উপস্থিতি অপ্রয়োজনীয়, রচনার যে পাঠটি পাঠক তাঁর নিজের জন্য তৈরি করছেন সেটিই হচ্ছে রচনা, তার বাইরে রচনাটির অন্য কোনো অস্তিত্ব নেই। দেরিদার সঙ্গে ফুকোর একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু সাঈদ দেরিদার বিনির্মাণ তত্ত্বকে মোটেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন না; তাঁর পদ্ধতি একেবারেই ভিন্ন প্রকারের।

কেবল রচনা পাঠে যাঁরা সন্তুষ্ট নন, ভেতরে লেখকের যে মনোভঙ্গি রয়েছে সেটাকে বিবেচনা করা যাঁরা খুবই প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন তাঁরাও কোন দিকে যে এগুবেন তা সবসময়ে ঠিক করতে পারেন না। কেউ চলে যান নারীবাদের দিকে, কেউ খোঁজ করেন রচনায় সমকামিতা রয়েছে কিনা তার, কারো বা লক্ষ্য যৌনতার অন্বেষণ। আমার মনে

www.pathagar.com

পড়ে নিউইয়র্কে এক সাবেক ছাত্রীর সঙ্গে দেখা; মেয়েটি গবেষণা করছে শুনে স্বভাবতই আগ্রহী হয়ে জানতে চেয়েছি, কোন বিষয়ে। সে বললো, না, সাহিত্যে নয়, সাহিত্য সে ছেড়ে দিয়েছে, এখন পড়াশোনা করছে গ্রন্থবিজ্ঞান নিয়ে। কেন? তা জানতে চাওয়ায় বললো, ভয়ে। সে ঠিকই গিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে, যার তত্ত্বাবধানে কাজ করবার কথা তিনি বিষয় বেছে দিলেন আধুনিক ইংরেজী উপন্যাসে মেয়েদের সমকামিতা; শুনে ছাত্রীটি ঘাবড়ে গেছে, পরে সে রীতিমত ভয়ই পেয়েছে তখন জানতে পারলো অধ্যাপিকাও ব্যক্তিগত জীবনে এই জীবনধারারই অনুসারী। মোটকথা সাহিত্যপাঠ অন্ধগলিতে চলে যাবে এমন আশঙ্কাও দেখা দিয়েছিল, এখনও যে সে-আশঙ্কা নেই এমন নয়।

সাঈদের সাহিত্যসমালোচনা এখানে অনেকটা মুক্তিদানকারী ভূমিকা পালন করেছে। সাহিত্যবিচারকে সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে তিনি নতুন আলো-বাতাস নিয়ে এসেছেন, তাঁর ক্ষেত্রটিকে দিয়েছেন অনেক বড় করে, তাতে সাহিত্যপাঠের উপকার হয়েছে, সংস্কৃতিচিন্তার যে হয়নি তাও নয়।

বহু পরিচিত লেখক ও তাঁদের রচনা সম্পর্কে সাঈদ আমাদেরকে নতুনভাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছেন। যেমন ধরা যাক, ফরাসী লেখক গুস্তাভ ফ্লবেয়ার, যিনি *মাদাম বোভারি* লিখেছেন, তাঁর কথা। তাঁকে আমরা নন্দনতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতাবাদী সাহিত্যিক হিসাবেই জানি, কিন্তু তাঁর ভেতরেও যে প্রাচ্যবাদী মনোভাব ছিল তা আমরা সাঈদের লেখা না পড়লে অনুধাবন করতে পারতাম না। আলজেরিয়াতে জন্ম যে ফরাসী লেখক আলবেয়ার কামু'র–তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সাঈদ আমাদেরকে অবহিত করেন। মেলভিলের সেই অসামান্য উপন্যাস *মবি ডিক*, যেখানে প্রকাণ্ড একটি তিমি মাছের আত্মরক্ষামূলক প্রত্যাঘাতে শিকারী ক্যাপ্টেন এহাব তাঁর একটি পা হারিয়েছেন এবং এখন প্রতিশোধের উন্মত্ত বাসনা নিয়ে তিমিটিকে হত্যা করবার জন্য জাহাজ চালাচ্ছেন, সেই উপন্যাসে যে মহাকাব্যিক পটভূমি রয়েছে, আছে সমুদ্র, পাওয়া যাবে মানুষের বীরত্বের প্রমাণ, এসব আমরা জানতাম। ডি এইচ লরেন্স আমাদেরকে এও জানিয়েছেন যে, ওই উপন্যাসে ন্যায়-অন্যায়ের লড়াই চলছে, এহাব অন্যায় করছে, সে প্রাণহন্তারকের ভূমিকা নিয়েছে: কিন্তু এহাব যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের, এমনকি খোদ জর্জ বুশের প্রতিভূ হতে পারে, এবং তার উন্মাদনা যে মনগড়া অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে একটি উন্মত্ত যুদ্ধের ঘটনা, এই চাঞ্চল্যকর ও সম্পূর্ণ যৌক্তিক পাঠ সাঈদের আগে আমাদের জন্য কেউ তৈরি করেছেন বলে শুনিনি।

ডব্লু বি ইয়েটসের একটি অবিস্মরণীয় কবিতা আছে 'লিডা এ্যান্ড দি সোয়ান' নামে। লিডা একজন কিশোরী, একদা স্নান করছিল সে নদীতে, ওই অবস্থায় দেবরাজ জীয়ুসের চোখে পড়ে যায় মেয়েটি। আর যায় কোথায়, বিপদ আসে ঘনিয়ে। জীয়ুসের ক্ষমতা আছে ইচ্ছামত চেহারা ধারণের; ওই ক্ষমতা প্রয়োগ করে সে সাজ নিয়েছিল একটি রাজহংসের। কিশোরী লিডা সন্দেহ করেনি, নদীতে রাজহংস দেখে সে আকৃষ্ট হয়েছে; এবং সেই সুযোগে জীয়ুস তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নিয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে ইয়েটসের লেখা কবিতাটিকে পুরাতন কাহিনী নবরূপদান হিসাবে পাঠ করা হয়েছে। প্রেমের কবিতা হিসাবেও তা অবশ্যই গ্রাহ্য। কিন্তু সাঈদ দেখাচ্ছেন যে, এই কবিতায় একটি রূপক

www.pathagar.com

আছে, সেটি হলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার ছলচাতুরির হাতে আয়ারল্যান্ডের দুর্ভাগ্যের। অথবা ধরা যাক, ই এম ফস্টারের *এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া* উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য। সাঈদ বলছেন, ওই উপন্যাসে ফস্টার যে-কারণে বিব্রত, সেটা হচ্ছে এমন একটি বিষয়কে তিনি উপন্যাসে নিয়ে আসতে চেয়েছেন যাকে উপন্যাসের কাঠামোর মধ্যে আনা অত্যন্ত কঠিন। এ বক্তব্যটিও মৌলিক। ডিকেন্সের *গ্রেট এক্সপেক্টেশনস* উপন্যাসে লন্ডন শহরে অল্পশিক্ষিত মানুষদের নাট্যাভিনয়ের একটি বিবরণ রয়েছে। উপন্যাসটির কাঠামোতে ওই বিবরণের তাৎপর্য সাঈদ দেখিয়েছেন উল্লেখযোগ্য রূপে।

কিন্তু সাঈদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্মোচন হচ্ছে জেন অস্টেনের উপন্যাস *মেনসফিল্ড পার্ক*-এর সঙ্গে উপনিবেশের সম্পর্ক। অন্যত্র যেমন, ওই উপন্যাসটিতেও তেমনি, জেন অস্টেন বিত্তবান পারিবারিক জীবনের ছবিই এঁকেছেন। কিন্তু বড় বাড়ি মেনসফিল্ড পার্কের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে গৃহকর্তা স্যার টমাস বাট্রামের ঔপনিবেশিক চিনি-উৎপাদনের মালিকানা যে জড়িত তা সাঈদ দেখিয়ে না দিলে অন্য কেউ দিতেন বলে মনে হয় না; আগে কেউ দেননি যে সেটা তো নিশ্চিত। এন্টিগুয়া নামক দ্বীপে দাসদের সাহায্যে চিনি উৎপাদন করে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা, অতিশয় ভদ্র ও সজ্জন স্যার বাট্রামও ওই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। এই তথ্যের আভাস মাত্র আছে উপন্যাসটিতে, কিন্তু এটা না জানলে উপন্যাসের ভেতরে যা ঘটছে তাকে যথার্থরূপে অনুধাবন করা যাবে না। সে জেন অস্টেন লন্ডনকে পর্যন্ত দেখছেন দূর থেকে, যিনি লিখেছেন মফস্বলের পারিবারিক জীবন নিয়ে, তাঁর উপন্যাসও যে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুক্ত এ-সত্য ভদ্র পাঠকদের জন্য গ্রহণ করা কঠিন বৈকি। (সাঈদ তাঁর *রিপ্রেজেন্টেশনস অব ইনটেলেকচুয়ালস* বইতে তাঁর ওই কাজটি যে অনেকের দৃষ্টিতে 'অমার্জনীয় পাপ' বলে গণ্য হয়েছে তা উল্লেখ করেছেন।)

সাহিত্যসমালোচক হিসাবে সাঈদের বিশেষ আগ্রহ উপন্যাসে। উপন্যাস যে একটি বুর্জোয়া রূপকল্প এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য; ইতিহাসের ধারাবাহিক অগ্রগতিতে বুর্জোয়া বিকাশের যে-স্তরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটেছে এবং শিক্ষিত পাঠকদের (বিশেষ করে মহিলাদের) আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে ঘরে বসে, হয়তো বা গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করে বই পড়বার–তখনই উপন্যাসকে পাওয়া গেছে, তার আগে নয়। সাঈদ উপন্যাসের বিচারে আরো একটি মাত্রা যোগ করেছেন। তাঁর মতে উপন্যাস কেবল যে সাহিত্যিক এবং অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতিভূ তা নয়, উপন্যাস মূলতঃ একটি সাংস্কৃতিক রূপকল্প বটে, এবং এর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যক্ষ এবং ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যাপারটা তিনি বহু উপন্যাস থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এডওয়ার্ড সাঈদের কাছে সাহিত্য সংস্কৃতিরই অংশ, এবং সে জন্যই অতটা গুরুত্বপূর্ণ। *প্রাচ্যবাদ* গ্রন্থে তিনি যে প্রতর্কটি গড়ে তুলেছেন তার নির্ভরতা প্রধানত সাহিত্যের ওপরই, সঙ্গে আছে ভ্রমণ-কথা এবং ভাষাতত্ত্বের আলোচনা, যেসব রচনার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক যে খুব একটা দূরবর্তী তা নয়। সংস্কৃতিতে এই আগ্রহ তৈরির পেছনে যে গ্রামসি রয়েছেন সে-কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সংস্কৃতির মধ্যে স্থান জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচ্যবাদ-এর একটা ভূগোল আছে, যেটাকে প্রাচ্য বলা হয়। নির্দিষ্টতা তথা স্থানীয়ত্বকে গ্রামসি তাঁর চিন্তায় গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু সেই গুরুত্ব প্রদানটা ফুকোর মতো নয়, ভিন্ন বটে। কেননা ফুকো নির্দিষ্টতাকেই মুখ্য করে তোলেন; গ্রামসি তাঁর চিন্তায়

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট ঠিকই. কারাবন্দীর রোজনামচাতে তিনি ইটালির ইতিহাস, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি নিয়েই বেশী করে যে ভেবেছেন তা তাঁর বই হাতে নেওয়া মাত্রই বোঝা যায়, কিন্তু ফুকো যেভাবে সবকিছুকে খণ্ডে খণ্ডে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন করে করে দেখতে চান, গ্রামসি তা কখনোই চাইবেন না। ইটালির ইতিহাসকে তিনি মোটেই শ্রেণীবিভাজন ও শ্রেণীসংগ্রামের বাইরে রেখে দেখেন না, তাঁর ইতিহাসচর্চায় মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষা সব সময়েই উপস্থিত ও কার্যকর। হেগেলের মতো মার্কসও ইতিহাসকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান করেন, মার্কস ও মার্কসবাদীদের কাছে ইতিহাস হচ্ছে ঈশ্বরহীন বিশ্বে ঈশ্বরের মতো ব্যস্ত ও প্রভাবশালী, হেগেলের মতো মার্কসও সাধারণীকরণ করেন; কিন্তু দু'জনের ভেতর পার্থক্য তো অত্যন্ত মৌলিক, হেগেল হচ্ছেন ভাববাদী, আর মার্কস হলেন বস্তুবাদী, হেগেলের দ্বন্দ্ব-তত্ত্বকে মার্কস যে মাথার ওপর দাঁড়ানোর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন সে-দাবী মোটেই মিথ্যা নয়।

মার্কসের ইতিহাস তাই নির্দিষ্টতাকে বাদ দেয় না, স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করার প্রশ্ন সেখানে অবান্তর এবং তাঁর যে সাধারণীকরণ তা কখনোই আধ্যাত্মিক, কাল্পনিক বা আরোপিত নয়, সুনির্দিষ্ট বাস্তবতার ওপরই নির্ভরশীল। ওদিকে গ্রামসি সর্বদাই মার্কসবাদী, আর ফুকোর কাজ হলো মার্কসকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া, এবং পরোক্ষে যতটা পারা যায় বিরোধিতা করা। গ্রামসি মানুষকে মুক্ত করতে চান, মুক্তির সেই সংগ্রামে রাজনীতিই হবে পথপ্রদর্শক, কিন্তু সংস্কৃতির ভূমিকাও হবে জরুরী, বস্তুত সংস্কৃতিকে না বুঝলে সংগ্রামের রণকৌশল তৈরী করা অসম্ভব হবে, এবং রাজনৈতিক বিজয়ের পরেও, বিজয় সত্ত্বেও, মানুষের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসবে না। পরিপূর্ণ মুক্তি সাংস্কৃতিক মুক্তি বটে। ফুকো অবশ্য ওই ধরনের মুক্তির কথা ভাবেন না, সংগঠিত লড়াই বা প্রতিরোধ সম্ভব বলেও মনে করেন না। সাঈদ নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, ফুকো অরাজনৈতিকতার দিকে এগিয়ে গেছেন; ব্যক্তিকে দেখেছেন ক্ষমতার অণু হিসাবে, যে-দেখাটা ব্যক্তিমনে হতাশার সৃষ্টি করে বৈকি। সাঈদ নিজে কখনোই হতাশাবাদী নন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি লিখেছেন, বক্তৃতা করেছেন, ফিলিস্তিনী মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ অব্যাহত রেখেছেন; এবং সে-সংগ্রাম যে অরাজনৈতিক হতে পারে এমন চিন্তা তাঁর মধ্যে কখনো দেখা দেয়নি। ব্যবস্থা বদলানোয় ব্যক্তির ভূমিকা অকার্যকর, এটা সাঈদ মনে করেন না, ব্যক্তির ভূমিকা থাকবেই, বিশেষত সে-ব্যক্তি যদি একজন বুদ্ধিজীবী হন, সাইদ যেমনটা ছিলেন। কোনো কিছুই স্থির নয়, সবকিছুই আপেক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক, এবং সর্বজনীন বলে কিছুই নেই, সাঈদ এমনটা ভাবেন না, ফুকো যেমন ভাবতেন। সাঈদের কাছে প্রাচ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এগুলো বাস্তব ও সাধারণ সত্য; এরা স্থানীয় নয়, আন্তর্জাতিক বটে, এবং এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অবশ্যই প্রয়োজন, যে-প্রতিরোধ হবে আন্তর্জাতিক।

এদিক থেকে সাঈদ গ্রামসির কাছাকাছি, কিন্তু তাই বলে গ্রামসির রাজনৈতিক পথ ধরে যে এগুবেন সেটা তাঁর পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়, কেননা ফুকোর মতো তিনিও অমার্কসবাদী। কেবল যে অমার্কসবাদী তা নন, সাঈদ মার্কসবাদের সমালোচকও। ফুকো মনে করতেন মার্কসবাদ সবকিছুকে একজায়গায় টেনে নিয়ে আসে, সাঈদেরও বক্তব্য অনুরূপ। ফুকোর মতে মার্কসবাদ ইউরোপকেন্দ্রিক, যে-কথা সাঈদও বলেছেন। রাষ্ট্র ও

www.pathagar.com

অর্থনীতির ওপর ইতিহাসের নির্ভরতার মার্কসীয় তত্ত্বও সাঈদ গ্রহণ করতে সম্মত হননি। *দি ওয়ার্লড, দি টেক্সট এ্যান্ড দি ক্রিটিক* বইয়ের শুরুতে সাঈদের একটি স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি রয়েছে; তিনি বলছেন, I have been more influenced by Marxists than by Marxism or any other *ism*'। মার্কসবাদীরা অগ্রসর চিন্তার মানুষ তাই সাঈদের ওপর তাঁরা প্রভাব ফেলেছেন, কিন্তু মার্কসবাদ ভিন্ন বস্তু, সেটা আর পাঁচটা ism-এর মতোই একটি মতবাদ বটে,যেটির দ্বারা প্রভাবিত হতে তিনি সম্মত হননি।

সংস্কৃতি বলতে সাঈদ কি বোঝাচ্ছেন তার একটি সংজ্ঞা *কালচার এ্যান্ড ইমপিরিয়ালিজম* গ্রন্থের শুরুতেই পাওয়া যাবে, যেখানে তিনি বলছেন,

> As I use the word, 'culture' means two things in particular. First of all it means all those practices,like the arts of description, communication, and representation that have relative autonomy from the economic, so-cial, and political realms and that often exist in aesthetic forms, one of whose principal aims is pleasure.

এবং দ্বিতীয়ত,

> Second, and almost imperceptibly, culture is a concept that includes a refining and elevating element, each society's reservoir of the best that has been known and thought, as Matthew Arnold put in the 1860s.

এই অর্থে প্রত্যেক সমাজেরই একটা নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে, যে-নিজস্বতার উপলব্ধির সঙ্গে পরে যোগ হয় জাতি ও রাষ্ট্রের; এই সংযোগের ফলে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব এসে যায়, এবং সংস্কৃতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্বের জন্য মঞ্চ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সাঈদের এই সংজ্ঞার পাশে সংস্কৃতির একটি বিকল্প সংজ্ঞাও আমরা দিতে পারি। সেটা হতে পারে এই রকমের, সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের সঙ্গে তার পরিবেশের (ব্যাপক ও নৈর্ব্যক্তিক) এবং প্রবৃত্তির (ব্যক্তিগত) যে দ্বন্দ্ব তার নান্দনিক ও ব্যবহারিক প্রকাশ। নান্দনিক প্রকাশ ঘটে শিল্পকলায় এবং সৌন্দর্যসৃষ্টিতে। ব্যবহারিক প্রকাশের মধ্যে থাকে সামাজিক সম্পর্ক, ভাষা, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং বিশ্বাসঘটিত আচরণ ইত্যাদি।

সাঈদের সংজ্ঞার সঙ্গে এই সংজ্ঞার পার্থক্যের মূল জায়গাটা হচ্ছে এখানে যে, তাঁর সংজ্ঞাতে সংস্কৃতিকে অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতির এলাকা থেকে আপেক্ষিকভাবে মুক্ত অবস্থায় দেখার ইচ্ছাটা বেশ স্পষ্ট। ওইখানে তিনি উদারনীতিক; উদারনীতিকরাও সংস্কৃতিকে এভাবেই দেখতে চান। কিন্তু আমরা মনে করি যে, সংস্কৃতিতে অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতি থাকবেই, তাদেরকে বাইরে রাখা যাবে না। সাঈদ নিজেও যে তেমনটা মনে করেন না তা নয়। রাজনীতির কথা তাঁর বইতে বার বার আসে, এবং একথা জোর দিয়েই বলেছেন তিনি যে, সাহিত্যপাঠে তাঁর পেশাগত অভিজ্ঞতা থেকে এটা জেনেছেন যে, রাজনীতিকে দরজার ওপাশে রেখে এলে সাহিত্যের যথার্থ আলোচনা একেবারেই অসম্ভব, বিশেষ করে উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেটা হবে অপূর্ণ।

সংস্কৃতিকে সাঈদ একরৈখিক ও এককেন্দ্রিক হিসাবে দেখতে চান না, তিনি চান বহুমুখিতা, আকাঙ্ক্ষা করে বৈচিত্র্য, সেখানে থাকবে আদানপ্রদান, শোনা যাবে বিভিন্ন কণ্ঠস্বর, যেমনটা ফুকো দেখতে চেয়েছেন; এবং সংস্কৃতির জন্য আপেক্ষিক স্বাধীনতা যে

www.pathagar.com

তিনি চান সেটা একারণে যে তিনি সংস্কৃতিতে রাজনীতির হস্তক্ষেপ অপছন্দ করেন। ওই হস্তক্ষেপ কী ভাবে ঘটে সেটা তিনি *প্রাচ্যবাদ* গ্রন্থে দেখিয়েছেন; আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন ওই গ্রন্থের পনের বছর পরে ১৯৯৩ সালে লিখিত *কালচার এ্যান্ড ইমপিরিয়ালিজম* গ্রন্থে। দ্বিতীয় গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এটি *প্রাচ্যবাদ*- এর ধারাতেই নতুন একটি সংযোজন মাত্র নয়, এর স্বাতন্ত্র্য আছে; আর সেই স্বাতন্ত্র্যটা এসেছে এই সজ্ঞানতা থেকে যে,সংস্কৃতিতে সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপ অত্যন্ত প্রবল। বস্তুত ওই হস্তক্ষেপকে শত্রুতা বললেও অতিশয়োক্তি হবে না, যদিও সাঈদ এই ধরনের বক্তব্য প্রকাশ করেননি।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিরূপণের ব্যাপারে (উপরের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য) তিনি ম্যাথু আর্নল্ডের বক্তব্যকে স্মরণ করেছেন। সেটা স্বাভাবিক। আর্নল্ড সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিতেন, তিনি *কালচার এ্যান্ড এনার্কি* নামে বই রেখে গেছেন আমাদের জন্য; সর্বোপরি আর্নল্ড ছিলেন উদারনীতিক। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাঁর কালের কার্লাইল ও ডিজরেলির মতো তিনিও যে ছিলেন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক, এ সংবাদ সাঈদের গ্রন্থেই আমরা পাচ্ছি। উদারনীতি ভদ্রতার নীতি বটে, কিন্তু সবসময়ে সে যে ভদ্রতা রক্ষা করে চলতে পারে তা নয়; যেমন 'উদারপন্থী' হবার পরে ব্রিটেনের লেবার পার্টি এখন পারছে না, তার বড় বড় নেতারা লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে জর্জ বুশের মতো নগ্ন সাম্রাজ্যবাদীর কৌতুককর তল্পীবাহকে পরিণত হতে অসম্মত হয়নি।

যে কোনো জনগোষ্ঠীর পক্ষেই সংস্কৃতিই হচ্ছে নিজেকে রক্ষার জন্য চূড়ান্ত শক্তি, যে জন্য সাঈদ সংস্কৃতিকে অতটা গুরুত্ব দেন, সংস্কৃতির নিজস্বতার ওপর প্রাচ্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপে তিনি অমনভাবে বিচলিত। গ্রামসি আজ নেই, সাঈদও চলে গেলেন, কিন্তু সংস্কৃতিকে রক্ষা ও বিকশিত করবার সংগ্রামটা চলছে, এবং চলবেই।

উল্লেখ্য যে, সংস্কৃতিতে নানাবিধ হস্তক্ষেপের প্রতিরোধে উদারনীতিকদের তুলনায় সমাজতন্ত্রীরাই অধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ফুকোকে যদি উদারনীতিক বলি এবং গ্রামসির পাশে তাঁকে দাঁড় করাই তাহলে পার্থক্যটা বড়ই পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ফুকোর উত্তর-আধুনিক বিপ্লবটি নৈরাজ্যপন্থী ও হতাশাবাদী, গ্রামসির কাঙ্ক্ষিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কর্তৃত্ব ও আধিপত্য থেকে মুক্ত করে সংস্কৃতিকে প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক করবার লক্ষ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ। ওদিকে রাজনৈতিক সংগ্রামে সর্বক্ষণলিপ্ত বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী লেনিন ছিলেন গভীরভাবে সংস্কৃতিমনস্ক, সঙ্গীত পছন্দ করতেন এবং সাহিত্যের অত্যন্ত উৎসাহী পাঠক ছিলেন। বিপ্লবের পরে বুর্জোয়া সংস্কৃতির অর্জনগুলোকে ধ্বংস করে ফেলা যায় কি না, এ ধরনের কট্টর চিন্তার উদ্ভব দেখে তিনি বিচলিত বোধ করেছেন, এবং ওই অর্জনগুলোকে কি করে সর্বজনের কাছে পৌছানো ও তাদের অন্তর্গত গণতান্ত্রিক উপাদানকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে ব্যাপারে সচেষ্ট করার জন্য রাশিয়ার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। লেনিন যে শিক্ষাবিস্তার ও বিদ্যুতায়নকে অত গুরুত্ব দিয়েছেন তার আসল লক্ষ্য ছিল সাংস্কৃতিক উন্নয়ন। উদারপন্থীদের কাছে উগ্রপন্থী বলে পরিচিত স্ট্যালিনও ভাষা প্রশ্নে যে অবস্থান নিয়েছিলেন সেটি ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কথা উঠেছিল ভাষাকে বুর্জোয়া প্রভাবমুক্ত করবার, স্ট্যালিন বলেছেন ভাষা কোনো বিশেষ শ্রেণীর সম্পত্তি নয় যে তার ওপর হস্তক্ষেপ করতে হবে, বরঞ্চ চেষ্টা করা চাই তাকে

www.pathagar.com

আরো সমৃদ্ধ ও সর্বজনীন করবার। প্রাচ্যের কৃষকপ্রধান দেশের মানুষ মাও সে তুঙ যে সংস্কৃতিকে কতটা জরুরী মনে করতেন তার বহুবিধ প্রমাণ আমরা পাবো তাঁর রচনাবলীতে। বিপ্লব সম্পন্ন করবার দেড় যুগ পরে তিনি যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন তার পেছনে সংস্কৃতির গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর সচেতনতাই যে কাজ করেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়। স্মরণীয় যে, রুশ বিপ্লব সংস্কৃতিতে রূপান্তর ঘটাবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্পন্ন করতে পারে নি, ভেতর থেকে আমলাতন্ত্রের এবং বাইরে থেকে পুঁজিবাদী ভোগবাদের যৌথ আক্রমণে উদ্যোগটা ভেঙ্গে পড়েছে। সংস্কৃতিতে স্থূল হস্তক্ষেপ যে কতটা প্রলয়ঙ্কর হতে পারে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন তার খুব বড় দৃষ্টান্ত বটে।

৬

কিন্তু অসুবিধা আছে, যেমন সকল মানবিক বিষয়েই থাকে। সাঈদের সংস্কৃতি চিন্তার অসুবিধার একটি হচ্ছে পরিধির, অপরটি দৃষ্টিভঙ্গির।

পরিধির ব্যাপারটাই প্রথমে দেখা যাক। যে কোনো রকম বিভাজনেই অসুবিধা থাকে সীমানা নির্ধারণের। সাঈদের প্রাচ্যবাদের ক্ষেত্রেও সেটা দেখা গেছে। প্রাচ্যবাদ অত্যন্ত প্রাচীন এবং আবার তা আধুনিকও। আধুনিক প্রাচ্যবাদের সূত্রপাত ঔপনিবেশিক যুগে, আর এই প্রাচ্যবাদের সঙ্গে আগের প্রাচ্যবাদের পার্থক্য রয়েছে, আগেরটাতেও প্রাচ্যের প্রতি অবজ্ঞা ছিল, কিন্তু পরেরটাতে অবজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জ্ঞানতাত্ত্বিক পীড়নের ইচ্ছা। ফলে দুয়ের ভেতর ব্যবধানটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সাঈদের আলোচনায় এই ব্যবধানটাকে ততটা স্পষ্ট করা হয়নি। আরো বড় অসুবিধা অবশ্য এইখানে যে, *প্রাচ্যবাদ* গ্রন্থে এশিয়াকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, এবং প্রাচ্য বলতে প্রধানত মধ্যপ্রাচ্যকেই বোঝানো হয়েছে। এটাও একটা সীমা বটে।

তাছাড়া প্রাচ্যবাদী বিভাজনে অন্য অসুবিধাও রয়েছে। সাঈদ যথার্থই দেখিয়েছেন যে, প্রাচ্যবাদীরা (এক্ষেত্রে পশ্চিমের ভাষাতাত্ত্বিকেরা) ভাষার ক্ষেত্রেও উচ্চ-নীচের মান প্রয়োগ করে সাংস্কৃতিক বৈষম্যের তত্ত্ব দাঁড় করেছেন, তাঁরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীরা সৃজনশীল, অগ্রসরমান ও সতেজ; অপরদিকে সেমেটিক ভাষাভাষীরা স্থির, পশ্চাৎপদ ও অলস। তাদের এই তৎপরতার বিবরণটি অবশ্যই গ্রাহ্য, এবং সে-বিবরণ সাঈদ নিজের জ্ঞান, গবেষণা ও অনুসন্ধানের সাহায্যে চমৎকারভাবে উপস্থিত করেছেন; কিন্তু অসুবিধা দেখা দিয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় ও সেমেটিকের বিভাজনকে প্রাচ্যবাদের সঙ্গে যুক্ত করার জায়গাটিতে। তথাকথিত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীতে গ্রীক ও জার্মান ভাষা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সংস্কৃত ও ফরাসী, যা পাশ্চাত্যের নয় প্রাচ্যের ভাষা বটে। অন্যদিকে সেমেটিক হীব্রু ও আরবী প্রাচ্যের ভাষা ঠিকই, কিন্তু হীব্রুভাষী ইহুদীদের সঙ্গে আরবীভাষী আরবদের বিরোধ যেমন ঐতিহাসিকভাবে সত্য, তেমনি তা সত্য বর্তমান কালেও। তাই প্রাচ্যবাদের কল্পিত ভৌগোলিক রেখাটি এখানে এসে পরিষ্কার থাকে না, কিছুটা অস্পস্ট হয়ে যায় বৈকি।

উপনিবেশবাদের আলোচনায় কবি ডব্লু বি ইয়েটস খুবই প্রাসঙ্গিক, কিন্তু প্রাচ্যবাদ প্রসঙ্গে

www.pathagar.com

নন; কেননা ইয়েটসের জাতীয়তাবাদ ইংরেজ উপনিবেশবাদের বিরোধী ছিল ঠিকই,কিন্তু ইয়েটস এবং তাঁর দেশ আয়ারল্যান্ড প্রাচ্যের নয়, পাশ্চাত্যেরই।

দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি স্বভাবতঃই আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সাঈদ অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, কিন্তু তিনি উদারনীতিক ও; উদারনৈতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বুদ্ধিজীবী, এই বর্ণনা তাঁর পক্ষে অগ্রহণযোগ্য হবার কথা নয়। উদারনীতিকেরা সাধারণত রাজনীতিকে দেখতে চান না, এবং রাজনীতির অভ্যন্তরে কাজ করে যে অর্থনীতি তাকে যতটা পারা যায় বিবেচনার বাইরে রাখেন। এডওয়ার্ড সাঈদের সাংস্কৃতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে রাজনীতির অবস্থান স্পষ্ট। প্রাচ্যবাদকে তিনি কোনো দিক দিয়েই রাজনীতির বাইরে বলে মনে করেন না, এবং সাম্রাজ্যবাদ বস্তুটি যে পুরোপুরি রাজনৈতিক এ সত্য তাঁর রচনাতে সর্বদাই পরিষ্কার। কিন্তু অর্থনীতিকে গুরুত্ব না- দেবার ক্ষেত্রটিতে তিনি উদারনীতিকদেরই একজন হয়ে যান, তাদের বৃত্তের বাইরে থাকেন না। উদারনীতির দুর্বলতা সম্পর্কে সাঈদ অবহিত। ম্যাথু আর্নল্ডের সম্রাজ্যবাদী প্রবণতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় উদারনীতিবাদীদের সমালোচনা তাঁর বইয়ে রয়েছে। একালের ইংরেজ বুদ্ধিজীবী রেমন্ড উইলিয়ামস, পরে যিনি মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন, তিনি তাঁর প্রথম দিককার উদারনৈতিক রচনা *কালচার এ্যান্ড সোসাইটি* সাম্রাজ্যবাদের ব্যাপারটাকে বিবেচনার মধ্যে আনেননি। সাঈদ এতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, এবং উল্লেখ করেছেন যে, এক সাক্ষাৎকারে উইলিয়ামস নিজেই স্বীকার করেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদের তৎপরতার কথা ভাবা উচিত ছিল। এক্ষেত্রে দুর্বলতাটি দৃষ্টিভঙ্গিরই। উদারনৈতিক আমেরিকান সাহিত্যসমালোচক লায়নেল ট্রিলিঙ উদারনীতিবাদী ঔপন্যাসিক ই এম ফস্টার সম্পর্কে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বইটি লেখেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ওই বইতে একটি স্থূল সত্যের উল্লেখ তিনি করেন নি। সেটি এই যে, ফস্টারের উপন্যাস *হাওয়ার্ডস এন্ড*-এ আধিপত্যকারী যে পরিবার উইলকক্সদের, সেই পরিবারের ক্ষমতার উৎস হলো নাইজেরিয়াতে তাদের রবার উৎপাদনের ব্যবসা। ট্রিলিঙের এই অমনোযোগের দিকে সাঈদ যখন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তখন আবারও আমরা অবহিত হই অর্থনীতিকে দেখার ব্যাপারে উদারনীতির অনীহা সম্পর্কে। আমরা যোগ করতে পারি যে, ট্রিলিঙের ওই বইতে আরো একটি দুর্বলতা রয়েছে, যেটির কথা সাঈদ উল্লেখ করেননি। সেটি হলো এই যে, ট্রিলিঙ ফস্টারের *এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া* *যে* ফস্টারের সর্বপ্রধান ও শ্রেষ্ঠ রচনা তা মনে করেননি, তাঁর বিবেচনায় *হাওয়ার্ডস এন্ড*-ই হচ্ছে ফস্টারের সবচেয়ে বড় কাজ। অথচ আমরা জানি যে, *এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া* লিখেছিলেন বলেই ফস্টার অতটা গুরুত্বপূর্ণ, ওই উপন্যাস পর্যন্ত না এগিয়ে তিনি যদি *হাওয়ার্ডস এন্ড*-এ এসেই থেমে যেতেন তাহলে ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান ঔপন্যাসিকদের একজন বলে বিবেচিত হতেন না, সেটা প্রায় নিশ্চিতই বলা যায়। আসলে উদারনীতিকেরা সাধারণত উপনিবেশবাদের রাজনীতি ও অর্থনীতিকে বুঝতে আগ্রহী হন না।

সাঈদ উপনিবেশবাদকে জানেন,জানেন সাম্রাজ্যবাদকেও। প্রাচ্যবাদ-এ তিনি উপনিবেশবাদের তৎপরতা দেখেছেন, কিন্তু সেই দেখাকে পর্যাপ্ত মনে করেন নি. যেজন্য সাম্রাজ্যবাদকে বিবেচনার মধ্যে এনে তাঁকে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি রচনা করতে

www.pathagar.com

হয়েছে। *কালচার এ্যান্ড ইমপিরিয়ালিজম* কেবল যে *অরিয়েন্টালিজম*-এর পরবর্তী তা নয়, পরিপূরকও বটে। কেননা সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদের মতো যেমন, তেমনি আবার স্বতন্ত্রও। সাম্রাজ্যবাদ একটি বিশ্বব্যবস্থা, সে-তুলনায় উপনিবেশবাদ স্থানীয়। উপনিবেশবাদকে আলাদা আলাদাভাবে দেখা যায়-ব্রিটিশ, ফরাসী,ডাচ ইত্যাদি অভিধায় তাকে অভিহিত করা সম্ভব; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে একটি অভিন্ন বিশ্বব্যবস্থা যার ভেতরে রয়েছে পুঁজির দৌরাত্ম্য, যে-পুঁজি অবাধে সারা বিশ্বজুড়ে ঘুরে বেড়ায়, বাধা দিলে রক্তপাত ঘটে, এখন যেমন ইরাকে ঘটছে।

সাম্রাজ্যবাদ আসলে পুঁজিবাদেরই রাজনৈতিক প্রকাশ, যে-সত্যের অতিউজ্জ্বল উন্মোচন আছে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের বইতে। কিন্তু উদারনীতিকেরা অর্থনীতিকে দেখতে চান না, বড় জোর রাজনীতিকে দেখেন। সমাজে তাঁরা জনগোষ্ঠী দেখতে পান, ব্যক্তিকেও দেখেন, কিন্তু শ্রেণী দেখেন না। অথচ শ্রেণী বিভাজনকে গভীর করাটা হলো গিয়ে পুঁজিবাদের বিশেষ ও চারিত্রিক অবদান। সাম্রাজ্যবাদীরা এই বিভাজনকে রক্ষা করে; তার অধীনস্ত দেশগুলোতে কর্তৃত্বকারী ধনিক শ্রেণীকে সহায়ক শক্তি হিসাবে সঙ্গে নিয়ে নেয়, এবং শোষণপ্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখে। সাঈদও তাঁর প্রতর্কে অর্থনৈতিক বিবেচনাকে তেমন গুরুত্ব দেন না, যার ফলে সাম্রাজ্যবাদকে মনে হয় বুঝি-বা একটি সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ। সাম্রাজ্যবাদ সংস্কৃতিকে আঘাত করে, সংস্কৃতির নিজস্বতা ও বহুমুখিতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চায়, সাম্রাজ্যবাদের একটি নিজস্ব সংস্কৃতিও রয়েছে। কিন্তু তাই বলে সাম্রাজ্যবাদকে কিছুতেই সংস্কৃতি বলা যাবে না, সে এক ভীষণ দৈত্য যার আসল জোরটা অর্থনৈতিক। নিজের দেশে সে ধনিক শ্রেণীর পুঁজির সেবক, পুঁজির সেবা করতে গিয়েই নানা দেশে গিয়ে হানা দেয়, দখল করে।

সংস্কৃতিতে সাঈদ বহুমুখিতা দেখতে চান; কিন্তু এই যে কাঙ্ক্ষিত বহুমুখিতা সেটা কেমন করে টিকবে সমাজে যদি বৈষম্য থাকে? বৈষম্যের কারণে একদল ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে, অন্যদল (যারা অধিকাংশ) অধীনে চলে যায়; যারা উপরে থাকে তারা তাদের আদর্শ নিচের মানুষের ওপর চপিয়ে দেয়, এবং নিজেদের সংস্কৃতিকেই সকলের সংস্কৃতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। এটাই ঘটছে, এবং ঘটতে থাকবে, যতদিন না পুঁজিবাদকে পরাভূত করা যাচ্ছে। পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থায় তথাকথিত পিছিয়ে-পড়া দেশগুলোর ওপর ধনী দেশগুলো কর্তৃত্ব করে, এবং দেশের ভেতরে যা ঘটে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। দু'টি অঙ্গাঙ্গী জড়িত। সাম্রাজ্যবাদের কাজ তাই কেবল যে বহিরঙ্গের, তা নয়, সে কাজ করে সমাজ ও সংস্কৃতির ভেতরেও।

পুঁজিবাদই হচ্ছে মূল শত্রু; এবং ওই যে উদারনীতি সেও পুঁজিবাদের ভেতর থেকেই বের হয়ে এসেছে। উদারনীতিকরা একসময় অবাধ বাণিজ্য চাইতেন, পুঁজিবাদীরা সব সময়েই সেটা চায়, যদিও অবাধ বাণিজ্য বলতে তারা বোঝায় ধনী দেশের পণ্য গরীব দেশ কিনবে, কিনে আরো গরীব হবে, কিন্তু গরীব দেশের কোনো পণ্য ধনী দেশে ঢুকতে দেওয়া হবে না, যেমনটি এখন ঘটছে।

উদারনীতিক বলেই হয়তো-বা এডওয়ার্ড সাঈদ মার্কসবাদকে ভুল বোঝেন। কার্ল মার্কসকে তিনি ইউরোপ-কেন্দ্রিক একজন চিন্তাবিদ বলেই দেখেন, যেমনটা ফুকো দেখেছেন। (ফুকো নিজেও কিন্তু ইউরোপ-কেন্দ্রিকই) ইউরোপীয় পরিচয়ে মার্কস ফ্রয়েড

ও নীৎসের সঙ্গী হয়ে যান, যদিও আদর্শিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মার্কসের সঙ্গে ফ্রয়েড ও নীৎসের ব্যবধান আকাশ ও পাতালের। অন্যত্র মার্কস স্থান পান ডিজরেইলি,বার্টন, কার্লাইল, নারভাল ও ফ্লবেয়ারের কাতারে–তাঁদের মতোই প্রাচ্যবাদী হবার কারণে। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন নানা বিদ্যার পাঠ দেওয়া হয়, যেমন আফ্রো-কালচারালিজম, অক্সিডেন্টালিজম, ফেমিনিজম, ডিকনস্ট্রাকশন ইত্যাদি; ছেলে-মেয়েরা নিজ নিজ পছন্দমতো বেছে নিতে পারে, যেটা ইচ্ছা; যেন তালিকা দেখে খাদ্য পছন্দ করা; মার্কসবাদও সেখানে ওইভাবেই পড়ানো হচ্ছে বলে সাঈদ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের প্রতর্কেও মার্কসবাদ ওই রকমের একটি নিস্প্রাণ বিষয় হয়ে যায়।

কথাটা অবশ্য পুরোপুরি ঠিক নয়; কেননা মার্কসের বিরুদ্ধে সাঈদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। একটা অভিযোগ এই যে, মার্কসবাদ একরৈখিক ও নিয়ন্ত্রণবাদী, সেখানে কোন উদারতা নেই। আরো বড় অভিযোগ মার্কস ছিলেন প্রাচ্যবাদী। তিনি ভারতে ব্রিটিশ আগমনের একটা মঙ্গলজনক দিক ছিল বলে মনে করেছেন। মার্কস সম্পর্কে এই ধারণাটা অবশ্য ভ্রান্তির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনতান্ত্রিক ভূমিকা নিয়ে মার্কস সংবাদপত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেখান থেকে একটি বিশেষ মন্তব্য উদ্ধার করে নিয়ে অনেকেই মার্কস ইংরেজাগমন সমর্থন করেছেন বলে মনে করেছেন; সাঈদও তাই করেছেন, দেখিয়েছেন যে প্রাচ্য সম্পর্কে মার্কসের মনেও বিরূপ ধারণা ছিল। কিন্তু মার্কস কোন অর্থেই প্রাচ্যবাদী ছিলেন না, এবং সবদিক দিয়েই আন্তর্জাতিক ছিলেন। হেগেলের মতো তিনিও বিশ্ব ইতিহাস নিয়ে ভেবেছেন ঠিকই, কিন্তু সে-ইতিহাসে পূর্ব পশ্চিমের বিভাজন ছিল না, ছিল মানুষের ইতিহাসের বিবর্তনধারা অধ্যয়ন। ডারউইন যেমন প্রাণীজগতে মানুষের আবির্ভাবের সর্বজনীন ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন, মার্কসও তেমনি পাঠ করেছেন মানবসভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস। সেই বিবর্তনের ভেতর দিয়েই পুঁজিবাদ এসেছে, এবং মার্কস ওই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেই লড়ছিলেন, কেবল বই লিখে নয়, বিপ্লবীদের সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নিয়েও।

শেকস্‌পীয়রের *দি টেমপেস্ট* নাটকে প্রসপেরো একটি উপনিবেশ গড়েছে, তার অধীনে এসেছে স্থানীয় দু'টি প্রাণী, এরিয়েল ও ক্যালিবান। এরিয়েলের কোনো সমস্যা নেই, সে প্রসপেরোর প্রভুত্ব মেনে নিয়েছে,সমস্যা ক্যালিব্যানের এবং ক্যালিবানকে নিয়ে প্রসপেরোর। *কালচার এ্যান্ড ইমপিরিয়ালিজম* বইতে ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের ক্যালিব্যানরা কি করতে পারে সে প্রশ্নটি সাঈদ তুলেছেন। ক্যালিবানদের সামনে তিনটি পথ খোলা আছে। এক, প্রসপেরোদের গোলাম হয়ে সন্তুষ্ট থাকা, এ্যারিয়েল যেমনটি হয়েছে। দুই, প্রসপেরোর শাসন মেনে নেওয়া কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য বিকাশের সম্ভাবনা তৈরি করা। তিন, পরাধীন হতে অস্বীকার করা এবং নিজের স্বাতন্ত্র্য খুঁজে নেওয়া।

জাতীয়তাবাদীরা ওই তৃতীয় পথ ধরে এগোয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আবশ্যকতা সম্পর্কে সাঈদ জানেন, ফিলিস্তিনীদের মুক্তি সংগ্রামে তিনি সরাসরি অংশ নিয়েছেন, কিন্তু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দুর্বলতাও তাঁর অজানা নয়। জাতীয়তাবাদ অতিউৎসাহী হয়ে অতিশয় স্থানীয় এবং স্বদেশী ও আত্মমুখী হয়ে যেতে পারে, তার মধ্যে সাঈদ যাকে বলেছেন নেটিভিজম, তা দেখা দেবার আশঙ্কা থাকে। আগ্রহ দেখা দিতে পারে অতিশয়

www.pathagar.com

স্থানীয় হয়ে পড়বার, পেছন দিকে সরে যাওয়ার, অতীতে আশ্রয় খোঁজার, মৌলবাদী হয়ে পড়ার।

পঞ্চাশের দশকে আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে লেখক ফ্রানৎজ ফাঁনো অংশ নিয়েছেন। ফুকোর তিনি প্রায় সমসাময়িক; কিন্তু ফুকোর মতো হতাশাবাদী নন; ফাঁনো অল্পবয়সে মারা গেছেন, কিন্তু প্রতিরোধের সংগ্রামে আস্থা হারান নি। জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্বে দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন নেতৃত্ব আবার সেই কাজই করতে চায় কিছুদিন আগেও 'প্রভু'রা যা করেছিল। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে মুক্তি সংগ্রামকারীদের করণীয় সম্পর্কে ফাঁনো বলেছেন; করণীয় হলো জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনায় পরিণত করা, অর্থাৎ সামাজিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাওয়া। সাঈদ ফাঁনোর এই বক্তব্য সমর্থন করেন, কিন্তু বলাই বাহুল্য, সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করা তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মসূচীর অংশ নয়। তাঁর কাজটা বুদ্ধিজীবীর, যে বুদ্ধিজীবী উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে সাংস্কৃতিকভাবে প্রতিহত করবেন, সংস্কৃতি ও চিন্তা থেকে তাদেরকে হটিয়ে দেবেন। কিন্তু সরাসরি সমাজ বিপ্লবের আন্দোলনে যাবেন না।

এ প্রসঙ্গে *অরিয়েন্টালিজম* এবং *কালচার এ্যান্ড ইমপিরিয়ালিজমের* উপসংহার লক্ষ্য করবার মতো। *অরিয়েন্টালিজম*-এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে প্রাচ্যবাদ প্রতর্কটি অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটি থাকার জন্য 'আমরা' ও 'অন্যরা'র ব্যবধানটা থাকছে, এবং বুদ্ধিজীবীরা বিভক্ত হয়ে পড়ছেন; ওটি না থাকলে সকলে মিলে বিশ্বের মানবিক উন্নতিতে ব্রতী হতে পারতেন। প্রাচ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে, কেননা প্রাচ্যবাদ থাকলে তা 'seductive degradation of knowledge' তৈরি করবে; জ্ঞান বিশ্বকে এগিয়ে না নিয়ে বরঞ্চ পিছিয়ে দেবে।

কালচার এ্যান্ড ইমপিরিয়ালিজম-এর উপসংহারটি এই রকমের। আজকের পৃথিবীতে কেউই কেবল কোনো একটা কিছু নয়; প্রত্যেকটি একের ভেতর বহু রয়েছে। মানুষের গায়ে ভারতীয়, নারী, মুসলমান বা আমেরিকানের মতো লেবেলগুলো প্রারম্ভিক পরিচয় মাত্র, তার বাইরে মানুষ মানুষই। সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বকে এক করেছে কিন্তু আবার, বিপরীত দিকে মানুষকে সাদা, কালো, পাশ্চাত্যের, প্রাচ্যের এসব বিভাজনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যা প্রয়োজন তা হলো সংযোগ, connections; কেবল আমাদের কথা না ভেবে অন্যদের কথাও ভাবতে হবে। সেই সঙ্গে অন্যদের ওপর কর্তৃত্ব করা এবং আমাদের সংস্কৃতিই পয়লা নম্বরের এই ভাবনাটা ত্যাগ করা চাই। এসব কাজে বুদ্ধিজীবীদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।

অরিয়েন্টালিজম রিকনসিডার্ড (১৯৮৪) নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের উপসংহারে এডওয়ার্ড সাঈদ বুদ্ধিজীবীদের জন্য কয়েকটি সম্ভাব্য করণীয় রয়েছে বলে মনে করেন। এক, বিভাজনের সীমানা অতিক্রম করার জন্য সচেতনতা তৈরি করা। দুই, আধিপত্যকামী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া। তিন, বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সম্পর্কে আরো সজাগ হয়ে ওঠা।

ভিন্ন ভিন্ন তিনটি গ্রন্থের উপসংহারে যেসব কাজের কথা বলা হচ্ছে সবগুলোই বুদ্ধিজীবীদের। কিন্তু এই সব কাজ কি যথেষ্ট? বুদ্ধিজীবীরা সচেতন হলেই কি প্রাচ্যবাদের ভিত্তিতে রয়েছে যে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ তা ভেঙ্গে পড়বে, বিভাজন দূর হবে মানুষে মানুষে, ঘুচবে বৈষম্য? না, সেটা তো হবার নয়; চরিত্র সংশোধনের

www.pathagar.com

পরামর্শ শুনে সিংহ কি তার হিংসা ভুলে যায়? তেমনটা যে হবার নয় সে-কথা তো সাঈদ নিজেই বলেছেন এবং দেখেছেন। ফাঁনোর একটি বক্তব্য এইরকমের, 'সাম্রাজ্যবাদ স্বেচ্ছায় কখনো কোনো ছাড় দেয় না'; সাঈদ এটিকে সমর্থন করেন। পরাভূত না হলে রণোন্মাদ ক্যাপ্টেন এহাব সমুদ্রে প্রাণহরণ ছাড়বে না; তাড়া না খেয়ে কামোন্মাদ জীয়ুস কিশোরী লিডা'কে নিরাপদে থাকতে দেবে না। এবং ওই যে পরাভূতকরণ ও বিতাড়ন তার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দরকার হবে–যেমন স্থানীয়, তেমনি আন্তর্জাতিক।

ফাঁনোর গ্রন্থ *দি রেচেড অব দি আর্থ*-এ সার্ত্র যে ভূমিকাটি লিখে দিয়েছিলেন, সাঈদ তা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সার্ত্র লিখেছেন, উপনিবেশে সত্য নগ্ন হয়ে থাকে, কিন্তু উপনিবেশের মাতৃভূমিতে নাগরিকেরা তাকে পোশাকে ঢাকা অবস্থায় দেখতে পছন্দ করে। সাম্রাজ্যবাদ আজ নগ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু সে তো রণে ভঙ্গ দেবে না যদি না সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক ও তীব্র হয়। এই সংগ্রামে বুদ্ধিজীবীরা কি করতে পারেন সেটা মার্কস দেখিয়েছেন, লেনিন দেখিয়েছেন আরো পরিষ্কারভাবে। বুদ্ধিজীবীদেরকে যেতে হবে জনগণের কাছে, সাঈদ যাঁদেরকে পাবলিক বুদ্ধিজীবী বলছেন, তাদেরকে সত্যিকার অর্থেই পাবলিক হতে হবে, কেবল নিজেদের আলাপচারিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে পুঁজিবাদ পরাজিত হবে না। দরকার হবে সংগঠনেরও। আবারও লেনিনের প্রসঙ্গ আসে। এবং এটা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ যে, সাঈদ তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর কোথাও লেনিনের কথা উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। উদারনীতিকরা লেনিনকে অপছন্দই করেন। গ্রামসি যেহেতু উদারপন্থী নন, সমাজবিপ্লবী, তাই তিনি লেনিনবাদী ছিলেন।

সাঈদের লেখায় 'আমরা' এবং 'অন্যরা'র বিবেচনাটি এসেছে। তাঁর নিজের ক্ষেত্রে 'আমরা' বলতে একই সঙ্গে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় প্রকাশ পায় : একটি হচ্ছে ফিলিস্তিনী, অপরটি আমেরিকান। এই দুই পরিচয়ের মধ্যে বিরোধ যে আছে তা খুবই স্পষ্ট; কেননা আমেরিকা ফিলিস্তিনীদের মিত্র নয়, শত্রু বটে। 'আমরা' এবং 'অন্যরা'র বিভাজনটা কিন্তু খুবই পরিচ্ছন্ন ও নির্দ্বন্দ্ব হতে পারতো যদি 'আমরা' বলতে বোঝানো যেতো সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীদের, এবং 'অন্যরা' হতো সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকরা। তখন দেখা যেতো যে আমরা সংখ্যায় অনেক, অন্যরা অল্প। এরাই হচ্ছে আসল দুই পক্ষ, এদের মধ্যে আপোসের কোনো জায়গা নেই। (উল্লেখযোগ্য যে, সাঈদ আমেরিকানদের একটি জাতি-রাষ্ট্র বলে মনে করেন, আমেরিকা কিন্তু আসলে তা নয়; সেখানে বহুজাতিসত্তা কার্যকর রয়েছে।)

সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থানের ভিত্তিতে দাঁড়-করানো বিভাজন আশাবাদকে স্পষ্ট করে। সামনে থাকে কেবল যে প্রতিরোধ তা নয়, থাকে বিকল্প এক ব্যবস্থার সমষ্টিগত স্বপ্নও, যে স্বপ্নটি হচ্ছে বৈষম্যহীন বিশ্ব, সমাজ এবং সংস্কৃতির। সংস্কৃতিতে যে বহুমুখিতা, বৈচিত্র্য, আদান-প্রদান এবং আধিপত্যহীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য সাঈদ লড়েছেন তার জন্য গণতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার স্বপ্নটি দরকার। এ স্বপ্ন মার্কসবাদীরা দেখে এবং উদারনৈতিকরা দেখতে অপারগ হয়, তথাকথিত সঙ্কীর্ণতার ভয়ে।

www.pathagar.com

৭

অসুবিধার কথা বলছিলাম। এডওয়ার্ড সাঈদ আমাদের জন্য যে সুবিধাগুলো রেখে গেছেন তা সামান্য নয়। তিনি উদারনীতির সীমা নতুন করে চিহ্নিত করেছেন। সেটা একটা ইতিবাচক ব্যাপার। তার চেয়ে অনেক বড় ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তিনি তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সাহিত্যিক ক্ষমতাকে আমাদের জন্য অধিগম্য উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে গেছেন। তাঁর রচনাপাঠ সাহিত্য পাঠেরই নামান্তর, তিনি কথা বলেন হৃদয়গ্রাহী ভাষা ও ভঙ্গিতে, তাঁর রচনার কোথাও কোনো আড়ম্বর নেই, বাহুল্য দুর্লভ। ভেতরে আছে প্রসন্ন একটি কৌতুকবোধ, স্মিতহাস্যের। পরিচিত গ্রন্থকে তিনি নতুনভাবে উন্মোচিত করেন। অপরিচিত গ্রন্থ বিষয়ে কৌতূহল তৈরি করে দেন। আমাদেরকে একটি ভ্রমণে নিয়ে যান, যার বাঁকে বাঁকে বিস্ময়। মৌলিকত্ব ও অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি অসামান্য।

পরিবেশ তাঁর অনুকূলে ছিল না, শেষ দশ বছর দুরারোগ্য ব্যাধিতে কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু কখনো পিছিয়ে যাননি। পিছিয়ে না-যাবার শিক্ষাটা তাঁর কাছ থেকে আমরা পাবো। পাবো বহু বিষয়ে আগ্রহ গড়ে তুলবার সাংস্কৃতিক দৃষ্টান্ত। সর্বোপরি সংস্কৃতিতে প্রাচ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ক্ষতিকর তৎপরতাকে তিনি যেভাবে চিহ্নিত করেছেন সেভাবে আর কেউ করেননি। তাঁর প্রয়াণে আমরা আমাদের এক আপজনকে হারালাম।

নতুন দিগন্ত, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ, '০৪

www.pathagar.com

তত্ত্বের সীমানাভাঙ্গন এবং এডওয়ার্ড সাঈদ

মূল : ফকরুল আলম

অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম ও ইফতেখার উদ্দিন

ফিলিস্তিন-বংশোদ্ভূত মার্কিন সাহিত্যতাত্ত্বিক এডওয়ার্ড সাঈদ 'তত্ত্বের সীমানাভাঙ্গন' ধারণাটির উপস্থাপক। ১৯৮২ সালে *রারিটান কোয়ার্টারলিতে* প্রকাশিত সাড়াজাগানো Traveling Theory শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি এটি পেশ করেন। পরবর্তীতে এটি অন্তর্ভুক্ত হয় তাঁর *The World, The Text and The Critic* বইয়ে। তত্ত্বের সীমানাভাঙ্গন বিষয়ে সাঈদের মোটাদাগের ভাষ্য হলো : 'মানুষের তত্ত্ব ও সময়, সীমা ও দেশ বাড়িয়ে চলে।' এ প্রসঙ্গে প্রবন্ধের প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদের বক্তব্যটি উল্লেখ করার মতো, 'মানুষ ও সমালোচনার ধারার (schools of criticism) মত ধারণা ও তত্ত্ব ব্যক্তি হতে ব্যক্তিতে, অবস্থা হতে অবস্থান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে ঘুরে বেড়ায়।' সাঈদের মতে : 'তত্ত্বের এ সীমানাভাঙ্গন মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ তত্ত্বের এমনতর চলন একই সাথে বাস্তব সমাজ পৃথিবীর প্রয়োজন মেটানোর এবং বুদ্ধিনির্ভর কর্মকাণ্ড পরিচালনার জরুরী শর্ত।' প্রবন্ধটিতে সাঈদ তত্ত্বের রূপান্তর ও চলন ধর্মের ওপর আলোকপাত করেছেন। এতে আলোচিত হয়েছে তত্ত্বের যাত্রাবিন্দু, দূরত্ব অতিক্রম এবং গৃহীত বা নিগৃহীত হবার মত বিষয়গুলি।

তত্ত্বের নামসর্বস্ব সীমানাভাঙ্গন কিংবা এর 'কষ্টকর ভ্রমণ' নিয়ে সাঈদের উৎসাহ কম। উদাহরণ হিসাবে তিনি বেছে নেন লুকাচের 'বস্তুরতিকরণ' (reification) ধারণা, যার প্রথম প্রকাশ 'ইতিহাস এবং শ্রেণী চেতনা' (*History and Class Consciousness,* 1923) বইয়ে। পরে এ ধারণা গ্রহণ করেন ফ্রান্সের লুসিয়ান গোল্ডম্যান। এ উদাহরণ দিয়ে সাঈদ তত্ত্বের আসল ও অর্জিত নিট উদ্দেশ্য বা তত্ত্ব কাজের কাজ কি করতে পারে এ দু'য়ের মাঝে ভেদরেখা টানার প্রয়াস পেয়েছেন। আসল উদ্দেশ্য যদি হয় এই যে, তত্ত্বকে অবশ্যই দিন-বদলের হাতিয়ার হতে হবে, তবে হয়তো দেখা যাবে যে, সব সময় কাজের কাজ হচ্ছে না, কারণ তত্ত্ব ভ্রমণ ক্লান্তিতে দুর্বল, অক্ষম ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। সাদামাটাভাবে বললে, তত্ত্ব ভাটার মুখে পড়েছে। এটা বুঝাতে সাঈদ লুকাচের তত্ত্বের সীমানাভাঙ্গনকে সরবোন থেকে কেমব্রিজ, কেমব্রিজ থেকে রেমন্ড উইলিয়ামস পর্যন্ত অনুসরণ করেন। যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নির্ভর করে উইলিয়ামসের তত্ত্বচিন্তা দেশ ও সময়ের মানদণ্ডে কিভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে তা দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে উইলিয়ামসের মতকে সাঈদ সাজিয়ে বলছেন : 'কোন ধারণা তখনই প্রভাব অর্জন করে

www.pathagar.com

যখন তা কার্যকর ও শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু ভ্রমণকালে এটি সীমিত,সংকলিত (codified) কিংবা প্রতিষ্ঠানের খোপে আবদ্ধ হয়ে যেতে পারে, এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।' এমনতর সিদ্ধান্তে পৌছার ব্যাপারে সাঈদ উইলিয়ামসের যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন না। তাঁর মতে উইলিয়ামসের রয়েছে সমালোচকের বড় গুণ 'সমালোচকীয় চেতনা' যা তত্ত্বের উৎপত্তি ও গন্তব্যের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায়, এর ফসিলীকরণ (ossification) ঠেকাতে প্রয়োজনীয় রসদের যোগান দেয় এবং এটি যাতে সমাজ বদলাবার শক্তি না হারায় সে বিষয়ে সজাগ রাখে।

একই প্রবন্ধে সাঈদ মিশেল ফুকোর ক্যারিয়ারকে তত্ত্বের সীমানাভাঙ্গন ও এর অবনমনের (the systemic degradation of theory) সাথে মিশিয়ে উদাহরণ হিসাবে আমাদের সামনে হাজির করেছেন। সাথে সাথে ফুকোর বাক্যবিতান থেকে জন্ম নেয়া মরমীবাদেরও (quietism) সমালোচনা করেছেন। এর আগে অবশ্য তিনি ফুকোর ক্ষমতাতত্ত্ব কিভাবে তথ্য/উপাত্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থাপনার (micro management) বরাতে কাজ করে তার ব্যাখ্যা করেছেন। বিশ্লেষণ করেছেন আরও, তত্ত্বটি কিভাবে তাঁরই অন্ধভক্তদের না-যাচাই মানসিকতার জন্যে সংকটের মুখে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ সাঈদ ফুকোর শেষ দিককার গুরুত্বপূর্ণ বই *History of Sexuality*-তে সূত্রবদ্ধ সর্বব্যাপী ক্ষমতা 'Power is every-where' ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন। এ পর্যায়ে তাঁর মূল উদ্দেশ্য দেখানো কিভাবে ফুকোর সাড়াজাগানো এ কনসেপ্টটি হতাশাবাদ বা নিষ্ক্রিয়তার জন্ম দিয়েছে এবং সরে পড়েছে, প্রতিষ্ঠান যেভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগের আড়ালে ক্ষমতাকে নিজস্ব সম্পত্তি বানিয়ে ফেলে তার সমালোচনা করার আবশ্যকতা থেকে। এর মাধ্যমে সাঈদ যেন বলতে চাচ্ছেন : এমনতর বক্তব্য শেষমেশ এক প্রকার পরাজিত মনোভাবের জন্ম দেয়। যে রকমটি দেখা যায় আমেরিকার নব্য ইতিহাসবাদ প্রসূত সূত্ররাশিতে। এমনটি মনে হওয়া এ পর্যায়ে খুবই স্বাভাবিক যে, এখানে সাঈদ ফুকোরই সমালোচনা করছেন যিনি কিনা তাঁর অনেক অনুসারীকে উৎসাহিত করেছেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একপ্রকার অন্ধকারে থাকতে। সাঈদ যেমনটি বলছেন, ফুকো তাঁর অনুসারীদেরকে জানতে দেন নাই যে, 'কাজ, উদ্দেশ্য, প্রতিরোধ, চেষ্টা কিংবা বিরোধ ব্যতীত ইতিহাস সৃষ্টি হয় না, এবং এর কোনটাই ক্ষমতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্টেশনগুলির সাথে একাট্টা হয় না।'

তিনি ফুকোর ইউরোপীয় আলোকপর্বের ক্ষমতা-বাসনা (will to power) ধারণার মৌলিক সমালোচনার তুলনা দাঁড় করিয়েছেন গ্রামসির সাথে। সাঈদ মনে করেন; (গ্রামসি) নিঃসন্দেহে ফুকোর 'জ্ঞানের গোষ্ঠী' (archeology of knowledge)[১] বিচারের অসাধারণ প্রয়াসকে' সমাদর করতেন, তবে অখুশি হতেন একথা ভেবে যে, 'নতুন নতুন বিদ্রোহ, ক্ষমতার ক্ষেত্র বা ইতিহাসের বাধাগুলি ব্যাখ্যা করতে এই বিচার অক্ষম।' এ ক্ষেত্রে সাঈদের নমুনা গ্রামসি নিজেই। কারণ জীবনের বড় অংশ বন্দিদশায় কাটিয়েও গ্রামসি মুহূর্তের জন্যও ভুলেন নাই যে, 'মানবেতিহাসে বর্তমান কায়েমী নিয়মই কেবল নিয়ম নয়, সমাজদেহে এর বিস্তৃতি যেমনই হোক না কেন এর বাইরে অন্য একটি শক্তির অস্তিত্বও রয়েছে, যা সমাজ-পরিবর্তন সম্ভব করে তোলে। এই শক্তি ক্ষমতাকে সীমিত করে, যা আবার ফুকোর অর্থে এবং একই সাথে ক্ষমতার সেই আগ্রাসী তত্ত্বকে ল্যাং মেরে খোঁড়া করার দায়িত্বটিও পালন করে।'

www.pathagar.com

শুরুতে যেমনটি বলা হয়েছে, সাঈদের 'তত্ত্বের সীমানাভাঙ্গন' (*Traveling Theory*) লেখা হয় ১৯৮২তে, তাঁর *প্রাচ্যবাদ (Orientalism) লেখার চারবছর পর। সাঈদের* প্রাচ্যবাদকে 'তত্ত্বের সীমানাভাঙ্গনের' আলোকে বিচার করলে কেমন হয়? এর আগে আসুন, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও কাজ সম্পর্কে জানি। জীবন ও সমালোচনাকর্ম–উভয়দিক থেকেই সাঈদ তাঁর তত্ত্বের সীমানাভাঙ্গন ধারণার এক অসামান্য উদাহরণ। জন্ম জেরুজালেমে, বড় হন কায়রোয়। এখন থেকে চল্লিশ বছর আগে কলাম্বিয়ায় জায়গা করে নেয়ার আগে পড়েন ম্যাসাচুসেটসের স্কুলে এবং পরবর্তীতে প্রিন্সটন ও হার্ভার্ডে। দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন নিউইয়র্কে। তার মানে এই নয় যে, ভ্রমণ বাদ দিয়েছেন। বরং বেড়িয়েছেন বিরামহীন। শুধু মধ্যপ্রাচ্যে ফিলিস্তিনীদের পক্ষেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্নদেশে সাম্রাজ্যবাদ আর এর দোসর ছদ্মবেশী বৈশ্বিক, বহুজাতিক ধনবাদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। তাত্ত্বিক হিসাবে তাঁর হাতেখড়ি আর. পি. ব্লাকমোরের হাতে। Phenomenology অনুসরণ করে প্রথম বই লেখেন *Joseph Conrad and the Fictions of Autobiography*। তবে এর থেকে সরে গিয়ে দীক্ষা নেন উত্তর-কাঠামোবাদে (post-structuralism)। লেখেন 'সূচনাবলী' (Beginnings)। এর পর ফুকোর জ্ঞান/ক্ষমতা ধারণার আশ্রয় নিয়ে লেখেন সাড়া জাগানো *Orientalism*, যেখানে তিনি হাজির হয়েছেন ঔপনিবেশিকতার কোষ্ঠীর (colonial archive) বিস্তৃত বিবরণ নিয়ে। কিন্তু এমনকি এই বইতেও, যেমনটি আমরা দেখব, সাঈদ ফুকোর নির্ধারণবাদ (determinism) প্রসূত চিন্তাধারার গণ্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নাই। গ্রামসি, ফাঁনো এবং উইলিয়ামসরাও এসেছেন তাঁর প্রভাবক হয়ে।

সাঈদের পরবর্তী প্রকাশনাগুলিতে এ সমস্ত চিন্তাবিদদের ব্যাপারে তাঁর অসীম আগ্রহ দেখা যায়। আরও দু'টি বিষয় তাঁকে উৎসাহিত করেছে–তার একটি ফিলিস্তিনী ইন্‌তিফাদা (অভ্যুত্থান),অন্যটি উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা-রাখা বিংশ শতাব্দীর কয়েকজন অগ্রনায়ক। চিন্তার এ কারুকাজ ধরা পড়ে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর এর সেনানীদের মহত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যে। প্রমাণ পাওয়া যায় *Culture and Imperialism* (1993)-এ। সাঈদের যে কোন ছাত্র মাত্রই জানেন তাঁর আগ্রহের ঘোড়া ছোটে ঐ সকল চিন্তাবিদদের অভিমুখে যাঁরা নির্বাসনকে মেনে নেন মনের একটি বিশেষ অবস্থা হিসাবে। এবং ফলতঃ মানসিকভাবে ভ্রমণ করেন চৌহদ্দি থেকে চৌহদ্দিতে, হোক না তা স্বভাবজ কিংবা অর্জনগত।

সে কারণেই দেখা যায়, ভিকো, থিওডোর আউয়েরবাখ, এবং লুকাচের মত চিন্তা করা বরাবরই তাঁর উৎসাহের উৎস হিসাবে কাজ করেছেন। তাঁদের আইডিয়ার কথা না হয় নাইবা বললাম। দেখা যাচ্ছে, তিনি এমনসব ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন যাঁরা জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ বেড়া ডিঙ্গিয়ে বৃহত্তর মানবতা ও চেতনার স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেন। গ্রামসি,ফাঁনো, উইলিয়াম এবং চমস্কি তাঁদের কয়েকজন।

এবার পেছনে ফেলে আসা প্রশ্নে ফেরা যাক : তত্ত্বের সীমানাভাঙ্গন ধারণার আলোকে *প্রাচ্যবাদ (Orientalism)*-কে বিচার করতে সাঈদ নিজে কতটা কার্যকর? সন্দেহের কোন অবকাশ নাই, বইটি লেখার পেছনে ফুকো ছিলেন সাঈদের জন্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে কিভাবে এ ফরাসীর বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারা বিশেষভাবে তাঁর 'উদ্দেশ্যবাহিত

www.pathagar.com

তথ্যবিন্যাস' ধারণা (discursive formations)[২] প্রাচ্যবাদের 'কোষ্ঠী বিচারে' (archival excavation) উল্টো পথ ধরে? সাঈদের প্রাচ্যবাদের পাকা সমালোচনাকারী এবং *Traveling Theory* নামক বিখ্যাত প্রবন্ধের লেখক জেমস ক্লিফোর্ড মনে করেন, সাঈদের রচনায় তাত্ত্বিক অসঙ্গতি স্পষ্ট। *Orientalism* প্রকাশের পর দেয়া এক সাক্ষাতকারে সাঈদ অবশ্য বিষয়টি খোলাসা করেছেন। ফুকোকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কখনও অসামঞ্জস্য এবং কখনও পুরোপুরি বাদ দেয়ার কাজটি সচেতনভাবে করেছেন বলেই সাঈদ সাক্ষাতকারে স্বীকার করেছেন। কারণ তিনি কখনই চাননি ফুকো কিংবা অন্য তত্ত্বচিন্তা কারো দ্বারা 'অবদমনমূলক জ্ঞানের' (non-coercive) বিষয়টি আড়ালে পড়ে যাক। *প্রাচ্যবাদের* শুরুতেই সাঈদ বলছেন : 'আমি বিশ্বাস করি, ব্যক্তি চিন্তার একক প্রভাব অজানা, অনাগত একগুচ্ছ বয়ানের (collective body of text) ওপর পড়ে বিশেষ আলোচনার ধারা তৈরী করতে পারে। অথচ এক্ষেত্রে ফুকোর মত বিপরীত : 'কোন একক বয়ান বা একলা লেখক খুবই কম গুরুত্ব বহন করেন।' অন্যভাবে বললে, যদিও সাঈদ ফুকো-প্রভাবিত হয়ে 'প্রাচ্যালোচনার কোষ্ঠী বিচার' (archeological excavation of orientalist tradition) শুরু করেন, বাস্তবে তিনি ফুকোকে ছাড়িয়েও তত্ত্বের জগতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আগাগোড়া ফুকোর চিন্তার তাঁবেদার হলে এটি প্রতিষ্ঠা পেত যে 'ব্যক্তির ভূমিকা বলতে কিছু নেই' এতে তিনি বিশ্বাস করছেন। যা হোক,সাঈদ এমন বিষয় নিয়ে ঘেঁটেছেন যা তাঁকে নিয়ে যায় ইউরোপের বাইরে। এমনকি ফুকোরও। সহজ করে বললে সাঈদের হাত ধরে তত্ত্ব ঘুরে বেড়িয়েছে স্থান থেকে স্থানান্তরে। ফুকোকে ব্যবহার করেই সাঈদ সমালোচনা করেন জ্ঞান/ক্ষমতার মৈত্রীকে যা দীর্ঘমেয়াদী উপনিবেশের রাস্তা তৈরী করে দেয়ার জন্য দায়ী। কিন্তু জ্ঞান/ক্ষমতা এমন পথ ঘুরে বেড়িয়েছে যা ছিল ফুকোরও কল্পনার বাইরে।

সাঈদের সাথে ফুকোর সম্পর্ক এবং উত্তর-উপনিবেশিক পাঠশাস্ত্রে (post-colonial studies) সাঈদের চিন্তার প্রভাব নিয়ে কড়া যুক্তিতর্ক হাজির করেছেন টিমোথি ব্রেনান (timothy Brennan) তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত The Illusion of a future: Orientalism as Traveling Theory প্রবন্ধে। ব্রেনান সাঈদের *প্রাচ্যবাদ*-কে গ্রহণ করেন এই বলে : *প্রাচ্যবাদ* তত্ত্বের সীমানা ভাঙ্গনের এক উপভোগ্য ও হতাশাব্যঞ্জক দৃষ্টান্ত।' কারণ 'এই বইয়ের তত্ত্ব সীমানা ভেঙ্গেছে আবার ভাঙ্গেও নি।'

ব্রেনান যে বিরোধের আভাস দেন তা মোটামুটিভাবে ত্রিমাথা বিশিষ্ট : এক. *প্রাচ্যবাদ* লিখতে সাঈদ একদিকে ফুকোরই উদ্দেশ্যবাহিত তথ্যবিন্যাস (discurslive formations) ধারণা এবং শাস্ত্রীয় প্রতিষ্ঠানের(disciplinary institutions) মাল-মসলা ব্যবহার করেছেন, অন্যদিকে ফুকো থেকে সরেও গিয়েছেন; দুই. উত্তর-উপনিবেশিক পৃথিবীতে প্রাচ্যবাদী ধারণা- কাঠামোর চলমানতা বিষয়ে সাঈদের বক্তব্য কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে; এবং তিন. উত্তর-উপনিবেশিকবাদ নিজেই পশ্চিমা বিদ্যাজগতে, সাঈদের একনিষ্ঠ পূজারীদের কল্যাণে, পশ্চিমাসভ্যতার বহুত্বের (Pluralism) ধারণা প্রকাশে এবং উত্তর-উপনিবেশিক পৃথিবীর উদীয়মান সভ্যতা/জাতিসমূহের প্রতি এর উদারতা প্রদর্শনের মডেল অবলম্বন হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অর্থাৎ ব্রেনানের মতে, প্রাচ্যবাদ প্রতিরোধার্থক/আক্রমণাত্মক গুণ ধারণ করার পরও এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

একটি জবরদস্ত হাতিয়ার হয়েও পরিশেষে মোটাদাগে ভোঁতা হয়ে পড়েছে। ব্রেনান পরাধীনোত্তর পাঠশাস্ত্রে এর কারণ খোঁজ করেছেন। তবে তিনি বলতে ভুলেন নাই, যেমনটি আমি আগেই বলেছি, সাঈদ *প্রাচ্যবাদ*-এ একদিকে ফুকো'কে ছাড়িয়েছেন,অন্যদিকে ইটালিয়ান ভিকো এবং গ্রামসি, ইংরেজ উইলিয়ামস এবং মার্টিনিক্যাল ফাঁনোকে তাঁর যাত্রার সঙ্গী করেছেন। তবে ভিন্নপথে হেঁটে ক্লিফোর্ড শুধু ফুকোকে সাঈদের একক গুরু মানছেন। অন্যদিকে আরও এগিয়ে, ব্রেনান *Traveling Theory*-র মধ্যে একটি দ্বৈত উদ্দেশ্যের খোঁজ পেয়েছেন। তাঁর মতে, এটি একদিকে তত্ত্ব স্থান বদলকালে কিভাবে শক্তি হারায় তাঁর কথা বলে: এবং অন্যদিকে ফুকোকে বাতিল করে প্রতিরোধ সম্ভাবনার মন্ত্র আওড়ায়। অধিকন্তু, প্রবন্ধটি ব্রেনানের কাছে এমন একটি অবস্থানের কথা বলে, যেখান থেকে সমালোচকের ক্ষমতার ডিসকোর্সে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। তবে কথা হল, তাকে 'ক্ষমতার বিষয়ে সত্য উচ্চারণ' ('speak truth to power') করতে পারতে হবে।

বিষয়টি ঘুরিয়ে বললে, ব্রেনান ঠিকই ধরেছেন, 'এই বইটির তত্ত্ব একই সাথে ঘুরে বেড়ায় আবার বেড়ায়ও না।' বিষয়টি পরিষ্কার হয়, সাঈদের *প্রাচ্যবাদ*-এ ফুকোকে ত্যাগ করার ঘটনার মধ্যে। এটি অনেকটা তত্ত্বের মূল প্রণেতার কল্পনার বেড়া ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার মত। ব্রেনান এর চেয়ে বেশি কিছু স্পষ্ট করে বলেন না। অবাক হবার মত ব্যাপার এই যে, তাঁর প্রবন্ধে তিনি একবারও 'তত্ত্বের সীমানা ভাঙ্গনে' সম্পূরক প্রবন্ধ Traveling Theory Considered এর নাম নেন নাই। যদিও এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় আগেরটির দশ বছর পর, ১৯৯৪-এ। অর্থাৎ ব্রেনানেরটির ছয় বছর আগে। সম্প্রতি এটি সংকলিত হয়েছে *Reflections on Exile and Other Literary and Cultural Essays (2001)*-এ। এতে সাঈদের যুক্তি : তত্ত্বের একটি অস্থির অবস্থা রয়েছে যা একে সামনে এগিয়ে যাবার, সীমা পেরুবার পথ বাতলায়। সাঈদের আলোচনার বিষয়বস্তু লুকাচের উপন্যাসতত্ত্ব *(The Theory of the Novel 1920)*, যেখানে লুকাচ দেখিয়েছেন কিভাবে উপন্যাস আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সমকালীন সঙ্গীতের অসঙ্গতি (dissonance) আলোচনা করতে এডোর্নো কিভাবে এ তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন তাও সাঈদ তুলে ধরেছেন এ প্রবন্ধে।

লুকাচ হতে এডোর্নো–তত্ত্বের এই ভ্রমণ তেমন বেখাপ্পা কিছু নয়। কারণ তাঁদের মাঝে ভৌগোলিক ও তাত্ত্বিক পটভূমির মিল আছে। কিন্তু সাঈদ তত্ত্বের সীমানা ভাঙ্গনের নতুন খোঁজ দেন। যেখানে পরিবেশও নতুন। ফাঁনো হচ্ছেন এক্ষেত্রে তাঁর খুঁটি। তিনি দেখিয়েছেন ফাঁনো কিভাবে লুকাচ হতে 'ইতিহাসের আদি চেতনা' (primacy of consciousness in history) ধারণা ধার করে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করেন চেতনা ও বিষয়ের ওপর 'ইতিহাসের আদিম অবস্থা ও ইতিহাসের ভূগোলের ধারণার' আদলে। এক্ষেত্রে সাঈদের বলার বিষয় : 'তত্ত্ব সমালোচনা, বিকেন্দ্রীকরণ, রহস্যঘুচান (demystification) এসবের কাজ শেষ হবার নয়। কারণ তত্ত্ব বেড়ায় সীমা ছাড়িয়ে, দেশান্তরীও হয়। এভাবেই তত্ত্ব সর্বদা একরকম নির্বাসিত অবস্থায় থাকে।' দেখা যাচ্ছে, হেগেল প্রভাবিত লুকাচের তত্ত্বকে খোলস ছাড়িয়ে এডোর্নো ও ফাঁনো কাজে লাগিয়েছেন সুরস্রষ্টাদের অসংগতি ও প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ (reactive nationalism)-এর

www.pathagar.com

সমালোচনা করার জন্য। সাঈদ প্রথমতঃ দেখান লুকাচের তত্ত্বের সীমানা ভাঙ্গনে সৃষ্টিধর্মী ক্ষমতার ব্যাকরণ।
সাঈদ তাঁর তত্ত্বের সীমানাভাঙ্গন ধারণার সংশোধিত সংস্করণে তত্ত্ব কিভাবে সীমানা ভাঙ্গনের মাধ্যমে তত্ত্বধারার জগতে এবং পরাধীন-পরবর্তী সময়ে সংস্কৃতির 'মিলনভূমিতে' (contact zones)[৩] সংকরায়িত (cross-fertilized) রূপ ধারণ করেছে সে-বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। লেখার বাকী অংশে আমরা দেখব বিশ্বের এ অঞ্চলে এসব ধারণার কাজে লাগানোর সম্ভাবনা কতটা এবং বিশ্লেষণ করব এ-সকল ধারণা মহাদেশ পেরিয়ে কিভাবে আমাদের চিন্তাজগতকে প্রভাবিত করেছে।
এরই এক নমুনা রিচার্ড ফক্সের (Richard G. Fox) 'সাঈদের প্রাচ্য' (East of Said) প্রবন্ধে। এটি লেখা হয় সাঈদের *Culture and Imperialism* বইখানা ও তত্ত্বের সীমানা ভাঙ্গন নিয়ে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি লেখার আগে। প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে *Edward Said : A Critical Reader* বইয়ে। 'ভারতের কৃষ্টি' বিষয়ে বিশেষ বিদ্যার দাবীদার মার্কিন নৃতত্ত্ববিদ ফক্স তাঁর প্রবন্ধে তত্ত্বের সীমানা ভাঙ্গনের আলোকে সাঈদের *প্রাচ্যবাদ*-এ উত্থাপিত কিছু প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। ফক্সের বিশেষ জিজ্ঞাসা : '*প্রাচ্যবাদ* তত্ত্বটি কতটুকু ভ্রমণ করতে সক্ষম?... পূর্বের সুয়েজ খাল হতে দক্ষিণ এশিয়া কতটুকু এর বিস্তার?' ফক্সের জরিপের সিদ্ধান্ত : 'সাঈদ তাঁর বইয়ে এত বেশি চিন্তাবিদের হাজির করেছেন যাঁরা দক্ষিণ-এশিয়া বিষয়ক পাশ্চাত্যের যে কোন জ্ঞানকলার প্রসারকে *প্রাচ্যবাদী* বলে' সমালোচনা করেন। পক্ষান্তরে তাঁর কাছে এটি বিরক্তিকরও ঠেকেছে যে, 'তাঁরা (প্রাচ্যবিদরা) মূল্য-নিরপেক্ষ জ্ঞানচর্চায় এ বক্তব্যগুলির সঠিক বিচার করেন নাই।' ফক্স সাঈদের নিকট তাঁর ঋণ স্বীকার করেন নিজের বই *Lions of the Punjab*-এ সাঈদের তত্ত্বকে ব্যবহার করার কথা উল্লেখ করে। সাঈদের সমালোচনার তত্ত্বগত কাঠামো কিভাবে তাঁকে শিখদের উপস্থাপন কড়চা এবং 'জাতিতত্ত্বের কাহিনী' (the fictions of ethonography) বুঝতে সাহায্য করে সে বিষয়টি ফক্স উল্লেখ করেছেন বেশ গুরুত্বের সাথে। এ থেকে ফক্সের সিদ্ধান্ত, কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে *প্রাচ্যবাদ*-এর মূল ধারণাজ্ঞানকে মধ্যপ্রাচ্যের বাইরেও কাজে লাগান যেতে পারে।
তবে ফক্স মনে করেন, অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাঈদের *প্রাচ্যবাদের* ধারণাতত্ত্ব খুব বেশি দূর দৌড়াতে পারে নাই। তাঁর মতে, '*প্রাচ্যবাদ* কিভাবে পশ্চিমা আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগান দিয়েছিল' সে-সম্বন্ধে কিছুই বলে না। এ-প্রসঙ্গে ফক্স গান্ধীজীর নাম নিয়েছেন। আপাতবিরোধের মত শোনালেও তিনি মনে করেন গান্ধীজী ঊনবিংশতি শতাব্দীর ইউরোপীয় প্রগতির (progress) ধারণাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন, মূলতঃ রাস্কিন এবং তলস্তয়ের আদলে তাঁর চিন্তাধারার দেহ গড়নের মাধ্যমে। 'নেতি প্রাচ্যবাদ' ও তাঁর কাছে একটি গুরুত্বপূ প্রত্যয়।' 'নেতি প্রাচ্যবাদ'-এর প্রাচ্যকে নেতিবাদী অর্থে বিবেচনা করার রীতি দাঁড় করালেও এবং এর মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যার্থে ভূমিকা পালন করলেও ফক্স-এর কাছে তা বিবেচ্য নয়। বরং তাঁর অভিমত, গান্ধীজী আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রকল্প হাতে নিতে পেরেছিলেন প্রধানতঃ *প্রাচ্যবাদের* এই বিকল্প ধারার ওপর নির্ভর করেই, যেখানে প্রাচ্য চিত্রিত হয় 'স্বভাবজাতভাবেই আত্মিক, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও যূথবদ্ধরূপে।' ফক্স এগুলিকে

www.pathagar.com

ইন্ডিয়া-বিষয়ে প্রাচ্যবাদের 'সদর্থক প্রত্যয়' (affirmative stereotypes) হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। সেই সাথে রায়ও দিয়েছেন অবশ্য এই বলে যে, এগুলি 'কার্যকর প্রতিরোধের জন্মদানে বেশ সহায়ক হয়েছিল।' তাঁর আক্ষেপ, সাঈদ তাঁর *প্রাচ্যবাদ*-এ এদিকটি আমলে নেন নাই। ফক্স এ থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, 'প্রাচ্যবাদী আধিপত্যের ভেতর থেকে উত্থিত প্রতিরোধ ঠাউরে সাঈদের *প্রাচ্যবাদ* তত্ত্ব হিসাবে খুব বেশি কিছু করতে পারে নাই।' এমনতর উপসংহার টেনেছেন ফক্স বেশ খানিকটা সচেতনতার সাথে। এ সিদ্ধান্ত যে তাঁকে আশীষ নন্দী বা পার্থ চ্যাটার্জীর মত তাত্ত্বিকদের সাথে বিরোধমূলক অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দেয় সে বিষয়টি তিনি মাথায় রেখেছেন। বিরোধের প্রশ্নটা আসছে এ কারণে যে, অন্যপক্ষে তাঁরা (আশীষ নন্দী এবং পার্থ চ্যাটার্জী) ইউরোপীয় কর্তৃত্বের ঋণ নিয়ে–তবে এর থেকে আলাদা রকমের–কৃষক বিদ্রোহবাদের অথবা গান্ধীবাদের পক্ষে যুক্তি দেখান। সংক্ষেপে ফক্স-এর বলার বিষয়: সাঈদের *প্রাচ্যবাদ* তত্ত্ব হিসাবে তেমন সীমানা ভাঙ্গেনি। কারণ যদি ভাঙ্গত তাহলে তাতে একদিকে প্রাচ্যবাদ ও পশ্চিমী সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মধ্যে সখ্য এবং হালের জগতে প্রাচ্যবাদের জেঁকে বসার বিষয়টি ফুটে উঠত। এবং অন্যদিকে ইউরোপীয় প্রাচ্যবাদের কর্তৃত্ব এবং তৃতীয় বিশ্বের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের মধ্যে বিদ্যমান অন্তরঙ্গ সম্পর্কের দিকটিও এখানে প্রকাশ পেত। তা সত্ত্বেও তিনি স্বীকার করেন সাঈদের তত্ত্ব ইতিমধ্যেই বেশ বড় মার্জিনে বেড়া ডিঙ্গিয়েছে। কারণ তাঁর মেধামননের মেজাজ গড়ে উঠেছে অনেকটা সিসেরোর আদলে।

ফক্স ওই সমস্ত হ্যাঁ-বাদী প্রাচ্যবিদ (affirmative orientalists)-এর কথা বলেছেন যারা গান্ধীকে 'অহিংস আন্দোলন' তত্ত্ব খাড়া করতে মূলধন যোগান দিয়েছিলেন। যার ফলে গান্ধীজী সমর্থ হয়েছিলেন ইউরোপীয় প্রগতি ধারণার বিকল্প চিন্তা দাঁড় করাতে। এ সকল হ্যাঁ-বাদী প্রাচ্যবিদদের মাঝে রয়েছেন রাস্কিন যিনি ধনতন্ত্র ও শিল্পায়নের বিরুদ্ধে লিখেছেন। আছেন এডওয়ার্ড কার্পেন্টার যিনি অক্সফোর্ডে মহাত্মার সাথে পরিচিত হয়েছিলেন এবং শেষমেশ হয়েছিলেন 'নিরামিষ ভোজিতা'র (vegetarianism) একনিষ্ঠ সমর্থক। আরো ছিলেন এ্যানি বেসান্ট। ফক্স যদিও ডেভিড থরোর কথা বলেননি কিন্তু আমার বিশ্বাস এটি তত্ত্বের সীমানাভাঙ্গন ধারণার আরেকটি বড় উদাহরণ হতে পারে। সাঈদের প্রাচ্যবাদের মাঝে রয়েছে নেতিবাদী শক্তি আর এর বিপরীতে এতে পাব সদর্থক মাজেজা।

এটি সবার জানা যে, থরোর চিন্তার মেজাজ ও গড়ন কেবল এমারসনের অতীন্দ্রিয়বাদ (Trancendentalism) তত্ত্ব দ্বারাই হয়নি। হিন্দুধর্মের পুস্তকগুলির একনিষ্ঠ পাঠও এতে বড় ভূমিকা রেখেছে। এ সকল পুস্তক তিনি শুধু বারবার অধ্যয়নই করেন নাই, তাঁর ওয়াল্ডেন পর্বের জীবন-অধ্যায়ে অনুবাদও করেছেন, *The Transmigration of the Seven Brahmans*-এর ফরাসী সংস্করণ। সত্যি বলতে কি, এ সকল প্রভাবের জন্যই ওয়াল্ডেন অংশে থরোকে দেখতে পাই একজন কঠোর সাধুরূপে। এসবই পরিণতিতে তাঁকে সাহায্য করেছে অন্যায় সরকারের বিরুদ্ধে 'অসহযোগ আন্দোলন' তত্ত্ব নির্মাণে। এ বিষয়ে স্পষ্ট করে বলার মত বিদ্যা না থাকলেও এ সম্পর্কে আমরা মোটেই বেখেয়াল নই যে, থরোর অমর প্রবন্ধটি গান্ধীজীকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। এর প্রমাণ পাই

www.pathagar.com

জর্জ হেনরিকের The Influence of Thoreau's 'Civil Disobedience' on Gandhi শীর্ষক প্রবন্ধে। যেখানে উল্লেখ পাই গান্ধীজী তাঁর মার্কিন সমর্থক ওয়েব মিলারকে ১৯৩১ এর দিকে কি বলেছিলেন তার বিষয়ে। তিনি ১৯০৬ এর গোড়ার দিকে থরোর কাজের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। মিলারকে তিনি আরও বলেছিলেন, আমেরিকার কিছু অননুবর্তী (non-conformist) চিন্তাধারা সম্বন্ধে, যেগুলি 'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন' বিষয়ে সংগ্রামে তাঁকে সহায়তা করেছিল। দৃশ্যত স্পষ্ট যে, গান্ধীজী আন্দোলনের নামটি পর্যন্ত ধার করেছেন থরো থেকে। মিলার শেষতক এ সিদ্ধান্তে আসেন, 'গান্ধীজী যা ধার করেছেন তা আদতে ছিল ভারতের। থরো এসব চিন্তাভাবনার শুদ্ধ রূপায়ণের কাজটি করেছিলেন মাত্র।' গান্ধীজী থরোর মাঝে এতটাই মজে গিয়েছিলেন যে নিজের কোন একটি লেখায় এর হুবহু তর্জমা করে দিয়েছিলেন এবং থরোর ওই লেখা হতে বারবার উদ্ধৃতি দিচ্ছিলেন। 'সরকার যদি কাউকে অহেতুক অন্যায়ভাবে বন্দি করে তখন সত্যিকার মানুষের আসল কাজ নিজেকে নিজে বন্দি করা।' অবশ্যই গান্ধীজী ব্যক্তির প্রতিরোধ রূপান্তর করেছেন গণআন্দোলনে। এখানেই সাঈদ আমাদের অবহিত করছেন তত্ত্ব যে তার উৎপত্তির মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে যেতে এবং আরও শক্তিশালী ভিন্নরূপ ধারণ করতে পারে তার বিষয়ে। বিশেষভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠনে।

মজার ব্যাপার এই যে, এ তত্ত্ব খোদ আমেরিকাতেই ফিরে আসে প্রজন্মান্তরে। অনেকেই হয়তো অনুমান করতে পারছেন, আমি মার্টিন লুথার কিং-এর কথাই বলছি। আমি বিশেষভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদের (segregation) বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলনের কথা বলতে চাচ্ছি। *A Brief History of American Culture* (1990) বইতে যেমন রবার্ট ক্রানডেন বলেছেন : 'গান্ধী থরোর প্রবন্ধে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। নিজে অদ্ভুত তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন। এর মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ও ব্রিটিশ ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়েছেন। কিং যতদূর পারেন গান্ধীজীর কাছ থেকে ধার নিয়েছেন। বিশেষ করে সমুদ্রপানে লবণযাত্রা এবং অনশনসমূহ তাকে নাড়া দিয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্য হল 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলনের পুরো ধারণাটি।' মার্টিন লুথার কিং গান্ধী ও থরোকে মিলিয়ে নতুন দর্শন দেন যা আমেরিকার বর্ণবাদী চরিত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে তাঁকে নেতৃস্থানীয় করে তোলে। কিং এতেই ভারতবর্ষের নজরে আসেন। গান্ধীর ভক্ত রঙ্গনাথ দিবাকর মন্টোগমারী সফর করে কিং কে 'এহেন আন্দোলনে শারীরিক নির্যাতন সহ্য করে উদাহরণ সৃষ্টি করার কথা' বুঝিয়েছিলেন। পরবর্তীতে কিং ভারত সফরে আসেন। দেখেন ভারতে হরিজনদের (Harijans) জন্যে নেয়া ইতিবাচক নীতিসমূহ। শিখেন 'শান্তি সেনারা' কিভাবে ভারতে সাধারণ নাগরিক অধিকারসমূহের স্বীকৃতি চূড়ান্ত রূপ না দেয়া পর্যন্ত কাজ করেছে এবং এর মাধ্যমে 'গান্ধীজী অহিংস আন্দোলন, ধর্মঘট ও অসহযোগ আন্দোলন তত্ত্ব খাড়া করেন।' সবশেষে পাচ্ছি অসহযোগ আন্দোলন কিভাবে আবার ভারতে ফিরে আসে এবং শেষ পর্যন্ত নেলসন ম্যান্ডেলার হাত ধরে দক্ষিণ আফ্রিকাতে পাড়ি জমায়। ম্যান্ডেলা একে ব্যবহার করেন বর্ণবাদের (Apartheid) বিরুদ্ধে।

শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের ইতিহাসে সাঈদের এ তত্ত্ব কিভাবে আমাদের এই ভূ-অংশে কাজে লাগে তার একটি নমুনা পেশ করব। উপমহাদেশের ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রমাত্রই জানেন সেইসব তত্ত্ব সম্বন্ধে যেগুলি ইংরেজী সাহিত্যপাঠের (the rise of English studies)

www.pathagar.com

পর থেকে শুরু হয়েছে এবং পরে তা কিভাবে কাঠামো, উত্তর-কাঠামোবাদের মারফত আমেরিকা হয়ে আমাদের কাছে বর্তমানে Old Historicism ও New Criticism নামে পরিচিত। সন্দেহ করার কোন জো নাই, এ সকল তত্ত্ব উপমহাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইংরেজী বিভাগগুলিতে কেবল ছড়িয়েই পড়ে নাই, ছাত্র-শিক্ষক ও নীতি-নির্ধারকেরা এতে মজে আছেন রীতিমত। এখন এ হতে সরে দাঁড়াবার চেষ্টা চলছে মাত্র। ১৯৯২-তে আনিয়ালুম্বা The Lie of the Land প্রবন্ধে লিখেছেন, 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগগুলি লিভীয় (Levisite) সমালোচনার শেষ আকড়া। এ কথাই শেষ নয়, তাদের মন-মেজাজ, আচার-আচরণ সবকিছুই এর মাপে ছাঁটা।' Makers of Indian Literature নামে সি ডি নারসিমাইয়ের (C.D. Narasimhaiah) প্রবন্ধে প্রমাণ পাই কিভাবে লিভীয় মানদণ্ডে আমরা প্রভাবিত হয়েছি এ সিদ্ধান্তানুসারে দুই দশকের ইংরেজী সাহিত্য এমনকি রুশদির *মিডনাইট চিলড্রেনকেও* বাদ দিতে হয়। সম্প্রতি আমার হাতে এসেছে ইন্টারনেটে প্রকাশিত Return to Inscription পাঁচ নম্বর খণ্ডে সংকলিত জেমস ক্লিফোর্ডের Notes on Travel and Theory প্রবন্ধটি। এটিতে ক্লিফোর্ড কিভাবে তত্ত্ব এবং ভ্রমণরত তাত্ত্বিকদের নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন তার দোহাই পেড়ে আমি আমার প্রবন্ধ শেষ করব। বলে রাখা ভাল, এতদ্বিষয়ে বক্তব্য হাজির করতে ক্লিফোর্ড প্রথমতঃ সাঈদের, দ্বিতীয়তঃ তাঁর নিজের Traveling Cultures থেকে ঋণ নিয়েছেন। তাঁর মোটামুটি উদ্দেশ্য এটা বলা যে, কিভাবে মনঃসমীক্ষণাত্মক তত্ত্ব (psy-choanalytic theory) গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যান্ডে কিছুকালের মধুচন্দ্রিমা শেষে ভিয়েনায়, ভিয়েনা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফ্রান্সে পৌঁছে, এবং পঞ্চাশ-ষাটের দশকে ফাঁনো সেটিকে সেবা দিয়েছেন। সাথে সাথে মার্ক্সীয় তত্ত্ব কিভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর পুরোটা জুড়ে সারা পৃথিবীময় চষে বেড়িয়েছে তারও স্মরণ নিয়েছেন ক্লিফোর্ড।

প্রবন্ধে আলোচনার ধরণ দেখে বোঝা যায়, ক্লিফোর্ডের মূল অগ্রহ 'পরাধীনোত্তরকালে তত্ত্বের অবস্থান (locations) এবং অবস্থানবিচ্যুতি' (displacements) নিয়ে। সাঈদের Traveling Theory সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব প্রশংসার; কিন্তু এটি একটি 'সীমিত আয়তনের সীমানা ভাঙ্গন কাহিনী' বলে জ্ঞান করতঃ তাঁর কণ্ঠে আক্ষেপ ঝরে। এ বিষয়ে তাঁর বোধ : সাঈদের তত্ত্বের কেন্দ্র বিশেষভাবে ধারণার ইউরোপীয় বিস্তৃতি-কাঠামোয় আবদ্ধ। তবে ক্লিফোর্ড স্বীকার করেছেন, সাঈদের 'প্রবন্ধটি তত্ত্বের সীমানাভাঙ্গন, অবস্থান এবং অবস্থানবিচ্যুতির আলোচনার একটি অপরিহার্য সূচনাবিন্দু।' কিন্তু আবারও তাঁর আক্ষেপ, সীমিত পরিধির মধ্যে এর বিস্তার দেখে। এক্ষেত্রে তাঁর অভিমত, সাঈদ তাঁর প্রবন্ধে 'তত্ত্ব এবং তাত্ত্বিকগণ' ঘুরে বেড়ানোর কালে 'বিশেষতঃ উন্নত এবং অনুন্নত বিশ্বের মাঝে' যে 'দ্ব্যর্থবোধক গ্রহণ এবং বর্জনের সম্মুখীন হয়' তার ওপর আলো ফেলতে পারতেন। 'সাবঅল্টার্ন স্টাডিজে'র বরাতে গ্রামসীয় মার্কসবাদ ভারতে আসে, এবং এটি নবরূপ পায় আমেরিকাতে এবং রণজিৎ গুহ, পার্থ চ্যাটার্জিদের লেখায়—এ উদাহরণ টেনে তিনি তাঁর যুক্তিকে ঠেস দেন। চালাকিপনার সাথে তিনি আরও উদাহরণ জুড়ে দেন সাঈদের নিজের লেখা থেকে; এবং দেখান কিভাবে সাঈদের নিজের কর্ম আশির দশকে 'বহুবিধ বুদ্ধিবৃত্তীয় উত্তর-ঔপনিবেশিক পদক্ষেপ' নেয় 'প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্ব,' 'কেন্দ্রীয়' এবং

www.pathagar.com

'প্রান্তীয়' স্থানসমূহের মাঝে।' তবে আমার মনে হয়, ক্লিফোর্ড সাহেব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমলে নেন নাই। অথচ বাদ পড়ে-যাওয়া সেই বিষয়টি এমন যে তা ছিল সাঈদের আগ্রহের কেন্দ্রে। সাঈদ একটি তত্ত্বের সীমানা ভাঙ্গন বিষয়ে তখনি আগ্রহবোধ করেছেন, যখন ঐ তত্ত্বটির মাঝে পৃথিবীকে পরিবর্তন করার আওয়াজ আছে বলে নিশ্চিত হতে পেরেছেন। আরও লক্ষণীয়, সাঈদ ঐ সকল তত্ত্বকে সরাসরি বাতিলের খাতায় ফেলে দেন যেগুলি সীমানাভাঙ্গার কালে বস্তুরতির (reified) আকার-প্রকরণ নেয়। অথচ ক্লিফোর্ড শুধু তত্ত্বের নামসর্বস্ব গমনাগমন নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন–বিদ্রোহাত্মক শক্তির জোরে তত্ত্বের যে পৃথিবীকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রয়েছে সে বিষয়ে রা না করেই।

শেষমেশ তাহলে দাঁড়ালো কী? সাঈদের তত্ত্বের সীমানাভাঙ্গন ধারণাটি (বিশেষতঃ দু'টি প্রবন্ধের প্রথমটিতে যেখানে তার সীমানার পরিধি ভেঙ্গে দ্বিতীয়টিতে আরও নতুন স্বাদে-গন্ধে উপস্থিত) দু'টি কারণে আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ : এক, এটি আমাদের জানান দেয় তত্ত্ব কিভাবে দেশ ও কালের আয়তনের বাইরে তার ব্যাপ্তি ঘটায়; দুই, জীবন ও সমাজে পরিবর্তন আনয়নে কিভাবে এটি শক্তিশালী দাওয়াইয়ের কাজ করে। এ পর্যায়ে আমাদের না ভাবলেও চলবে ঐ সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে, যেগুলি রুগ্নতার কবলে পড়ে স্থিত হয়ে পড়েছে এবং পরিবর্তিত হবার যোগ্যতা হারিয়েছে। আরও আছে। তত্ত্ব-ধারণার দ্রুত অথচ অকার্যকর পরিবর্তনধর্মিতাকেও আমরা অবজ্ঞা করতে পারি, কারণ এ তত্ত্ব ধারণা নিয়ে শুধুই খেলা করে। সাঈদ এমন সব তত্ত্ব বিষয়ে আমাদের বলছেন, যাদের প্রকৃতই কিছু একটা করার জোর আছে। এখানেই তিনি আমাদের চোখ-কান খুলে দিয়েছেন। শিখিয়েছেন কিভাবে ধারণারাজি প্রতিনিয়ত তাদের সুপ্ত শক্তির জোরে পৃথিবীর রূপান্তরের কাজটি করে চলছে। তবে কথা হলো, দেখতে হবে, তারা নিজেরা পরিবর্তনের সেই আচরণের সাথে নিজেদেরকে কতটুকু মানিয়ে নিচ্ছে।

তথ্যসূত্র

১. আর্কিওলজি'র বাংলা রূপ প্রত্নতত্ত্ব। এ সরল পথ ধরে হেঁটে হালে ফুকোর The Archeology of Knowledge এর বাংলা খাড়া করা হয়েছে 'জ্ঞানের প্রত্নতত্ত্ব'। ফুকোর বিদ্যার সাথে সামান্যতম যাঁদের যোগ আছে, তাঁরা মানবেন, বাংলা প্রত্নতত্ত্ব আর ফুকোর আর্কিওলজি এক নয়। আমাদের ধারণা,ফুকোর আর্কিওলজি বুঝবার আগে আর্কাইভ (archive) কি তা স্পষ্ট হওয়া দরকার। বাংলায় আর্কাইভ মহাফেজখানা। এ নিয়ে আমাদের দ্বিমত নাই। কিন্তু ফুকো এখানে আর্কাইভ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। আর্কাইভ সম্বন্ধে ফুকোর বক্তব্য : "The domain of things ...the general system of the formation and transformation of statements". এখানে আর্কিওলজির ভূমিকা "to analyse that archive"। দেখা যাচ্ছে ফুকো যে অর্থে আর্কাইভ শব্দটির ব্যবহার করেছেন তার মিল বাংলায় লক্ষ্য করি 'কোষ্ঠী' শব্দের সাথে; এর বিশেষ যোগ ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের সাথে। যেখানে জ্যোতিষবিজ্ঞানের নানাজ্ঞান জড়ো করে থরে থরে সাজানো হয়। এ যেন জ্ঞানের শিকল। কোন এক জায়গায় শিকল কেটে গেলে বা তর ছিঁড়ে গেলে তখন তা আবার অনুসন্ধান করতে হয়। এ অনুসন্ধানের নামই আর্কিওলজি। ফুকো জ্ঞান বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর বইয়ে ঠিক এই কাজটি করেছেন। তাই বাংলায় এর প্রস্তাব করি 'জ্ঞানের কোষ্ঠী বিচার', 'জ্ঞানের প্রত্নতত্ত্ব' নয়।–অনুবাদকদ্বয়

২. ফুকোর ব্যবহৃত শব্দপুঞ্জ। বাংলায় সচরাচর এর অনুবাদ হতে দেখা যায় বাচনিক বিন্যাস। কিন্তু এ তর্জমা এর ভেতরের অর্থ বোঝার পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রশ্ন : কোন্ যুক্তিতে? তাহলে আসুন এর ঠিকুজি

www.pathagar.com

ঘেঁটে দেখা যাক। ফুকোর দেখিয়ে-দেয়া রাস্তা অনুসরণ করলে দেখা যাবে discursive শব্দটি discourse শব্দের বিশেষণ। discourse মানে বাচন। আর এ বাচন যে কোন প্রকারের হতে পারে : যেমন বক্তৃতা/ভাষণ,সাক্ষাৎকার, আলাপ, মন্তব্য ইত্যাদি . আমরা প্রায়ই বলি ডিসকোর্স অব রেসিজম (Racism), ডিসকোর্স অব সায়েন্স, ডিসকোর্স অব এ্যাডভার্টাইজিং: কিন্তু ফুকোর অভিধানে ডিসকোর্স 'সুসমন্বিত কতকগুলো বক্তব্য' ('large group of rule-governed statements') যা সত্য সম্বন্ধে একটি আত্ম-প্রমাণশীল বিবরণ দেয় এবং বিষয় চিহ্নিতকরার জন্যে যে সব ধারণা বিশিষ্ট হবে সেগুলোর জন্ম দেয়। যেমন : পাগলামির ডিসকোর্স, যৌনতার ডিসকোর্স, লিটারারি ডিসকোর্স, মেডিক্যাল ডিসকোর্স, ক্ষমতা/জ্ঞানের ডিসকোর্স (সাঈদ ও যেমন ওরিয়েন্টালিজমকে প্রাচ্যের ওপর ক্ষমতা বিস্তারের একটি বিশেষ পশ্চিমী ডিসকোর্স হিসেবে দেখছেন)। ফুকোর মতে, পাগলামিই বলুন আর যৌনতাই বলুন–এগুলো গূঢ়ার্থে নির্মিত হয়েছে ক্ষমতা-বিস্তার এবং প্রয়োগের এক একটি বলয়রূপে। তাই discursive formation (তেমনি–discursive practice) এর বাংলা সুপারিশ করব–'উদ্দেশ্যবাহিত তথ্যবিন্যাস'। –অনুবাদকদ্বয়

৩. কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিদ্যাশাস্ত্রে (Cultural Studies) ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ। প্রথম উদগাতা মেরি লুই প্রাট। এদ্বারা বিশ্বে ভিন্ন ভূগোল ও ভিন্ন ইতিহাস দ্বারা বিভক্ত পৃথিবীর পরাধীন, পিছিয়ে-পড়া জাতিসমূহের জায়গা করে নেয়ার নিরন্তর সংগ্রামকে বোঝায়। বাংলায় বোধ করি 'মিলন ভূমি' বললে সহজ হয় (the space in which peoples geographically and historically separated come into contact with each other)। এ 'মিলন ভূমি' অনেকটা নো ম্যান্স ল্যান্ডে'র মত। এখানে একে অন্যের ওপর জবরদস্তি খাটাবার সুযোগ কম। প্রাট য়ুরোপের বাইরের লোকদের ইংরেজি সাহিত্য লেখার চেষ্টাকে এ 'মিলন ভূমির' নাগরিক হবার সাধনা বলে অভিহিত করেছেন। –অনুবাদকদ্বয়

ব্যবহৃত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

Brennan,Timothy. "The Illusion of a Future: *Orientalism* as Traveling Theory." *Critical Inquiry* 26 (Spring 2000) : 558-583

Clifford, James. "Review of *Orientalism*". In *History and Theory* 19:2 (1980) : 204-23

...., "Traveling Cultures." In *Cultural Studies*. Ed. Lawrence Grossberg et al. New York : Routledge. 1992.

..., "Notes on Travel and Theory". In *Return to Inscriptions volume* 5. http://humwww. usc. edu/Div Web/CultStudies/PUBS/Inscriptions/Vol-5/ Clifford.html

Crunden, Robert M.*A Brief History of American Culture.* Helsinki. Shs. 1990. Fox, Richard G."East of Said." In *Edward Said : A Critical Reader.* Ed. Michael Sprinker. Oxford: Blackwell. 1992.

Hendrick, George. "The Influence of Thoreau's 'Civil Disobedience' on Gandhi's *Satyagraha"* In Henry *David Thoreau: Walden and Civil Disobedience.* New York:W.W.Norton & Company Inc., 1966.

Loomba,Ania, "Criticism and Pedagogy in the Indian Classroom." In *The Lie of the Land.* Ed. Rajeswari Sunder Rajan. Delhi: Oxford University Press. 1992.

Narasimhaiah.C.D. Ed. *Makers of Indians English Literature.* Delhi: Pencraft International, 2000.

Said, Edward. *Orientalism.* New York: Pantheon, 1978.

..., *Reflections on Exile and Other Literary and Cultural Essays.* New Delhi: penguin Books. 2001.

.... *The World. The Text,and the Critic,* Cambridge, Mass, Harvard University Press. 1983.

www.pathagar.com

একবাল আহ্‌মদ
এডওয়ার্ড সাঈদ ও 'ইসলাম'

ফরহাদ মজহার

একবাল আহমদ হচ্ছেন রাজনৈতিক বিষয়াদিতে আমার গুরু। **এডওয়ার্ড সাঈদ**

ওরিয়েন্টালিজম বই থেকে আরম্ভ করে সহিত্য সমালোচক হিসেবে এডওয়ার্ড সাঈদের একক ও সর্বোচ্চ অবদান হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদকে পশ্চিমা সভ্যতার গাঠনিক প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে স্থাপন করা। **একবাল আহমদ**

একবাল আহমদ সম্পর্কে লিখছি...

একবাল আহমদ সম্পর্কে লিখব এখানে। কিন্তু তার নাম পড়লে অনেকে গালে হাত দিয়ে ভাবতে শুরু করবেন, মানুষটি কে? অতএব তাকে যিনি লিখিতভাবে প্রকাশ্যে নিজের 'রাজনৈতিক গুরু' বলে সম্বোধন করতেন সেই এডওয়ার্ড সাঈদ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে বাংলাদেশে প্রায় অপরিচিত এই মানুষটির প্রসঙ্গে আসব। তার আগে এই লেখাটি লিখবার পরিপ্রেক্ষিতটুকু পাঠকদের জানানো দরকার।

সম্প্রতি এডওয়ার্ড সাঈদ যখন আমাদের ছেড়ে চলে যান তখন অন্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও– বিশেষত সংবেদনশীল তরুণ ও রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে বিচ্ছেদবোধ ও সংবেদনা তৈরি হয়। এডওয়ার্ড বাংলাদেশের শুধু পণ্ডিত হিসেবে নন, রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে দু'টি প্রতিক্রিয়াশীল ধারার বিরুদ্ধে একটা লড়াই জারি হয়েছে। শ্রেণী রাজনীতির প্রশ্নে পরিচ্ছন্ন ও সংবেদনশীল তরুণদের কাছে এই লড়াইয়ের চরিত্র আগের চেয়ে অনেক স্পষ্ট। এক. নিজ সমাজের সাম্প্রদায়িকতা, অজ্ঞতা, কুয়ায় বাস করা ব্যাঙের জগতের অন্ধকার ও মোহাচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে লড়াই– অর্থাৎ নিজেদের পতনের বিরুদ্ধে লড়াই দুই. অন্যদিকে বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ ইসলাম-প্রধান জনগোষ্ঠীকে নিশানা করে যে ভয়ানক যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র উদাম করে দেখানোর কর্তব্য রয়েছে। এই দুই ক্ষেত্রেই এডওয়ার্ড সাঈদ বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য অবশ্য পাঠ্য ব্যক্তি। চিন্তা ও রাজনীতির নিশানা পাকা করার জন্য জরুরি। বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং রাজনৈতিক চর্চায় তার সংবেদনার কারণ এখানেই।

এডওয়ার্ড সাঈদের তিরোধান উপলক্ষে আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা একটি আলোচনা সভার

www.pathagar.com

আয়োজন করে। তার পরিকল্পনা করতে গিয়ে অনেকেরই একটা বিস্ময়কর উপলব্ধি হয়। সেটা হল এডওয়ার্ড যাকে তার রাজনৈতিক গুরু বলে সম্বোধন করতেন সেই একবাল আহমদ সম্পর্কে আমরা কিছুই প্রায় জানি না বলা চলে। এটা খুবই লজ্জার কথা। কিন্তু একবাল এডওয়ার্ডের আগে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তার ওপর কোন সভা কেউ করেনি। গণমাধ্যমেও কোন খবর প্রায় আসেনি। তখন সিদ্ধান্ত হয় সাঈদ এবং একবাল দু'জনকে স্মরণ করেই সভাটি আয়োজন করা দরকার।

এই লেখাটি সেই সভার জন্য খসড়া কিছু পয়েন্ট হিসেবে তৈরি হয়েছিল। আসলে একবাল আহমদকে পরিচিত করানোর জন্যই সভা শেষে কথাগুলো আরও গুছিয়ে প্রকাশের দাবি ওঠে। তার জন্য এখনকার এই বিনীত প্রচেষ্টা।

আমি তিনটি কিস্তিতে লেখাটি শেষ করতে চাইছি। প্রথমে এডওয়ার্ড সাঈদ সম্পর্কে কিছু কথা বিশেষত তার ওরিয়েন্টালিজম বইটির কথা মনে রেখে একবাল আহমদকে প্রতিস্থাপন। এরপর একবাল সম্পর্কে একটি লেখা এবং শেষে একবালের চিন্তার মৌলিক দিকটা ধরিয়ে দেয়ার জন্য যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে খানিক বয়ান।

একবাল আহমদ ও এডওয়ার্ড সাঈদ

এডওয়ার্ড সাঈদ-প্যালেস্টাইনি পণ্ডিত ও লড়াকু বুদ্ধিজীবী-মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দাপটের সঙ্গে পড়িয়েছেন, লেখালেখি করেছেন। প্রথাগত চিন্তার গোড়া বেশ খানিকটা তিনি নাড়িয়ে দিয়েছেন। এই সংগ্রামী মানুষটিকে আমরা কয়েক অক্ষর অবশ্য চিনি। এডওয়ার্ড বাংলাদেশে পরিচিত। কিন্তু ভারতের দাঙ্গা বিধ্বস্ত বিহার থেকে পাকিস্তান তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং একসময় আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রামের অকুতোভয় লড়াকু মানুষ একবাল আহমদকে আমরা বিশেষ চিনি না। তিনিও এডওয়ার্ড সাঈদের মতোই মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দাপটের সঙ্গেই পড়িয়েছেন এবং রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার-বিশেষত মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির কঠোর সমালোচক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। শুধু ভিয়েতনাম, আলজেরিয়া ও প্যালেস্টাইন নয় সারা দুনিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে তিনি সবসময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন– এমনকি একাত্তর সালে বাংলাদেশের নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর পক্ষে তার ভূমিকা ছিল সর্ববিদিত। তিনি বিহারের মানুষ-এই সত্য তিনি কখনোই ভোলেননি– কিন্তু একাত্তরে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর ওপর সামরিক বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি নিইউর্য়ক টাইমসের মতো পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন। পাকিস্তানের নাগরিক, একজন দেশান্তরী বিহারি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসে বাংলাদেশের পক্ষে লিখছেন– এ ঘটনার রাজনৈতিক গুরুত্ব এখনকার বাংলাদেশ কতটুকু অনুধাবন করবে কে জানে?

এডওয়ার্ড সাঈদ এই বছর ২০০৩ সেপ্টেম্বরের ২৫ তারিখে ৬৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। তার তিরোধানের খবর আমাদের গণমাধ্যমগুলো আমাদের দিয়েছে। এটা তাদের মহানুভবতাই বলতে হবে। এডওয়ার্ডের তিরোধানের প্রায় চারবছর আগে ১৯৯৯ সালে মে মাসের ১০ তারিখে একজন আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।। এক টুকরো খবর হিসেবেও সেটা কোন পত্রিকায় আসেনি। এটা দুর্ভাগ্য আমাদের।

www.pathagar.com

প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে- শুধু প্যালেস্টাইন কেন, সারা দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর সংগ্রামের পক্ষে এই দু'জন মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসে যে লড়াই চালিয়েছেন তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসাধারণ।
তবে তাদের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে 'ইসলাম' ও ইসলাম-প্রধান জনগোষ্ঠী সম্পর্কে পাশ্চাত্যের প্রচার ও প্রপাগান্ডার বিরুদ্ধে লড়াই। 'ইসলাম' নামক একাট্টা এক ধরনের কোন ধারা নেই। তার নানা ফেরকা, নানা ব্যাখ্যা, নানা বাদ-প্রতিবাদ, হিংসা ও হানাহানি। এটাই ঐতিহাসিকভাবে স্বাভাবিক- সব ধর্ম সম্পর্কেও একই কথা সত্য। কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদ্যা ইসলাম সম্পর্কে একাট্টা এক ধরনের ধারণা থেকে বর্বর ও সভ্যের যে বিভাজন করে তার বিরুদ্ধেই দু'জনার লড়াই। ইসলাম মাত্রই বর্বরদের ধর্ম, আর মুসলমান মাত্রই সন্ত্রাসী– পাশ্চাত্যের এবং তথাকথিত আধুনিকতাবাদীদের এই বদ্ধমূল ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রপাগান্ডা ও আচার-আচারণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঔপনিবেশিকতা এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের অংশ– এই সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ধারাকে তারা শক্তিশালী করেছেন। প্রাচ্যবিদ্যার রাজনীতি আমরা দেখছি এই কালের যুদ্ধবিগ্রহে– যার আধুনিক পরিণতি জর্জ বুশের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধ' এসে ইসলামপ্রধান দেশগুলোকে নিষ্ঠুর রণক্ষেত্রে পরিণত করেছে। তাদের এই সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক লড়াইয়ের নীতিগত এবং কৌশলগত দিক শুধু বুদ্ধিজীবিতার ক্ষেত্রে অনন্য নয়, এ কালের রাজনীতির নতুন দিকনির্দেশনার জন্যও জরুরি।
এ দিকটা শুরুতেই উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, যে প্রাচ্যবিদ্যাকে এডওয়ার্ড ও একবাল সমালোচনা করেছেন তারই প্রতাপে আমরা এদের শুধু পণ্ডিত বলেই শনাক্ত করতে উৎসাহী। এডওয়ার্ড ১৪ বছর প্রবাসী প্যালেস্টাইন পার্লামেন্টের সক্রিয় সদস্য ছিলেন, ইয়াসির আরাফাতের রাজনীতি সমর্থন করেননি বলে পদত্যাগ করেছেন ১৯৯১ সালে। একবাল আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং আলজেরীয়দের পক্ষে ফ্রান্সের সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে একজন সদস্য হিসেবে ছিলেন। এরা যেমন তেমন পণ্ডিত ঠিক নন। পাশাপাশি ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সমস্যার বিরুদ্ধে নিরাপস অভ্যন্তরীণ লড়াই চালাতে হয়েছে তাদের। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার-প্রপাগাণ্ডা যুদ্ধবিগ্রহের হাত থেকে নির্যাতিত জনগোষ্ঠীগুলোকে রক্ষার জন্য সাহসী সংগ্রাম, অন্যদিকে ধর্ম, কূপমণ্ডূকতা ও নানাবিধ ঐতিহাসিক সমস্যা ও সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য ভেতরকার সংগ্রাম– এ দুইয়ের টানাপোড়েন তাদের মধ্যে খুবই পরিচ্ছন্নভাবে আমরা অবলোকন করতে পারি। এ কারণেই দু'জনের নাম একসঙ্গে উচ্চারণই সঙ্গত। কারণ এই দু'জন নানা কারণে আন্তর্জাতিকভাবেই এই জনগোষ্ঠীগুলোর ভেতর-বাইরের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। আর এ দুজনের কাছ থেকে বাংলাদেশে আমাদের শেখার আছে প্রচুর।
এডওয়ার্ড ধর্ম সূত্রে ক্রিশ্চিয়ান, জন্মসূত্রে প্যালেস্টাইনি। জেরুজালেমে তার জন্ম, বড় হয়েছেন মিসরে। একবাল ধর্মসূত্রে মুসলমান জন্ম সূত্রে ভারতীয়, সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের দাঙ্গা তাকে ও তার পরিবারের সদস্যদের দেশ ছেড়ে গৃহহারা করেছিল– তারা দেশান্তরী হয়েছিলেন পাকিস্তানে– নাগরিকত্বও নিয়েছিলেন আরও অনেক বিহারির মতো পাকিস্তানেই।

www.pathagar.com

দু'জনই পণ্ডিত মহলে কামিয়াব হয়েছেন। তবে তুলনায় এডওয়ার্ড সাঈদের খ্যাতি তার *Orientalism* বইটির কারণে ছড়িয়েছে অনেক বেশি। তবে *Orientalism* বইটির চেয়েও এডওয়ার্ডের *The Question of Palestine* (1979), *Covering Islam* (1981), *After the Last Sky : Palestinian Lives* (1986) এবং *Blaming the Victims* (1988) সমান গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ Orientalism-এ যে তত্ত্বটা অনেক বিমূর্ত ও অনেক বেশি পণ্ডিতী চালে হাজির করা হয়েছে সেই তত্ত্ব তৈরির পরিপ্রেক্ষিত আর প্রক্রিয়া এই বইগুলোতে আরও পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রয়োগও অনেক বেশি স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন।

মিশেল ফুকো ও ওরিয়েন্টালিজম

পাশ্চাত্য কিভাবে প্রাচ্যকে কল্পনা করে, উল্টাপাল্টা বানায় আর নিজের দুশমন জ্ঞান করে যুদ্ধবিগ্রহ প্রচার-প্রপাগান্ডা পরিচালনা করে সেসবের প্রকাশ্য ও গোপন কায়কারবারগুলো এডওয়ার্ড সাঈদ যে কায়দায় *ওরিয়েন্টালিজম* বইয়ে লিখেছেন সেই কৌশলটুকু বোঝা ও শেখার দরকার আছে। এ বইটি নিয়ে নানা পণ্ডিতী তর্কবিতর্ক হতেই পারে, কাটাছেঁড়া করা আন্তরিক লেখাও নিশ্চয়ই দরকার, যেমন মার্কসবাদী এজাজ আহমেদ লিখেছেন (Aijaj Ahmad 1992 : In Theory, Verso)। কিন্তু আমার সন্দেহ এজাজ বোধ হয় মার্কিন দেশে পণ্ডিতী পরিমণ্ডলের সীমাবদ্ধতার মধ্যে কৌশলগত সমস্যার দিকটা বিবেচনা করেননি। এডওয়ার্ড সাঈদের বই সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ভাবনা ও তর্কের ধারা পণ্ডিতদের মহলে যেমন বদলে দিয়েছে,ঠিক তেমনি রাজনীতির কর্মকাণ্ডেও প্রভাব বিস্তার করেছে নানা ডালপালায়। সেটা মানতেই হবে। বইটির গুরুত্ব গ্রন্থের সংকীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে খুবই সহজ-সরল উপলব্ধির জায়গায় এসে দাঁড়াতে পেরেছে। যেমন, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে সাহেবসুবার সংস্কৃতি, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ইত্যাদির মধ্যে পরাধীন মানুষ ও জাতিগুলোকে কীভাবে দেখা হয় তার একটা বয়ান আমরা খুঁজে পাই। ওই দেখার মধ্যে বর্ণবাদ– অন্য জাতি, বর্ণ, সংস্কৃতি বা ধর্মের মানুষদের দেখার প্রকরণ ও পদ্ধতির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। এডওয়ার্ড যাকে 'ওরিয়েন্টালিজম' বলেছেন।

বাংলায় দেখছি এর অনুবাদ করা হয়েছে 'প্রাচ্যবিদ্যা'। এ অনুবাদে বইটির রাজনৈতিক চরিত্র হারিয়ে যাওয়ার ভয় আছে। ঔপনিবেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ ইত্যাদি পরিভাষা অতি ব্যবহারে কিছুটা জীর্ণ হয়ে গিয়েছে বলে হয়তো ওরিয়েন্টালিজম বা পাশ্চাত্যের চোখে অন্য জাতগুলোকে দেখার, লিখার, বিচার ও শাসন করার ধরণ বোঝানোর জন্য নতুন পরিভাষার দরকার হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পুরানা পরিভাষার অন্তর্গত মর্ম ও রাজনীতি যেন আমরা না ভুলি। এডওয়ার্ড অপরকে দেখা ও অপরের প্রতি আচরণ এবং সেই দেখা ও আচরণের মধ্য দিয়ে একটি জনগোষ্ঠী নিজের সম্পর্কে যে ধারণা তৈরি করে সেই ব্যাপক ভাবনা কাঠামোর মধ্যেই 'ওরিয়েন্টালিজম' কথাটা ব্যবহার করেছেন। আমরা সংক্ষেপে রাজনৈতিকভাবে ব্যাপারটা বুঝতে চাইলে ঔপনিবেশিক শাসন, সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবাদ বললে সুবিধাই হয়। খামাখা পণ্ডিতী করতে হয় না।

www.pathagar.com

পণ্ডিত মহলের জন্য– বিশেষত মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিমণ্ডলে বইটি লেখা বলে বইটির পড়ার কায়দা বোঝার দরকার আছে। যদি আক্ষরিকভাবে কেউ বইটি পড়েন তাহলে এডওয়ার্ডকে বুঝতে ভুল হবে। যেমন ওরিয়েন্টালিজম সম্বন্ধে তার সংজ্ঞা হচ্ছে : Anyone who teaches. writes about. or researches the orient... and this applies whether the person is an anthropologist, sociologist. historian or philologist... either in its specific or in its general aspects, is orientalist and what he or she does is orientalism.

যে কেউই প্রাচ্য সম্পর্কে পড়ায়, লেখালেখি করে তারা নৃতত্ত্ববিদ, সমাজ গবেষক, ঐতিহাসিক, ভাষাবিদ ইত্যাদি যাই-ই হোক তারাই ওরিয়েন্টালিস্ট আর তারা যে কাণ্ডটি করে তার নামই প্রাচ্যবিদ্যা। খুবই পণ্ডিতপ্রবণ ধরিমাছ না ছুঁই পানি ধরনের সংজ্ঞা। কিন্তু এহ বাহ্য– অর্থাৎ সংজ্ঞার বাইরের দিক। এবার সংজ্ঞার আরেকটু ভেতর গিয়ে বিচার করা যাক : Orientalism is a style of thought based upon an onto-logical and epistemological distinction made between 'the orient' and (most of the time) the Occident'

যে অবস্থানে দাঁড়িয়ে ওরিয়েন্টালিজমের কসরৎ চলে তার একটা দেশকালপাত্র আছে (ontology) এবং বাঁধাগৎ পণ্ডিত্যের ফর্মুলাও (epistemology) আছে। আমরা ontology বা epistemology কথাগুলোর চাকচিক্যে খুব গদগদ হয়ে যাই। ভাবি বোধহয় মার্টিন হেইডেগার বা মিশেল ফুকো নিয়ে তুলকালাম তত্ত্ব হচ্ছে। হোক। এডওয়ার্ডের বইতে তার ছাপ অবশ্যই আছে। কিন্তু বাংলায় আমাদের সংস্কৃতি ও ভাষার মধ্যে কথাগুলো সহজভাবে বোঝার দরকার। কথা হল, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা ও অবস্থানের দেশকালপাত্রে জীবনের দাগগুলো তো থেকেই যায়। এতটুকু বুঝতে পারা কঠিন নয়। নিছকই কাণ্ডজ্ঞানের ব্যাপার। তাহলে আমাদের চিন্তা-ভাবনা আর আচার-আচরণের মধ্যে আমরা কীভাবে আছি বা থাকি তার প্রভাব, দাগ ও অভিব্যক্তি তো থাকবেই। সেই আছি হয়ে থাকার বিদ্যাই হচ্ছে ontology। তাহলে কেউ কি করে 'আছে' বা 'থাকে' আর 'ওরা' বা যাদের 'আমরা' আমাদের চেয়ে আলাদা জ্ঞান করি, 'অপর' বা 'অন্য' কেউ মনে করি, তারা কীভাবে 'আছে' বা 'থাকে'– উভয়ের অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের মধ্যে একটা ভেদ থাকবেই থাকবে। এডওয়ার্ড আরব বিশেষত প্যালেস্টাইনি। ফলে Orientalism-এ আমরা দেখি একজন আরব বিচার করেছে পাশ্চাত্যকে। প্রাচ্য বিষয় করেছে পাশ্চাত্য কীভাবে নিজেকে ও অপরকে অবলোকন করে– সেই দেখাদেখি থেকে সৃষ্ট সাহিত্য সভ্যতা সংস্কৃতি রাজনীতি ইত্যাদির বিচার করছে।

এবার পণ্ডিতদের কথা বোঝা যাক। যে কোন বিদ্যাচর্চা ব্যবস্থারই একটা কাঠামো, নিয়ম বা পাটীগণিত আছে। অনেকে epistemologকে জ্ঞানকাঠামো বা জ্ঞানতত্ত্ব অনুবাদ করেন। একদিকে ঠিকই আছে। তবে সহজ কথা হল এর একটা ফর্মুলাও আছে মিশেল ফুকো যাকে epistemological grip বা 'জ্ঞানকাঠামোর সাঁড়াশি' বলে অভিহিত করেছেন। পণ্ডিত যে সাঁড়াশি দিয়ে তার বিষয়কে চেপে ধরে পাণ্ডিত্য আত্মস্থ ও জাহির করেন সেটাই জ্ঞানতত্ত্ব বা এপিসটেমলজি। কথাটা ইমানুয়েল কান্টের জায়গা থেকে ঠিক হল। হেগেলের জায়গা থেকে নয়। মিশেল ফুকো হেগেলকে এড়িয়ে যেতে গিয়ে কান্টের

www.pathagar.com

খপ্পড়ে পড়েছেন স্বেচ্ছায়। জ্ঞান আর জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কি? এ প্রশ্ন হেগেলের। জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি কি নিছকই হাতিয়ার? সেই হাতিয়ার বা আঁকশি দিয়ে জ্ঞানবৃক্ষ থেকে কিছু একটা পেড়ে ফেল? হেগেল বরং জোর দেবেন জ্ঞান প্রক্রিয়ার ওপর। সেই প্রক্রিয়াই ঠিক করে দেয় ফলাফলটা কি দাঁড়াবে। পদ্ধতি, হাতিয়ার বা হাতিয়ার ব্যবহারের নিয়মকানুন বিচার করা কঠিন নয়। পরিভাষার চাকচিক্যে না ভুলে সহজভাবে অনেক কিছু বোঝার কাজ আমাদের এখনও বাকি রয়ে গেছে। কথা হল orientalism নামক কায়কারবারটিরও একটা হাতিয়ার বা সাঁড়াশি যেমন আছে তেমনি তার একটা ইতিহাসও আছে। প্রাচ্যবাদী চিন্তার সাঁড়াশিমূলক দিক আর প্রক্রিয়াগত ধারাবাহিক দিক দুটোই আছে। সেই সাঁড়াশি হাতে বা চিন্তার ধারার অধীনস্থতা যারা মেনেছেন তাদের একটা তালিকা করেছেন এডওয়ার্ড সাঈদ। বলছেন :

...This orientalism can accomodate Aeschylus, say, and Victor Hugo, Dante and Karl Marx.

প্রাচ্যবিদ্যার সাঁড়াশি হাতে ও ধারাবাহিকতার মধ্যে এসকাইলাস, ভিক্টর হুগো ও দান্তের পাশাপাশি কার্ল মার্কসের নাম করায় মার্কসপন্থীদের অনেকে গোস্বা করেছেন। তাদের যুক্তি আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু একবাল ও সাঈদ দুজনেই ঔপনিবেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস বুঝতে গিয়ে এই ভুল করতে রাজি নন যে কার্ল মার্কস শুধু কার্ল মার্কস বলেই প্রাচ্যকে ভিন্নভাবে দেখেছেন বা দেখতে সক্ষম। তিনি কি ভারতের ব্রিটিশ শাসনকে ইতিবাচক গণ্য করেননি? তিনি কি ইংল্যান্ডকেই সভ্যতার সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িতে স্থাপন করেননি? চীন, ভারতবর্ষ, আরব কিংবা ইসলাম, বৌদ্ধ বা হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তার ধারণা কতটুকু স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ছিল? তিনি তো অন্যদের লেখা থেকে এশিয়া সম্পর্কে জেনেছেন, নিজে তো আর সরাসরি প্রত্যক্ষ করেননি। এই প্রশ্নগুলো তোলা নিশ্চয়ই অন্যায় কিছু নয়। তবুও কার্ল মার্কসকে এসকাইলাস, ভিক্টর হুগো কিংবা দান্তের পাশাপাশি একই কাতারে তোলার মুশকিল আছে– এজাজ আহ্‌মদ ঠিকই ধরেছেন। একবাল এবং সাঈদ দুজনই কার্ল মার্কসের আন্তরিক অনুসারী, কিন্তু মার্কসের জ্ঞানগত এবং ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তারা আমাদের সচেতন করতে চেয়েছেন, সেদিক থেকে এই কাতারভুক্তির তাৎপর্য এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়। হয়তো তাদের সব কথা আমরা মানব না। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যার জায়গা থেকে মার্কসের প্রসঙ্গে তোলা মুশকিলের কথা এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। সেখানেই একবাল আহ্মদ বা এডওয়ার্ড সাঈদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য।

ওরিয়েন্টালিজম সম্পর্কে সাঈদের আরও একটি কথা হল যে ব্যাপারটিকে বুঝতে হবে discourse হিসাবে। বাংলায় ডিসকোর্স কথাটা 'বয়ান' নামে চলে। ওতে ইংরেজি ভাবটা পুরোপুরি ব্যক্ত হয় না বোধহয়। তবে কাজ চলে। ধারণাটা তিনি ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকোর কাছ থেকে নিয়েছেন বলে বলে দাবি করেছেন। বলছেন :

I have found it useful here to employ Michel Foucault's notion of discourse, as described by him in the Archaeology of knowledge and in Discipline and Punish, to identify Orientalism. My concern is that without examining Orientalism as a discourse one can not possibly understand the enormously systematic discipline by which European culture was able to manage and even

www.pathagar.com

produce... the Orient politically, sociologically, militarily, ideologically, scientifically and imaginatively during the post Enlighienment period.
মিশেল ফুকোর প্রকরণ এডওয়ার্ড তার বইতে কতটা ব্যবহার করেছেন সেই বিষয়ে তর্ক আছে। খানিক আগে জ্ঞানের সাঁড়াশি আর জ্ঞানের প্রক্রিয়া নিয়ে কান্ট-হেগেলের ফারাক সম্পর্কে যে ইশারাটুকু করলাম সেটা এখনকার জন্য যথেষ্ট।

এডওয়ার্ড ও একবালের চোখে ঔপনিবেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ ও 'ইসলাম'

নিজের বইতে যা লিখেছেন তা পাঠ করার বিকল্প নেই। কিন্তু হালকা চালের সাক্ষাৎকারে ওরিয়েন্টালিজম সম্পর্কে এডওয়ার্ড সাঈদের নিজের বয়ান আমাদের কাজ অনেক সংক্ষেপ করতে পারে। সেই কারণে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। কথোপকথন বা সাক্ষাৎকারে তিনি নিজের কথা যখন হালকা চালে পণ্ডিতী ভান ত্যাগ করে বলেন তখন কিভাবে বলেন? বছর দশ-এগারো আগে Social Thought-এর কাছে মাইকেল ফিলিপকে [ওকাকুরা কাকুজো রচিত '*দ্য বুক অব টি*' বইয়ের প্রথম অধ্যায়।] (Michel Phillip) দেয়া একটি সাক্ষাৎকারে এডওয়ার্ড বলছেন:
"And my argument is quite simple, that the growth of imperialism parallels, is paralleled by the growth of Orientalism, and that thereis a particular aspect of knowledge which is coercive, manipulative,and designed not only for pure knowledge, I mean there is a certain amount of that, of course, but also for the control of populations that were being acquired, or were being traded with, but were above all secondary to the Westerner let's say in India or Egypt or the Sudan,who needed to know about these populations in order to rule them."
খুবই সাফ কথা। তার কথা নাকি খুবই সরল আর সোজা। যাকে আমরা ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবিদ্যা বলছি সেটা সাম্রাজ্যবাদের সমান্তরাল, কিংবা গড়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদেরই সমান্তরালে। জ্ঞানের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যার ভূমিকা নিছকই জ্ঞানের জন্য নয়, বরং একটি জনগোষ্ঠীর ওপর বল প্রয়োগ, তাদের আচার-আচরণ ব্যবহার মোচড়াবার এবং নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের জন্যই। জানার প্রক্রিয়া থেকে ক্ষমতা ছাড়া আমরা কিছু জানি না তা নয়, কথা হচ্ছে ক্ষমতা নির্মাণ ও প্রয়োগের প্রক্রিয়া থেকে জ্ঞানকে আলাদা করে বিচার করা ঠিক নয়। জ্ঞানের যদি নিজের কোন স্বাধীন জায়গা থেকেও থাকে পশ্চিম বা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কাছে সেটা গৌণ বিষয়। ক্ষমতাই প্রধান। যদি তারা মিসর,সুদান, ভারত বা বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু জানতে চায় তবে সেটা এই দেশের জনগোষ্ঠীগুলোকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই। তাহলে প্রাচ্যবিদ্যা মানে প্রাচ্যের ওপর পাশ্চাত্যের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণের বিদ্যা। কিংবা আরও সহজভাবে– ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণীর যাদের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করবে সেই শাসিত জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত বিদ্যাচর্চা– প্রাচ্যবিদ্যা, ওরিয়েন্টালিজম।
মিশেল ফুকোর কাছ থেকে এডওয়ার্ড অনেক পরিভাষা ধার করেছেন, সন্দেহ নেই। প্রেরণা ও সূত্রাসূত্রও ধার করেছেন। ঋণ আছে। অন্তত 'ডিসকোর্স' বা 'বয়ান' সংক্রান্ত ধারণাটিকে ঠিকই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এডওয়ার্ড সাঈদকে ঠিক মিশেল ফুকোর প্রয়োগ বলা যাবে না। জ্ঞান মাত্রই যে বিশুদ্ধ ও নিরাসক্ত কারবার নয়, এর সঙ্গে অপরের ওপর

www.pathagar.com

ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও অপরকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার জড়িত এটা ফ্রিডরিখ নিৎসের কাছ থেকেই আমরা জানি। জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের সাধারণ কান্ডজ্ঞানকে নিৎসে যেমন, তেমনি ফুকোও নড়বড়ে করে দিয়েছেন। জ্ঞান আমাদের জ্ঞানী করে এই অর্থে যে আমরা জ্ঞান অর্জন করে কিছু একটা করি, করতে পারি। জ্ঞানের চর্চা মানে শুধু জ্ঞানের পরিমণ্ডলে চর্চা নয়, তার ব্যবহারও বটে। কিন্তু মিশেল ফুকো তর্ক করলেন যে আসলে অন্যের ওপর ক্ষমতা বিস্তারের জন্যই জ্ঞান। অপরকে সংজ্ঞায়িত করা বা জানার উদ্দেশ্য হচ্ছে অপরের ওপর নজরদারি প্রতিষ্ঠা, অপরের চতুর্দিকে বেড়ি দিয়ে তাকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে বাঁধা– অন্যের ওপর ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।

এই দিক থেকে ওরিয়েন্টালিজমে এডওয়ার্ড সাঈদ নতুন কিছু বলছেন না। প্রাচ্যবিদ্যা কিভাবে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ার নজরদারি, ক্ষমতা তৈরি ও নিয়ন্ত্রণের কড়িবর্গা নির্মাণের সঙ্গে 'সমান্তরাল' সেটাই তিনি দেখিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে নিয়েছেন পাশ্চাত্যের চোখে আরব– বিশেষত ইসলাম কিভাবে লিখিত ও চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের নতুন চিন্তার এ ধারার সঙ্গে তার পার্থক্যও আমরা দেখি। যখন নিপীড়িত প্যালেস্টাইনি হিসেবে প্রাচ্য সম্পর্কে পশ্চিমের বয়ানের বিপরীতে তিনি পাল্টা বয়ান তৈরির প্রস্তাব করেন না, বরং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে লড়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তখন বোঝা যায় এডওয়ার্ড সাঈদ নতুন কথা বলছেন। পাশ্চাত্য বয়ানের অন্দর মহল উদাম করে দিয়ে তিনি প্রাচ্যকে তার রাজনৈতিক কর্তব্য মনে করিয়ে দিচ্ছেন। তার লেখা নিপীড়িত শ্রেণী ও জনগোষ্ঠীর পাল্টা প্রতিরোধ ও লড়াইয়ের শর্ত তৈরি করে।

আবারও একটি সাক্ষাৎকার থেকে টুকে নিচ্ছি। সরাসরি ইসলা প্রসঙ্গে। এডওয়ার্ড সাঈদ Orientalism-কে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

The sense of Islam as a threatening Other-with Muslims depicted as fanatical, violent, lustful, irrational- develops during the colonial period in what I called Orientalism. The study of the other has a lot to do with the control and dominance of Europe and the West generally in the Islamic world. And it has persisted because it's based very, very deeply in religious roots, where islam is seen as a kind of competitor of Christianity. If you look at the curricula of most universities and schools in the country, considering our long encounter with the Islamic world, there is very little there that you can get hold of that is really informative about Islam. If you look at the popular media, you'll see that the stereotype that begins with Rudolph Valentino in *The Sheik* has really remained and developed into the transnational villain of television and film and culture in general. It is very easy to make wild generalizations about Islam. All you have to do is read almost any issue of *The New Republic* and you'll see there the radical evil that's associated with Islam, the Arabs as having a depraved culture, and so forth. These are impossible generalizations to make in the United States about any other religious or ethnic group.

অপরকে, অন্যকে ঔপনিবেশিক শক্তি কি চোখে দেখেছে ইসলাম তার একটা উদাহরণ। একে ঔপনিবেশিক শক্তি বিপজ্জনক মনে করেছে। ইসলাম মাত্রই মৌলবাদী, সহিংস, নারীলিপ্সু, যুক্তিবর্জিত। এই দেখা, বর্ণনা এবং ইসলাম চর্চা ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীর

www.pathagar.com

ওপর নজরদারি, নিয়ন্ত্রণ, শাসন এবং প্রয়োজনে হামলা ও যুদ্ধ পরিচালনার প্রয়োজনেই। খ্রিস্টধর্ম ইসলামকে প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিযোগী হিসেবে দেখেছে– এই দেখা বর্ণনা এবং চর্চা কেন দীর্ঘস্থায়ী ও নিবিড় হল এটা তার একটা কারণ। আসলে ইসলাম কি, সেই সম্পর্কে খুব কমই খোঁজ-খবর পাশ্চাত্য রেখেছে ও রাখে। তাদের স্কুল-কলেজে যেসব পড়াশোনা হয় সেটা ইসলাম সম্পর্কে ভুল কিংবা বিকৃত বর্ণনা। আরব বা 'শেখ' পাশ্চাত্য গণমাধ্যমে ভিলেন হিসেবেই চিত্রিত হয়। মার্কিন পত্রিকা New Republic পড়লেই বোঝা যায় ইসলামকে তারা কি চোখে দেখে।

ওরিয়েন্টালিজম সম্পর্কে এডওয়ার্ড সাঈদের সম্পর্কে এই ভূমিকাটা দিলাম একবাল আহমদকে বোঝার সুবিধার জন্য। যাকে এডওয়ার্ড তার রাজনৈতিক গুরু বলছেন তার মধ্যে নিশ্চয়ই এই চিন্তার উপাদান রয়েছে। থাকারই তো কথা। এই চিন্তা একবালের মধ্যে কীভাবে রয়েছে ও কাজ করছে সেটা বোঝানোর জন্য একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

Modern imperialism needed a legitimising instrument to socialise people into its ethos, To do that it needed two things; a ghost and a mission. The British carried the white man's burden. That was the mission. The French carried *la mission civilisatrice,* the civilising mission. The America had manifest destiny and the mission of standing watch on the walls of world freedom, in John F. Kennedy's ringing phrase. Each of them and the black, the yellow and the red peril to fight against. There was a ghost and there was a mission. People bought it.

After the Cold War, western power was deprived both of the mission and the ghost. So the mission has appeared ans human rights. It's a very strange mission for a country which for nearly a hundred years has been supporting dictatorship in Latin America and throughout the world Chomsky and Herman wrote about this in the Washington Connection and the Third World Fascism.

In search of menace they have turned to Islam. It's the easiest, because it has a history.

একবাল বলছেন এই কালের সাম্রাজ্যবাদের দুটি জিনিসের দরকার : একটা হল ভূত আর নিজেদের ন্যায্য প্রমাণ করার জন্য একটা মিশন বা লক্ষ্য। কালো বা অন্যান্যর রঙের শাসিত জনগোষ্ঠীকে সভ্য করার জন্য– তাদের বর্বর অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়ার মিশনের কথা বলে ঔপনিবেশিক শাসন চলেছিল। ব্রিটিশদের কাছে এরা ছিল 'সাদা মানুষের বোঝা' বয়ে বেড়ানোর দায়, আর ফরাসিদের কাছে 'বর্বরদের সভ্য করার কর্তব্য'। মার্কিনিরা এটাকে বলেছে পদানত দেশগুলোকে নাকি 'মুক্তি' দিচ্ছে তারা। প্রত্যেকেই নানা ভূতও দেখেছে। কালো মানুষের ভূত, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ভূত কিংবা কমিউনিজমের ভূত।

স্নায়ুযুদ্ধের পর ভূত আবিষ্কার করা আর কোন একটা মিশনের কথা বলে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন জায়েজ করা কঠিন হয়ে গিয়েছে। এখন অতএব মিশন হয়েছে 'মানবাধিকার'– হিউম্যান রাইটস। মানবাধিকার রক্ষার নামে এখনকার সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়াজোড়া অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে। ভূত পাওয়া কঠিন হয়ে গেছে কিন্তু একটা ভয়ংকর দানব আবিষ্কার না করলে তো আর চলে না। সেখানে তারা দাঁড় করিয়েছে ইসলাম। ইসলামকে দানব বানানো সহজ। কারণ একবাল বলেছেন– 'ইসলামের একটা ইতিহাস আছে'।

ইসলামকে দানব বানানো সহজ, কারণ ইসলাম ঐতিহাসিক—এটা নিছকই গায়েবি ব্যাপার নয়। একবালের এ কথার ওপর নজর রেখে এই কিস্তি শেষ করছি।

একবাল আহমদ

'আমি একবাল আহমদকে জনগণের সেই বুদ্ধিজীবী হিসেবে জানি যিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও মানবাধিকার রক্ষার জন্য বহু সীমান্ত অতিক্রম করেছেন। একবাল হচ্ছেন এমন এক অকুতোভয় ভাবুক দুনিয়ার হালহকিকত সম্পর্কে যার বিশ্লেষণ জাতিসংঘের দৈনন্দিন কার্যক্রমে আমাকে অনেক বিষয় বুঝতে সহায়তা করেছে'— *কফি আনান, সেক্রেটারি জেনারেল, জাতিসংঘ। হ্যাম্পশায়ার কলেজে তৃতীয় বিশ্বে জ্ঞানের সংকট শিরোনামের বক্তৃতা থেকে।*

পাণ্ডিত্য চাই, পণ্ডিতিপনা নয়

একবাল আহমদ (১৯৩৩-১৯৯৯) তিরোধান করেছেন প্রায় পাঁচ বছর হতে চলেছে। অনেক দিন আগে ইসলামাবাদে ১৯৯৯ সালের ১১ তারিখে তিনি যখন ইন্তেকাল করলেন তখন তার তিরোধানের খবর বাংলাদেশের গণমাধ্যমে আমরা দেখিনি। তাকে নিয়ে কোন আলোচনাও হয়েছে বলে চোখে পড়ে না। এডওয়ার্ড সাঈদ তিরোধান করার পর তার সম্পর্কে অবশ্য খবর হয়েছে। এডওয়ার্ড সাঈদকে ঘিরে বাংলাদেশে কিছু আলোড়ন, কিছু সংবেদনা আছে। ওর মধ্যে পাশ্চাত্যের একজন বুদ্ধিজীবীর প্রতি অরাজনৈতিক পণ্ডিতিপনাও আছে। তাতে মহাদোষ কিছু নেই। যদিও ওর ফলে সাঈদের *ওরিয়েন্টালিজম* বইটিকে নিছক কেতাব কিংবা কালচারাল স্টাডিজে সংকীর্ণ করে ফেলার ভয় থেকে যায়। এই বিপদ তো ঘটেই। আরও ভয় যে ওতে প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগ্রাম অর্থাৎ এইকালে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের কংক্রিট বিষয়গুলো বোঝার ও কর্তব্য স্থির করার জায়গা থেকে পিছলে যাওয়ার উদ্বেগ বাড়ে। 'ইসলাম' নামক ডাকনামে নানাবিধ ও বিচিত্র যেসব বিষয় নিয়ে লেখাজোখা, লড়াই-রক্তপাত যুদ্ধবিগ্রহ, উত্থান-পতন চলছে পণ্ডিতি করতে গিয়ে এডওয়ার্ডের জায়গা যেন আমরা আবার ধোঁয়াশা না করে ফেলি। পণ্ডিতি বলেছি, পণ্ডিত্য বলিনি। পাণ্ডিত্য দরকার, পণ্ডিতিপনা বাদ দিতে বলেছি।

একদিকে একাডেমিক পণ্ডিতিপনা ও মসৃণ কালচারাল স্টাডিজ মার্কা ওরিয়েন্টালিজম আর অন্যদিকে বিধ্বংসী সাম্রাজ্যবাদ মোকাবেলায় কর্তব্য— এই দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এডওয়ার্ড সাঈদ সম্পর্কে আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা যখন আলোচনার উদ্যোগ নিচ্ছিল তখন মনে হল একই সঙ্গে একবাল আহমদকেও সমান মাত্রায় আমাদের স্মরণ করা দরকার। একবালকে এডওয়ার্ডের পাশাপাশি না জানলে ও না পাঠ করলে আমাদেরই ক্ষতি। এডওয়ার্ড নিজে একবালকে তার রাজনৈতিক গুরু বলতেন। সেটা একটা কারণ। তাছাড়া দু'জনেরই রাজনৈতিক মতলবে যে মিল আছে বাংলাদেশে বসে তার মর্ম বোঝা আমাদের জন্য খুবই জরুরি। এই লেখাটি সেই প্রেরণায় শুরু করা একটি লেখার দ্বিতীয় কিস্তি। প্রথম কিস্তি 'একবাল আহমদ, এডওয়ার্ড সাঈদ ও ইসলাম' নামে ছাপা হয়েছিল *যুগান্তর*'র সাহিত্য সাময়িকীতে ১২ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে। বাংলাদেশে বসে দু'জনের মর্ম বোঝার কথা বলছি। ভিন্ন জায়গায় এবং ভিন্ন সময়ে একই পাঠ ভিন্ন

www.pathagar.com

অর্থ প্রদান করে। করতে পারে। এই দু'জনকে বাংলাদেশে একসঙ্গে পাঠ করা সবচেয়ে লাভজনক বলে আমার ধারনা।

আমি যখন একবাল সম্পর্কে লিখছি তখন ইসলামাবাদে দ্বাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন চলছে। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা যেন স্তিমিত। বাজপেয়ী আর পারভেজ মোশাররফ পরস্পরের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলছেন সেখানে স্বরবর্ণ কমছে, ব্যঞ্জনবর্ণ বাড়ছে। গলা নমনীয়। পাকিস্তান আর ভারতের মধ্যে নতুন সম্পর্কের সম্ভাবনা নিয়ে খবর বেরুচ্ছে। নতুন বিশ্লেষণ লিখছেন পণ্ডিতরা। একবাল ইসলামবাদে থাকার সময় জীবনের শেষ পাঁচটি বছর উপমহাদেশে পারমাণবিক প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধের উন্মাদনার বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। সাতচল্লিশের পাক ভারত বিভক্তি দুই দেশের মধ্যে হিংসার যে দগদগে ক্ষত তৈরি করেছে এবং তার জের ধরে যে রাজনীতি– তাকে নতুন করে মোকাবেলা করছিলেন একবাল। দক্ষিণ এশিয়ায় পুঁজিতান্ত্রিক গোলোকায়ন ও শ্রেণী পরিগঠনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে হিন্দুত্বের আর মুসলমান রাজনীতির চরিত্র আগের মতো নেই। তাকে নতুন করে বোঝারও তাগিদ ছিল তার।

কিন্তু সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে রাজনীতির যে নতুন ব্যঞ্জনবর্ণ আমরা শুনছি তার পেছনে একবালের ইচ্ছা কাজ করছে না। দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন, ইসরাইল ও ভারতীয় নতুন অক্ষশক্তির রাজনীতি এখন ক্রিয়াশীল। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সারিবদ্ধতার চাপে দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন-ইসরাইলি-ভারতীয় নীতির অধীনে এই অঞ্চলের শাসক শ্রেণীর মধ্যে নতুন বোঝাপড়া চলছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দরকারে একবাল চেয়েছিলেন দক্ষিণ এশিয়ায় জনগণের মধ্যে ঐক্য, ভবিষ্যতের কর্তব্য মনে রেখে অতীতের বিচার– গণবিচ্ছিন্ন সন্ত্রাস ও সহিংসতার রাজনীতির বিপরীতে দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গতিপরায়ণ কৌশল। সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সেটা নয়, ঘটছে বিপরীত ঘটনা। ঘটছে দক্ষিণ এশিয়ায় জনগণের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির শক্ত আঁতাত- যার অধীনতা মেনেছেন পারভেজ মোশাররফ ও খালেদা জিয়াও। সে জন্যই বলি, একবাল সম্পর্কে যখন লিখছি তখন সার্ক শীর্ষ সম্মেলন বেশ অর্থপূর্ণও বটে।

বিহার ও একবাল

একবালের জন্ম বিহারে। তখন ভারতে স্বদেশী আন্দোলন চলছে। একবাল এবং তার ভাইয়েরা পাকিস্তানে চলে গেলেন ১৯৪৭ সালে। তখন একবালের বয়স মাত্র ১৪ বছর। তার এই পাকিস্তান যাত্রার অভিজ্ঞতা বিবিসির একটি ডকুমেন্টারিতে বলা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানের নাম ছিল "Stories My Countries Told Me"। শুধু একবাল নন, আরও যারা এই অনুষ্ঠানে নিজেদের কাহিনী বলেছিলেন তারা হলেন এডওয়ার্ড সাঈদ, ই.জে হবসবম (E.J. Hobsbawm), ডেসমন্ড টুটু (Desmond Tutu), ম্যাক্সিন হংগ কিংসটন (Maxine Hong Kingston)। এই অনুষ্ঠানের মধ্যেও একবাল তার চিন্তা আর রাজনীতিরও একটা জানান দিলেন। তিনি দেশ হিসাবে একই সঙ্গে দাবি করলেন তার গ্রাম ইকরি আর ভারতীয় উপমহাদেশকে। যে দেশ ঔপনিবেশিক ইংরেজ ভাগ করেছে সেটাও তার দেশ নয়, যে দেশ 'অখণ্ড ভারত' ওয়ালারা চাইছে সেই দেশও তার নয়।

www.pathagar.com

কারণ ভারত এক জাতির দেশ নয়। বহুজাতির, বহু ধর্মের, বহু সম্প্রদায়ের, বহু ইতিহাসের- আর সেই অনেকের মধ্যে বিহারে একবালের গ্রাম ইকরি- সেটাও তার দেশ। দেশ পরিচয়ের মধ্যে এক আর অনেক-বিশেষ আর সামান্যের মধ্যে পার্থক্য ও ঐক্য মনে রাখার এই দৃষ্টান্ত ছিল অসাধারণ। দেশের কথা বললে আমরা বিমূর্ত 'অনেক'কে নিয়ে যে সাধারণীকরণ করি তার মধ্যে আমাদের নিজের বৈশিষ্ট্য যেমন হারিয়ে ফেলি, অন্যদিকে শুধু নিজের বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দিতে গিয়ে অনেকের বিপরীতে গিয়ে দাঁড়াই। সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠি। তারপর দেশ ও জাতি পরিচয়ের মধ্যে সত্যের চেয়েও কল্পনাই যে অধিপতি সে তর্ক তো আছেই।

আশ্চর্য যে বিহারি হিসাবে একবালের এক মধুর গর্ব ছিল। নিউইয়র্কে আমি তাকে খুবই কাছে থেকে দেখেছি। নিজের দেশ খুবই গরিব, গোঁড়া এমনকি বিপজ্জনক- এটা বলতে তার কোন জড়তা ছিল না। কিন্তু তবু এই গরিব বিহারের জন্য তার সব মনপ্রাণ পড়ে রয়েছে। বিহারের ধর্ম নির্বিশেষে সবাই যেন তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী- সেই সম্পর্কের সুতা ছিল টনটনে। এটা সত্যি বিহার একবালের অনুপ্রেরণা ছিল। দারিদ্র্য, গোঁড়ামি আর সাম্প্রদায়িক সহিংসতার মধ্যে একবাল কীভাবে এত অমায়িক আর মধুর ছিলেন সেটা ভেবে তার বন্ধুবান্ধবরা অবাক হত। বিহার আর বিহারি সম্পর্কে বাঙালি হিসাবে যে সব সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার বাঙালিদের মধ্যে কাজ করত নিউইয়র্কে যারা একবাল আহমদের সঙ্গ পেয়েছেন তাদের সেই সব আবর্জনা ধুয়ে যেতে বেশি সময় লাগত না।

বিহারের দারিদ্র্য আর কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা আর সহিংসতা নিয়ে কথা উঠলে একবাল মনে করিয়ে দিতে ভুলতেন না যে এই বিহারেই বিকশিত হয়েছে দুটো মধুর ভাষা : মৈথিলি আর ভোজপুরি। এখানেই নকশালবাড়ির মতো সহিংস ও ভূদানের মতো অহিংস কৃষক আন্দোলন হয়েছে, বিহারের চামপারাণ থেকেই গান্ধী অহিংস আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। প্রাচীন ভারতে বিহারের রাজধানী পাটনা (তৎকালীন পাটলীপুত্র) ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের জ্ঞানীদের আড্ডা, আবার বৌদ্ধ মন্দির সারনাথ উত্তর প্রদেশের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত।

একবালের বাবা-দাদারা ছিলেন বিহারের জমিদার, কিন্তু তার পরিবার বিহারে জ্ঞান ও শিক্ষার কর্ণধারও ছিলেন। তার দাদাই পাটনায় খুদাবক্স লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই লাইব্রেরিতে এখনো মধ্যযুগের ফারসি ভাষার পাণ্ডুলিপির সবচেয়ে মূল্যবান সংগ্রহ রয়েছে। তার দাদা ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তার মা-বাবাও গান্ধীর অনুসারী ছিলেন। পারিবারিক ইতিহাস হিসাবে যেটা উল্লেখযোগ্য সেটা হল তার বাবা বিহারের প্রথম জমিদার ছিলেন। যিনি তার জমিজমা কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন। এর জন্যই তার আত্মীয়রা একবালের বাবাকে হত্যা করেছিল। তখন একবাল বালক। তার বাবা যখন খুন হয় একবাল তার বাবার পাশেই। একবালকে বাঁচাতে গিয়েই বাবার মৃত্যু হয়েছিল। বাবার হত্যাকাণ্ডে একবাল খুবই মুষড়ে পড়েছিলেন বলে মা তাকে তার বড় ভাই সগীর আহমদের কাছে পাঠান। ভাইয়ের কাছে এসে একবালের মন শান্ত হয়নি, বরং ভেতরের দুঃখ তাকে একাকী আরো বয়ে বেড়াতে হয়েছে।

একবালের নিজের কথায় জীবনে মায়ের চেয়ে বড় ভাইয়ের প্রভাব তার ওপর অনেক

www.pathagar.com

বেশি। বড় ভাই একজন সরকারি চাকুরে ছিলেন। তার কাছে একবাল একজন সরকারি চাকুরের নম্র আচরণ শিখেছিলেন। মায়ের কাছে শিখেছেন নীতি এবং পরিবারের প্রতি দায়িত্ব। কিন্তু একবাল মায়ের ওপর একটু গোস্বাও ছিলেন। খুব কম বয়সে গান্ধীর কাছে তার মা একবালকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন একবার। তার ওপর এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল নিশ্চয়ই কিন্তু অন্যদিকে গান্ধীর রাজনীতির তিনি সমালোচকও হয়ে উঠেছিলেন পরে।

সাতচল্লিশের দেশভাগ ও দাঙ্গা

তার এই কৈশোর ও পারিবারিক ইতিহাস খুব গুরুত্বপূর্ণ। বালক একবাল ইসলাম এবং উপমহাদেশের সনাতন ও লোকায়ত ধর্মের মধ্যে সমন্বয়, সংমিশ্রণ ও পার্থক্যের মাধুর্য দেখে বড়ো হয়েছেন। ভাইকে দেখেছেন উপনিবেশিক শাসকদের চাকুরিতে। এর মধ্যে একটা নিরাপদ জীবনের স্বাদও ছিল। তাই ১৯৪৬ সালে বিহারে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ছিল তার জন্য মারাত্মক আঘাত। এমনই অবস্থা যে তার ভাই এবং তাকে পাকিস্তানের উদ্দেশে দেশ ছাড়তে হয়। কিন্তু একবালের মা যেতে অস্বীকারই শুধু করেননি, তিনি তার ছেলেদের মুসলিম জায়োনিস্ট বলে তিরস্কারও করেছিলেন।

দাঙ্গার ভয়াবহতা, দেশান্তরী হওয়া এবং দেশত্যাগের মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল বালক একবালের তা খানিক বয়ান না করলে একবাল মানুষটিকে চেনা যাবে না। এই কাহিনী একবাল বলতে পছন্দ করতেন। সাতচল্লিশ সাল। একবালের বয়েস তেরো। এই সেই বয়েস ছেলেদের– যখন তাদের গলা ভাঙে। আর সেই বয়স যখন একবার একবালের গলা হঠাৎ পুরুষালি হয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ আবার কিশোরের মতো মেয়েলি– নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে ভেতরে ভেতরে একটা পুরুষালি দৃঢ়তা– সেই বয়সের ও সময়ের ঘটনা। দেশবিভাগ। দাঙ্গা আর একটি কিশোরকে ইতিহাস কী করে তৈরি করছে তার কাহিনী।

একবালের বড় ভাই সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি পাকিস্তান যাবেন। একবাল আর তার ভাই সগীরের সঙ্গে তার মা একমত হলেন না। তিনি বিহারের ইকরি গ্রাম ছাড়লেন না। দুই ভাই পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে লাহোর যাওয়ার জন্য ট্রেনে চড়লেন। ট্রেন দিল্লি অবধি এলো। জানানো হল এরপর আর যাবে না। তখন দুই দিকেই লক্ষ লক্ষ লোক দাঙ্গা, হত্যা, আর সহিংসতার মধ্যে সীমান্ত অতিক্রম করছে। ট্রেনের সব মানুষকে আরও অনেকের সঙ্গে রিফিউজি ক্যাম্পে রাখা হল। দুর্দশার আর অবধি ছিল না। ওই দেশত্যাগী মানুষগুলোর দুর্দশার মধ্যে একবালের নজরে পড়ল এক আফিমখোর হাঁপানি রোগীর। কিন্তু সবাই তাকে চরসসেবক বলে চরসী চরসী বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে। কিন্তু লোকটির প্রতি একবালের চোখ লাগল ঠিকই।

একবালের বড় ভাই ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরে। তিনি রাওয়ালপিন্ডি টেলিফোন করলেন। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের নেয়ার জন্য দিল্লি থেকে প্লেন এলো। প্লেন আসার সঙ্গে সঙ্গে প্লেন ভর্তি হয়ে গেল দ্রুত। রয়াল এয়ার ফোর্সের পুরনো ফকার প্লেন। পাইলট একবালের ভাইকে ডেকে বলল, আপনি কর্কপিটে বসে যেতে পারবেন স্যার, আসুন।

একবালের ভাই বললেন আমি তো একা নই, আমার সঙ্গে আমার ছোট ভাই আছে। পাইলট বলল, তাহলে কি কাউকে নেমে যেতে বলব?
না, আপনি একবালকেই নিয়ে যান– ভাই বললেন।
কিন্তু একবাল ততক্ষণে যাবে না বলে গোঁ ধরেছে। না, আমি কিছুতেই যাচ্ছি না। প্লেনের টারমাক থেকে একবাল দৌড়ে চলে গেল দূরে। কিছুতেই তাকে কেউ রাজি করতে পারল না।
আমি আর সবার সঙ্গে হেঁটে যাব– একবালের সিদ্ধান্ত। অনড় রইল বালক একবাল। ঠিকই কেউই তাকে আর রাজি করাতে পারল না।
বাধ্য হয়ে একবালের ভাই একবালকে বলল যখন তুমি যাবেই না তাহলে এই নাও একশ' টাকা আর এই নাও পয়েন্ট টুয়েন্টি টু ক্যালিবারের পুরনো একনলা শিকারি বন্দুক। সঙ্গে কার্তুজ আর কার্তুজ রাখার জন্য বেল্ট।
একবাল প্রথমে একটি রেস্তোরাঁয় গেলেন। এক মস্ত অর্ডার দিয়ে খেলেন। বিল এলো দশ টাকা। তারপর বড় রাস্তা ধরে পুরনো দিল্লির মিনার দেখে হাঁটা শুরু করলেন। মুসলমান রিফিউজি ক্যাম্প সেদিকে। তখন দাঙ্গা চলছে। কিন্তু বড় রাস্তায় তার কাঁধে বন্দুক থাকার বালখিল্য সাহস তাকে অভয় দিচ্ছিল। নিরাপদেই পৌঁছে গেলেন।
তার পরদিন দেশত্যাগী দাঙ্গা বিধ্বস্ত জনগোষ্ঠী এক বিরাট পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে তিনি যোগ দিলেন। কয়েকশ' মাইল হেঁটে এরা লাহোর যাবে। তার পরদিন তারা হাঁটছেন। একবালের পেছনে এক মধ্যবয়সী ব্যবসায়ী তার সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই বয়সের ছেলেদের অস্ত্র বহন করা উচিত নয়। তার সঙ্গী উত্তর করলেন,বন্দুকবাহক হতে দোষ কি, অন্তত আমাদের তো বহন করতে হচ্ছে না। জনস্রোত ক্রমে সমতলে গিয়ে পড়ল। বুড়ো আর কমজোররা যাত্রার গতি থিতিয়ে দিচ্ছিল। কারণ কাউকে যদি ফেলে যাওয়া হয় তাহলে একা তার আর বাঁচার ভরসা ছিল না।
তৃতীয় দিনে দলের ওপর হামলা হল। একবালই প্রথম দেখলেন পানির সেচ দেয়া জমি ডিঙিয়ে সশস্ত্র দাঙ্গাবাজরা তাদের দিকে ছুটে আসছে। একবাল মাটিতে শুয়ে পড়লেন, বিহারে তাদের জমিদারিতে হরিণ শিকার তিনি দেখেছেন। উত্তেজিত হওয়া যাবে না। ঠাণ্ডা থাকতে হবে। বন্দুক তাক করে অপেক্ষা করে রইলেন। আর ঠিকই তার গুলিতে তিনি চারজন দাঙ্গাবাজ ভূপাতিত করলেন। এরপর থেকে দলের মধ্যে যারা তার বন্দুক বহনের বিরোধী ছিলেন তারা আর উচ্চবাচ্য করলেন না। একবাল শুধু বন্দুক বহন করার সম্মতি পেলেন না এমনকি তা চালানোর অনুমতিও পেলেন। তিনি দলের রক্ষাকারী হয়ে উঠলেন।
আর সেই আফিমসেবী চরসী, সেও আছে দলে। হাতে লাঠি। আফিম নেই ফলে হাঁটতে গিয়ে সে আর তেমন কুঁজো হয়ে যাচ্ছিল না। মেরুদণ্ড অনেক সিধা। আর সবেমাত্র গলার স্বর ভেঙেছে যে বালকের এত দুঃখ, দুর্দশা আর মৃত্যুর মঝখানে দাঁড়িয়ে থাকার পরও তার চোখে পড়ে যাচ্ছিল দলের কিশোরী আর তরুণী মেয়েদের। ওদের মধ্যে তার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল যাকে তার কোর্তায় খচিত ছিল ছোট ছোট সাদা ফুল তোলা তারা। দল যখন কোথাও থামত একবাল সাদা ফুল তোলা তারার আশপাশে ঘুর ঘুর করত। কিন্তু শরম ছিল তার প্রবল,কথা বলার সাহস হয়নি।

www.pathagar.com

একদিন দল দুপুরে খাবার জন্য থেমেছে। এমন সময় একবাল দেখলেন ফুল তোলা তারার কুর্তা দল থেকে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে খানিক দূরে আমের বাগানের দিকে। আর ঠিক তার পেছন পেছন আর একটি লোক উঠল। মেয়েটিকে অনুসরণ করছে লোকটি। একবালও আস্তে উঠলেন। সাবধানে। যেন ওরা দু'জন তাকে দেখতে না পায় সেইভাবে অনুসরণ করতে থাকলেন একবাল। এমন সময় একবাল দেখলেন লোকটি মেয়েটির ঘাগরা মেয়েটিরই মাথার ওপর তুলে দিয়েছে, আর মেয়েটি ধস্তাধস্তি করছে। লোকটির হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার চেষ্টা। একবালের চোয়াল কঠোর হয়ে উঠল। বন্দুক উঠে এল হাতে। বন্দুকের নিশানাও ঠিক হয়ে গেল।

গুড়ুম।

'খুন', 'খুন' বলে মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল। বন্দুকের আওয়াজ আর মেয়েটির চিৎকারে দলের লোকজন দৌড়ে এলো। মাঠের ওপর দিয়ে একবাল দৌড়াতে লাগলেন। কিন্তু একসময় দেখলেন সামনে পাথরের দেয়াল আর পেছন ফিরতেই দেখলেন মারমুখো মানুষগুলো ধেয়ে আসছে তার দিকে।

ক্ষিপ্ত জনতার দিকে বন্দুক তাক করে একবাল বললেন, 'খামোশ, আর যদি এক পা আগাও তাহলে এই বন্দুকের গুলি মেরে খুলি উড়িয়ে দেব।' তার পা কয়েক সেকেন্ড কাঁপছিল। ভূমিকম্পে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তের সর্ববিদিত সন্ত্রস্ত প্রাণীকূলের মতো।

আর তখনই হঠাৎ উদিত হল চরসী। লাঠির ওপর তার শরীর আর ভর করে নেই। লাঠিও নেই। ক্ষিপ্ত মানুষ আর বন্দুক তাক করে রাখা বালকের মাঝখানে দাঁড়াল আফিমখোর। তার হাঁপানিও নেই।

'থামো সবাই। রুখো।' চরসীর বাজখাই গলা। হৈ হল্লা চিৎকার থামল। 'তোমরা একজন আরেকজনকে এভাবে মেরে ফেলতে পার না। কেন আজ আমাদের এই দুর্দশা? কেন হাঁটছি আমরা? কোথায় যাচ্ছি? কেন আমরা পালাচ্ছি? কারণ দুনিয়ায় ন্যায়বিচার বলে কিছু নেই এবং সবল সবসময়ই দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে। এই ছেলেটির বিচার হবে। বিচার করতে হবে। যদি সে দোষী সাব্যস্ত হয় তখন তোমরা তার শাস্তি দাও।'

এরপর চরসী একবালের দিকে তাকাল। বলল, 'দাও দেখি তোমার বন্দুক। আমাদের হাঁটা বন্ধ করা যাবে না। তুমি দুই জন মানুষের মাঝখানে বন্দি হিসেবে হাটবে। চলো।'

সেদিন রাতে আগুন জ্বালিয়ে আগুনের চারপাশে দলের বিচার বসল। সবাই চরসীকে বিচারক মেনে নিল। চরসী সব পক্ষের কথা শুনে রায় দেবে। একবালের দিকে তাকিয়ে চরসী বলল, 'তোমার কিছু বলার থাকলে তুমি বলো'।

একবাল কিছু বলার আগেই মেয়েটির বাপ সামনে এগিয়ে এল। আগুনের আলোয় তার মুখ স্পষ্ট। 'আমার মেয়ে আমার কাছে স্বীকার করেছে যে লোকটি ওকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করছিল।' চতুর্দিকে হঠাৎ নৈঃশব্দ। আর ওরই মধ্যে খানিক-বদলায়-খানিক-ঠিক-থাকে সেই প্রকার বিচিত্র সন্ধিক্ষণের গলার স্বরে একবালঃ 'হ্যাঁ। এটাই। এই হল সত্য। এই আমার কথা।'

কিছুদিন পর একবাল সাহস করে চরসীকে তার আসল নাম জিজ্ঞাসা করল। 'আমার নাম মুসা', চরসী বলল। নবীর নামে নাম। ধর্মকে প্রথম যিনি আল্লার আইন হিসেবে

www.pathagar.com

জারি করেন তার নাম মুসা। একবাল আর মুসা দ্রুত পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠলেন। দিন যত যাচ্ছিল, মুসা দলের স্বাভাবিক নেতা হয়ে উঠছিল। মুসাই ঠিক করত কোন পথদিয়ে দল যাবে, কারা কারা কিভাবে পাহারা দেবে। ঝগড়া-ফ্যাসাদের মীমাংসাও করে দিত মুসা। কারাভি যখন দিল্লি ত্যাগ করছিলেন তখন দলের লোকসংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। কিছুদিনের মধ্যেই দলের সংখ্যা অর্ধেকে গিয়ে দাঁড়ায়। কলেরায় মরল বহু। মুসা দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করল। সুস্থদের অসুস্থদের কাছ থেকে আলাদা রাখার যথাসাধ্য বুদ্ধিমত্তা ও ব্যবস্থাপনাও তার। সহজ কাজ ছিল না। সবাইকে ঠিক রাখা। মাথা স্থির রেখে কাজ করা। উত্তেজিত না হওয়া। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ সংকট, ঝগড়া-ফ্যাসাদগুলো মেটানো ইত্যাদি।

মুসা যখনই কারও সঙ্গে কথা বলত– এমনকি কারও পাশ দিয়ে হেঁটে যেত যেন একটা সাহস হাঁটছে। একটা আশা। একটা ভরসা। ওর ব্যক্তিত্বের মধ্যেই এই মাধুর্য ছিল। কিন্তু রাতে একবালকে মুসা আশার কথা শোনাতে পারত না। 'আমরা ভবিষ্যতের যে খোয়াব দেখছি সেটা মিথ্যা হবে। যে কয়জন বাঁচি আর সীমান্তের ওপারে পৌঁছাই জীবন আমাদের জন্য মধুর নয়। বদমাইশ রাজনীতিবিদরা ইতিমধ্যেই শয়তানির দোকান সাজিয়ে বসেছে। আমাদের বন্ধু বা ভাই হিসেবে তারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করে নেই। আমরা সীমান্তে পৌঁছালেই ওরা আমাদের ব্যবহার করবে।'

সদ্য বিভক্ত হওয়া সীমান্তে যখন মানুষগুলো পৌঁছাল মেয়েরা চাদর মোড়ালো মাথায়। একবাল শেষবারের মতো ফুল তোলা তারার দিকে তাকালেন। একবারও তিনি এই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলেননি। নক্ষত্র খচিত কোর্তার ছবি আর স্বপ্নের একটি সাদা তারার বুকে তার চিবুক ঘষার আনন্দ ছাড়া ব্যক্তিগত স্মৃতি আর কিছুই নেই। তিরিশ হাজার মানুষ নিয়ে এই কাফেলা শুরু হয়েছিল দিল্লিতে। লাহোর সীমান্তে এসে যখন পৌঁছল তখন তা এসে ঠেকল আট হাজারে।

মুসা বলল একবালকে, 'তোমার জন্য এই যাত্রা শেষ হল। ট্যাক্সি আসবে তোমার জন্য। তুমি ট্যাক্সি করে বাড়ি যাবে। বিদায়...'

সীমান্তে একবাল তার মায়ের লেখা চিঠি পেল। মা লিখেছেন, 'বাবা একবাল, এই জিন্দেগি মসৃণ কাফেলা নয়। অনেক সময় বাধ্য হয়ে মানুষকে গু-মুতও খেতে হয়। খাবে, যদি বাধ্য হও। কিন্তু খাবার পরে সব সাফসুতরো নিজেই করবে, যেমন করে তোমাকে আমি মানুষের বাচ্চা হয়ে উঠবার জন্য আদবকায়দা শিখিয়েছি। জিন্দেগির কাফেলায় জমে ওঠা ময়লা-আবর্জনা সাফ করার আত্মমর্যাদাও যেন তোমার থাকে... ।'

ইতিমধ্যে সাত মাস পার হয়ে গিয়েছে। একদিন রাতে লাহোরে একটি রেস্তোরাঁ থেকে একবাল বেরিয়েছেন। রাস্তার ওপর জড়োসড়ো এক বস্তার ওপর হোঁচট খেয়ে পড়লেন। আসলে গুটলি পাকানো কেউ বসে ছিল। একবাল থামলেন। কাছে মুখ নিয়ে দেখলেন, মানুষটিকে তিনি চেনেন। চরসী। যার সঙ্গে দীর্ঘ পথ দিল্লি থেকে লাহোর পর্যন্ত তিনি হেঁটে এসেছেন। বস্তার মতো গুটলি পাকানো মানুষটিকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। কিন্তু চরসী তাকে আর চিনতে পারছে না।

একবাল তাকে ঝাকুনি দিয়ে সম্বিত ফেরাতে চেষ্টা করলেন। না চরসীর কোন হুঁশ নেই। আফিমের নিরাপত্তা আর বাস্তবের সহিংসতার মাঝখানে কোন ফাঁক ছিল না চরসীর যে

www.pathagar.com

সে বেরিয়ে এসে একবালের ডাকে সাড়া দেবে। চরসী চিনল না একবালকে, একবাল নাম ধরে ডাক দিলেন, মুসা, মুসা। হিংসায় বিভক্ত উপমহাদেশের সর্বত্র সেই ডাক পৌঁছে গেল। কিন্তু লাহোরের অন্ধকার রাস্তায় পড়ে থাকা আফিমের গুটলির পাথর থেকে কোন প্রতিধ্বনি বেরুল না। আবারও একবাল ডাকলেন, মুসা। অ্যাই মুসা, আমি একবাল। কোন আওয়াজ নেই। ঝাঁকাতে লাগলেন মুসাকে একবাল। ঝাঁকাতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে দু'জনেই পুটুলি হয়ে রাস্তায় পাশে গড়িয়ে পড়লেন।

ক্রোধে, গোস্বায়, মানুষের জীবনের এই অপচয়ে একবাল কেঁদে ফেললেন। সেই আধা ভাঙা গলা– কখনও পুরুষালি আর কখনও মেয়েলি– বয়ঃসন্ধিক্ষণে যে কণ্ঠস্বরের ওপর বালকদের আর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সেই গলায় কান্নামেশা গলায় একবাল আবার ডাকলেন, 'মুসা, আমি একবাল...'। মুসা সেই গলাটিও চিনল না।

শেষাবধি একবাল উঠে দাঁড়ালেন। কিছুই করার ছিল না তার। ফিরে গেলেন নিজের ডেরায়। দরজা বন্ধ করে কাঁদলেন তিন দিন। কারও সঙ্গে দেখা করলেন না। একাই। আর সেই সময়– যে সময়ে মানুষ তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়,সেই সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বদলে দেবেন এই বাস্তবতা, হিংসা আর অপচয়ের এই সময় অতিক্রম করবেন তিনি। জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে বিপ্লবী রাজনীতিতে অঙ্গীকারবদ্ধ করল।

দাঙ্গাবিধ্বস্ত ভারত থেকে কিশোর একবাল কীভাবে মোহাজেরদের সঙ্গে সীমান্ত পাড়ি দিয়েছিলেন এই ঘটনা আমি বিস্তারিত লিখলাম কারণ একবালের এই কাহিনী আমার নিজের খুব প্রিয়। তার বন্ধুদের অনেকেই তার মুখে এই গল্প শুনেছে। তার বন্ধু জন বার্জার দেখেছি এই গল্প সম্পর্কে লিখেছেন (Two Recumbant Male Figures Wrestling on a Sidewalk, A Story by John Berger)। একবালের কর্মকাণ্ড এবং চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে মানুষটি কি অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে বড় হয়েছেন সেটা জানার দরকার আছে। প্যালেস্টাইনের ইতিহাসের ভেতর থেকে যেমন এডওয়ার্ড সাঈদকে পাঠ সঙ্গত, ঠিক তেমনি একবালকে বুঝতে হবে এই উপমহাদেশের ইতিহাসের ভেতর থেকে। বিভিন্ন একাডেকি, বুদ্ধিজীবী বা বিমূর্ত বিপ্লবী হিসেবে নয়।

একবাল মারা যাওয়ার পর এডওয়ার্ড সাঈদ আল আহরাম সাপ্তাহিকীতে তার অসাধারণ জীবন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে শুরু করেছেন এই বাক্য দিয়ে : 'একবাল আহমদ হচ্ছেন গত ৩৫ বছরের মধ্যে আসা সবচেয়ে মেধাবী এবং অসাধারণ রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও সক্রিয় কর্মী' (নম্বর ৪২৮/১৩-১৯ মে ১৯৯৯)। তারপর লিখছেন, 'তার জীবনে দেশ ভাগের আগের ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং দেশ বিভাগের দাগ লেগে ছিল। বিহারে জন্ম, তিনি ও তার আত্মীয়স্বজন দেশ ছেড়ে পাকিস্তানে পাড়ি জমালেন ১৯৪৮ সালে। তার আগে তার বাবা জমি নিয়ে বাদবিস সংবাদে খুন হলেন, আর একবাল শিয়রে বসে বাবার মৃত মুখ দেখলেন। মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। এ ঘটনাটির কথা একবাল প্রায়ই ধনসম্পত্তির মালিকানার বিরুদ্ধে বলবার ছুতা হিসেবে বলতেন, যেসব জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা নফস থেকে সাফ করতে সক্ষম হয়েছে একবালের মতো এমন কাউকে জীবনে দেখিনি।'

'লাহোরে একবাল ফোরম্যান ক্রিশ্চিয়ান কলেজে পড়েছেন। কিছু সময়ের জন্য আর্মি অফিসার হয়েছিলেন। তারপর পঞ্চাশের মাঝামাঝি সময়ে ক্যালিফোর্নিয়ার American History at

Occidental College–এ রোটারি ফেলো হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এলেন। সেখান থেকে তিনি গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট হিসেবে প্রক্টর ফেলোশিপ নিয়ে ১৯৫৮ সালে গেলেন প্রিন্সটনে পড়তে। ফিলিপ হিট্টির অধীনে ডবল মেজর নিয়ে পড়লেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত বিষয়ে (Middle Eastern Studies)। প্রিন্সটনে তার পড়াশোনার সময়– পিএইচডি করেছেন ১৯৬৫ সালে– একবাল আলজেরিয়া চলে গেলেন। সেখানে FLN-এর বিরুদ্ধে আলজিরীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে লড়লেন, ফ্রানৎজ ফ্যাননের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন আলজিরিয়ায়। ফ্রান্সে গ্রেফতার হলেন। তিউনিসে গিয়ে খুলে বসলেন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, প্রথমবারের মতো মরক্কো ঘুরে বেড়ালেন। সেই দেশের সামনের সারির বুদ্ধিজীবীরা এখনও তাকে স্মরণ করে।' 'ষাটের দিকে তিনি কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর পড়িয়েছিলেন। শিকাগোতেও। কিন্তু চিরাচরিত বুদ্ধিজীবী ছিলেন না তিনি। যুদ্ধবিরোধী ওয়াশিংটন ইন্সটিটিউট অব পলিসি স্টাডিজের প্রথম ফেলো হিসেবে যোগদান করলেন। শুরুর দিকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধীদের একজন একবাল। সত্তর সালের দিক বেরিগান ভাইদের সঙ্গে হেনরি কিসিঞ্জারকে কিডন্যাপ করার এক সাজানো দায়ে অভিযুক্ত হয়ে খবর হলেন'।

শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের জন্য একবাল মার্কিন একাডেমিক পরিমণ্ডলে যথাযোগ্য স্বীকৃতি পাননি। এডওয়ার্ড সাঈদ বললেন : His defense cost him dearly, even though he and his alleged co-conspirators were acquitted of all charges in the spring of 1972. In addition to his out-spoken support of unpopular causes (especially Palestinian rights), his uncompromising politics kept him an itinerant,unerured professor at various universities until 1982 when Hampshire College, a small institution in Massachusettes, made him a professor, he taught there until he became emeritus professor in 1997.

আমি যেহেতু এডওয়ার্ড সাঈদ আর একবাল আহমদকে একসঙ্গে পাঠ, বোঝা ও আলোচনার ওপর জোর দিচ্ছি সেই কারণে এডওয়ার্ড সাঈদের বয়ানে একবালের কথা বললাম। তার কথায় একবালকে বোঝার মূল্য আলাদা। দুজনেরই জীবন যদি আমরা পড়ি এবং পাশাপাশি তাদের তত্ত্ব কাজে লাগাতে চাই তাহলে একটা মিল খুঁজে পাব। এডওয়ার্ড আর একবাল দু'জনের কেউই প্রথাগত অর্থে যাকে আমরা জন্মভূমি বলি তার সঙ্গে সম্পর্কের টানভোলেননি। প্যালস্টাইন এডওয়ার্ডের কাছে নিছকই একটা সার্বজনীন রাজনৈতিক ইস্যু নয়, তার জীবনও বটে। ঠিক তেমনি একবালের কাছেও বিহারে তার ইকরি গ্রাম বাস্তবে আজ প্রতীকের মিশমিলে তার সার্বজনীন রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু বিশেষ করে সার্বজনীনের ভেদ বহাল রেখে। কথা হচ্ছে হয়তো আমরা সবাই এভাবেই আমাদের জীবনের বিশেষ স্মৃতিও অভিজ্ঞতায় সিক্ত থাকি। কিন্তু তত্ত্ব ও চর্চাগত দিক থেকে যে প্রশ্নটা দুজনেই তুলেছেন সেটা হল আত্মপরিচয়ের সীমাটা কী করে ঠিক করব? গ্রাম? বড় একটি ভৌগোলিক এলাকা যাকে আমরা দেশ বলি? নাকি পুরো উপমহাদেশ। একবাল পুরো ভারতবর্ষকে তার দেশ মনে করতেন। কিন্তু সেটা স্থির করার পদ্ধতি বোধ হয় জন্মের দাগ ও অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে নয়। বিমূর্ত দেশের ধারণা বা কল্পনায় নিজের দেশ বলতে যে উপলব্ধি সেখানে নিজের অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলে যা ধরা আছে সেটা ভুলতে চাননি দুজনের কেউই– একজন প্যালেস্টাইনি আর একজন বিহারি। দুই উদ্বাস্তু। এডওয়ার্ড আরব কিন্তু একই সঙ্গে

প্যালেস্টাইনি। একবালের নিজের দেশ বললে পুরো উপমহাদেশ বুঝতেন, কিন্তু নিজের বিহার ঐতিহ্য ছাড়েননি। যে ভাব ও রাজনীতির চর্চা উপমহাদেশের– অর্থাৎ সারা পৃথিবীর মানুষকে রাজনৈতিকভাবে এক করতে পারে তার সন্ধানে উভয়ের জীবন কেটেছে। উদ্বাস্তুর রাজনৈতিক চিন্তার উপাদান কি খুঁজে পাই আমরা দু'জনের মধ্যে?
অখণ্ড ভারত তত্ত্বের আচ্ছাদনে যে হিন্দুত্ববাদের রাজনীতি তার দুশমন ছিলেন একবাল। কিন্তু একদিন এই উপমহাদেশের জনগণ গণতান্ত্রিক ঐক্যের বড় কিছু ঘটানোর কর্তব্য ঘাড়ে নেবে হয়তো সেই ভবিষ্যৎও কল্পনা করতেন। কারণ যদি ঔপনিবেশিক দেশ বিভাগ মানি, তাহলে ঔপনিবেশিকতা ও তার ধারাবাহিকতায় সাম্রাজ্যবাদকেও মেনে নিতে হয়। যদি অখণ্ড ভারততত্ত্ব মানি তাহলে হিন্দুত্ববাদকে মানতে হয়, যদি পাকিস্তান মানি তাহলে সাম্প্রদায়িক মুসলমানিত্ব মানতে হয়। কী করে রাজনীতির এই পিচ্ছিল সিঁড়িগুলো আমরা অতিক্রম করব?
উপমহাদেশের মানুষ গণতান্ত্রিক ঐক্যগড়ে তুলুক চাইতেন একবাল, কিন্তু বিহার ভোলেননি। যার মধ্যে তার ইকরি গ্রাম বহাল তবিয়তে বর্ধিষ্ণু ও বাড়ন্ত হয়ে থাকবে। আমি একবালের কাছে উপমহাদেশে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের তাৎপর্য বুঝেছি। বাঙালি আর বাংলাদেশীর ফাঁদে না পড়ে উপমহাদেশকে মনে রেখে ভাব, সংস্কৃতি ও রাজনীতির চর্চা কী করে করা যায় সেই পাঠ নিয়েছি।
একবালকে বোঝার এটা খুবই প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র।

যুগান্তর, ৯ ডিসেম্বর '০৩ ও ১৬ জানুয়ারি, '০৪

www.pathagar.com

অসম্পূর্ণ আধুনিকতা উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদের সহচর এডওয়ার্ড সাঈদের সাহিত্যভাবনা

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

এডওয়ার্ড সাইদের সাহিত্যভাবনা বিংশ শতাব্দীর দুই পরস্পরবিরোধী সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে লড়াই করে বেড়ে উঠেছে। প্রথম সাহিত্যাদর্শ লুকাচ-প্রভাবিত প্রবল মার্ক্সিস্ট সাহিত্যাদর্শ। এই সাহিত্যাদর্শে পাঠককে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং ঠেলে দেওয়া হয় ফর্ম এবং ফর্মালিজমের দিকে। লুকাচ প্রত্যক্ষ বাস্তবতা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই প্রত্যাখ্যান

হচ্ছে : ইতিহাস ও শ্রেণীচেতনা গ্রন্থটির কেন্দ্র ভিত্তিমূল। গ্রন্থটির প্রভাব অপরিসীম : গ্রন্থটির মাধ্যমে জার্মানি ও ফ্রান্সে সাহিত্যভাবনা সম্বন্ধে মার্ক্সবাদী বিচার বিশাল প্রভাব বিস্তার করেছে। আডরনো, বেনজামিন, ব্লক, হরখাইমার এবং হাবারমাস : সবাই জার্মানির ফ্যাসিস্ট অভিজ্ঞতার মধ্যে জীবনযাপন করেছেন, কিন্তু নিজেদের কারণে এই অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক ও ফর্মাল প্রাচীর তুলেছেন। ফ্রান্সে, লুকাচের প্রভাব সবচেয়ে ব্যাপ্ত লুসিয়ান গোল্ডমানের ওপর, যিনি লুকাচের প্রভাবকে সৃষ্টিশীল করেছেন। একইসঙ্গে লুকাচ নিরন্তর বিদ্বেষজাগ্রত করেছেন লুই আলথুসারের মধ্যে। তিনি ফিরে গেছেন মার্ক্সের প্রবাহে, তিনি প্রত্যক্ষ বাস্তব থেকে বহুদূর-তত্ত্বে সরে এসেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লুকাচের প্রভাব ফ্রেডরিক জেমিসনের ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল ও সক্রিয়, বিশেষ করে তাঁর *Marxism and form* এবং *The Political Unconscious* বই দুটির ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় সাহিত্যাদর্শ টি এস এলিয়ট-স্কুল উদ্ভূত অভিজ্ঞতা থেকে পালানো সম্ভব নয়; এই সাহিত্যাদর্শ এলিয়ট-কেন্দ্রিক। বিশেষ করে মধ্যশ্রেণীর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং শহুরে অস্তিত্বের বিশৃঙ্খলা ও স্থানচ্যুতি। এলিয়ট-উৎসারিত নিউক্রিটিসিজমের প্র্যাকটিস এক্ষেত্রে এবং এই প্র্যাকটিসে প্রত্যাখ্যাত আত্মজীবনী ও ইতিহাস। এই তত্ত্ব অনুপ্রবেশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি, ফরাসি এবং জার্মান বিভাগগুলোতে। টেক্সটের ধারণা প্রায় মেটাফিজিক্যাল এবং অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন সেমিওলজি ও ডি-কনস্ট্রাকশনের প্রবল হাওয়া এবং ফুকোর প্রত্নতাত্ত্বিক বর্ণনা জীবন এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে সাহিত্য বোঝার ক্ষেত্র থেকে ঝেঁটিয়ে বার করে দিয়েছে। সাইদ, এক্ষেত্রে হেডন হোআইটের বিখ্যাত গ্রন্থ *Metahistory : The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe* ভালো করে পড়েছেন। সাইদ অনুমোদন করেছেন মার্ক্স, মিশেল এবং ক্রোচের ঐতিহাসিক চেতনার গভীর কাব্যিক

www.pathagar.com

কাঠামো, হোআইটের এই উপস্থাপিতকরণে তাঁর সমর্থন আছে। তারপরও হোআইট বিভিন্ন ক্যাটেগরিগুলো প্রয়োজন, এমনকি অনিবার্য বলে ভেবেছেন। তিনি দৃষ্টিপাত করেননি বিভিন্ন বিকল্প কিংবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কিংবা ক্ষমতাগঠনের ভূমিকার দিকে, যা-কিনা নিটশে ও ম্যার্ক্সের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বরং হোআইট ফুকোর মতো, তাঁদের দিকে অনিচ্ছুক ভাবনার মতো ফিরে তাকিয়েছেন। হোআইট একেবারে চুপ লেখার ব্যাপারে, –শক্তি, প্যাশান, উদ্দীপনা সম্বন্ধে, টেক্সটের ক্ষেত্রে ইতিহাসের লগ্নী সম্বন্ধে। তার দরুন হোআইটের কাছে জীবন যাপনের অভিজ্ঞতা, ঐ অভিজ্ঞতার পটভূমি বদলে গেছে অচেনা এক ছিমছাম ফর্মের মধ্যে। ঐ ফর্ম আবার একেবারেই ইউরোপিয়ান।

সাইদ ক্রিটিক্যাল প্র্যাকটিসের মধ্যে ইউরোসেন্ট্রিক ঐকমত্য খুঁজে পেয়েছেন। এই ঐকমত্য হচ্ছে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে এবং এই ঐকমত্য থেকেই উৎসারিত হয়েছেন ফ্রাই, হোআইট এবং বার্ক। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ গ্রন্থের পর গ্রন্থে, লেখকের পর লেখকে খুঁজে পাওয়া যায়, এখানেই মিল লুকাচ ও টি এস এলিয়টের মধ্যে। লুকাচের 'প্রলেতারিয়েট দৃষ্টিভঙ্গি' শ্রমিক শ্রেণীর বাস্তবিক অভিজ্ঞতা নয়, যেমন এলিয়টের সাহিত্য সম্বন্ধে ধারণার সঙ্গে গিসিঙের *New Grub Street*-এ বর্ণিত লেখকদের জীবনের তুলনা করা হয় না। লুকাচ এবং এলিয়ট, দুজনই তৈরি করেছেন অব্যবহিত বাস্তবের সঙ্গে সৃষ্টিশীলতার দূরত্ব। দুজনই খুব ঘনিষ্ঠ একদিক থেকে, এলিয়টের ক্ষেত্রে কবিতার পক্ষে এবং লুকাচের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক তত্ত্বের পক্ষে অভিজ্ঞতার যন্ত্রণা 'প্রত্যাখ্যান'।

এক্ষেত্রে সাঈদের বক্তব্য ভাববার মতো। একদিকে লুকাচ এবং এলিয়ট অন্যদিকে ক্লিনথ ব্রুকস এবং পল ডি মান এক হিসেবে এই ঐকমত্যের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা সবাই সাহিত্যপাঠ করতে গিয়ে নারীবাদী লেখকদের কণ্ঠ অস্বীকার করেছেন। তাঁদের সাহিত্য পাঠে নারীরা অনুপস্থিত, চুপ কিংবা বহির্ভূত। সান্ড্রা গিলবার্ট এবং সুসান গুবারের *The Mad Woman in the Attic* বইটির উল্লেখ করা যায়। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে সাহিত্যের চিলেকোঠায় নারীদের উপস্থিতি নির্বাসিত করা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে, ইচ্ছা করেই। ইতিহাসকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে লুকাচ থেকে এলিয়ট থেকে সবাই নারীবাদী অভিজ্ঞতার সমপ্রতিনিধিত্বের অধিকার প্রত্যাখ্যান করেছেন। জয়েসও এই ঐকমত্যের অংশ। তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল এলিয়ট ও প্রুস্তের অনেক বৈশিষ্ট্য। যদিও তিনি বলেছেন, 'বাস্তবতার অভিজ্ঞতা' তিনি একজন আইরিশ লেখক হিসেবে বিধৃত করতে চান; এই অভিজ্ঞতা তিনি অনুপস্থিত কিংবা এড়িয়ে যেতে চান না, Dubliners হচ্ছে তাঁর জনসাধারণের আধ্যাত্মিক মুক্তির প্রথম অধ্যায়। সাইদ এক্ষেত্রে স্পষ্ট করে দেখান যে স্টেফান ডিডালুসের প্রয়াস হচ্ছে চার্চ, পরিবার এবং জাতি থেকে পালিয়ে স্বাধীনতা সৃষ্টি করা। এই আর্টের জন্য সাইদ ধনী আইরিশ ক্রিটিকদের নতুন জেনারেশনের কাছে সীমুস ডিন, এমার নোলান, ডেক্‌লান কীবার্ড, ডেভিড লয়েড, টম পউলিন, লুক গীবন্‌সের কাছে : তিনি ঋণী, তাঁদের কাছে উপনিবেশের প্রত্যক্ষ, অবমাননাকর, ক্রমাগত দরিদ্র হওয়ার অভিজ্ঞতা অনেক বড় আধুনিকতায় চেয়ে। এঁদের সাহায্যে সাইদ এই সিদ্ধান্তে পৌছোন যে সাহিত্যবিচারে যে-পুরুষ-কেন্দ্রিক ও ইউরোপ-কেন্দ্রিক ঐকমত্য তৈরি হয়েছে সে-ঐকমত্য নারীবাদী অভিজ্ঞতা ও উপনিবেশের অভিজ্ঞতা প্রান্তি

www.pathagar.com

ক করে রেখেছে। সেজন্য আধুনিকতা যেমন পুরুষ-কেন্দ্রিক ও ইউরোপ-কেন্দ্রিক তেমনি আধুনিকতা নারীবাদী অভিজ্ঞতা ও উপনিবেশের অভিজ্ঞতা দরজার বাইরে রেখে দিয়েছে। এই আধুনিকতা অসম্পূর্ণ, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের সহচর।

ইউরো-আমেরিকান ঐকমত্যের আধুনিকতার বিরুদ্ধে সাঈদ দেখান প্রচণ্ড ধাক্কা এসেছে এথনিক ও সংখ্যালঘুদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে। আফ্রিকান-আমেরিকান, এশিয়ান-আমেরিকান এবং নেটিভ আমেরিকান লেখকরা সাহিত্যকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, এই সাহিত্য টেস্টিমনি, এই সাহিত্যকে অপাংক্তেয় বলে দূরে ঠেলে দেওয়া যাবে না। অবশ্য, রবার্ট হিউজের মতো কেউ কেউ এই সাহিত্যকে 'অভিযোগের সংস্কৃতি' বলে বর্ণনা করেছেন। সাঈদ মনে করিয়ে দেন রিচার্ড স্লোটকিনের *Regeneration Through Violence* বইটির কথা কিংবা ফ্রেডরিক ডগলাস, টনি মরিসন, হেনরি লুই গেইটসের মতো লেখকদের যাঁরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, অধস্তন অভিজ্ঞতা, প্রান্তিক অভিজ্ঞতা সাহিত্যের মূল ধারায় নিয়ে এসেছেন ঐকমত্যের আধুনিকতার বিরুদ্ধে। সাঈদ, সঙ্গতভাবেই, টনি মরিসনের *Playing in the Dark : Whiteness and the Literary Imagination* একটি স্মরণীয় বই বলে উল্লেখ করেন।

অ্যাডওয়ার্ড সাইদের সাহিত্যতত্ত্বের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে : সাহিত্য পর্যালোচনার ফর্মালিস্ট প্রভাব শিথিল করে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পুনর্বাসিতকরণ সাহিত্য ও সমালোচনার মূল ধারার ক্ষেত্র বাদ দেওয়া হয়েছে। মূল ধারা তাঁর দিক থেকে এক ধরনের সমাজকর্তৃত্ব যা কিনা কোনো একটি জাতির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যত্র এথনিক আইডেনটিটির বিতর্ককালে স্পষ্ট হয় সমস্যা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইমেজ নিয়ে, এই ইমেজটাই বিপন্ন ও ভয়ের সম্মুখীন। এই ভয়টাই *The Disuniting of America* বইটির কেন্দ্র : সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য জাতীয়তার জনসমষ্টির সম-অধিকারের দাবি আমেরিকান ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে নড়বড়ে করে তুলেছে।

সাঈদ স্থিতিশীল আইডেনটিটির স্থায়িত্বটা বুঝবার চেষ্টা করেছেন সাম্প্রতিক সময়ের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ডিসকোর্সের পরিপ্রেক্ষিতে। জাতীয় আইডেনটিটির সমস্যা বিশ্ব জোড়া সমস্যায় পরিণত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের কারণে। সাম্রাজ্যবাদ একটি জাতির বিরুদ্ধে অন্য একটি জাতি, একটি সমাজের বিরুদ্ধে অন্য একটি সমাজ, একটি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অন্য একটি সংস্কৃতি খাড়া করেছে। এরিক হবসবম *Age of Empire*-এ এই সমস্যার বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাম্রাজ্যবাদের সময়ে ইউরো-পিয়ান ঔপনিবেশিক শক্তি ও তাদের নন-ইউরোপিয়ান উপনিবেশের বাসিন্দাদের মধ্যে স্পষ্ট, প্রখর, তীব্র বিভাজন তৈরি হয়েছে। এই বিভাজন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিদ্বেষ ও বৈষম্যের বিশাল প্রাকার তুলেছে। এই বিভাজনের অন্তঃসার হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ ও অ-শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে, প্রভুত্বকারী সমাজ ও অধস্তন জাতির মধ্যে একটি শক্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তর-বিন্যস্ততা তৈরি করা ও রক্ষা করা। ফানন এই অসম ক্ষমতাকে ঔপনিবেশিক শাসনের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করেছেন। সাঈদ এই অসম ক্ষমতার সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করেছে তাঁর *Orientalism*[১] এবং *Culture and Imperialism*[২] দুইটি গ্রন্থে।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা কি জাতীয় আইডেনটিটি তৈরি করে? ফাননের *The Wretched*

www.pathagar.com

of the Earth বইটি সাঈদ গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়েছেন। তাঁর পাঠ থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে, ফানন যেমন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী তাত্ত্বিক, তেমনি তিনি জাতীয়তাবাদী চেতনার নোংরা দিকগুলো সম্বন্ধে তীব্রভাবে সমালোচনামনস্ক। তার কারণ হচ্ছে জাতীয়তাবাদ সেক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রয়োজনীয় স্ফুলিঙ্গ, তেমনি বহুক্ষেত্রে জাতীয় চেতনা, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সমাজচেতনায় রূপান্তরিত হয় না। ফাননের চোখ দিয়ে সাঈদ দেখেছেন স্বাধীনতা-উত্তর কালে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল-প্রণীত সর্বোচ্চ লিডারের তত্ত্ব কিংবা রাজধানী শহরের কেন্দ্রিকতা, কিংবা সাধারণ বুদ্ধির হাইজ্যাকিং কিংবা আমলা, টেকনিক্যাল এক্সপার্টস কিংবা বক্তৃতাবাজ নেতাদের গলাবাজি। ভি এস নই পালের আগেই ফানন সংঘের রাজনীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, যেন রাজনীতি তৈরি করেছে মবুতোদের, ইদি আমিনদের, সাদ্দামদের ক্ষমতার অসুস্থতা তৈরি করেছে নির্যাতনকারী রাষ্ট্রের এবং প্রিটোরিয়ান গার্ডদের, যে-রাজনীতি গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অবরুদ্ধ করেছে।

ফাননের সাহায্যে সাঈদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে আইডেনটিটির রাজনীতি নিয়ে বহুদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। আইডেনটিটির রাজনীতি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে অর্থ তৈরি করেছে তা হচ্ছে একজন স্বাধীন উপনিবেশ-উত্তর আরব হওয়া, কিংবা কৃষ্ণাঙ্গ হওয়া কিংবা একজন ইন্দোনেশিয়ান হওয়া। এই হওয়াটা সাঈদ মনে করেন কোনো প্রোগ্রাম নয়, কিংবা কোনো প্রক্রিয়া নয়, কিংবা কোনো ভিশন নয়। কাজটা হচ্ছে : নবমানুষ এবং সংস্কৃতি জোড়া লাগানো, যেসব মানুষ এবং সংস্কৃতিকে প্রান্তিক করা হয়েছে একদা। এটি একটি সর্বনাশা প্রক্রিয়া : উপনিবেশ-উত্তর জনসমষ্টি বিশ্ব ক্ষমতার সার্কিটে প্রান্তিক ও নির্ভরশীল অস্তিত্ব নিয়ে বসবাস করবে কিংবা বিশ্বসংস্কৃতি থেকে স্থানচ্যুত হয়ে শেষ হয়ে যাবে। সাঈদ মনে করেন যে বিশ্ব রাজনীতির স্তরে পৌছানো ব্যাখ্যানের স্তর থেকে বিপজ্জনক, কিন্তু তাঁর কাছে দুইয়ের সম্পর্ক বাস্তবিক, একটি অপরটির ওপর যে-আলোক প্রক্ষেপ করে তা দ্যুতিময়।

সাঈদ এখান থেকে তাঁর সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অবস্থানের একটি স্তরে পৌছোন। সংখ্যালঘু, অধস্তন, নারীবাদী এবং উপনিবেশ-উত্তর চেতনার ঘূর্ণন থেকে উৎসারিত হয়েছে অনেক অর্জন। এই অর্জন ছড়িয়ে পড়েছে বিদ্যায়তনিক পাঠক্রমে এবং তাত্ত্বিক প্রস্তাবনায়। ইউরোসেন্ট্রিজমকে নিশ্চিতভাবে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে; সাম্প্রতিক সময়ের অধিকাংশ মার্কিন স্কলার এবং ছাত্র এ বিষয়ে অবহিত : সমাজ এবং সংস্কৃতি হেটোরেজনাস জনসমষ্টির হেটোরেজনাস ফসল, বিশাল বিভিন্ন বিচিত্র সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরিস্থিতির পরিসরে। টি এস এলিয়টের সাম্রাজ্যের মহান মাস্টারপিসদের স্থায়িত্ব আর স্বীকৃত নয়; স্বীকৃত নয়, সাহিত্য পাঠের পুরানো কর্তৃত্বের প্যাটার্ন।

তবু সাঈদ মনে করেন সহিত্যপাঠের পুরোনো কর্তৃত্ব এখনো নিঃশেষ হয়নি। অ্যালান ব্লুমের *The Closing of the American Mind* কিংবা আলভিন কারনানের *The Death of Literature,* কিংবা রোজার কিম্বালের *Tenured Radicals* : সবই ইঙ্গিত দেয় যে সাইদের মতো যাঁরা কাজ করেছেন, সংস্কৃতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে চেতনার বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন, এসব কাজ এখনো সমাপ্ত হয়নি কিংবা স্থিতিশীল হয়নি। সাইদের বক্তব্য হচ্ছে পূর্বে অবদমিত কিংবা জ্ঞানের স্তব্ধ ফর্মের ওপর জোর দেওয়াই যথেষ্ট নয়; কিংবা

www.pathagar.com

এ কথা বলা যথেষ্ট ... ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মৃগয়া উপনিবেশের এবং অধস্তন জনসমষ্টির জ্ঞানচর্চা ... হচ্ছে। এ ধরনের স্ট্র্যাটেজি অসম্পূর্ণ। ইউরোসেন্ট্রিজমকে দূরে ঠেলার অর্থ নয়, ই... সেন্ট্রিজমের জায়গায় আফ্রোসেন্ট্রিক অথবা ইসলামোসেন্ট্রিক মনোভঙ্গি বসানো। তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে, নারীবাদ, সাব অলটার্ন কিংবা ব্ল্যাকস্টাডিজ এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিরোধের অর্থ নয়, এক ধরনের কর্তৃত্ব ও ডগমার বদলে আর এক ধরনের কর্তৃত্ব ও ডগমা শক্তিশালী করা। দরকার একটি বুদ্ধিবাদী এবং সাংস্কৃতিক প্রয়াশের কেন্দ্রিক প্রবাহে অংশগ্রহণ করা। উদাহরণ স্বরূপ সাইদ ঘাসান কানাফানির *Men in the Sun* উপন্যাসটির কথা উপস্থাপিত করেন। উপন্যাসটির বিষয় হচ্ছে তিনজন প্যালেস্টাইনি উদ্বাস্তুর ইরাকের বসরা থেকে কুয়েতে পৌছবার প্রয়াসের কাহিনী। প্যালেস্টাইনে তাদের দারিদ্র্যের, তাদের ভিটেমাটি উচ্ছেদের কথা উল্লেখিত[১]। বসরায় তাদের সঙ্গে দেখা হয় একজনের, যার পেশা উদ্বাস্তুদের স্মাগল করে অন্য দেশের সীমান্তে পৌছে দেওয়া। এই কাজটি সে করে থাকে তার শূন্য পানি বহনকারী ট্রাকের পেটের মধ্যে উদ্বাস্তুদের লুকিয়ে রেখে। সীমান্ত চৌকিতে পৌছনোর পর উত্তপ্ত রৌদ্রের মধ্যে সীমান্তরক্ষী ও স্মাগলারের মধ্যে শুরু হয় দীর্ঘ, অফুরন্ত এক সংলাপ। উদ্বাস্তুরা, ইতিমধ্যে, গরমে শ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যায়। স্মাগলার তাদের কথা ভুলেই যায়। কানাফানির উপন্যাস রুশদি, নইনল, বার্জার, কুন্ডেরার কাজের সমতুল্য। (১৩ পৃষ্ঠা থেকে)

উপন্যাসটি একইসঙ্গে প্যালেস্টানিয়ান নিয়তির ওপর মেডিটেশন। কানাফানির কাজটি সাহিত্য হিসেবেই নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত, একইসঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত।

সাইদের অবস্থান হচ্ছে : সাহিত্যের সঙ্গে সাহিত্যের যুক্ততা, বইয়ের সঙ্গে বইয়ের যুক্ততার মধ্যে দিয়ে নানা ধরনের রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক কারণের জন্য অবহেলিত ও উপেক্ষিত লেখক ও বইকে বৈশ্বিক পরিসরে নিয়ে আসা সম্ভব। তাঁর অবস্থান বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে এবং বহির্ভূততার বিপরীতে। এসব কাজের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে, এসব কাজকে সাহিত্য হিসেবে, বিনোদন হিসেবে, উদ্ভাসন হিসেবে উপভোগ সম্ভব। অন্যথায় এসব কাজ বিবেচিত হবে এথনোগ্রাফিক বিবরণ হিসেবে, বিশেষজ্ঞ ও এরিয়া এক্সপার্টসদের সীমাবদ্ধ কৌতূহলের খোরাক হিসেবে। সেজন্য বিশ্বমুখিতা হচ্ছে এসব কাজের পুনরুজ্জীবন ও ব্যাখ্যানের জন্য জরুরি, এই পুনরুজ্জীবন তখনই সম্ভব যখন এসব কাজ মানুষী সংস্কৃতির অসংখ্য বাতায়নের পরিসরে দেখা হবে[৬]।

সেজন্য সাইদ যখন বলেন সকল জ্ঞান মানুষের সমাজ সম্পর্কে, তখন অবাক হই না। জ্ঞান হচ্ছে ঐতিহাসিক জ্ঞান, সেজন্য জ্ঞানের ভিত্তি, বিচার ও ব্যাখান[৭]। সমালোচনার ভবিষ্যৎ কিংবা সমালোচনামনস্ক কাজের ভবিষ্যৎ এখানেই, বিভিন্ন সংস্কৃতি, ডিসকোর্স এবং ডিসিপ্লিনের মধ্যে ট্রাফিকের ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে। শেষ পর্যন্ত সমালোচনা একটি বুদ্ধিবাদী এবং সমাজভিত্তিক এবং যুক্তিশীল কাজ, এই কাজের ধরন হস্তক্ষেপের মধ্যে কিংবা গ্রামসির ভাষায় ... ...

তাঁর শেষের দিকের ... *Culture ... Imperialism*-এ তার অবস্থানের বদল হয়েছে। একটি ... ... অপরটি হচ্ছে সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে

এ বিরোধের একটি ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। সংস্কৃতিতে তিনি যেভাবে Orientalism ব্যাখ্যা করেছেন, সেই ব্যাখ্যার বদল ঘটেছে এখানে, কিংবা ব্যাখ্যার সম্প্রসারণ ঘটেছে এখানে। প্রথমত, সংস্কৃতির একটি আপেক্ষিক অটোনমি আছে : অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্তর থেকে, প্রায়শই এই অটোনমি নান্দনিক ফর্মের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। সাইদ, বিশেষ করে উপন্যাসের মতো সাংস্কৃতিক ফর্ম পর্যবেক্ষণ করেছেন, এই ফর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী মনোভঙ্গি, উল্লেখ ও অভিজ্ঞতা গঠনের ক্ষেত্রে। তার অর্থ নয় উপন্যাস হচ্ছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ফর্ম, তার দিক থেকে উপন্যাস হচ্ছে নান্দনিক অবজেক্ট, যে-অবজেক্টের ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সম্প্রসারণশীল সমাজের দিক থেকে সম্পর্ক আছে। প্রটোটিপিক্যাল আধুনিক বাস্তববাদী উপন্যাস হচ্ছে রবিনসন ক্রুসো, এটি হচ্ছে একজন ইউরোপিয়ানের নিজের জন্য জায়গিরদারি তৈরির বিষয়, এই জায়গিরদারির জায়গা হচ্ছে একটি দূরবর্তী নন-ইউরোপিয়ান দ্বীপ।

দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতি হচ্ছে একটি কনসেপ্ট, এই কনসেপ্টে অন্তর্গত পরিশীলিত ও উৎকর্ষময় উপাদানাবলি, প্রতিটি সমাজের সর্বোত্তম সম্পদ, যে-সম্পদ সবার জানা ও চিন্তার মধ্যে ক্রিয়াশীল, যেমন ম্যাথু আর্নল্ড ভেবেছেন। দান্তে কিংবা শেকস্‌পিয়র পড়ার অর্থ হচ্ছে সর্বোত্তম আলোকে নিজেকে, নিজের সমাজ এবং ঐতিহ্যকে দেখা। কখনো-কখনো সংস্কৃতি জঙ্গিভাবে যুক্ত রাষ্ট্র কিংবা জাতির সঙ্গে। সংস্কৃতি এই অর্থে আইডেনটিটির উৎস, যা-কিনা সাম্প্রতিককালে সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এসব প্রত্যাবর্তনে যুক্ত বুদ্ধিবাদী এবং নৈতিক আচরণের সঙ্গে কোডসমূহ। এসব কোড পারমিসিভনেসের বিরোধী। পূর্বতন উপনিবেশে, এসব প্রত্যাবর্তন থেকে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ধর্মজ ও জাতীয়তাবাদী মৌলবাদ।

দ্বিতীয় অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে এক ধরনের থিয়েটার যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক প্রসঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। সংস্কৃতির এই ধরনের আইডিয়া গ্রহণ করার অসুবিধা হচ্ছে একদিকে সংস্কৃতি সম্পর্কে বিনীত শ্রদ্ধার ভাব তৈরি করা, অন্যদিকে সংস্কৃতির বোধ প্রাত্যহিক পৃথিবী থেকে বিযুক্ত করা, সেজন্য পেশাদার মানবতাবাদীরা দাসত্ব, ঔপনিবেশিক ও জাতি-বর্ণের নির্যাতনের মতো নিষ্ঠুর প্র্যাকটিস ও সাম্রাজ্যবাদী অধীনতা এবং প্রবল সমাজের কবিতা, উপন্যাস ও দর্শনের সঙ্গে ঐসব প্র্যাকটিসের সূত্র খুঁজে পান না। কার্লাইল কিংবা রাস্কিন, এমনকি ডিকেন্স ও থ্যাকারের প্রসঙ্গে সমালোচকরা এসব লেখকদের উপনিবেশের বিস্তার, নিকৃষ্ট জাতি অথবা নিগারদের সম্পর্কে মনোভাব একপাশে রেখে সংস্কৃতি বিচার করতে থাকেন। এভাবে সংস্কৃতি বিচার করার অর্থ হচ্ছে রাজনীতি দরজার বাইরে রেখে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা। এই প্রবেশ করা বিপজ্জনক, ভ্রান্ত, সাইদ –এই রূঢ় সত্যটার কাছে আমাদের নিয়ে এসেছেন। আবার সাইদ ঐতিহাসিক বাস্তবতার অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করতে ভোলেন না। অংশত সাম্রাজ্যের কারণে, সকল সংস্কৃতি পরস্পরের সঙ্গে লিপ্ত, কোনো সংস্কৃতি একক কিংবা শুদ্ধ নয়, সব সংস্কৃতি সংকর, হেটেরোজেনাস, বিভিন্ন। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আরব বিশ্বের জন্য সত্য। ডিফেনসিভ, রিঅ্যাকটিভ জাতীয়তাবাদ শিক্ষার পরতে পরতে প্রবিষ্ট, যেখানে ছাত্রদের শেখানো হয় তাদের 'নিজস্ব' ঐতিহ্য শ্রদ্ধা করতে। এই অ-সমালোচনামনস্ক এবং ভাবনাহীন শিক্ষার ফর্ম সংশোধন করা দরকার। সাঈদের মতে,

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে এই ইউটোপিয়ান স্পেস, যেখানে এসব প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ, আলোচনা, ভাবনা করা সম্ভব। সাঈদের এই ভাবনা, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে কিংবা 'উন্নত' বিশ্বের অসহিষ্ণু সমাজের পরিসরে ক্রিয়াশীল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে অসম্ভব বলে মনে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাকার্থি পর্যায়, ব্রিটেনের রুশদি পর্যায়, ভারতের বাজপেয়ি রাজত্ব, বাংলাদেশে খালেদা জিয়ার রাজত্ব সাইদের ভাবনার প্রশান্তি নাকচ করে দেয়।

গ্রন্থপঞ্জি

১. Edward W. Said, Orientalism, ১৯৭৮
২. Edward W. Said, Culture and Imperialism, ১৯৯৩
৩. Edward W. Said, 'Nationalism, Human Rights and Interpretation', in Reflections on Exile, ২০০১
৪. Edward W. Said, 'The Politics of Knowledge', in Reflections on Exile, ২০০১
৫. Edward W. Said, 'Knowledge and Interpretation', in Covering Islam, ১৯৮১

ভোরের কাগজ, ২ এপ্রিল, ০৪

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড সাঈদ
একজন বুদ্ধিযোদ্ধার প্রতিকৃতি

খোন্দকার আশরাফ হোসেন

এডওয়ার্ড সাইদের জীবনাবসানের সংবাদ বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো নেমে এসেছে সারা বিশ্বের প্রগ্রসর চিন্তার মানুষের কাছে। পশ্চিমা মিডিয়াতে এই প্রতিবাদী মানুষটির মৃত্যু যথাযোগ্য গুরুত্ব পায়নি, কেননা জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি পশ্চিমী দুনিয়ার বৌদ্ধিক ও আর্থনীতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। প্যালেস্টাইনের ঋতরাষ্ট্র জনগণের পক্ষে দুর্নিবার ও অসমসাহসী যোদ্ধা ছিলেন তিনি। আজ যখন ফিলিস্তিনি জনগণের সংগ্রাম একটি বিপজ্জনক ক্রান্তিতে পৌঁছেছে, যখন ইসরায়েলি আক্রমণে প্যালেস্টাইনে প্রতিদিন প্রাণ হারাচ্ছে মানুষ, যখন তাদের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাত কার্যত বন্দি, সেই সময় সাইদের মৃত্যু একটি বিশাল বিপর্যয়। সারা বিশ্বের বিশেষত উত্তর-ঔপনিবেশিক শোষণের শিকার তৃতীয় বিশ্বের, বঞ্চিত-দরিদ্র মানুষ সাঈদকে তাদের অগ্রসৈনিক হিসেবে পেয়েছিল। তিনি যুদ্ধ করেছেন বুদ্ধির মাঠে; তাঁর লেখনী ছিন্নভিন্ন করেছে পশ্চিমী দুনিয়ার বানানো প্রাচ্যপৃথিবী সম্পর্কিত নানা মতলবি মিথকথার মায়াপ্রপঞ্চ। অমর গ্রন্থ *'অরিয়েন্টালিজম'*-এর স্রষ্টা এডওয়ার্ড সাঈদকে ভোলা যাবে না। ভোলা যাবে না এই স্বদেশচ্যুত ফিলিস্তিনি লেখককে, যিনি তাঁর শাণিত কলমকে নিয়োজিত করেছিলেন স্বদেশের মানুষের রাজনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে। *The Politics of Dispossession, The Question of Palestine Covering Islam, Culture and Imperialism*- তাঁর এই সরাসরি রাজনৈতিক গ্রন্থাবলির পেছনে ক্রিয়মান ছিল তাঁর অনমনীয় দেশাত্মবোধ, ইতিহাস সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞা এবং প্যালেস্টাইনের মানুষের মুক্তি সম্পর্কে দুর্মর আশাবাদ। আজ যখন প্যালেস্টাইনের মুক্তিসংগ্রাম আত্মঘাতী আত্মদানের প্রতিযোগিতায় উপনীত হয়েছে, যখন ইসরায়েল হুমকি দিচ্ছে অনন্তকাল ধরে অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার, তখন সাইদের অসীম আত্মবিশ্বাসী উক্তির কথা মনে পড়বে। সাঈদ ঘোষণা করেছেন যে, প্যালেস্টাইনি প্রতিরোধ দৃঢ়তর হবেই, যদিও ইসরায়েল ভাবছে অনন্তকাল তারা দখল করে রাখবে প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ড। ইসরায়েল এবং তার মিত্র আমেরিকার উদ্দেশে সাইদের মন্তব্য-'Your Logic, by which you forecast an endless siege, is doomed, the ways all colonial adventies have been doomed.'

এডওয়ার্ড সাঈদ জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৫ সালে জেরুজালেমে, খ্রিস্টান পরিবারে। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর জায়নিস্টরা দখল করে নেয় জেরুজালেম।

www.pathagar.com

আরো অসংখ্য ফিলিস্তিনি পরিবারের মতোই গৃহচ্যুত হয় সাইদের পরিবার; তারা চলে আসে কায়রোতে। কায়রোতে কৈশোরের কয়েক বছর কাটানোর পর সাইদ আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের Mount Hermon School-এ পড়তে যান। পরবর্তী সময় পড়াশুনা করেন প্রিন্সটন ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপর কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেন শিক্ষক হিসেবে। মৃত্যু পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন সেখানেই। প্রসঙ্গত, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বিশ শতকের শেষভাগে লিটারারি থিয়োরি-র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চর্চাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি পায়। তত্ত্ববিশ্বের অন্যতম প্রধান নায়ক হিসেবে সাইদ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদার মনোজাগতিক পরিবেশকে সহায় হিসেবে পেয়েছিলেন। এডওয়ার্ড সাইদের চিন্তাগত বিবর্তন খুব আকর্ষণীয়। প্রথম দিকে তিনি রাজনীতি সম্পর্কে নিস্পৃহ না-হলেও শুদ্ধ জ্ঞানচর্চায়ই নিবেদিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ *Joseph conrad and the functions of Autobiography* তে স্বনির্বাসিত পোলিশ ঔপন্যাসিক যোশেফ কনরাড (যিনি ইংরেজি ভাষায় রচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসাবলি- *Lord Jim, Heart of Darkness, Nostromo, Nigger of the Narcissus* প্রভৃতি) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সম্ভবত কনরাডের বহির্বাসী বহির্দেশীয় লেখকসত্তার সঙ্গে সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিলেন উন্মূল অভিবাসী সাইদ। এই বইয়ের মূল্য আজ শুধু সাহিত্যসমালোচনা হিসেবে। পরবর্তী কালের উন্মুখর প্রতিবাদী এডওয়ার্ড সাইদকে এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে সাইদের জন্য কনরাড হতে পারতেন এক সোনার খনি। তার পরবর্তী রচনাসমূহে যে ঔপনিবেশিকতা ও উত্তর-ঔপনিবেশিকতার নানা প্রপঞ্চ তুলোধুনা করেছেন সাইদ, কনরাড হতে পারতেন তার গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শ। অন্য অনেক সমালোচক দেখিয়েছেন কনরাড কীভাবে সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার (Colonial enterprise) সমালোচনা করার ভান করে তলে তলে সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থনই করেছেন। সে যাক, সাইদের কনরাডবিষয়ক গ্রন্থ তাঁর নবজাগৃতির পূর্বকালীন হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

তবে সাইদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য যেভাবে বিবর্তিত হয়েছে গত সিকি শতাব্দীতে তা বিস্ময়কর। তাঁকে কোনো বিশেষ বুদ্ধিজীবী খোপে ভরাও কষ্টকর। তিনি তুলনামূলক সাহিত্য থেকে যাত্রা শুরু করে ক্রমাগত হয়েছেন ইন্টারডিসিপ্লিনারি। ভাষাতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, রাজনীতি থেকে শুরু করে সঙ্গীত পর্যন্ত তাঁর চিন্তা ও লেখনী ছিল বিচরণশীল। যেন ক্লাসিক্যাল পাণ্ডিত্যের আধুনিকতম ও বিরল উদাহরণ তিনি। তাঁর সঙ্গে তুলনীয় রয়েছেন সম্ভবত কেবল আরেকজন। তারই মতো আপোসহীন, চিরপ্রতিবাদী, মনস্বী লেখক নোয়াম চমস্কি। সাম্প্রতিক ইরাক যুদ্ধের আগে-পরে এই দুই মার্কিন মুলুকবাসী পণ্ডিত যেভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অভীপ্সাকে সমালোচনা করেছেন তা সত্যি অতুলনীয়। সাইদ অনর্গল বলতে পারতেন তিনটি ভাষা- ইংরেজি, আরবি ও ফরাসি। পড়তে পারতেন জার্মান, ইতালিয়ান স্প্যানিশ ও লাতিন। ইউরোপীয় ক্ল্যাসিকাল মিউজিকে আপাদমস্তক সঞ্জীবিত এডওয়ার্ড সাইদ ঘুরে বেড়িয়েছেন কায়রো, প্যারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক। সর্বার্থে আন্তর্জাতিক এই মানুষটি সম্পর্কে সমালোচক মাইকেল স্প্রিংকারের মন্তব্য- 'He incarnates the very ideal of the cosm opolitan intellectual that remains so central to the humanities self-image to this day.'

www.pathagar.com

প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাইদের জড়িয়ে পড়াটা ঘটে ১৯৬৭ সালের পরে (১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরায়েল প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ড দখল করে নেয়)। এর আগে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল পারিবারিক। তাঁর পিতা বৈরুতে বাস করতেন। ১৯৬৯ এবং ১৯৭০-এ সাইদ আম্মান এবং বৈরুতে বেড়াতে যান পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর এক আত্মীয় এবং কবি কামাল নাসের প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের কাজে জড়িত ছিলেন। কামাল নাসেরের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনা সাইদকে প্যালেস্টাইন আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করে। প্রসঙ্গত, কামাল নাসের ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত পিএলও-র অফিসিয়াল মুখপাত্র ছিলেন। ঐ সালেই ইসরায়েলি ঘাতকদের হাতে বৈরুতে নিহত হন বিপ্লবী ও কবি কামাল নাসের। মার্কিন মুলুকে ফিরে এসে সাইদ নিজকে যুক্ত করেন প্যালেস্টাইনের মুক্তিসংগ্রামের কাজে। যুদ্ধক্ষেত্র নয়, তিনি বেছে নেন আরববিদ্বেষী এবং আরব বিশ্বসম্পর্কে অজ্ঞ মার্কিনি পাঠকের কাছে প্যালেস্টাইন তথা আরব বিশ্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা তুলে ধরার কাজ। পাশ্চাত্য দুনিয়ায় 'একজন আরব'-এর ভাবমূর্তি ছিল এরকম-'বাস্তববিমুখ, সংস্কৃতিহীন একজন মানুষ যার পূর্ব-ইতিহাস ঢাকা পড়ে আছে এমন একটি দুর্বোধ্য ভাষার নিচে যেভাষাটি মার্কিনিরা পড়তে পারে না। সে নিঃসঙ্গ, ভোগী এবং মানবিক গুণাবলি থেকে বঞ্চিত।' আরবের মানুষ সম্পর্কে পাশ্চাত্য দুনিয়ার এই যে Stereotype তা একদিনে গড়ে ওঠেনি। এর পেছনে শত শত বছরের অরিয়েন্টালিজম তথা প্রাচ্যবিদ্যার ভূমিকা অনেকখানি। Orientalism হচ্ছে ইউরোপের জ্ঞানকেন্দ্রসমূহে গড়ে-ওঠা প্রাচ্যবিষয়ক বিদ্যা। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা তাঁদের পাশ্চাত্য দৃষ্টির প্রিজমের ভেতর দিয়ে প্রাচ্য তথা মধ্যপ্রাচ্যকে দেখেছেন; সে প্রিজম সাম্রাজ্যবাদী অভীপ্সা, ধর্মীয় আপ্তধারণা, ক্রুসেড-সঞ্জাত ঘৃণা-অবিশ্বাস, ভয় ইত্যাদি নানা কুয়াশায় আচ্ছন্ন। এই ঘোলা কাচকে ভেঙে দেওয়াই ছিল *Orientalism* (১৯৭৭) লেখার পেছনে এডওয়ার্ড সাইদের মূল উদ্দেশ্য।

অরিয়েন্টালিজম গ্রন্থে সাইদের প্রতিপাদ্য ছিল প্রাচ্যবিদ্যার সাম্রাজ্যবাদী অভীপ্সা এবং এর মাধ্যমে প্রাচ্যদেশসমূহে আধিপত্যকে পরিপোষণ। সাইদ অবশ্য সমগ্র পাশ্চাত্যকে তার শত্রু হিসেবে দেখেননি; তিনি সমালোচনা করেছেন সেইসব পণ্ডিত, আর্যবেত্তা, ইত্তোলজিস্ট, মিশরবিদ্যাবিদ প্রভৃতির যাঁরা জ্ঞানীসুলভ পরমহংসতা ছেড়ে সাম্রাজ্যবাদের সেবায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। সাইদের সিদ্ধান্ত : অরিয়েন্টাজিম নামক বিদ্যার উদ্দেশ্য ছিল 'to understand, in some cases to control, manipulate, even incorporate, what is manifestly a different world...' একটি আয়নার মতো প্রাচ্যবিদ্যা পশ্চিমাশক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধাকে প্রতিফলিত করেছে। প্রাচ্যদুনিয়াকে ঐ প্রাচ্যবিদরা এমন রঙে এঁকেছেন যাতে মনে হয় ঐ দুনিয়ার মানুষদের উপনিবেশিত করা, 'সভ্য করে তোলা' পশ্চিম বিশ্বের মানুষের জন্য ফরজ কাজ- তথাকথিত 'White man's burden'। ঠিক যে ধরনের স্বঘোষিত ত্রাণকর্তার মুখোশ পরে ইরাকে, আফগানিস্তানে হামলে পড়েছে নব্য উপনিবেশবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সাইদ বুঝেছিলেন, আজকের দিনে জরুরি হচ্ছে উপনিবেশবাদী বিকৃতচিত্রণের (Colonial misrepresentation) বিপরীতে উপনিবেশিতের সঠিক আত্মচরিত্র তুলে ধরা। ঔপনিবেশিক প্রভুত্বকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ঔপনিবেশিক মানুষের উচিত তার নিজের ন্যারেটিভ উপস্থাপন করা- ডিসকোর্সের

www.pathagar.com

বিপরীতে কাউন্টার ডিসকোর্স, ইতিহাসের বিপরীতে পালটা ইতিহাস। এতদিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের দৃষ্টিতে ইতিহাস লিখেছেন, এবার উপনিবেশিকরা তাদের নিজেদের ইতিহাস লিখবেন। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির সেটিই সম্ভাব্য পথ। সন্দেহ নেই যে, অরিয়েন্টালিজম রচনার পেছনকার গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল প্যালেস্টাইনিদের রাজনৈতিক সংগ্রামের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটটি পরিষ্কার করা। তার উদ্দেশ্য ছিল- 'উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রথম কার্যকর পদক্ষেপটি নেওয়া, যার ভিত্তিতে ঔপনিবেশিকতাপীড়িত মানুষ বিশ্বনাট্যমঞ্চে তাদের হারানো কণ্ঠস্বরটি আবার ধ্বনিত করতে পারে, আওয়াজ তুলতে পারে প্রতিরোধের।'

এডওয়ার্ড সাইদের অরিয়েন্টা-লিজম গ্রন্থের সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব হল পরবর্তী কালের পোস্টকলোনিয়াল চিন্তাজগতের ওপর এর প্রভাব এবং একটি প্রখর ও ক্রমবিস্তারমান রচনাশৈলীর উৎসমুখ খুলে দেওয়া। সাইদের নিজভাষ্য মতে, তিনি চেয়েছিলেন তৃতীয় বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার শিকরসমূহ খুলে দিতে, যাতে তাঁরা নিজ নিজ দেশে ভৌগোলিক ঐতিহাসিক শোষণ সংদমনের চিত্রগুলোকে তুলে ধরতে পারেন। যুগ যুগ ধরে শোষিত জনগোষ্ঠী, তা তারা আরবেই হোক কিংবা আফ্রিকায়, কিংবা ক্যারিবিয়ান অথবা ভারতে, যেন নতুনভাবে উপনিবেশোত্তর মুক্তিচেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে এবং প্রতিবাদ করতে পারে নব্য-উপনিবেশবাদী প্রকল্পের বিরুদ্ধে। এরকম অভিযোগও করা সম্ভব যে, সাইদের এই অভীপ্সা এক ধরনের মেসিয়ানিক অত্যুৎসাহই ছিল। কিন্তু উপেক্ষা করা যায়নি অরিয়েন্টালিজমের প্রভাবকে। আজকের দিনে সাহিত্যতত্ত্বের জগতে দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশনবাদী নিরঞ্জন চিন্তার বিপরীতে যে সমাজ-রাজনীতি-ইতিহাসঘনিষ্ঠ উত্তর-কাঠামোবাদী উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তন-আলোড়ন চলছে তার উৎসমুখ এডওয়ার্ড সাইদের অরিয়েন্টালিজম গ্রন্থটি। হোমিভাবা-গায়ত্রি স্পিভাক-আশিস নন্দীদের রচনাবলিতে বিধৃত হয়েছে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জায়মান ডিসকোর্সের বিবিধ অনুষঙ্গ। আফ্রিকি কিংবা ক্যারিবীয় চেতনা, অথবা সাব অলটার্ন, নানা নামে চলমান ডিসকোর্সের ওপর সাইদের প্রভাব অনপনেয়। অবশ্য সাইদের সঙ্গে এদের অনেক পার্থক্যও রয়েছে। এর একটি মার্কসবিষয়ে সাইদের দৃষ্টিভঙ্গি : কার্ল মার্কসকেও প্রাচ্যবিদদের সারিভুক্ত করাকে সমালোচনা করেছেন এজাজ আহমেদসহ অনেক নব্যমার্কসবাদী তাত্ত্বিক। এজাজ আহমেদ সমালোচনা করেছেন সাইদের দ্বিধাগ্রস্ততাকে, বিশেষ করে হিউম্যানিজম সম্পর্কে সাইদের দোলাচল খুব স্পষ্ট। তিনি পাশ্চাত্য হিউম্যানিজমের ক্লাসিক্যাল

টেক্সটগুলোর প্রশংসা করেছেন। যদিও বলেছেন যে, ওই হিউম্যানিজমও উপনিবেশবাদের গাড্ডায় পড়ে হয়ে উঠেছিল আধিপত্যবাদের হাতিয়ার। সাঈদ প্রশংসা করেন হিউম্যানিজমের নানা দিক, কিন্তু কার্যত ব্যবহার করেন মিশেল ফুকোর তত্ত্ব, যা একইসঙ্গে হিউম্যানিস্টবিরোধী ও বাস্তববাদবিপ্রতীপ। এজাজ আহমেদ অভিযোগ করেছেন সাইদের অসঙ্গতি সম্পর্কে; বলেছেন যে, সাঈদ মানবতন্ত্রের প্রশংসা করেন অথচ ব্যবহার করেন ফুকোদীয় ডিসকোর্স; একই নিশ্বাসে উচ্চারণ করেন আন্তনিও গ্রামসি এবং বেন্ডার নাম। কিন্তু সাইদেরও আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য আছে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'Orientalism is theoretically inconsistent and I

www.pathagar.com

designed it that way : I didn't want Foucault's method or anybody else's method, to override what I was trying to put forword. The notion of a kind of non-coercive knowledge which I came to at the end of the book was deliberately anti-Foucault.' সাইদের চিন্তার সারগ্রাহিতা (eclecticism) প্রশংসার যোগ্য, এবং তাঁর বিবিধ দ্বৈধতা সত্ত্বেও তাঁর প্রধান যে থিসিস- অর্থাৎ জ্ঞানকে পাশ্চাত্য ব্যবহার করেছে আধিপত্যবাদের বশংবদ হিসেবে তা মিথ্যা হয়ে যায়নি।

অরিয়েন্টালিজম গ্রন্থের একটি মারকুটে দিক আছে, যাকে পাশ্চাত্য অগ্রাহ্য করতে পারেনি। পরবর্তী বইগুলোতে সাঈদ জ্ঞানের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ছেড়ে নেমে এসেছিলেন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের রাজনৈতিক বাস্তবতার পাটাতনে। প্যালেস্টাইন স্বাধিকার আন্দোলনে তুখোড় প্রবক্তার ভূমিকাটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন স্বেচ্ছায়। তা শুধু দীর্ঘ ১৪ বছর পিএনসি অর্থাৎ প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নয়; বিবিধ পাশ্চাত্য সংবাদপত্রে বিরতিহীনভাবে প্রবন্ধ লিখে, টেলিভিশনে বক্তব্য রেখে তিনি পশ্চিমী দুনিয়ায় হয়ে উঠেন প্যালেস্টাইন আন্দোলনের সর্বোত্তম এবং ক্লান্তিহীন প্রচারক। এমনকি ইহুদিবাদীরা পর্যন্ত সাইদের যুক্তির ধারকে সমীহ করতেন। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় আরব বিশ্বের সপক্ষে সাইদের তীক্ষ্ণ রচনাবলি তাঁকে প্রায় জিহাদি অগ্রনায়কে রূপান্তরিত করে- তাঁকে 'প্রফেসর অব ভায়োলেন্স' অভিধাও দেয় কেউ কেউ। কিন্তু সাঈদ সহিংসতায় বিশ্বাস করতেন না; উগ্র ইসলামি মৌলবাদের সমর্থক হওয়ারও প্রশ্ন আসে না। কিন্তু আয়রনি হল, এই আরব খ্রিস্টান মানবতাবাদী দেশপ্রেমিক মানুষটিকেই এক পর্যায়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদের মর্দে মুজাহিদ বলে ভাবতে শুরু করে আরববিশ্বের মানুষ। *অরিয়েন্টালিজম* (১৯৭৭) প্রকাশিত হওয়ার পরপর কিছু ঘটনা সাইদের এহেন ইসলামায়নকে ত্বরান্বিত করেছে। ১৯৭৮-এ ইরানে ইসলামি বিপ্লব; প্যালেস্টাইন-ইসরায়েল সংঘর্ষ, ১৯৮২-তে ইসরায়েল কর্তৃক লেবানন আক্রমণ এবং ১৯৮৭-এর শেষ দিকে ইন্তিফাদার আবির্ভাব। শীতল যুদ্ধের অবসান একটি binary opposition-এর (পুঁজিবাদ-সমাজবাদ) অবসান ঘটালেও অন্য একটি দ্বিঘাত-বিরুদ্ধতা জেগে উঠল প্রচণ্ডভাবে। একদিকে আরবজগৎ ও ইসলাম, অন্যদিকে পাশ্চাত্য দুনিয়া। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আক্রমণ, আলজেরিয়া, জর্ডান, লেবানন, মিশর এবং অন্যত্র ইসলামি মৌলবাদের উত্থান, উপসাগরীয় যুদ্ধ, সেপ্টেম্বর ১১, আফগানিস্তানে মার্কিন অভিযান, সর্বশেষ ইরাকে কোয়ালিশনের একতরফা যুদ্ধ। এ কারণেই 'ইস্ট' এবং 'ওয়েস্ট' নামক তেল-জলের বিভাজনটি যেন এখন আরো স্পষ্ট। 'আমরা' এবং 'ওরা' এই অনুভূতি তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাঈদকে টেনে আনা হয়েছে 'আমরা' শিবিরে, তথা ইসলামের ভাগে- যেভাগটি আবার এক অর্থে যেন শোষিত উপনিবেশিত দরিদ্র দুনিয়ার ভাগও। সাঈদ লিখেছেন কীভাবে এই অঘোষিত যুদ্ধে তাঁকে ইসলামের তথা আরব দুনিয়ার পক্ষে, নিপীড়িত-নির্যাতিত প্রাচ্যবাসীর পক্ষে মহাকাব্যের যুযুধান বীর বানানো হয়েছে। সাঈদ তাঁর এই আয়রনি- সঙ্কুল ভূমিকাটি মেনেও নিয়েছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর অঙ্গীকার থেকে সরে আসেননি। বীররা যেমন সরে না। অন্তত আরবদেশগুলোর প্রেক্ষাপটে এডওয়ার্ড সাইদের অবস্থান তুলনারহিত এবং তাঁকে ঘিরে আরব জনগণের

www.pathagar.com

উচ্ছ্বাসের প্রকৃত কারণ রয়েছে। সাইদের মৃত্যুর পর ইয়াসের আরাফাত যে শোকবাণী উচ্চারণ করেছেন তাতে সেটি স্পষ্ট।

এডওয়ার্ড সাইদ মূলত কাজ করেছেন তিনটি ভিন্ন ক্ষেত্রে, এবং তিনটি ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান বিপুল।

১. 'প্রাচ্যবিদ্যা' নামক জ্ঞানশাখার ক্রিটিক করার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী রূপ তুলে ধরেছেন। অরিয়েন্টালিজম ছাড়াও এ ক্ষেত্রে তাঁর বিস্তৃততর কাজ *Culture and Imperialism* (১৯৯৩)।

২. বিশুদ্ধ থিয়োরিবিষয়ক গ্রন্থ যথা *The world, the Text and the Critic.*

৩. প্যালেস্টাইনি জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রাম, আধুনিক প্যালেস্টাইনি জাতির উদ্ভব এবং ইহুদিবাদের সঙ্গে এর সংঘর্ষের প্রেক্ষাপট। *The Question of Palestine (1980), After the Last Sky* গ্রন্থদ্বয়ে সাইদ প্যালেস্টাইনি জনগণের অধিকারকে পাশ্চাত্য দুনিয়ার কাছে অপূর্ব বাগ্মীতার সঙ্গে উপস্থিত করেন। সেই অর্থে সাইদকে প্যালেস্টাইন তথা আরব বিশ্বের একজন যুধ্যমান অগ্রসৈনিক ভাবা যায় অবশ্যই। সেইসঙ্গে মানবতার সপক্ষে একজন বুদ্ধিযোদ্ধাও। তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড সাঈদ : গণবুদ্ধিজীবীর দায়

রাশিদ আসকারী

এডওয়ার্ড সাঈদ প্রধানত একজন বুদ্ধিজীবী। গণবুদ্ধিজীবী। যে সকল স্থানের ওপর দিয়ে তাঁর জীবনকাল প্রবাহিত তাদের কোথাও তিনি স্বচ্ছন্দ বোধ করেননি। তাঁর সত্তা সততই এক নির্বাসিত সত্তা হিসেবে কাজ করেছে। ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করলেও সেখানে তাঁর বেশি দিন থাকা হয়ে ওঠেনি। সপরিবারে তাঁরা মিশরে যান এবং বিপ্লবোত্তর মিশরের আমূল সমাজকাঠামোগত পরিবর্তনের পর লেবাননে পাড়ি জমান। গৃহযুদ্ধ শুরু হলে তাও পোড়ামাটিতে পর্যবসিত হয়। শেষে পনের বছরের স্কুল ছাত্র সাঈদ ১৯৫১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসিত হন। তারপর থেকে সেখানে বসবাসের ধারণার সাথেই নিজেকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। কনরাডের মতো সাঈদেরও জীবনেও বৌদ্ধিক আগ্রহের এক বিপুল এলাকা জুড়ে কাজ করেছে নির্বাসন প্রসঙ্গ।

অবশ্য এই নির্বাসনের বিষয়টিকে সাঈদ কখনোই নেতিবাচক অর্থে দেখেননি। নানাবিধ টানাপোড়েনের ভেতরেও তিনি বিস্মৃত হননি যে তিনি একজন ফিলিস্তিনী। এই পরিস্থিতির কারণে মার্কিন মুল্লুকে তাঁকে অনেক বৈরী পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকেই তিনি লাভ করেছেন অন্তর্জ্ঞান। খুঁজে পেয়েছেন তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য। শুরু করেছেন তাঁর যাত্রা– একজন নির্বাসিত ফিলিস্তিনী হিসেবে।

সাঈদের রচনাকর্মকে সাদামাটাভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ফিলিস্তিন এবং আরব বিশ্বের ওপর রচনা এবং সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক তত্ত্ব সংক্রান্ত রচনা অবশ্য এই বিভাজন এক পর্যায়ে উক্ত ভেদরেখাকে অতিক্রম করেছে এবং পরস্পরের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তাঁর Culture and Imperialism গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের ওপর আলোচনা মূলত ব্রিটিশ কিংবা ইসরাইলীদের দ্বারা উপনিবেশক পীড়ন হবার অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তাত্ত্বিকতায় উন্নীত হবার বিষয়টি সার্থকভাবে ঘটেছে তাঁর Orientalism গ্রন্থে। Orientalism নিয়ে এন্তার বিতর্ক হয়েছে। এখানে এক ধরনের প্রাক-অস্তিত্বশীল 'বাস্তব' প্রাচ্যের (Orient) সাঈদীয় ধারণাকে স্বীকৃতি দিতে চাননি অনেকেই। গ্রন্থটির নয়া পেঙ্গুইন সংস্করণে বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন সাঈদ নিজেই। দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিম যে স্বয়ম্ভু ভাবমূর্তি সংরক্ষণ করে চলেছে তার অসারতা প্রমাণের একটি প্রতি-ডিসকোর্স হিসেবে তিনি প্রাচ্যবাদের নতুন তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। উত্তর-উপনিবেশিক ভাবনার প্রসারে সাঈদের *অরিয়েন্টালিজম* একটি বীজগর্ভ রচনার মর্যাদা লাভ করেছে। বিকল্প ধারার তাত্ত্বিক ভাবনার জগতে এটি নতুন মাত্রা।

www.pathagar.com

সাঈদের ইতিহাসবোধ মুখ্যত ইহবাদী ধারণা নির্ভর। তিনি আগ্রহী ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায়, যে অভিজ্ঞতা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত কিংবা ঐতিহাসিক ঘটনার অংশ বিশেষ। সাম্প্রতিক তথ্যের আলোকে সাঈদের এই ইতিহাস-চেতনা বিবাদমূলক এবং একজন সংস্কারবাদীর চোখে রক্ষণশীল। অবশ্য সাঈদ তা মনে করেন না। তাঁর মতে ইতিহাসের সঙ্গে বা বৈশিষ্ট্যাবলী নিজেই বিবাদের উর্ধ্বে নয়। ইতিহাসের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে মানুষের ভেতরে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। সুতরাং ইতিহাস-চর্চা কার্যত সমস্যাসঙ্কুল। আপন প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠায় সাঈদ ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ লগ্নকে বেছে নেন এবং তাঁর এই চর্চাকে সেক্যুলার চর্চা জ্ঞান করেন। হেইডেন হোয়াইটের *Metahistory* গ্রন্থটির দ্বারা তিনি ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যেখানে একটি কাহিনী রচনায় ইতিহাস হয়ে ওঠে শব্দালংকারের সমারোহ। তাতেও সমস্যা থেকে যায়। সত্যের হয় অপলাপ। পরে অবশ্য সাঈদ অধি-ইতিহাসের জগত থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং ইতিহাসের ঐতিহ্যিক ইহবাদী চর্চায় ব্যাপৃত থেকেছেন।

ভিকোর প্রতি আগ্রহই সাঈদের সেক্যুলার সমালোচনা চর্চার গোড়ার কথা। ভিকোর জার্মান অনুবাদক অয়েরবাখ এবং গ্রামসির মতো সাঈদ ও ভিকোর ঐহিক ও পারত্রিকের ভেতর প্রভেদকারী সেক্যুলার চিন্তাধারার দ্বারা গভীরভাবে প্রবাবিত হয়েছিলেন। সাঈদের সেক্যুলার সমালোচনার পেছনে রেমন্ড উইলিয়ামসের প্রভাবও নেহাত কম নয়। লুক্রেটিয়াস থেকে উদ্ভূত ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারণাকেই তিনি সেক্যুলার বলে গণ্য করতেন। তাই বলে তিনি সনাতন ধারার মার্কসবাদী সমালোচক ছিলেন না। তিনি বস্তুত অর্ডনোর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অর্ডনো ভাবনার স্থির মোড়ক ও ধারণাসমূহকে ভাঙতে চাইতেন। সাঈদও মনে করেন যে, ওগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা কিংবা খাটো করে দেখানো কিংবা হ্রাস করাই সমালোচনার ধর্ম হওয়া উচিত।

অর্ডনো নানাভাবে সাঈদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এর একটি কারণ হলো সাঈদের মতো অর্ডনোর কাছেও সঙ্গীত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। বুদ্ধিজীবীর যে ধারণা সাঈদের ভেতর গড়ে উঠেছিল তা রূপদান করেছেন মূলত অর্ডনোই। সাঈদের 'রিপ্রেজেনটেশন অফ দি ইনটেলেকচ্যুয়াল' ছয়টি প্রবন্ধের এক সংকলন বা বুদ্ধিজীবীর ভূমিকার ব্যাপারে একটা দিকনির্দশনা দেয়। প্রবন্ধই তাঁর প্রিয় মাধ্যম। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ ঐতিহ্য দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। তার একটি কারণ হলো তার প্রবন্ধ প্রাতিস্বিক বিষয়সমূহকে গুরুত্ব দেয়। এর একটি রাজনৈতিক মাত্রা থাকে। তাঁর পছন্দের এই প্রবন্ধ মাধ্যমের জন্যেই তিনি বহুস্বরিক (polyphonic) হয়ে উঠেছিলেন।

'রিপ্রেজেনটেশন অফ দি ইনটেলেকচ্যুয়াল'-এর প্রবন্ধগুলো একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে সাঈদের অবস্থান নির্দেশ করে এবং তাঁর পরিচিতির ব্যাখ্যা দেয়। সমকালীন সময়ে সাঈদ একজন গণবুদ্ধিজীবীর ভূমিকায় আস্থাশীল। এ ধরনের বুদ্ধিজীবীদের বেদনা এবং উদ্বেগ তাদের অবস্থান এবং পরিচিতির ভেতর থেকে উৎসারিত। উক্ত গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো সঙ্গত কারণেই নির্বাসন, জাতীয়তাবাদ এবং পেশাদার এবং অপেশাদারের ভেতরকার দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা করে। এগুলো সুস্পষ্টভাবেই সাঈদের নির্বাসিত জীবনালেখ্য, একটি ফিলিস্তিনী মাতৃভূমির জন্যে তাঁর সংগ্রাম এবং একজন রাজনৈতিক ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির কেন্দ্রে তাঁর সম্পৃক্ততার বিষয়গুলো নির্দেশ করে। সাঈদের

www.pathagar.com

নিজের ভাষায় প্রবন্ধসমূহের মুখ্য বিষয় হলো : "the public role of the intellectual as outsider, ~amateur", and disturber of the status quo" Representations of the Intellectual X)।

গ্রন্থটির নাম প্রবন্ধে সাঈদ একজন বুদ্ধিজীবীর পরিচিতির রূপরেখা প্রদান করেন। এখানে তিনি এ্যান্থনিও গ্রামসি এবং জুলিয়েন বেন্দার বুদ্ধিজীবীর ধারণাসমূহকে পাশাপাশি স্থাপন করেন। ঐতিহ্যবাহী এবং সংগঠিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তিনি মৌলিক প্রভেদ দেখান। সাঈদ নিজেকে সংগঠিত (Organic) বুদ্ধিজীবী হিসেবে মনে করেন এবং দাবী করেন যে, তাঁরা সমাজের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত, নিয়ত সংগ্রামী ও গঠনশীল। সংগঠিত বুদ্ধিজীবীর ধারণাটি সাঈদ গ্রামসির নিকট থেকে ধার করেন। সাঈদ আরও চান যে বুদ্ধিজীবীরা বেন্দার চিন্তাধারার দ্বারা ঋদ্ধ হোক যেখানে বলা হয়েছে যে, কোনো পার্থিব শক্তিই খুব বেশি বড়ো-নয়। এভাবে সাঈদের বুদ্ধিজীবী দর্শন সম্পূর্ণ, বিপরীতধর্মী দুই ব্যক্তিত্ব,গ্রামসি ও বেন্দার চিন্তাধারার মিশেলে রচিত। তাঁর মতে একজন বুদ্ধিজীবীর একটি বাণী, একটি লক্ষ্য, একটি দৃষ্টিভঙ্গি, একটি দর্শন কিংবা মতাদর্শ প্রকাশ, রূপায়ণ কিংবা প্রচার করবার গুণাবলীর অধিকারী হওয়া আবশ্যক। তার দায় হলো জনসমক্ষে বিব্রতকর প্রশ্ন উত্থাপন করা কিংবা গোঁড়ামি আর ধর্মান্ধতার মোকাবিলা করা। বিশ্বজনীন নীতিমালার আলোকে বুদ্ধিজীবীরা এগুলো করবেন, যেমন স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার সম্পর্কিত আচরণের মানদণ্ড প্রত্যাশার অধিকারী সকল মানুষ। অতএব সাঈদ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবেই দেখান যে, বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা প্রধানত গুণ।

'রিপ্রেজেনটেশন অফ দি ইনটেলেকচ্যুয়াল'-এ সাঈদ নিশ্চিত করে দেখান যে, 'there is no such thing as a private intellectual' (ROI, 9)। প্রকাশরীতির প্রবণতাই গণবুদ্ধিজীবীর মূল প্রবণতা। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি সার্ত্রের কথা বলেন।

একজন বিরোধী সমালোচক হিসেবে তার অবস্থান আমাদের জানায় যে, বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে তাঁর ধারণা কোনো প্রশমনকারীর নয় কিংবা নয় কোনো ঐক্য-নির্মাতার। এটি বরং এমন একজনের ধারণা যার পুরো সত্তা একটি সমালোচনা- বোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

সাঈদের ভাবনায় একজন বুদ্ধিজীবীর অবশ্যই একটি রাজনৈতিকমতাদর্শ থাকবে এবং তিনি অবশ্যই একটি মানবগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করবেন। তিনি অবশ্যই স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক প্রচারিত কর্তৃত্বের ধারণাসমূহকে ভেঙ্গে ফেলবেন। সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র পরিচিতিকে সংরক্ষণ করার জন্যে একজন বুদ্ধিজীবী নিরন্তর কাজ করে যাবেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে সাঈদ আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধে ফ্রানৎস ফেনো এবং কামুর মতো বুদ্ধিজীবীর অবদানের কথা বলেন।

উক্ত গ্রন্থের 'Speaking Truth to Power' প্রবন্ধে সাঈদ একজন বুদ্ধিজীবীর জন্যে সবচাইতে মৌলিক প্রশ্নটি উত্থাপন করেন :- 'How does on speak truth? What truth? From whom and where?' (ROI, 65)। সাঈদ মনে করেন যে লেখকী ইচ্ছার প্রতিফলন টেক্সটের ভেতরে বিদ্যমান এবং একটি টেক্সট নিছক একটি ডিসকোর্সের ব্যাখ্যার চেয়ে অনেক বেশিকিছু। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কলম ধরবার সামর্থ্যের ভেতরেই প্রতিবাদের শক্তিকে একজন যথার্থ বুদ্ধিজীবী অনুভব করেন।

www.pathagar.com

একজন উত্তর-উপনিবেশিক লেখক হিসেবে আত্ম-পরিচিতির নিরিখে তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেন। অধিকন্তু সাঈদ একজন বুদ্ধিজীবীকে তার জ্ঞানদীপ্তির উজ্জ্বলতায় সীমালঙ্ঘনেরও আহ্বান জানান। আপন পরিচিতির সাথে অন্যের পরিচিতির বাস্তবতার সমন্বয় ঘটানোর কথা তিনি বলেন। তবে অন্যের সংস্কৃতিকে অবদমন করার তিনি ঘোর বিরোধী। তিনি যুক্তি দেখান যে, একজন বুদ্ধিজীবীর উচিৎ মুক্তি এবং জাগৃতির কথা প্রচার করা। এটি কেবল একটি ইহবাদী উপায়েই সম্ভব বলে সাঈদ মনে করেন। তিনি মনে করেন যে বুদ্ধিজীবী একটি সেক্যুলার সত্তা (a secular being)।

চূড়ান্ত বিচারে, একজন গণবুদ্ধিজীবী হিসেবে সাঈদের ওপর গভীরতম প্রভাব পড়েছে তাঁর নিজেরই। কোনো কর্তৃত্বময়, আগ্রাসী সংস্কৃতির প্রতি মাথা নত না করার মানসিকতা, আমৃত্যু নির্বাসিত অবস্থান, প্রান্তে অবস্থানের চির অভিলাষ, সর্বোপরি আপোষহীন রাজনৈতিক দৃঢ়তা তাঁকে একটি ভিন্ন জগতের কথা ভাবিয়েছে– যেখানে আত্ম (self) এবং অন্য (other) পরস্পরের করুণার পাত্র নয়। সে জগতই সাঈদের বুদ্ধিজীবীর জগৎ।

আজকের কাগজ, ১১ ডিসেম্বর '০৩

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ
মননযোদ্ধার শেষ বাক্য

সিরাজ কাজী

আপন জনগোষ্ঠীর নির্বাসিত জীবনের পাথুরে দীর্ঘশ্বাসের মতোই সমান ওজনশীল কষ্ট-যাতনাকে বুকে নিয়ে চিরদিনের জন্য চলে গেলেন এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ। আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান একজন মননযোদ্ধা। সাহিত্য সংস্কৃতি সঙ্গীতসহ মানবীয় কর্ষণার নানান সুকুমারলোকে বিচরণশীল মানুষটি সমানভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন মানবজাতিত্ব, এর অস্তিত্ব, এর মর্যাদাকে। অতীত থেকে তার সমকাল, মহল বিশেষের দ্বারা আক্রান্ত মানবতা, মানব সভ্যতার ক্রন্দনশোর শুনে শুনে তিনি বেড়ে উঠেছেন। প্রত্যয়দীপ্ত হয়েছেন। লিখেছেন। প্রাচ্যের 'আল আহরাম' থেকে পাশ্চাত্যের 'গার্ডিয়ান'। ওয়ার্ল্ড রিপোর্টেড আরো কতো জার্নাল, নিয়মিত তিনি লিখেছেন। রাজনৈতিক নানা ভাষ্য। সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের মুখোশটি উন্মোচন করে দেয়া, প্রাচ্যলোক, প্রাচ্যলোকবাসীর বোধ ও মূল্যবোধ, পরমতসহিষ্ণু এশীয় বাণী, মানুষকে মানুষরূপে গ্রহণ করার মাঙ্গলিক বাসনা তথা উদার প্রাণশীল ইসলামের সুশীতল ছায়া ইত্যাদিতে উদ্দীপ্ত ছিলো এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের লেখনী। তাঁর ভাষ্য, মানব সমাজ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ এতোটাই জোরালো এবং যুক্তিগ্রাহ্য ছিলো যা কী না সইতে পারতো না আমেরিকার কোনো কোনো ঈর্ষাতুর মহল। অভিহিত করতো 'টেরর প্রফেসর' হিসেবে। ধন্যবাদ জানাতে হয় তাঁর আমৃত্যু কর্মক্ষেত্র কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে পাশে থেকেছে এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের। কর্পোরেট আমেরিকার প্রভাবিত প্রচার মাধ্যমে একদা এমন রটনাও ছড়িয়ে দেয়া হয় বিশ্বময় 'ইসরাইলি সীমান্ত রক্ষীদের ক্যাম্পকে লক্ষ্য করে লেবাননভূমি থেকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছেন এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ।' কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সম্মান দেখিয়েছে আমেরিকার বুকে নির্বাসিত প্যালেস্টাইনী মানুষটির প্রতি। জীবনের উজ্জ্বল যৌবনের বিশেষ একটি পর্যায় থেকে চল্লিশটি বছর আমৃত্যু তিনি অধ্যাপনা করে গেছেন কলাম্বিয়ায়। শিক্ষাবিদদের প্রতি শিক্ষালয়ের ওই সম্মান প্রকৃতপক্ষে মুখ রক্ষা করেছে আমেরিকার ভালো মানুষগুলোর। এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করেন নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে ৬৮ বছর বয়সে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩-এ। আপন জনগোষ্ঠী-নির্যাতিত নির্বাসিত ফিলিস্তিনবাসী। অসহায় আদম সন্তান আবালবৃদ্ধবণিতা। একদা যাদের ভিটেমাটি ছিলো। ছিলো জন্মভূমি। শরণার্থী ভুবনে যাত্রা শুরু ১৯৪৮ থেকে। ঔপনিবেশিক বৃটিশ রাজশক্তির নানান

www.pathagar.com

ছল-চাতুরি এবং আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতার ফলে ইসরাইল নামক বিষফোঁড়া রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদকেও ত্যাগ করতে হয় মোহন মায়াময় জন্মস্থান জেরুজালেম নগরী। মা-বাবার সাথে চলে যান কায়রো তেরো বছর বয়সে। পৃথিবীর অন্যতম সুপ্রাচীন নগরী জেরুজালেমে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৫-এ। এক খৃস্টান পরিবারে।

কায়রোয় চার থেকে পাঁচ বছর কাটে নির্বাসনে। পড়াশুনার মাধ্যমিক স্তরটি অতিক্রমণ এবং কলেজে কিছুদিন। বয়স যখন সতেরোর ঘরে, মা-বাবার সাথে আমেরিকায়। কলেজ পাঠ্যক্রমের অবশিষ্ট পড়াগুলো সম্পন্ন করে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে। একেকটি সোপান পেরিয়ে অবশেষে পিএইচডি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪তে। এর আগের বছর যোগদান করেন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে। আমৃত্যু ওখানেই থেকে গেলেন। পড়াতেন ইংরেজি, তুলনামূলক সাহিত্য লিখতে পারতেন একাধিক ভাষায়। মাতৃভাষা আরবির পাশাপাশি ইংরেজি ও ফরাসি। পড়তে পারতেন ততোধিক ভাষায়। ইতালি-জার্মান-ল্যাতিন ও স্প্যানিশ।

সুদূর আমেরিকার বুকে ভার্সিটিতে একজন টিচার হিসেবে বেতনতো নেয়াহেত কম পেতেন না। পারতেন না কি তথাকথিত নন্দন সায়রে অবগাহন আর ভোগবাদি জীবন বেছে নিতে? ধাত এবং মেজাজে মানবপ্রেমিক এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ হাতে তুলে নিলেন কলম। সভ্যতা নির্মাণের অন্যতম এক মননাস্ত্র। লিখলেন একের পর এক গ্রন্থ। *বিগিনিংস* (১৯৭৫) *দ্য কোয়েশ্চান অব প্যালেস্টাইন* (১৯৭৯) *লিটারেচার এন্ড সোসাইটি* (১৯৮০) *কভারিং ইসলাম* (১৯৮১) *দ্য ওয়ার্ল্ড, দ্য টেক্সট এন্ড দ্য ক্রিটিক* (১৯৮৩) *আফটার দ্য লাস্ট স্কাই* (১৯৮৬) *ব্লেমিং দ্য ভিকটিমস* (১৯৮৮) *মিউজিক্যাল ইবারোরেশন* (১৯৯১) *কালচার এন্ড ইম্পেরিয়ালিজম* (১৯৯৩) *আউট অব প্লেস* (১৯৯৯) *দ্য রিফ্লেকশন অন এক্সাইর* (২০০০) ইত্যাদি। গ্রন্থরাজি, একেকটির নাম শুনলেই বুঝা যায় এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের ইস্পাতকঠিন অভিপ্রায়। অনুভব করা যায় তাঁর সত্যসন্ধানী লেখক সত্তা। পৃথিবীর নানান দেশে নানান ভাষায় গ্রন্থগুলো অনূদিত। পাঠকপ্রিয়তা ঈর্ষণীয়।

তাঁর লেখা সবচেয়ে আলোচিত যে বইটি-এর নাম Orientalism বা প্রাচ্যবাদ। এশীয়বাণী, প্রাচ্যলোকবাসীর মানবপ্রেম, ধর্মপ্রাণশীল অনুভব, শিক্ষা, সহনশীলতা, সবকিছুকে তছনছ করে দেয় পাশ্চাত্যশক্তি বিশেষ করে বৃটিশ-সহনশীলতা,সবকিছুকে তছনছ করে দেয় পাশ্চাত্যশক্তি বিশেষ করে বৃটিশ-ফরাসি রাজশক্তি প্রাচ্যলোকে ওদের ঔপনিবেশিক শাসনামলে। ওদের শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে-পাঠ্যক্রমে, উপনিবেশে পর্যন্ত এমন সব শিক্ষাক্রম চালু করা হয় যেনো ওরাই শ্রেষ্ঠ। মেকি শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার ওরা কেড়ে নেয় প্রাচ্যলোক মনুষ্যত্ব। উপনিবেশবাসীর ভাবনা-চিন্তায় পরিয়ে দেয় দাসত্বের শৃঙ্খলা। প্রাচ্যের ওপর চলে পাশ্চাত্যের শাসন এবং শোষণ। তার প্রভুত্ব বিস্তার। এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ আবিষ্কার করেন নিষ্পিষ্টপ্রাণী সত্যকে বন্দী করে রাখা অন্ধকূপ। দেখিয়ে দেন-অন্যকে ছোট করে বড়ো হওয়া যায় না। *Orientalism*-এর মোদ্দাকথা, মোদ্দাসুর প্রাচ্যের গৌরবময় অতীত, তার ঐতিহ্যের ঝঙ্কার বিশেষ। গ্রন্থটি গোটা দুনিয়ায় দু'ডজনেরও বেশি ভাষায় অনূদিত। এটির প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭-এ।

www.pathagar.com

পৃথিবীর নামকরা অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ রেখেছেন এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ। দেড়শ'র অধিক। বিদগ্ধজন, মুক্তপ্রাণ মানুষের সমাবেশে তাঁর আহ্বান ছিলো-শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার বর্জন। 'মনুষ্যত্বের মুক্তি।' নিজের জন্মস্থান জেরুজালেম আর জন্মভূমি ফিলিস্তিন, ছোটকালের খেলার সাথী এবং স্কুলে সহপাঠীচক্র, শরণার্থী-নির্বাসিত ফিলিস্তিনি, পিএলও, হামাস এবং জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ, আদম সন্তানের হাহাকার, দীর্ঘশ্বাস প্রতিধ্বনিত হয়েছে এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের লেখায়, ভাষণে। -বৃদ্ধ ময়দানে ইসরাইলের বিরুদ্ধে লড়াকু যোদ্ধার অন্তরে, সমগ্র আরবের জনপ্রাণে এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ স্বীকৃত হন বহির্বিশ্বে একজন কলমীযোদ্ধা, বক্তা প্রতিনিধি রূপে। বলার অপেক্ষা রাখে না মহলবিশেষ, ঈর্ষাতুর মহল কিংবা কর্পোরেট আমেরিকা আদতে ওটা ইহুদী বলয়; অপশক্তির নানান বাধার মুখে কাজ করে গেছেন এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ। লাভ করেছিলেন আমেরিকান কলা ও বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্যপদ। অবসর বলতে কিছুই ছিলো না সাধক এ কর্মী পুরুষের জীবনে। তার দুঃখ,তার কষ্ট-যন্ত্রণা, নির্বাসিত জীবনের সকল বেদনা ছিলো ফিলিস্তিনবাসীর দুঃখ-কষ্ট-যাতনা-বেদনার সাথে একাকার।

হল্যান্ডের হেগ নগরীর বুকে অবস্থিত Institute of Social Studies (ISS) এর ৫০তম বর্ষপূর্তি উদযাপিত হলো গতবার। সে উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদকে তাঁর কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ অনারারি ডক্টরেট দেয়ার। ISS মূল্যায়নটা ছিলো-'সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক সমালোচনায় তাঁর (এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ) দৃঢ়তাপূর্ণ সারগ্রাহী আন্তর্জাতিক বক্তব্য, সার্বজনীন মূলভাব-আশ্রিত অদম্য-জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তি বনাম সমাজ, নৈতিক পছন্দ, সংখ্যাগুরু বনাম সংখ্যালঘুর অধিকার এবং রাজনৈতিক দমন-পীড়ন বিষয়' (His consistent international and eclectic approach in his literary and cultural criticism, addreessing unirevsal themes such as nationalism, the individual versus society, moral choices, majority versus minority rights and political repression).

অসুস্থতাজনিত কারণে তাঁর পক্ষে সে সময় (অক্টোবর ০২) সম্ভব হয়ে ওঠেনি নিউইয়র্ক থেকে হেগ নগরীর বুকে যাওয়া। চলতি বছর মে'র দিকে কিছু সময়ের জন্য তিনি গমন করেন হেগ নগরীতে। স্বল্পকালীন অবস্থানের একটি পর্যায়ে কার্ডিয়াল ভিজিটে যান ISS দপ্তরে। গ্রহণ করেন উল্লেখিত ডক্টরেট সম্মাননা। অতঃপর প্রতিক্রিয়া যেভাবে ব্যক্ত করেন- 'ডক্টরেট সম্মাননাটিকে আমার জনগণের প্রতি স্বীকৃতি হিসেবেই দেখছি, প্যালেস্টাইনিয়ান জনগণ, সকরুণ অস্তিত্বে যারা আজ বিপদ-সঙ্কুল অবস্থায়' (I see the award of the doctorate as a recognition of my people, the palestinian people, whoe are in danger of being forgotten).

কথাগুলো চার কী পাঁচ মাস আগের। এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ লিউকেমিয়া বা ব্লাড ক্যান্সারে ভুগছিলেন। বিগত একটি যুগ। হেগ-এর পর, হবে নিরা যায় তাঁর পক্ষে আর কোথাও যুক্ত করা, কোনো ম্যাসেজ রাখা বোধ হয় সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সত্যতা খুঁজে নেয়া যায় ISS দপ্তরে বলা তাঁর একটি কথার ভেতর- I am feeling reasonably well at the moment, but next week could be a different story.

কর্ডিয়াল ভিজিটের একটি পর্যায়ে সাংবাদিক হেইকো জেসায়ানকে (Heiko Jessayan)

দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ বলেন–'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি অকৃত্রিম মানবিক মূল্যবোধ-মর্যাদা এবং সংহতির অনুরূপ। আমার বিশ্বাস আমরা পরস্পর শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারি এবং তার ফলে আমরা ভারসাম্যপূর্ণ একটি অর্থনীতি এবং পরিবেশ আবহ তৈরী করতে সমর্থ হবো। ওসব বিষয়ে আমরা শিখতে পারি এবং ওটা হচ্ছে আমার আশাবাদের ভিত্তি।' কথাগুলো মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উঠে আসা মুক্তপ্রাণ, প্রসন্ন মনের প্রতিধ্বনি বিশেষ। খোলামেলা, পরিষ্কার। সাক্ষাৎপর্বটি প্রকাশিত হয় ডাচ ডেইলি 'হেট ফিনান্সিয়ালি ডাগ ব্লাড'-এ (Het Financieele Dagblad) মনে হতে পারে এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ খুব সম্ভব ছাড় দিয়েছেন ইসরাইল তথা ইহুদীবাদ বা জায়নিজমকে। নয়তো মর্যাদা এবং সংহতির কথা আসবে কেনো? কার মর্যাদা এবং কার সাথে কাকে পাশাপাশি রেখে তৈরী হবে সংহতি? সেতো হবে প্রকারান্তরে জায়নিজম তথা ইহুদিবাদকে স্বীকার করে নেয়া। সংশয়বাদী মনের ঘোর কেটে যেতে পারে যদি আমেরিকার তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত রোড ম্যাপের দিকে খানিকটা তাকানো যায়। ইয়াসির আরাফাততো এটা মেনে নিয়েছেন ইসরাইলের অস্তিত্বকে অনস্বীকার্য রেখেই। কই! শান্তি কি এলো মধ্যপ্রাচ্যে? রোড ম্যাপ সম্পর্কে এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের বক্তব্য একদম রাখঢাকহীন–'আপনি বলতে পারেন না এর ফলে মানবাধিকারকে আমরা সমর্থন করছি এবং অতঃপর কোথায় প্যালেস্টাইনীদের উদ্বিগ্নতা সেটাকে গ্রাহ্য করছি' (You can't say: we support human rights and then ignore them where the palestinians are concerned.) রোড ম্যাপের অগ্রবর্তী চেরাবালি অসলো শান্তি (!) চুক্তিরও বিরোধিতা করেছিলেন তিনি।

তার মানে মধ্যপ্রাচ্যের বুকে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির যে কার্বাঙ্কল তৈরী করা হলো ইসরাইল নামক রাষ্ট্র কাঠামোয়, এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ সেটাকে দেখতে চেয়েছেন নির্দোষ প্যালেস্টাইনরূপে। ভূমিপুত্র প্যালেস্টাইনী এবং ছন্নছাড়া বহিরাগত ইহুদী উভয়ের মানবিক মূল্যবোধকে দেখতে চেয়েছেন মর্যাদা ও সংহতির মোড়কে। বিষয়টি আরো খোলসা হতে পারে– এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ কর্তৃক এরিয়াল শ্যারণকে যুদ্ধাপরাধী এবং তার পক্ষে বুশের শক্তির সাফাই গাওয়ার কথাটি উল্লেখের মধ্য দিয়ে– 'Sharon is a criminal, while Bush calls him a man of peace.'

আমেরিকার যুব-জনতার মাঝে অনেকটা সময় ব্যয় করেছেন এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ। যুবশক্তিকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে দীর্ঘদিন ওদেরকে ঘুমন্ত নয়, জাগৃতির মন্ত্রে দরকার উন্নত পরিচর্যা এবং শিক্ষাদান। বিষয়টি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন– বিগত ছ'টি মাস আমেরিকার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে সফর করেছি, ভাষণ রেখেছি। যুব-জনতা যারা শিক্ষার জন্য সমবেত হয়েছেন, আমার অবস্থানটা কোথায় এবং আমি কী বলতে চাই তাদের জানা। আমি বলতে চাই– 'আমি যুদ্ধের এবং চলমান ইসরাইলি নীতির বিরুদ্ধে।' (I am againist war, and againist current Israeli policy)

আমেরিকাকে তিনি দেখতে চেয়েছেন মানুষের জন্য বাসযোগ্য একটি দেশ হিসেবে। সে কী মানবিক অভিপ্সা। বুশ এবং তেল কারবারীদের চেয়ে শ্রেয়তর এক আমেরিকার স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। অভিবাসীদের জন্যেও যে আমেরিকা হবে নিরাপদ। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন– 'বুশ এবং তেল কারবারী গোষ্ঠী। ওরা আমেরিকাকে ছিনতাই করেছে।

এটা ওদের অধিকার আয়ত্তে নয়, এটা ওরা করতে পারে কিভাবে?' (Bush and the oil companies. They have hijacked america.but it does rot belong to them, why should they take it?) এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ আমেরিকার দিকভ্রান্ত যুব-জনতার অন্ত রে উজ্জীবনের একটি শক্তি ফুকে দিলেন। কর্মের মাঝে দুস্তর বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীয় অফিসে হুমকি পেয়েছিলেন মৃত্যু পরওয়ানার। তিনি ভয়ার্ত হননি। মেধা ও মানবিক উৎকর্ষণা সৃষ্টি করার প্রত্যয়ে অসুরবৃত্তির বিপরীতে চালিয়ে যান কলমযুদ্ধ।

কর্পোরেট আমেরিকার প্রচার মাধ্যমে ইন্টারভিউর ব্যাপারে অসংখ্য অনুরোধ পেয়েছিলেন এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ। প্রথমটায় সাড়াও দেন। শেষে অভিজ্ঞতা যা অর্জন করেন– 'অনেক হয়েছে। দীর্ঘ সময়ব্যাপী অর্থহীন প্রশ্নকথার দংশন-যন্ত্রণা কমতো পাইনি।' একটা পর্যায়ে বন্ধ করে দেন ইন্টারবিউ দেয়া। স্বীয় মনন চর্চাকে কেন্দ্রীভূত করে নেন লেখালেখি এবং স্বকণ্ঠ বক্তব্যের মাধ্যমে সেমিনার সিম্পোজিয়ামে। কখনো কখনো রেডিও ইন্টারবিউ দিতেন নাতিদীর্ঘ সময় (I sometimes do a radio programme, but short, rolonger than 20 minutes)

ইরাকের ওপর আমেরিকার আগ্রাসন পরবর্তী গণতান্ত্রিক বাতায়ন খুলে দেয়ার ব্যাপারে এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ সাংবাদিক হেইকো জোসায়ানকে দেয়া ইন্টারভিউতে বলেন– 'গণতন্ত্রটা কি? যদি আমেরিকার কাছেই জানতে চাওযা হয়, আমেরিকায় এটা আপনি কিনে নিতে পারেন যদি কোটি ডলার আপনার থাকে। মাইকেল বোমবার্গের (Michael Bloomeberg) কথাই ধরা যাক। নিউইয়র্কের মেয়র হওয়ার জন্য তিনি খরচ করেন ৬০ মিলিয়ন ডলার। আর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য বুশ খরচ করেন ২০০ মিলিয়ন ডলার। বিশ্ববিদিত বিষয়– নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট তাকে সহযোগিতা করেছে হোয়াইট হাউজে যেতে। ওটা কি গণতন্ত্র?' (Take Michael Bloom berg: he spent 60 million dollars of his own money to become mayor of New York. Bush needed 200 million dollars to become President and he was not elected! The Supreme Court had to help him to the white House. is that democracy?)

বুশ প্রশাসন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ফিল্ডম্যানকে দায়িত্ব দেয় ইরাকের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের। এ ব্যাপারে এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ– বেয়াল্লিশ বছর বয়সী এ ভদ্রলোক নিউইয়র্ক ভার্সিটিতে আইন বিভাগের একজন সহকারী অধ্যাপক গোঁড়াপন্থী একজন ইহুদী। পনেরো বছর যখন তার বয়স, সে সময় থেকে আরবি শিখতে শুরু করেন। বর্তমানে দশ শতকের ইসলামী আইনের একজন বিশেষজ্ঞ।' গোঁড়াপন্থী কথাটার মর্মার্থ বুঝে উঠতে আর বেশি বেগ পাওয়ার কথা নয়। দশ শতক ছিলো পাশ্চাত্য দুনিয়ায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। সে দুনিয়ার নৃপতি, সেনাচক্র এবং জনগোষ্ঠীর একটি অংশ গোঁড়া মতবাদে আঁকড়ে থাকার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো ক্রুসেডের। দশ শতকের ইসলামী আইন কথাটির দ্বারা এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ ইসলাম সম্পর্কে খুব সম্ভব ক্রুসেড প্রস্তুতিকালীন পাশ্চাত্য চেতনার কথাই বুঝেছেন। আসলে ওই সময়কালীন চিন্তা-চেতনায় বুশও যথেষ্ঠ পরিপুষ্ট, গোঁড়া। আফগানিস্তানে আগ্রাসনের সময় মুখ ফসকে একবার বেরিয়েছিলো মনের কথাটি 'ক্রুসেড' উচ্চারণে। ফিল্ডম্যান সম্পর্কে এডওয়ার্ড

www.pathagar.com

ডব্লিউ সাঈদ আরো যা বলেন– 'তিনি ইরাককে কখনো বুঝতে সমর্থ হবেন না এবং আরব দুনিয়া সম্পর্কে সামান্যই জানতে পারবেন।' বুশ প্রশাসনকে ইঙ্গিত করে– 'সংবিধান রচনার দায়িত্বভার কি উন্নতমান শিক্ষিত কোনো একজন ইরাকীকে, ত্রিশ কোটি আরববাসীর মধ্য থেকে কাউকে অথবা মুসলিম বিশ্বের শতকোটি জনতার মধ্য থেকে কাউকে দেয়া যেতো না? ওটা হচ্ছে উন্মত্ততা। আজব দুনিয়ার একটি তামাশা। মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি অপমান' (Couldn't they find someone better qualified Iraqis, or the three-hundred million Arabs, or the billion of Muslims in the world? That's crazy Alice in wonderland. Insulting.)

আজকের দিনে ইহুদীদের মনে-মগজে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার। ১৯৪৮-এর পূর্বাপর সময়কাল থেকে প্রচার করা হচ্ছিলো পুরাকালে জেরুজালেম আর ফিলিস্তিন ছিলো ওদের আদি পুরুষের ভিটেভূমি। সে দাবীতে শুরু হয় ফিলিস্তিনি হত্যা-জখম-ধর্ষণ-বন্দী এবং ভূমি থেকে বিতাড়ন প্রক্রিয়া। আজ বহুমাত্রিক মাতব্বারতুষ্ট বহুজাতিক বণিকগোষ্ঠী এরাই কর্পোরেট আমেরিকা, ইহুদী। জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের রাক্ষুসে দানবের গায়ে আজ বিশ্বায়নের পোশাক। এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ গোড়ায় আঘাত করে বলে গেছেন– 'ইতিহাস আমাদেরকে খুব পরিষ্কার এবং বেদনাদায়কভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, নিষ্কলুষ মানবজাতি হচ্ছে একটি ভ্রান্তকথা, একটি প্রবঞ্চনা (History has shown us very clearly and painfully that puse ethnicity is a delusion) সাংবাদিক হেইকো জেসায়ানকে দেয়া ইন্টারভিউর একেবারে শেষ ধাপে এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের চূড়ান্ত কথাটি– 'That makes the exile a genuine citizen of the world, a successful example of globalisation'? একসাইল বা নির্বাসিত মানবগোষ্ঠী, শুধুমাত্র ফিলিস্তিনবাসীই নন। সঙ্গে আছেন বিপন্ন দুনিয়ার সিংহভাগ জনগোষ্ঠীও। অবিরাম যার পিঠের ওপর চাপকে চলছে কর্পোরেট আমেরিকা তথা ইহুদীবাদী বিশ্বায়ন চাবুক। এদিক-ওদিক ঘাড় ফেরানোর উপায় নেই. ধড়ের কাছেই উদ্যত বিশ্বায়নের রক্তাক্ত খড়গ। সত্যিই, শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীসীর কণ্ঠনিসৃত কী তাৎপর্যবহ বাক্য, তাঁর শেষ কথাও বটে। অতঃপর শুরু হোক নির্বাসিত-নিষ্পিষ্ট বিশ্বমানবতার জাগরণ। এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ সে ম্যাসেজটিই রেখে গেলেন।

ডিভেলপমেন্ট ইস্যুস-আইএসএস জার্নাল
ভল্যুম ৫ নাম্বার ২ সেপ্টেম্বর ২০০৩, হেগ, হল্যান্ড।
ইত্তেফাক, ২৪ অক্টোবর '০৩

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড সাঈদ
লেখা যখন সক্রিয়তা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

উত্তর-উপনিবেশী সাহিত্যতত্ত্বের বিকাশ এবং গুরুত্ব অর্জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত এডওয়ার্ড সাঈদের নাম। (তাঁর নামের কী উচ্চারণ? সেইড না সাঈদ? পশ্চিমারা বলে প্রথমটি, আমরা দ্বিতীয়টি। *ওরিয়েন্টালিজম* গ্রন্থের রচয়িতার জন্য সিদ্ধান্তটি গুরুত্বপূর্ণ। সেইডকে ডি-এ্যাংলিসাইজড করলে সাঈদ হয়, কিন্তু তার প্রথম নাম যে এডওয়ার্ড, তাকে ইংরেজি-বিযুক্ত করা যায় না। প্রাচ্যবাদের আঙুলগুলো সত্যি কী দীর্ঘ!) *ওরিয়েন্টালিজম* (১৯৭৮) এক সেমিনাল কাজ, যুগ-উদ্বোধক। এ বইয়ের চিন্তাগুলো আশির ও নব্বইয়ের দশকের উত্তর-উপনিবেশী থিওরির সংহতি অর্জন এবং একাডেমিক ডিসিপ্লিন হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অন্তর্ভুক্তির পেছনে বড় অবদান রেখেছে। আবার ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর সাঈদ নামলেন নতুন এক ভূমিকায়। তিনি নির্যাতিত বাস্তুচ্যুত এবং নির্বাসিত প্যালেস্টাইনিদের পক্ষে কলম ধরলেন। *ওরিয়েন্টালিজম*-এর তিন বছর আগে প্রকাশিত *বিগিনিংস গ্রন্থ* থেকেই তিনি উত্তর-উপনিবেশী তত্ত্বের বলয় থেকে উত্তর-উপনিবেশী প্রতিরোধের অঞ্চলে প্রবেশ করলেন। সাঈদ যা বিশ্বাস করতেন, তা-ই লিখতেন। তার শত্রুর অভাব ছিল না কোনো কালেই। কিন্তু ইসরায়েল রাষ্ট্র ও এর উপনিবেশী ও আগ্রাসী নানা নীতি এবং ইহুদিবাদের মানবতাবিরোধী অবস্থানগুলো চিহ্নিত করে তিনি তার তীব্র সমালোচনা করায় যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিবাদী একাডেমিক লবিটি তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাকে 'প্রফেসর অব টেরর' বলে ডাকা শুরু করে। সাঈদের প্রতি পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় দল (শুধু ইহুদি নয়) এবং মিডিয়া তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এবং মৃত্যুর পরও বৈরী আচরণ করে গেছে। সিএনএন, এমনকি বিবিসিতেও তার মৃত্যুকে অনেকটা গুরুত্বহীন একটি সংবাদ হিসেবে প্রচার করা হয়েছে। ইন্টারনেট তালাস করে দেখেছি, বিশ্বের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেসব অবিচ্যুয়ারি লেখা হয়েছে, তাতে ব্রিটেন ও ভারতের কয়েকটি কাগজ ছাড়া, বাকিগুলো দায়সারা। আরববিশ্বের পত্রিকাগুলো সঙ্গত কারণেই আবেগাক্রান্ত। ইসরায়েলের কাগজগুলো কী লিখেছে দেখা হয়নি। সেগুলো যদি সাঈদকে হামাসের সদস্য বানিয়ে ফেলে, অবাক হবো না।

১৯৯৩ সালে বিবিসির রেডিও ফোর-এ সম্মানজনক রিজ বক্তৃতা দেওয়ার জন্য সাঈদকে আমন্ত্রণ জানানো হলে ব্রিটেনের অনেক বুদ্ধিজীবী তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। প্যালেস্টাইন মুক্তি আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্যকে কীভাবে এই মহান বক্তৃতার

www.pathagar.com

জন্য ডাকা হলো, এই প্রশ্ন ছিল অনেকের। *সানডে টেলিগ্রাফ* পত্রিকায় এই বক্তৃতা সিরিজকে 'প্যালেস্টাইনি অপপ্রচার' বলেও আখ্যায়িত করা হয়। ১৯৯০ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধ ও (বড়) জর্জ বুশের সমরনীতির কড়া সমালোচক ছিলেন সাঈদ এবং ২০০১ সেপ্টেম্বর ১১ পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ অবস্থান ও সাম্প্রতিক ইরাক আক্রমণের তিনি প্রবল প্রতিবাদ করেছেন। সংবাদপত্রে অসংখ্য লেখালেখির মাধ্যমে সাঈদ তার অবস্থান তুলে ধরেছেন। সেগুলো মার্কিন প্রশাসন, ডানপন্থি রাজনীতিবিদ ইহুদিবাদী একাডেমি, যুদ্ধবাদী মিডিয়ার যে মনোপূত হবে না, তা বলাই বাহুল্য। ইন্টারনেটবাহিত হয়ে সেগুলো আমাদের হাতেও পৌঁছেছে এবং শুভবুদ্ধির মানুষ সেসব পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এখন যদি আমেরিকার 'এমবেডেড মিডিয়া' তাকে অবজ্ঞা করে এবং তার প্রতি অসূয়াপ্রসূত আচরণ করে, তাহলে বুঝতে হবে সাঈদের 'প্রতিরোধ এবং প্রতি অবস্থান গ্রহণের' মন্ত্রটি শুধু একটি উত্তর-ঔপনিবেশিক জপমন্ত্র নয়, সক্রিয়তার একটি কর্মসূচি হিসেবেও সফল হয়েছে। যদি কোনো গাছ থেকে হঠাৎ দলে দলে ক্ষিপ্ত মৌমাছি বেরিয়ে পড়ে এবং হুল ফুটানোর জন্য উন্মুখ উড়াল দিতে থাকে, বুঝতে হবে চাকের ঠিক জায়গাতে ঢিল পড়েছে।

উত্তর-উপনিবেশী আদি তত্ত্বগুরুদের একজন, ফ্রানৎস ফাঁনো-র মতো, তবে অনেক বেশিসক্রিয় এবং দৃশ্যমানভাবে সাঈদ তাঁর তত্ত্বগুলোর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন জীবনে। এ রকমটি বিরল জগতে। এ জন্য সাঈদ বেঁচে থাকবেন।

লেখা দিয়ে জবাব (writing back) এবং সক্রিয়তা হিসেবে লেখা (writing -as-action)

একটা সাই-ফাই ছবি হয়েছিল, *দি অ্যাম্পায়ার স্ট্রাইকস ব্যাক* নামে সত্তরের দশকে। তারপর সালমান রুশদি ইংরেজিতে ভারতীয় ও অন্যান্য 'কলোনি'র লেখকদের সাহিত্যরচনার বিরাট ঘটনার প্রেক্ষিতে যখন 'কেন্দ্রের কাছে সাম্রাজ্যের লিখে জবাব দেওয়া–রাইটিং ব্যাক–' কথাটি চালু করলেন, তখন তিন উত্তর-উপনিবেশী পণ্ডিত তাদের একটি বইয়ের নাম দিলেন *দি অ্যাম্পায়ার রাইটস ব্যাক*। কথাটা এখন অতি ব্যবহারে জীর্ণ, কিন্তু শুরুতে উত্তর-উপনিবেশী সাহিত্যের ও তত্ত্বের একটি মূল উদ্দেশ্য/প্রবণতাকেই তা যুৎসইভাবে তুলে ধরেছিল। কেন্দ্রের সাহিত্য প্রান্তের (কলোনির, 'সাম্রাজ্যের') সংস্কৃতি, জীবন, ভাষা, দৃশ্যপট–সবকিছুকে যেভাবে কিনারে ঠেলে দিয়ে গুরুত্বহীন করে ফেলে এবং এর বিপরীতে কেন্দ্রকে সকল জ্ঞান, মূল্যবোধ ও রুচির উৎসভূমি হিসেবে উপস্থাপন করে, তাকে উল্টে দিয়ে কেন্দ্রের 'আদারিং' (অন্য বা নিম্ন প্রতিকল্প নির্মাণের) প্রক্রিয়াটিকে চ্যালেঞ্জ করে বসে এই রাইটিং ব্যাক, কেন্দ্রের তথা পশ্চিমের জ্ঞান ও শক্তির সংযুক্তিটি বিনির্মাণ করে, তার সৃষ্ট অজেয়তার মিথটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে লেখার বিষয়টিকেই প্রতিরোধের কাতারে নিয়ে আসে এই উদ্যোগ। মিশেল ফুকো যে 'আখ্যান– পদ্ধতি' বা 'ডিসকার্সিভ সিস্টেমের' কথা বলেছেন, কেন্দ্র সেগুলো নির্দ্বিধায় ব্যবহার করেছে আধিপত্যবাদ সৃষ্টিতে (গোটা প্রাচ্যবাদ ব্যাপারটিই তাই, সাঈদ তার *ওরিয়েন্টালিজম গ্রন্থে* দেখিয়েছেন)। এ গ্রন্থের প্রকাশনার কয়েক বছর পর *ডয়াক্রিটিকস* নামক জার্নালে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাঈদ বলেছিলেন, তাঁর

www.pathagar.com

অবস্থানটি হচ্ছে একজন প্রাচ্যের মানুষ হিসেবে 'প্রাচ্যবিদদের লিখে জবাব দেওয়া (রাইটিং ব্যাক), যারা দীর্ঘদিন আমাদের নীরবতার কল্যাণে বেড়ে উঠেছেন।' তাদের 'ডিসিপ্লিনের কাঠামো গুঁড়িয়ে দিয়ে' এর 'আধি-ঐতিহাসিক, প্রাতিষ্ঠানিক, পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতাভিত্তি-বিরোধী আদর্শগত পক্ষপাতগুলি চিহ্নিত করে' তাদের কাছেও লিখছেন বলে সাঈদ ওই সাক্ষাৎকারে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন। এর আগে, *বিগিনিংস*-এ লেখাকে সক্রিয়তার একটি অংশ হিসেবে তিনি বর্ণনা করেছিলেন। যেসব 'টেক্সট' (যেকোনো ডিসকোর্স বা আখ্যান যা রোলা বার্থের মতে, একটি 'পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে' বিরাজমান) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রান্ত পেয়েছে কেন্দ্রের থেকে, যেগুলোকে পুনরায় সাজিয়ে নেওয়ার এমনকি পুনর্বার লিখে নেওয়ার যে সম্ভাবনার কথা তুলেছেন সাঈদ, তার জন্য লেখাকেই সক্রিয়তার বাহন হিসেবে বেছে নেওয়াটা প্রায় নির্বিকল্প।

শুরুতে–এমনকি *বিগিনিংস*-এও–সাঈদ কিন্তু এই সক্রিয়তাকে রাজনীতির ক্ষেত্রে নিয়ে আসার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না। একজন বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা কী হবে উত্তর-উপনিবেশী বিশ্বে, সে ব্যাপারে *বিগিনিংস*-এ অস্পষ্টতা রয়েছে। এ বইটি নির্বাসন এবং নীরবতায় পীড়িত শিকড়-বিচ্যুৎ কোনো মাইগ্রেন্টের লেখা নয়, যিনি প্রতিরোধ গড়বেন/গড়ছেন উচ্ছেদকারী উপনিবেশী শক্তির বিরুদ্ধে। মাঝে মাঝে সাঈদ বাস্তুচ্যুৎ প্যালেস্টাইনি,মাঝে মাঝে আমেরিকার এক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পণ্ডিত, যিনি অনেক কিছুই ঠাণ্ডা চোখে দেখে বিচার/ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। বস্তুত *বিগিনিংস* পর্যন্ত সাঈদের একটি সত্তা/পরিচিতি আধিপত্য করেছে, এবং তা হচ্ছে একজন একাডেমিক পণ্ডিতের, যিনি থিওরির রাজ্যে বেশ কিছু নতুন ভাবনাচিন্তার যোগান দিচ্ছেন। কিন্তু এই *বিগিনিংস*-এরই কোনো কোনো জায়গা পড়লে মনে হবে, শুধু তত্ত্ব নয়, যেন সক্রিয়তার সন্ধানে রয়েছে তাঁর আরেকটি সত্তা, যা 'রাজনীতি, ক্ষমতা, আধিপত্যবাদ ও সংগ্রামের' জগতে আরো ঘনিষ্ঠভাবে প্রবিষ্ট। বস্তুত, *ডায়াক্রিটিকস*-এর ওই সাক্ষাৎকারে সাঈদ জানিয়েছিলেন, তিনি নিজেও সচেতন এই 'বিভাজিত জীবন' সম্পর্কে। বলেছিলেন, একদিকে তার একাডেমিক অবস্থান, যা এক 'জগদন্ত মিনারবাসীর' মতো, যেখানে তত্ত্বের খুঁটিনাটিতে নিহিত সব অভিনিবেশ। তাঁর রাজনীতি-সক্রিয় সত্তাটি ছায়া ফেলেছে ওই পণ্ডিতি অবস্থানের ওপর, তাঁকে দিয়েছে নিজের দেশের, সমাজের ও পরিবারের ইতিহাসের কাছে আরো ঘনিষ্ঠ হওয়ার এবং সেই ইতিহাসকে ক্ষমাহীনভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সত্যের কাছে উপনীত হওয়ার অনুপ্রেরণা। একবার ওই সত্যের কাছে পৌছে যাওয়ার পর আর তার কোনো দ্বিধা ছিল না তার অবস্থানকে চিহ্নিত করার। প্রতিরোধ, সংগ্রাম এবং উপনিবেশ-মুক্তির প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ নানান ক্রিয়াশীলতায় পঁচিশ বছর কাটিয়ে জীবনের শেষ দুই-তিন বছরে যেন মুক্তি ও স্বাধীনতার–শুধু প্যালেস্টাইনি নয়, নানা ধরনের উপনিবেশী নিগড়ে আবদ্ধ মানুষজনের–একটি দ্যুতিময় প্রতীক হয়ে দাঁড়ালেন সাঈদ।

এই যে এক জীবনের এক প্রান্ত থেকে অবস্থান বদল করে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তাতে অবিচল থাকা, এটি শুধু সাঈদের ব্যক্তিজীবনের ঘটনা নয়,বরং এতে প্রতিফলিত সার্বিকভাবে উত্তর-আধুনিক সাহিত্যের দু'টি সুস্পষ্ট মোড় ফেরার ঘটনা। পিটার ব্যারি তার *বিগিনিং থিওরি* (ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৯৫) গ্রন্থে তিনটি কাছাকাছি শব্দ ব্যবহার

www.pathagar.com

করে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, adopt, adapt ও adept–এই তিন স্তরে হচ্ছে উত্তর-উপনিবেশী সাহিত্যের বিবর্তন। শুরুতে সকল উত্তর-উপনিবেশী সাহিত্য পশ্চিমা (প্রধানত ইউরোপীয়) মডেল প্রশ্নহীনভাবে গ্রহণ করে–বিশেষ করে উপন্যাসে, এবং একটা সুপ্ত বাসনা সক্রিয় থাকে এর পেছনে যে, মূলধারার সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়ার মতো সাহিত্য/উপন্যাস লিখতে হবে। এই পর্যায়কে বলা যায় adopt বা গ্রহণ-এর পর্যায়। দ্বিতীয়, Adapt বা অভিযোজন-এর পর্যায়ে ইউরোপের ফর্ম বা শৈলীকে দেশজ বিষয়বস্তুর জন্য তৈরি করে নেওয়া হয়। অর্থাৎ পশ্চিমের প্রকাশ বিশিষ্টতাগুলোকে আত্মীকরণের মাধ্যমে 'নতুন সাহিত্য' সৃষ্টি করা হয়। আর তৃতীয় পর্যায়ে কোনো দেশের উত্তর-উপনিবেশী সাহিত্য adept বা বিচক্ষণ হয়ে যায়, পশ্চিমা ফর্মকে সম্পূর্ণ নিজের মতো করে নিয়ে এক ধরনের আধিপত্য বিস্তার করা হয় হয়, তার ওপর।

ওরিয়েন্টালিজম, কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম (১৯৯৩) এবং *দি পলিটিক্স অব ডিসপেজেশন* ১৯৯৪) গ্রন্থে এ রকম একটি প্রক্রিয়াকে আমরা কার্যকর দেখতে পাই। উত্তর-উপনিবেশী লেখক নিজের ইতিহাস ও শেকড়ের সন্ধানে নতুন মানচিত্র তৈরিতে মনোযোগী হবেন, কলোনির শিক্ষা, বিচার ও প্রশাসন-ব্যবস্থা তার ওপর যেসব প্রভাব ফেলেছে, সেগুলোর ব্যাপারে সংবেদনশীল হওয়া এবং উপনিবেশ-উত্তর সময়েও যে তাদের প্রভাব বিদ্যমান থাকে সেভাবে সতর্ক হওয়া এবং উপনিবেশীদের জ্ঞানতত্ত্বকে আমূল পাল্টে বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং রুচির পশ্চিমা নির্মাণগুলোকে ডিকনস্ট্রাক্ট করে নতুন নির্মাণ শুরু করা–এসবই এই ত্রি-স্তরবিশিষ্ট প্রক্রিয়ার অংশ। সাঈদও শুরুতে পশ্চিমা মূলধারাতেই নিমজ্জিত ছিলেন। ১৯৩৫ সালে জেরুজালেমে জন্ম নেওয়া সাঈদকে পরিবারের সঙ্গে দেশান্তর হতে হয়েছিল কায়রোতে, ১৯৪৮ সালে (ওই বছরই ইসরায়েল দখল করে নেয় প্যালেস্টাইন)। তারপর যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস-এর মাউন্ট হার্মন স্কুল ও প্রিন্সটন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে তিনি ১৯৬৬ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। ওই বছরই তার প্রথম বইটি প্রকাশিত হয় : *জোসেফ কনরাড অ্যান্ড দি ফিকশনস অব অটোবায়োগ্রাফি*। কনরাডকে নিয়ে লিখেছেন বেনিটা পেরিসহ অসংখ্য উত্তর-উপনিবেশী তাত্ত্বিক। তার উপনিবেশী চিন্তা-ভাবনা প্রায় সব উপন্যাসেই আছে, বিশেষ করে *হার্ট অব ডার্কনেস, লর্ড জিম* ও *নস্ট্রমোতে*, কিন্তু সাঈদ এই বিশাল দিকটি নিয়ে উৎসাহ দেখাননি। *বিগিনিংস*-ই তার প্রথম বই, যেখানে অভিযোজনের পর্যায়টি সূচিত। তিনি উত্তর-উপনিবেশী রাইটিং ব্যাককে কিছুটা হলেও বাজিয়ে দেখছেন, নিজের চিন্তা-ভাবনাগুলো মেলাচ্ছেন আধিপত্য, নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতা–এসব উপনিবেশী চিন্তার বিপরীতে। তবে *ওরিয়েন্টালিজম* বইটিই উদ্বোধন করে সাঈদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়, তার adept পর্যায়ের। এই পর্যায়ে তিনি উপনিবেশের চিন্তাগুলোকে পরীক্ষা করছেন, প্রশ্ন করছেন এবং সম্পূর্ণ নিজের মতো করে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন।

ওরিয়েন্টালিজম-এর পর সাঈদের বড় কাজ আমার বিবেচনায়, দু'টি : *কালচার অ্যান্ড ইম্পেরিয়ালিজম* এবং *দি ওয়ার্ল্ড দি টেক্সট এন্ড দি ক্রিটিক*। এ দু'টি গ্রন্থে সাঈদ শুধু যে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং এর চিহ্নগুলো মুছে ফেলার প্রয়াসের কথা বলেছেন তা

www.pathagar.com

নয়,বরং সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চিন্তার খোলস থেকে বেরিয়ে এসে 'মানবসমাজ ও মানবমুক্তির' লক্ষ্যে 'একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি' গ্রহণের জন্যও বলেছেন। সাঈদ কখনো সংকীর্ণ অর্থে জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেননি। প্যালেস্টাইনের মানুষ, ইতিহাস, ভূগোল ও সংস্কৃতি'র পক্ষে বলে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিলেও বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর সমালোচনা করেছেন। তিনি ইয়াসির আরাফাতের চেয়ে নেলসন ম্যান্ডেলাকে ওপরে স্থান দিয়েছেন, যেহেতু ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের অতিশয় ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদী অবস্থানের বিরুদ্ধে আজীবন যুদ্ধ করেও নিজে থেকেছেন এক উদার, ব্যাপকভিত্তিক ও বহুজাতিক জাতীয়তাবাদী চেতনার অনুসারী হয়ে।

যারা সাঈদকে প্যালেস্টাইনের পক্ষে অপপ্রচারকারী হিসেবে অভিহিত করে, তারা তার এই নৈতিক-নান্দনিক-রাজনৈতিক এবং ইতিহাস ও সমাজ-আশ্রিত চিন্তাকে বুঝতে প্রকৃত অক্ষম, অথবা ইচ্ছে করেই অক্ষম।

ওরিয়েন্টালিজম-এ সাঈদ নিজেই বলেছেন, কলোনি নেই কিন্তু তার চিহ্ন আছে। প্রাচ্যবাদী চিন্তা এখনো সতেজ। সেপ্টেম্বর ১১ পরবর্তী বিশ্বে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানরা, (হায় ইরাকিরা)! সেটি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। ওরিয়েন্টালিজম রিভিজিটেড!

সাঈদের প্রাচ্যবাদ

সাঈদের *ওরিয়েন্টালিম* শুরু থেকেই উত্তর-উপনিবেশী চিন্তাকে ইতিহাস, রাজনীতি ও সংস্কৃতির অঞ্চলে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছে এবং ক্ষমতা, বিশেষ করে আধিপত্যবাদী ক্ষমতাকে বৈধতা ও ব্যাপকতা দিতে জ্ঞানকে কীভাবে ব্যবহার করছে, পশ্চিমা উপনিবেশী শক্তি, সে সম্পর্কে নতুন পাঠ উপহার দিয়েছে। মূলত উনিশ ও শুরুর বিশ শতকে পশ্চিমা এসব দেশ (প্রধানত ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স) কীভাবে উত্তর-আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতকে উপস্থাপন করছে, তার একটি আখ্যান হলেও *ওরিয়েন্টালিজম* অতীতের প্রাচ্যবাদী উৎসের কাছে যেমন গিয়েছে, তেমনি ভবিষ্যতে (আমাদের বর্তমান, নিকট এবং হয়তো দূর ভবিষ্যতেও) প্রাচ্যবাদের রূপ কী হতে পারে, তার একটি সম্ভাব্য চিত্রও তুলে ধরেছে। 'বর্তমানে প্রাচ্যবাদ' শীর্ষক এই গ্রন্থের তৃতীয় অংশে সাঈদ দেখিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদের দোসর হিসেবে প্রাচ্যবাদ কীভাবে বিদ্যমান পশ্চিমের ক্ষমতা-দর্শনে ও চর্চায়। 'নতুন সাম্রাজ্যবাদ খুব সাফল্যের সঙ্গে প্রাচ্যবাদকে নিজের কাঠামোয় মিলিয়ে নিয়েছে', বলেছেন সাঈদ। সেপ্টেম্বর ১১ পরবর্তী বিশ্বে এ বিষয়টি কতখানি অকাট্য সত্য, তা আর বলে দিতে হয় না। ইরাকের হাতে ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে—এই রণহুঙ্কার যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তা জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকরা ইরাকে সারা জীবন খুঁজলেও পেতেন না, কারণ একটি যুক্তরাষ্ট্রের (এবং যুক্তরাজ্যের) পূর্বের সঙ্গে জ্ঞান ভাগাভাগী করে নেওয়ার ভীতি এবং সে সঙ্গে সাম্রাজ্য হারানোর শঙ্কা থেকে উৎপাদিত। জ্ঞানকে পশ্চিম নিজের নিরঙ্কুশ অধিকারে রাখতে চায়। ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইট নামে যে কৌশল পশ্চিম গ্রহণ করেছে, তার পেছনে আছে জ্ঞানের ওপর আধিপত্য হারানোর ভয়। এগুলো প্রাচ্যবাদের নতুন নানা রূপ।

www.pathagar.com

প্রাচ্যবাদ বিষয়টি আসলে কী? এর সংক্ষিপ্ত (এবং প্রয়োজনীয়ভাবেই অসম্পূর্ণ) একটি উত্তর হতে পারে, এ হচ্ছে প্রাচ্য সম্পর্কে জ্ঞান-চর্চার ভেতরে প্রাচ্যকে প্রথাবদ্ধ করে ফেলে প্রাচ্যকে পশ্চিমের একটি প্রতিকল্প বা 'আদার' হিসেবে দাঁড় করানো এবং সাম্রাজ্যবাদকে প্রচ্ছন্নভাবে সহযোগিতা করার একটা প্রবণতার প্রকাশ। প্রাচ্যবাদকে সাঈদ দেখেছেন একটি ডিসকোর্স অথবা আখ্যান হিসেবে এবং বলেছেন এভাবে না দেখলে ইউরোপীয় সংস্কৃতি যে 'বিশাল পদ্ধতিগত শৃঙ্খলার' মাধ্যমে প্রাচ্যকে 'রাজনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক, সামরিক, আদর্শিক, বৈজ্ঞানিক এবং কল্পনাগতভাবে' নিয়ন্ত্রণ এমনকি উৎপাদন করে যাচ্ছে, তা বোঝা যাবে না। মিশেল ফুকোর ওপর লেখা একটি প্রবন্ধে ১৯৮৮ সালে সাঈদ প্রাচ্যবাদ সম্পর্কে যে ধারণা দেন, তাতে *ওরিয়েন্টালিজম* থেকে নিয়ে তিনি যে একটি প্রতি-আখ্যান বা কাউন্টার ডিসকোর্স গড়ে তুলছেন, সে বিষয়ে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।

প্রাচ্যবাদ 'সেলফ' (নিজ) ও 'আদার' ('অন্য' বা 'প্রতিরূপ')–এই মূল দ্বিত্ববাদের ছাঁচে ফেলে পশ্চিমকে এর ইতিবাচক ও প্রাচ্যকে নেতিবাচক মেরুতে স্থাপন করে। কাজেই সাঈদ যেমন *ওরিয়েন্টালিজম*-এর শুরুতেই বলেন, ইউরোপীয় সংস্কৃতি প্রাচ্যকে এর এক ধরনের সারোগেট বা প্রতিনিধিমূলক, এমনকি আন্ডারগ্রাউন্ড বা চোরাগুপ্তা সত্তা হিসেবেও দেখে তার বিপরীতে নিজেকে স্থাপন করে শক্তি ও পরিচিতি লাভ করেছে। তবে এর বাইরে প্রাচ্যবাদ প্রাচ্য সম্পর্কে পশ্চিমের কল্পনা,স্বপ্ন, উৎকল্পনা এবং নানান ধারণার যোগফলও বটে। পশ্চিম তার নিজের বাস্তবতা, যুক্তি ও বিচারের নিরিখে প্রাচ্যকে বিশ্লেষণ করে, ফলে এই কল্পনা,স্বপ্ন ইত্যাদি এক ধরনের দূরবর্তী কিন্তু নেতিবাচক 'কোড' হিসেবে প্রাচ্যের সংস্কৃতি, ধর্ম ও জীবনাচরণকে প্রতিষ্ঠা করে। কল্পনাভিত্তিক হলেও এসব কোড বস্তুগতভাবে উপনিবেশী শাসনের কাজে আসে। এক সময়ের প্রাচ্য সম্পর্কে পশ্চিমা পণ্ডিত, লেখক, ভ্রমণ কাহিনীকার ও অন্যান্য বর্ণনাকারীর 'নিষ্পাপ' বর্ণনাতেও আসলে প্রাচ্যকে অধিকার করার একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রয়াস নিহিত রয়েছে বলেই সাঈদ মত প্রকাশ করেন।

প্রাচ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যের একটি ভূমিকা আছে এবং *ওরিয়েন্টালিজম* গ্রন্থে সাঈদ যেমন বলেছেন, 'ফিলোলোজি [বা ভাষা-ইতিহাসবিদ্যা] অভিধান লেখা, ইতিহাস, জীববিদ্যা, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক থিওরি, উপন্যাস-লেখা এবং গীতিধর্মী কবিতাও' প্রাচ্যবাদের কাজে এসেছে। এসব কারণে প্রাচ্যবাদ একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার কাঠামোর ভেতর দিয়ে প্রাচ্য সম্পর্কে জ্ঞান, চিন্তা, মতামত, ধারণা ইত্যাদিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান ও সত্য হিসেবে প্রচার করা হয়েছে। প্রাচ্যবাদ এভাবে রাজনৈতিক আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কাঠামো হিসেবে বৈধতা পেয়েছে। উপনিবেশী ভারতের প্রচলিত শিক্ষা, বিচার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলোকে 'অসভ্য, অসম্পূর্ণ' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে (মেকলে সাহেবের কথা স্মরণ করুন) এগুলো সরিয়ে পশ্চিমের নানাবিধ ব্যবস্থা সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। হেতু, প্রাচ্যের ত্রুটিপূর্ণ সভ্যতার মেরামতি! টেনিসন বলেছিলেন, 'চীনের প্রাচ্যের এক যুগচক্রের চেয়েও ইংল্যান্ডের/ইউরোপের পঞ্চাশ বছর উত্তম', সাবাশ!

এই প্রগলভ চিন্তায় আছে প্রত্যক্ষ প্রাচ্যবাদের প্রকাশ। তবে প্রাচ্যবাদ সুপ্ত বা

www.pathagar.com

প্রচ্ছন্নরূপেও বর্তমান। ফ্রয়েড থেকে সুপ্ত (latent) এবং প্রকাশিত (Manifest) –এই দু'টি শব্দ ধার নিয়ে সাঈদ দেখিয়েছেন, ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে একটি ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছে প্রাচ্যবাদ – যাতে ওই স্বপ্ন, উৎকল্পনা ইত্যাদি মিশে আছে। কিন্তু এর ধারা থেকে জল নিয়ে 'প্রকাশিত' প্রাচ্যবাদ প্রাচ্য সম্পর্কে নানা বয়ান তৈরি করেছে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই পূর্ব-পশ্চিমের বিভাজন এবং পূর্ব যে পশ্চিমের এক নিকৃষ্ট 'অন্য' বা 'প্রতিরূপ' সে চিন্তাটি আছে মূলে। কেন নিকৃষ্ট? কারণ প্রাচ্য সম্পর্কে সকল প্রথাগত চিন্তাই তো একটি নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরে।

জন ম্যাকলয়েড তার *বিগিনিং পোস্টকলোনিয়ালিজম* (ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ২০০০) গ্রন্থে এই নেতির একটি তালিকা দেন। পূর্বের সময় স্থবির, পূর্ব সময়হীন; পূর্ব এক অদ্ভুত ভূগোল; পূর্বের জাতি বা race গুলোতে রয়েছে নানা সহিংসতা, বীভৎসতা এবং এগুলো তৈরি করে নানা স্টিরিওটাইপ (ভারতীয়রা অলস, আরবরা সহিংস); প্রাচ্যের পুরুষরা নারীসুলভ নানা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, আর নারীরা রহস্যময়ী; প্রাচ্য ক্ষয়িষ্ণু ইত্যাদি। সাঈদ তার গ্রন্থে দেখিয়েছেন এসব স্টিরিওটাইপ পশ্চিম তৈরি করেছে প্রাচ্যকে নিজের ইচ্ছা মতো গড়ে নিতে যাতে নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াস বৈধতা পায়।

পশ্চিমা মিডিয়ার সংবাদ ও সংবাদ-বিশ্লেষণে সম্প্রতি এই স্টিরিওটাইপ নির্মাণের এক প্রবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ইরাক যুদ্ধের সময় সিএনএন-এর এমবেডেড সাংবাদিকরা ছিলেন 'সেলফ' (অর্থাৎ উন্নত, সত্যবাদী, যুক্তিবাদী, বস্তুনিষ্ঠ) এবং ইরাকে কর্মরত অন্য যে কোনো (বিশেষ করে আল-জাজিরা টেলিভিশনের) সাংবাদিক ছিলেন 'আদার' (অর্থাৎ মিথ্যেবাদী, অলস, অসংলগ্ন, অসম্পূর্ণ ইত্যাদি)। এই প্রচারটি জোরেসোড়েই হয়েছিল, একেবারে সুপার-ম্যানিফেস্ট ও ওরিয়েন্টালিজম।

মিডিয়া শুধু মেসেজ নয়, মিডিয়া নতুন নানা উপনিবেশ গড়তে জ্ঞানকে শক্তির প্রয়োজনে কাজে লাগায়–এ সত্যটি এই যুদ্ধে পরিষ্কার দেখা গেছে। সাঈদ অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন ইরাক যুদ্ধ নিয়ে (অরুন্ধতী রায়ের কিছু) এবং সাঈদের এসব প্রবন্ধে প্রাচ্যবাদের নবতম রূপ সম্পর্কে পাঠক সম্যক পরিচিতি লাভ করেছে।

গত দু-এক বছরে আমার মনে হয়েছে প্রাচ্যবাদের মূল প্রতিপাদ্যগুলো আরেকবার যেন প্রমাণিত হয়েছে।

ওরিয়েন্টালিজম রি বিভিজিটেড! বটে! সাঈদকে নিয়ে অনেক কিছু লেখা যায়। যেমন তার অন্য দুটি গ্রন্থ নিয়ে। সাম্রাজ্যবাদের সংস্কৃতি চিন্তা, উত্তর-উপনিবেশী বিশ্বে একজন বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা, প্যালেস্টাইন নিয়ে সাঈদের বই ও লেখালেখি নিয়ে, নির্বাসন ও ডায়াসপোরা নিয়ে অথবা তার ট্রাভেলিং থিওরি নিয়ে (মানুষের মতো থিওরিও ভ্রমণ করে)। এডওয়ার্ড সাঈদকে শ্রদ্ধা।

প্রথম আলো, ৩ অক্টোবর '০৩

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড সাঈদ : তাঁর প্রয়াণে

আবু দায়েন

দ্য এইটিন ব্রুমেয়ার অব লুই বোনাপার্ত-এ কার্ল মার্কস বলেছিলেন: ওঁরা নিজেদের মেলে ধরতে পারে না, ওঁদের মেলে ধরতে হয়। বলাই বাহুল্য, এ 'ওরা' অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিভক্ত বিশ্বের পূর্বাঞ্চল "Orient" তথা প্রাচ্যের পশ্চাদ্‌পদ জনগোষ্ঠি। এ পশ্চাদ্‌পদতা আজ নানাদিকে। পৃথিবীর ইতিহাস, এর ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিত, সভ্যতার ঐতিহাসিক ধারাক্রম, সাংস্কৃতিক বিবর্তন, শাসনতন্ত্র, উপনিবেশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিমী বিশ্বের শাসকশক্তি তথা প্রতীচ্যের এক ধরনের 'শুচিবাইগ্রস্ত' মানসিকতা লুকোনো নয়। ঔপনিবেশিক আমল থেকে হাল জমানা অবধি প্রাচ্য ও তার অধিবাসী জীব প্রতীচ্যের দোর্দণ্ড প্রতাপে স্থাপিত সাম্রাজ্যে কখনো করুণায়, কখনো শাসনে পুষ্ট! শাসন ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিক প্রকরণে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের ভারতভূমিতে শাসকের মস্তিষ্কপ্রসূত যে প্রাচ্যবাদ তা সময়ের তাৎপর্যপূর্ণ বিন্যাসে আজ বিশেষ তত্ত্ব ও হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। দুশো বছরের জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চায় ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবাদ তত্ত্বটি আজকের প্রকরণে বিন্যস্ত হয়েছে মূলত আনোয়ার আবদেল মালেক ('*সিভিলাইজেশন এন্ড সোশাল থিয়োরি*', ১৯৬৩) ও এডওয়ার্ড উইলিয়াম সাঈদের ('*ওরিয়েন্টালিজম*', ১৯৭৭) গবেষণার মধ্য দিয়ে। সূচনা লগ্নে ইংরেজ ও ফরাসি জাতির সঙ্গে প্রাচ্যের (ভারত ও বাইবেলভূমি) যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তারই পরিণত ফসল আজকের প্রাচ্যবাদ। জন্মভূমি প্রাচ্যের সঙ্গে এডওয়ার্ড উইলিয়াম সাঈদের নাড়ির যোগই এর সহৃদয় তাত্ত্বিক বিন্যাসে ভূমিকা রেখেছে।

নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডওয়ার্ড উইলিয়াম সাঈদ গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন ইংরেজি ও তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক। বিশ শতকের একজন প্রতিনিধি-স্থানীয় বুদ্ধিজীবী হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইংরেজি সাহিত্য, সঙ্গীত, সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ে বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন তিনি। ফিলিস্তিনীদের ন্যায্য অধিকার প্রশ্নে তিনি ছিলেন সরব ও সোচ্চার। এ প্রসঙ্গেই বলা হয়ে থাকে, অসির চেয়ে মসি বড় – এ প্রবাদকে সব দিক থেকে সার্থক প্রমাণ করেন এডওয়ার্ড সাঈদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ-নীতি, ফিলিস্তিনি অধিকার, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সঙ্গীত, ইসলাম ইত্যাদি বহু বিষয়ে লেখালেখি করলেও '*ওরিয়েন্টালিজম*' গ্রন্থটি তাঁকে খ্যাতি ও সমালোচনার তুঙ্গস্পর্শী করে তোলে। বইটি বিভিন্ন দেশের ২৬টি ভাষায় অনূদিত হয়। ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবাদকে তিনি অভিনব

www.pathagar.com

বুদ্ধিবাদী তত্ত্বে বিন্যস্ত করেন।

আঠার শতকের শেষার্ধে ভারতে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর মূলত 'ওরিয়েন্টালিজম' শব্দটি প্রচলন লাভ করে। শব্দটি প্রচলন ও তার ভাবের প্রসারে মূল ভূমিকা ছিল কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোনস্ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির। ছিলেন বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস। তাঁদের প্রবক্তন ছিল : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষের আইনানুযায়ী এদেশ শাসন করা উচিত এবং সে জন্য কর্মাধ্যক্ষদের স্থানীয় ভাষা, রীতি-নীতি, লোকাচার, সংস্কৃতি ও জীবনবেদ সম্পর্কে সবিশেষ অবগত হওয়া প্রয়োজন। কারণ শাসিতের সঙ্গে শাসকের সুষম আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে অর্জিত জ্ঞান রাষ্ট্রের পক্ষে উপকারী হয়। এর ফলে কেবল শাসনকার্যই সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয় না, বরং শাসকের আধ্যাত্মিক উন্নতিরও সহায়ক হয় তা। ভারতবর্ষে প্রোটেস্ট্যান্ট সুসমাচার প্রচারকদের আবির্ভাব পর্যন্ত এ নীতি প্রচলিত ছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রাচ্যচর্চার এ বিষয়টিকে নতুন রূপে বিন্যস্ত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ব্রিটিশ ও ফরাসি ঔপনিবেশিক প্রতাপ প্রাচ্যবাদ বা ওরিয়েন্টালিজমকে 'মূল্য নিরপেক্ষ বর্ণনামূলক শব্দ' হিসেবে প্রাচ্য অনুসন্ধিৎসা অর্থে বুঝিয়েছে। সে থেকে 'প্রাচ্য' বা 'ওরিয়েন্ট-কেন্দ্রিক ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, রাজনীতি, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি চর্চাকে 'ওরিয়েন্টালিজম' বা 'প্রাচ্যবাদ' বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বে ব্রিটিশ ও ফরাসি উপনিবেশসমূহের পতন, পৃথিবীর নানা অঞ্চলে উত্তর-ঔপনিবেশিক সেন্টিমেন্টের প্রসার – সাহিত্যে, মননে, রাজনীতিতে; সাম্রাজ্যবাদের নতুন আসনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব ইত্যাদি বিষয় প্রাচ্যবাদী ধারণাকে তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্বে বিন্যস্ত করে। এ তত্ত্বের বিন্যাসে আনোয়ার আবদেল মালেকের গবেষণা পথ দেখায় এডওয়ার্ড সাঈদকে। সাঈদ প্রাচ্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেন প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের মধ্যে সত্তাতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক বিভাজনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক বিশেষ চিন্তাশৈলী হিসেবে। এ বিভাজনকে মনে রেখেই প্রতীচ্যের কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, অর্থনীতিবিদ প্রাচ্যের মানুষ, তাদের জীবন ও সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করেন। এমনি একটি নির্দিষ্ট চত্বরেই আনাগোনা ইস্কিলাস থেকে হুগো, দান্তে, মার্কস সবার। পূর্বাপর সাম্রাজ্যবাদী যুগেই প্রাচ্য প্রতীচ্যের কায়-কারবারের এক বিশেষ হাতিয়ার ও প্রতিষ্ঠান। প্রাচ্যকে শাসন, শিক্ষিত ও সভ্য করে গড়ে তোলা এবং তার নীতি নির্ধারণ করে দিয়ে প্রতীচ্যের আধিপত্য সর্বাংশে নিশ্চিত করার হাতিয়ার হয় প্রাচ্যবাদ। সাঈদের এরূপ তত্ত্বায়নের পেছনে কাজ করে বিশ শতকের দু'টি কার্যকর তাত্ত্বিক ধারা। একটি ফরাসি চিন্তাবিদ মিশেল ফুকোর ডিসকোর্সের ধারণা, যাতে ভাষার আধারে জ্ঞান ক্ষমতার রূপ হিসেবে ব্যক্ত হয়। অন্যটি আন্তোনি গ্রামশির সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের তত্ত্ব। এতে সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের মাধ্যমে নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে উচ্চবর্গের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয় ও বহাল থাকে। এডওয়ার্ড সাঈদের এরূপ তত্ত্বায়নের ফলে প্রাচ্যবাদ আর নিছক জ্ঞানচর্চার ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আটকে থাকে না। এর ফলে প্রতীচ্য নিজের সম্প্রসারণের প্রয়োজনে প্রাচ্যকে নির্মাণ করে প্রাকল্পিত এক মৈথিক কাঠামোয়। এ কাঠামোয় প্রতীচ্য প্রবল শক্তিমান এক স্বয়ং। অপর প্রাচ্য হীনকল্প। যেখানে জীবনের মূল্য অন্য রকম। সে ভাবের সাধক; রোগ-শোক, জরা-মরণ তার সহচর,গুহ্য সাধক সে। অশিক্ষা, অনালোক, তন্ত্র-

www.pathagar.com

মন্ত্রময় বন্যজীবন তার। 'ওরিয়েন্টালিজম' গ্রন্থের প্রচ্ছদ স্পষ্টত সে ইঙ্গিতই দেয়। প্রাচ্যের মমতাময় যোদ্ধা সাঈদের জীবন ও কর্ম বর্ণাঢ্য। খ্রিষ্টান ব্যবসায়ীর সন্তান সাঈদের জন্ম ১৯৩৫ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ-শাসিত ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে। ১৯৪২ সালে তাদের পরিবার চলে যায় কায়রোতে। ১৭ বছর বয়সে তিনি পিতার সঙ্গে পাড়ি জমান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬০ ও ১৯৬৪ সালে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করেন স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি। কর্মজীবনের প্রায় পুরো সময় তিনি অতিবাহিত করেন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে একই সঙ্গে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথিতযশা ইয়েল, হার্ভার্ড ও জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে লেখালেখি করা বিশ শতকের প্রথম দিককার ঔপন্যাসিক জোসেফ কনরাডের ওপর প্রথম বই লেখেন সাঈদ: 'জোসেফ কনরাড এন্ড ফিকশন অব অটোবায়োগ্রাফি'। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে : 'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই' (১৯৮৬), 'বগিনিংস' (১৯৭৫), 'ব্লেমিং দ্য ভিকটিমস্' (১৯৮৮), 'কভারিং ইসলাম' (১৯৮১), 'কালচার এন্ড ইম্পিরিয়ালিজম', 'এডওয়ার্ড সাঈদ : এ ক্রিটিক্যাল রিডার', 'লিটারেচার এন্ড সোসাইটি' (১৯৮০),'মিউজিক্যাল ইলাবোরেশন' (১৯৯১), 'ন্যাশনালিজম, কলোনিয়ালিজম এন্ড লিটারেচার', 'আউট অব প্লেস' (১৯৯৯), 'দ্য কোয়েশ্চেন অব প্যালেস্টাইন' (১৯৭৯), 'দ্য রিফ্লেকশনস অন এক্সাইল' (২০০০), 'দ্য ওয়ার্ল্ড, দ্য টেক্সট এন্ড দ্য ক্রিটিক' (১৯৮৩) প্রভৃতি।

এডওয়ার্ড সাঈদের রচনাসমূহে বিধৃত চিন্তার মৌলিকত্ব ও আন্তরিকতা বিস্ময়কর। এসব রচনা একদিকে যেমন পশ্চিমী বিশ্বে সমালোচনার ঝড় তুলেছে, অন্যদিকে বিশ্বের শান্তি কামী মানুষের পেয়েছে প্রশংসা ও শ্রদ্ধা। প্রাচ্যবাদের লেখক তাঁর 'কভারিং ইসলাম' গ্রন্থে ইসলাম বিষয়ে আমেরিকানদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরীক্ষা করেছেন। সংবাদ মাধ্যম ও তাদের 'বিশেষজ্ঞ' নেটওয়ার্কের দ্বারা যে তথ্য তারা পান তা শুধু ইসলামি বিশ্বের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিই সৃষ্টি করে। ইসলাম ধর্ম ও মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে এরূপ ধারণার সুযোগে তারা তাদের পরিকল্পিত এজেন্ডাকে বাস্তবায়িত করে সহজে।

'কালচার এন্ড ইম্পিরিয়ালিজম' গ্রন্থে তিনি পশ্চিমী সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ উন্মোচন করেন। উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের সাম্রাজ্যবাদ ও সংস্কৃতি কীভাবে আন্তঃক্রিয়ায় নানা স্থানে প্রতিফলিত হয় তা দেখান সাঈদ। তিনি আরো দেখান কীভাবে সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্র ও উপনিবেশসমূহে প্রতিবাদী ও প্রতিরোধী সাহিত্য রচিত হয়। যেমন, ইয়েটস, চিনুয়া আচেবে ও মার্ক টোয়েন। সাম্রাজ্যবাদ ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন দ্বারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের চিত্র তিনি তুলে ধরেন। সেখানে পশ্চিমের শক্তিশালী গণমাধ্যমের ভূমিকাও নির্ধারিত হয়ে যায়।

বিশ্বসংস্থার হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষ বাস্তুচ্যুত। তারা বঞ্চিত তাদের জন্মভূমিতে বসবাসের অধিকার থেকে। এ অধিকার-বঞ্চিত মানুষের অনুভূতিপ্রশ্নে সাঈদের মতো এত সরব আর কাউকে হতে দেখা যায়নি। তিনি যখন নিজেকে নির্বাসিত দাবি করেন তখন বিষয়টি কেবল রাজনৈতিক এজেন্ডা হিসেবেই বিবেচিত হয় না। বরং ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মাতৃভূমির অধিকার-বঞ্চিত

www.pathagar.com

মানুষের হৃদয়ার্তিরই প্রকাশক হয় তা। 'দ্য রিপ্লেকশনস অব এক্সাইল'-এ বাস্তুচ্যুত সাঈদ সে বর্ণনাই দিয়েছেন।

১৯৯১ সাল পর্যন্ত এডওয়ার্ড সাঈদ নির্বাসিত ফিলিস্তিনি পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। ইয়াসির আরাফাতসহ ফিলিস্তিনি নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য হয়েছে বারবার। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেও মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির তিনি কড়া সমালোচক ছিলেন। ফিলিস্তিনিদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালানোয় তিনি বরাবর ইসরায়েলের সমালোচনায় মুখর ছিলেন। ১৯৯২ সালে অসলো শান্তিচুক্তির কঠোর সমালোচনা করেন তিনি। তাঁর মতে, ওই চুক্তির মাধ্যমে আরবরা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের কাছে, আত্মসমর্পণ করেছে। অসৎ মধ্যস্থতার জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রেরও কঠোর সমালোচনা করেন। দু'বছর আগে তিনি বলেন, আরবদের প্রতি অহেতুক ঘৃণা ও ভয় ফিলিস্তিনিদের ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আরো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে তুলছে। শুরু থেকে ইসরায়েলি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আরবভূমির মুক্তির সপক্ষে কায়রোর ইংরেজি সাপ্তাহিক 'আল্ আহরাম'-এ তিনি লিখে গেছেন।

২০০২ সালে সাঈদ পিয়ানোবিদ ডেনিয়েল বেরেনবোয়েমের সঙ্গে যৌথভাবে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করার স্বীকৃতিস্বরূপ স্পেনের "প্রিন্স অব অস্ট্রিয়া'স কনকর্ড" পুরস্কার লাভ করেন। তাঁরা দু'জন আরব ও ইসরায়েলি যুবাদের জন্য সঙ্গীত-বিষয়ক কর্মশালা পরিচালনা করেন।

বিশ শতকের অসাধারণ মেধাবী ব্যক্তিত্ব, আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী, রাজনীতি ও সাহিত্য সমালোচক, তাত্ত্বিক, মনীষী ও নির্যাতিত আরবদের সপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর এডওয়ার্ড উইলিয়াম সাঈদ ৬৭ বছর বয়সে ১২ বছরের লিউকেমিয়ায় পরাস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বের নানা প্রান্তের নির্যাতিত মানুষ একজন ঘনিষ্ঠ সুহৃদকে হারাল। সাহিত্য-সংস্কৃতি হারাল একজন মননশীল যোদ্ধাকে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট লি বোলিঙ্গার তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি ঘনিষ্ঠভাবে শিল্পকর্ম, বিশেষত কবিতা ও উপন্যাসের প্রতি নিবেদিত ছিলেন। এ মানবদরদী ব্যক্তি বিশ্বাস করতেন সাহিত্যপাঠ সুন্দর ও অর্থপূর্ণ জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

ইত্তেফাক, ৩ অক্টোবর '০৩

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড সাঈদ ও পশ্চিমের প্রাচ্য দর্শন

বখতিয়ার আহমেদ

এডওয়ার্ড সাঈদ আর নেই। গত ২৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক শহরের এক হাসপাতালে দুনিয়ার মুক্তিমুখীন প্রতিরোধ আন্দোলনের লড়াকু এই সৈনিক ৬৭ বছর বয়সে এসে হার মানলেন লিউকেমিয়ার কাছে। তাও খুব সহজে নয়, একটি দশক ধরে এই মরণ ব্যাধিকে প্রাণপণ প্রতিরোধ করেই। আমরা যারা পৃথিবীর আরেক প্রান্তে ইন্টারনেট মারফত *আল আহরাম উইকলি, আল হায়াত, কাউন্টার পাঞ্চ* বা *জেড নেটের* বদৌলতে তার নিয়মিত কলামগুলো অনিয়মিতভাবে পড়তাম, এই নিঃশব্দ লড়াইয়ের পুরো খোঁজ তাদেরও জানা ছিল না। নিজের সামাজিক পরিচয়ের পরিসর জুড়ে তৎপর একজন শাস্ত্রবিদ হিসেবে, মধ্য ষাটের দশক থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রতিটি ধাপে ক্ষুরধার বিশ্লেষণী ক্ষমতা দিয়ে জগৎ শাসন ও জগৎ বিচারের পশ্চিমা তরিকার স্বরূপ উন্মোচনের অগ্রণী চিন্তক হিসেবে, এমনকি ১১ সেপ্টেম্বরের টুইন টাওয়ারে হামলা এবং তার অব্যবহিতকালে আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন ও গণহত্যার মধ্য দিয়ে সূচিত হওয়া তীব্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অপরায়নের ডামাডোলেও সাঈদের কলম আমাদের সচকিত করেছে পদে পদে। তার তৎপর বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার প্রথম প্রতিধারণাগত রূপায়ন "প্রাচ্যবাদ" আলোড়িত করেছে তুলনামূলক সাহিত্য থেকে নৃতত্ত্ব পর্যন্ত জ্ঞানকাণ্ডের অনেকগুলো শাখাকেই। পাশাপাশি নিজ জন্মভূমি প্যালেস্টাইন প্রশ্নে একাধারে মোকাবিলা করেছেন পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক জগৎকে এবং পূর্ব-পশ্চিমের সম্ভাব্য প্রতিটি বুদ্ধিবৃত্তিক আয়োজনে সোচ্চার কণ্ঠে উত্থাপন করেছেন প্যালেস্টাইনি স্বাধিকার আন্দোলনের দাবি, কর্মজীবনের প্রায় পুরোটাই কাটিয়েছেন নিউইয়র্কে, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ও তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন ১৯৬৩ সাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। তারপরও পশ্চিমা জগতে তার পরিচিতি 'ভয়েস অফ প্যালেস্টাইন' হিসেবেই।

তার কর্মজীবনের আরেকটু হদিস করতে গেলে জানা যায়, ১৯৭৪ সালে তুলনামূলক সাহিত্যের অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৭৯ সালে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মাঝখানে ১৯৭৫-৭৬ সাল কাটিয়েছেন স্ট্যানফোর্ডের সেন্টার ফর অ্যাডভান্স স্টাডি ইন বিহেভিওরাল সায়েন্সে গবেষক হিসেবে। সম্পাদনা করেছেন 'আরব স্টাডিজ কোয়ার্টারলি' নামে একটি পত্রিকা। সর্বাধিক পঠিত ও আলোচিত *অরিয়েন্টালিজম* ছাড়াও উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আছে *জোসেফ কনরাড*

www.pathagar.com

এন্ড দ্য ফিকশন অফ অটোবায়োগ্রাফি, বিগিনিংস; ইনটেনশন এন্ড মেথড, দ্য কোয়েশ্চেন অফ প্যালেস্টাইন, লিটারেচার এন্ড সোসাইটি, কাভারিং ইসলাম, আফটার দ্য লাস্ট স্কাই, ব্লেমিং দ্য ভিকটিমস, মিউজিক্যাল ইলাবোরেশনস, কালচার এন্ড ইম্পেরিয়ালিজম, রিপ্রেজেন্টেশন অফ ইন্টেলেকচুয়াল, আউট অফ প্লেস, দি এন্ড অফ পিস প্রসেস,অসলো এন্ড আফটার, পিস এন্ড ইটস ডিসকন্টেন্টস। নিকটজনদের ধারণায় তিনি একজন গুণী পিয়ানো বাদক, দূরবর্তী পাঠকেরা কিছুটা আঁচ পাবেন তার সঙ্গীত বিষয়ক লেখালেখি থেকে। তার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ তৎপরতার সুবিশাল ক্যানভাস বরাবরই আড়াল করেছে ঘাতক ক্যান্সারের সাথে যুগব্যাপী লড়াই ও বসবাসের ইতিবৃত্ত। ফলে জেনিন, নাবলুস, জাফা, আক্রা, গাজা, জেরুজালেম, বাগদাদ, তিকরি, উম্মে কসর, কারবালা, কাবুল, মাজার-ইশরিফ, কান্দাহারসহ পৃথিবীর তাবৎ করদ নগরীর অবিশ্রান্ত রক্তপাত থামবার আগেই তার এই মৃত্যু বড় আকস্মিক ঠেকে, বিহ্বল করে।
এডওয়ার্ড সাঈদের জন্ম ১৯৩৫ সালে জেরুজালেম নগরীতে, প্যালেস্টাইনি ঐতিহ্যের এক খ্রিস্টান পরিবারে। ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই ব্যবসায়ী পরিবারটি চলে আসে কায়রোতে। শৈশব ও স্কুল জীবনের একাংশ কেটেছে কায়রোর ভিক্টোরিয়া কলেজে এবং আরেক অংশ ম্যাসেচুসেটস এর মাউন্ট হারমনে। নিজের শৈশবে পশ্চিমা শিক্ষা কাঠামোর সাথে প্রাচ্য সংস্কৃতির সংশ্লেষণের ঠিকুজি তালাস করেছেন আত্মজীবনীমূলক রচনা *আউট অফ প্লেস* এবং *নট হোয়াইট রাইট*-এ। ১৯৬৪ সালে হার্ভার্ডে পিএইচডি শেষ করার আগে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায় শেষ করেন ১৯৫৭ সালে। এর মাঝেই যোগ দেন প্যালেস্টাইনি স্বাধিকার আন্দোলনে এবং ১৯৭৭ সালে প্রবাসী প্যালেস্টাইন পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। তারপরের এক যুগেরও বেশি সময় ধরে ইয়াসির আরাফাতের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন পিএলও তথা প্যালেস্টাইনি স্বাধীনতা আন্দোলনকে। ১৯৯১ সালে অসলো চুক্তি নিয়ে রাজনৈতিক মতান্তর ঘটে ইয়াসির আরাফাতের সাথে, অনেকটা নিঃশব্দেই সরে আসেন সাঈদ। কিন্তু আরাফাতের সাথে যুগব্যাপী এই সংগ্রামী বন্ধুত্বের অবসান প্রসঙ্গে নিজের দৃঢ় রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করেছেন মধ্যপ্রাচ্য প্রশ্নে দুই রচনা *অসলো এন্ড আফটার* এবং *পিস এন্ড ইটস ডিসকন্টেন্টস*-এ। পিএলও এবং ইসরাইলের মধ্যে সম্পাদিত অসলো শান্তিচুক্তিকে সাঈদ মূল্যায়ন করেন "প্যালেস্টাইনি আত্মসমর্পণের দলিল" হিসেবে যা পুরো আরব জনগোষ্ঠীর উপর সামরিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পুরনো ইসরাইলি নীতির সম্প্রসারণ মাত্র। সাঈদের বিচারে এই প্রহসনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা "অসৎ দালালে"র– যে তার মক্কেল ইসরাইলকে আগাগোড়া মদদ দিয়ে এসেছে।
১৯৯১ সালে পিএলও'র রাজনীতি থেকে সরে আসার পরপরই তার লিউকেমিয়া ধরা পড়ে। ১৯৯২ সালে এক সাক্ষাৎকারে সাঈদ নিজের ক্যান্সার নিয়ে কথা বলেন। জানান জটিল পদ্ধতির চিকিৎসা এবং নিজের কাজের মাঝে সমন্বয়ের চেষ্টা করছেন। সেই সমন্বয়ের ফলাফল হচ্ছে এই যে, পরের ১১ বছরে শুধু তার একাডেমিক লেকচারের তালিকাতেই এসে যায় ভারত, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নাম। এ সময়েই বিবিসি রেডিও, কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং রেডিও,

www.pathagar.com

অস্ট্রেলিয়ান রেডিওতে নিয়মিত উপস্থিতি তাকে অচিরেই শীর্ষস্থানীয় মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিতি এনে দেয়। প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের অধিকার আদায়ের আমৃত্যু সংগ্রাম এবার নতুন মাত্রা পায়। প্যালেস্টাইনি উদ্বাস্তু হয়ে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেও সাঈদ মধ্যপ্রাচ্য তথা দুনিয়াজুড়ে ইসরাইল-ইঙ্গো-মার্কিন নীতির কঠোর সমালোচকদের অন্যতম হয়ে ওঠেন। মুস্তফা বারঘাওতির সাথে গড়ে তোলেন প্যালেস্টাইনের গণতান্ত্রিক মুক্তিকামী সংগঠন প্যালেস্টাইনিয়ান ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভস। ১৯৯৮ সালে বিবিসি টেলিভিশন ইসরাইল রাষ্ট্রের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্যালেস্টাইনি দৃষ্টিকোণ থেকে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের ইতিহাস সম্বলিত তথ্যচিত্র নির্মাণের জন্য সাঈদকে মনোনীত করে। ইসরাইল, বেশ কয়েকটি আরব দেশ এবং ব্রিটেনে ঘুরে ঘুরে অজস্র সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাঈদ এই তথ্যচিত্রে প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডের দাবিকে কেন্দ্র করে ইহুদিবাদী জ্ঞানতত্ত্ব যে "আরব মুখ" পরিবেশন করে তাকে চ্যালেঞ্জ করেন। প্রবল আধিপত্যশীল মিডিয়া এবং তার রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতর থেকে সাঈদের এই বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধের পথ সবসময় কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ৯০ দশকের শুরুতে ইসরাইলি মিডিয়ায় সাঈদের বিরুদ্ধে বিষোদগারের ধরণ জানা যায় দুটি ঘটনা থেকে, একবার ইসরাইলি মিডিয়া লিখল যে সাঈদ আদৌ কোন প্যালেস্টাইনি উদ্বাস্তু নন, কাজেই তিনি যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার যোগ্য নন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরি তো নয়ই। আরেকবার বৈরুতে ইসরাইল সীমান্তবর্তী ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শনে গিয়ে উদ্বাস্তুদের ইসরাইলি ভূখণ্ডের প্রতি পাথর নিক্ষেপের প্রতীকি অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ব্যাস, পরদিন পশ্চিমা মিডিয়া ফলাও করে "ইহুদি বিদ্বেষী" সাঈদের পাথর ছুড়ে মারার ছবি ছাপায়।

কিন্তু তবু বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পঞ্চাশ লক্ষ প্যালেস্টাইনি উদ্বাস্তু এখন শোক, শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছে সাঈদকে। গাজা, পশ্চিম তীরে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ এবং মধ্যপ্রাচ্যের আরো কয়েকটি আরব সরকার তার একাধিক বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, কিন্তু সাঈদের কণ্ঠ তাতে রোধ করা যায়নি। ১৯৯৩ সালে পিএলও তথা আরাফাতের সাথে বিচ্ছেদের পরে তিনি আরো উচ্চকিত হয়েছেন ইসরাইল আগ্রাসনের বিরোধিতার পাশাপাশি আরব সমাজ তথা আরব নেতৃত্বের রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, প্রায় অচল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং উৎপাদন বিমুখ অর্থনৈতিক নীতির সমালোচনায়। কায়রোর *আল আহরাম* এবং *লন্ডনভিত্তিক* আরবি দৈনিক *আল হায়াতে* প্রকাশিত ধারাবাহিক রাজনৈতিক নিবন্ধগুলো হাজার হাজার আরব তরুণকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্পেষিত একটি জনগোষ্ঠীর বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের ভার ইতিহাস সাঈদকে দিয়েছে,আমৃত্যু তিনি তাতে পিছু হটেননি এক পাও।

এই সুদীর্ঘ প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সক্রিয়তার পাশাপাশি এডওয়ার্ড সাঈদ পশ্চিমের সাহিত্য তথা বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় উত্তর-উপনিবেশিক ধারার শীর্ষ স্থানীয় যোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৬০'র দশকের মাঝামাঝি তুলনামূলক সাহিত্যে তার প্রথম গবেষণা ছিল জোসেফ কনরাডের উপন্যাস নিয়ে। ১৯৭০ এর দশকের শুরুতেই তিনি আকৃষ্ট হন ইউরোপীয়, বিশেষত ফরাসি কাঠামোবাদের দিকে। ১৯৭৫ সালে ফরাসি কাঠামোবাদের অন্যতম দুই পুরোধা জাঁক দেরিদার অবিনির্মাণ এবং মিশেল ফুকোর ক্ষমতাতত্ত্বের আলোচনায়

www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন *বিগিনিংস : ইনটেনশন এন্ড মেথড* শিরোনামের বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে। নিজের অনুকল্প প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐতিহাসিক আন্তঃসম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচনের ক্ষেত্রে তিনি ফুকোর ক্ষমতা ও জ্ঞানের গভীর কাঠামোগত আন্তঃসম্পর্কের ধারণা প্রয়োগ করেন। প্রবল ক্ষমতাতন্ত্রের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সত্য বলার জন্য প্রয়োজনীয় সাহসের স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন তার সবচেয়ে আলোচিত রচনা, ১৯৭৫-৭৬ সালে স্ট্যানফোর্ডের সেন্টার ফর অ্যাডভান্স স্টাডি ইন বিহেভিওরাল সায়েন্সে গবেষক হিসেবে কাজ করার সময় লেখা *অরিয়েন্টালিজম*-এ।

শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, রাজনীতি তথা সমসাময়িক বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিটি ক্ষেত্রকে আলোড়িত করেছে তার এই প্রাচ্যবাদ বিচার যার আওতায় সাঈদ আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তি যে বহুমাত্রিক প্রক্রিয়ায় নিজের ঐতিহাসিক 'অপর' হিসেবে প্রাচ্যের সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণ করে তার সঙ্গে উপনিবেশিক তথা সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য ও শোষণের যোগসূত্র বিশ্লেষণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি আগ্রহী প্রাচ্য-প্রতীচ্যের আন্তঃসম্পর্কের রাজনৈতিক,সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-জাগতিক প্রক্রিয়ারগুলোর স্বরূপ অনুধাবনে। তার বিবেচনায় 'প্রাচ্য' একটি পশ্চিমা জ্ঞান-জাগতিক নির্মাণ যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে উপনিবেশ যুগের প্রথম দিকে পৃথিবীর এই আধা-কল্পিত রহস্যময় ভূমিতে ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের অভিনব রোমাঞ্চকর অভিযান ও অভিজ্ঞতার স্মৃতি। ফলে আধুনিক পশ্চিমের যাবতীয় জ্ঞান-জাগতিক প্রতিভাসে এই 'প্রাচ্য' 'পরিবেশিত/উপস্থাপিত' হয়েছে প্রান্তিক অপর হিসেবে। প্রস্তাবের সমর্থনে সাঈদ চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন পশ্চিমের দেশগুলোর ক্রুসেড থেকে সমসাময়িক কাল অব্দি পররাষ্ট্রনীতি, শেক্সপিয়ার থেকে কিপলিং পর্যন্ত সাহিত্য, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ইতিহাস ও ইতিহাস তত্ত্ব, রাজনীতি, শিল্পকলা, ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানের নৃতাত্ত্বিক মাঠ গবেষণা, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কর্তৃত্ববাদী শাস্ত্রচর্চা এমনকি আরব-ইসরাইল উত্তেজনা নিরসনে হেনরি কিসিঞ্জারের মতামত পর্যন্ত।

প্রত্যয় হিসেবে 'প্রাচ্যতন্ত্র/প্রাচ্যবাদ/প্রাচ্যবিদ্যা'র একাধিক অর্থ বা পরিবেশনজনিত, আন্ত-নির্ভরশীল দ্যোতনা আছে। সবচেয়ে বেশি প্রচলিত অর্থে এটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় প্রাচ্যবিদ্যার যে কোন ধরনের চর্চাকে বোঝায়। চর্চকারী প্রাথমিক পরিচয়ে নৃবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী বা ভাষাবিজ্ঞানী যাই হোন না কেন, তার প্রাচ্য সম্পর্কিত যে কোন জ্ঞান-জাগতিক তৎপরতাই বিশেষ বা সাধারণ অর্থে তাকে প্রাচ্যবিদ বলার জন্য যথেষ্ট এবং এক্ষেত্রে তিনি যা করেন তাকে 'প্রাচ্যবাদ' বলা চলে।

অন্যদিকে এই শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের নিরীখে, যে জনগোষ্ঠীগুলোর ঐতিহাসিক রাজনৈতিক নিয়তি, বিচ্ছিন্নতা ও অবিবাসন, স্বাতন্ত্র্য ও বিকাশ প্রাচ্যবিদ্যার গোড়ার বিষয়বস্তু, আরো সাধারণতর অর্থে প্রাচ্যবাদ ঐ জনগোষ্ঠীগুলোর সাংস্কৃতিক পরিচয়কে ক্ষমতা সম্পর্কের পরিপূরক রূপে বিন্যস্ত ও পরিবেশন করে। এক্ষেত্রে প্রাচ্যবাদ হয়ে যায় 'প্রাচ্য' ও 'প্রতীচ্যে'র মধ্যে সত্তাগত বা চৈতন্য পর্যায়ের সুনির্দিষ্ট বিভাজন নির্ভর একটি চিন্তন পদ্ধতি। তখন এই পদ্ধতির প্রকরণগত আওতায় চলে আসে আধুনিক ইতিহাসের অসংখ্য লেখক, কবি, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ আরো অনেকে যারা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এই

www.pathagar.com

বিভাজনকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে, প্রাচ্যের মানুষের চিন্তা,জীবন ও সংস্কৃতিকে নিজের কাজের বিষয় বা ক্ষেত্র হিসেবে নির্ধারণ করেন। প্রাচ্যবিদ্যার এই সংজ্ঞায়ন একাইলাস ও ভিক্টর হুগো বা দান্তে ও কার্ল মার্ক্সের রচনার তুলনামূলক পাঠ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্র তৈরি করে শাস্ত্রীয় প্রকরণ হিসেবে প্রাচ্যবিদ্যার শক্তিমত্তার প্রমাণ দেয়।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগকে প্রাচ্যবিদ্যার আবির্ভাব কাল ধরলে, বিগত একশ'-দেড়শ' বছর বয়সী প্রাচ্যবিদ্যার চেহারা দাঁড়ায় আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্রের মতই। আবির্ভাবের কিছুদিনের মধ্যেই এটি একটি মতাদর্শিক সংহতি সংঘের রূপ নেয় এবং এর মধ্য দিয়ে এনলাইটেনমেন্ট যোগ রেঁনেসা যোগ উপনিবেশবাদ যোগ শিল্প বিপ্লব যোগ ফরাসী বিপ্লব যোগ রুশ বিপ্লবের উত্তরাধিকার নিয়ে 'আধুনিক' পশ্চিম মুখোমুখি হয় 'প্রাক-আধুনিক' প্রাচ্যের। এই প্রাচ্যবিদ্যা তখন নিজেকে উপনিবেশিক সম্প্রসারণবাদী ক্ষমতাতন্ত্রের পরিপুরণক মতাদর্শ তৈরির কাজে লাগায়। এই প্রাচ্যবিদ্যাই তখন প্রাচ্যের মানুষ ও সমাজের বিবরণ লেখে, তাদেরকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে, তাদের কাছে সভ্যতার আলো পৌঁছে দেয়, শিক্ষা দেয় এবং সর্বোপরি শাসন করে... মোদ্দা কথা হচ্ছে এই বিচারে প্রাচ্যবিদ্যা হচ্ছে প্রাচ্যের উপর পশ্চিমা কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার একটি সুসংহত তরিকামাত্র। ফুকোর অনুগামী হিসেবে সাঈদ এই তরিকাটিকে বিবেচনা করেন 'ডিসকোর্স' হিসেবে, যার কল্যাণে ইউরোপীয় সংস্কৃতি 'প্রাচ্য'কে রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক, মতাদর্শিক, বৈজ্ঞানিক এমনকি কাল্পনিকভাবেও নিয়ন্ত্রণ ও পুনরুৎপাদন করে। সাঈদের মতে প্রাচ্য-প্রতীচ্য কোন প্রাকৃতিক বিভাজন নয়, এমনকি এটা কোন ভৌগলিক বিভাজনকেও নির্দেশ করে না। 'প্রাচ্য' একটি ধারণা মাত্র যা পশ্চিমের একটি ঐতিহাসিক চিন্তন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা, একটি কল্পিত ভৌগলিক সীমানা, কিছু আধাকল্পিত সাংস্কৃতিক পরিচয়, বিচ্ছিন্ন কিছু চিত্রকল্প এবং ভাষার সমন্বয়ে ঐ ধারণার একটি বাস্তব প্রতিরূপ সৃষ্টি করে। একইভাবে 'প্রতীচ্য'ও একটি ধারণা যা একই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় 'অপর''প্রাচ্যে'র বিপরীতে 'অহম' হিসেবে 'প্রতীচ্য'কে নির্মাণ করে মানবিক চিন্তন প্রক্রিয়ার দ্বৈত বিপরীত কাঠামো পূর্ণ করে। সাঈদের তাত্ত্বিক পরিগঠনে ফরাসি কাঠামো ও উত্তর-কাঠামোবাদী নৃবিজ্ঞানের প্রভাব ছাড়াও প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সম্পর্ক বিচারে তিনি শরণ নিয়েছেন নব্য মনঃ-সমীক্ষণবাদীতাত্ত্বিক জাঁক-লাঁকার। লাঁকার মতে ব্যক্তি মানুষ কেবলমাত্র নিজের বিপরীতে 'অপরে'র অস্তিত্বের সাপেক্ষেই নিজের ভেতর 'আমি'র অস্তি ত্ব নির্মাণ করতে পারে। সাঈদ এই একই যুক্তিপ্রয়োগ করে দেখান যে, আধিপত্যশীল পাশ্চাত্যসংস্কৃতি প্রাচ্যসংস্কৃতির অপরায়নের মধ্য দিয়েই নিজের পরিচয় নির্মাণ করেছে। এই ঐতিহাসিক চিন্তন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতাকে সাঈদ যুক্ত করেন উপনিবেশিক ক্ষমতাতন্ত্র এবং আধিপত্যবাদী ভৌগলিক সম্প্রসারণের সাথে। ১৯৯৮ সালের ক্যামব্রিজ এক্সপিডিশন এবং তার পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ক্রিয়াবাদী নৃবিজ্ঞানের মাঠকর্মলব্ধ জ্ঞান উপনিবেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন, বিদ্রোহ ইত্যাদি মোকাবেলায় উপনিবেশিক প্রশাসনিকতাকে শক্তিশালী করেছে। তখনও কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা বর্বর অপাশ্চাত্য সমাজগুলোকে 'সুসমাচার' শুনিয়ে সভ্য বানানোর জন্য পশ্চিমা সভ্যতার মহান মিশন হিসেবেই উপস্থাপিত। কিন্তু সাঈদ একে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন প্রাচ্যের উপর ইউরো-আটলান্টিক ক্ষমতাতন্ত্রের জারি রাখা আধিপত্যের প্রতীক হিসেবে, তার

www.pathagar.com

আচার, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বিচারমূলক বয়ান হিসেবে। পরিবেশন ও উপস্থাপনের গুণে এই বয়ান এমনকি, একাধারে জৈবিক এবং সাংস্কৃতিক বর্ণবাদের জন্ম দিতে সক্ষম। তার এই সক্ষমতার পেছনে আছে জ্ঞান ও ক্ষমতার অন্তর্লীন সম্পর্কের বুনিয়াদ যা প্রাচ্যবিদ্যার বয়ানগুলোর কর্তৃত্বের উৎসও বটে। সাঈদ প্রাচ্যের এহেন বাঙময় বাস্তবতাকে শুধুমাত্র পশ্চিমা কল্পনার জাল হিসেবেই বিবেচনা করেন না, তার বস্তুগত অস্তিত্বকেও আমলে নেন। প্রাচ্যবিদ্যা তাই চূড়ান্ত বিচারে পশ্চিমের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানের সমর্থনপুষ্ট মতাদর্শিক কথকতার প্রকাশ এবং তার প্রতিনিধিত্ব করে।

১৯৭৮ সালে প্রাচ্যবাদ প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাঈদের কলম যে বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল, পশ্চিমা দুনিয়াকে বিগত একশ বছরে এত বড় আর কোন বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়নি। গত ২৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় এই কলম যখন চিরদিনের মত স্থির হল, তার আগের প্রায় তিন যুগে তা থেকে নিসৃত শব্দমালা আরো বহু যুগ হাজারো কলমকে ব্যতিব্যস্ত রাখবে জ্ঞান, ক্ষমতা ও সংস্কৃতির আন্তসম্পর্কের নিবিড় অনুধাবনে, শক্তি জোগাবে আসন্ন সব ইন্তিফাদাকে।

যুগান্তর, ৩ অক্টোবর '০৩

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক অভিপ্রকাশ ও সাম্রাজ্যবাদী বাসনার ইতিবৃত্ত

আ-আল মামুন

আমাদের দেশে সাহিত্যকে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ফেলে সমাজবিশ্লেষণের অভ্যাস আজও গড়ে ওঠেনি; যদিও নতুন ইতিহাস নির্মাণে এবং বিদ্যমান ইতিহাস বিনির্মাণে সাহিত্যের নানা শাখাপ্রশাখা চমকপ্রদ ফলাফল সরবরাহ করতে পারে। সাহিত্যকে এখনও বাস্তবের সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি-ইতিহাস ও ক্ষমতাকাঠামোর সাথে সম্পর্করহিত নান্দনিক বিনোদনের উপায় ভাবা হয়। সংস্কৃতি সম্পর্কেও এরূপ ধারণা বিদ্যমান।

সাম্রাজ্যবাদের সুবিশাল ডিসকোর্সে সংস্কৃতির, বিশেষত সাংস্কৃতিক অভিপ্রকাশরূপে কথাসাহিত্যের অবস্থান শনাক্ত করেছেন খ্যাতিমান এডওয়ার্ড সাঈদ। তিনি দেখিয়েছেন সাম্রাজ্যিক বাসনার সাথে সাংস্কৃতিক অভিপ্রকাশগুলোর নিবিড় আঁতাত থাকে।

ওরিয়েন্টালিজম গ্রন্থটি ১৯৭৮ সালে প্রকাশের কিছুকাল পরে এডওয়ার্ড সাঈদ মনোনিবেশ করেন সাম্রাজ্য ও সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্কের একটা সাধারণ ধরন অনুসন্ধানে। এর প্রথম ফলাফল আমরা দেখি ১৯৮৫-৮৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তার দেয়া বক্তৃতামালায়। এই বক্তৃতামালা সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যবাদের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে তার কেন্দ্রীয় যুক্তিপরম্পরা গড়ে তোলে- যার অভিপ্রকাশ ঘটে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত *কালচার অ্যান্ড ইমপেরিয়ালিজম* গ্রন্থে। *ওরিয়েন্টালিজম* গ্রন্থে যেখানে মধ্যপ্রাচ্যের সাথে পশ্চিমের সম্পর্ক বিচার করা হয়েছে সেখানে এই গ্রন্থে এসে যুক্তি পরম্পরাকে আরও সম্প্রসারিত করে আধুনিক মেট্রোপলিটান পশ্চিম ও তার অধীন ভূখণ্ডসমূহের সম্পর্কের একটি সাধারণ প্যাটার্ন হাজির করা হয়েছে। সেই সাথে দীর্ঘ সময় ধরে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যে ডিসকোর্স গড়ে উঠেছে সেটাও বিচার করা হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্য-প্রসঙ্গ ছাড়া আর যে মালমসলা বিচারে সাঈদ প্রবৃত্ত হয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে আফ্রিকা, ভারত, দূর-প্রাচ্যের অংশবিশেষ, অস্ট্রেলিয়া ও ক্যারিবীয় দ্বিপপুঞ্জ নিয়ে ইউরোপীয়দের বিভিন্ন রচনা। এই ডিসকোর্সগুলোতে *সাঈদ দেখেছেন* দূরদেশ ও তার জনমানুষকে শাসন করার এক সর্বজনীন ইউরোপীয় প্রচেষ্টা ও অভিলাষ। এবং ফলে, প্রাচ্যবাদী বর্ণনে ইসলামীবিশ্বকে যেমন প্রকরণে চিহ্নিত করা হয় সেইমতো বিশেষ কায়দায় ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ, আয়ারল্যান্ড বা দূর-প্রাচ্যকেও উপস্থাপন করা হয়। এই

www.pathagar.com

ডিসকোর্সগুলোতে, সাঈদের ভাষ্যমতে, যে চমকের মুখোমুখি হতে হয় তা হলো 'রহস্যময় প্রাচ্য' বর্ণনে ব্যবহৃত বাগালঙ্কারিক-প্রতিমাসমূহ এবং 'আফ্রিকান [কিংবা ভারতীয়-আইরিশ-চীনা-ক্যারিবীয়] মন' সম্পর্কিত স্টিরিওটাইপসমূহের ব্যবহার; আদিম বা বর্বর জনগোষ্ঠীর নিকট পশ্চিমারা সভ্যতা বয়ে নিয়ে যায়; যখন 'তারা' দুর্ব্যবহার করে বা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তখন তাদেরকে চাবকানো বা হত্যা করা বা শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন হয় কারণ 'তারা বলপ্রয়োগ বা সহিংসতার ভাষাটাই ভাল বোঝে; 'তারা' 'আমাদের' মতো নয় এবং এ কারণেই তারা শাসিত হওয়ার উপযুক্ত।

অ-ইউরোপীয় বিশ্বের প্রায় সকল স্থানেই সাদা-মানুষদের উপস্থিতি কোনো না কোনো ধরনের প্রতিরুদ্ধতার জন্ম দিয়েছে। পশ্চিমা আধিপত্যের বিরুদ্ধে এই প্রতিরুদ্ধতা চূড়ান্ত রূপ পায় পুরো তৃতীয় বিশ্ব জুড়ে উপনিবেশের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার বিশাল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। সশস্ত্র প্রতিরোধের পাশাপাশি প্রায় সকল স্থানেই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে, জাতীয়তাবাদী পরিচয় নির্মাণে; এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে সংগঠন ও রাজনৈতিক দল গঠন করতে বিপুল প্রচেষ্টা নিয়োগ করা হয়– যার সাধারণ লক্ষ্য হিসেবে থাকে স্বাধিকার ও জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন। সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা কোনো সক্রিয় পশ্চিমা অনুপ্রবেশকারীকে নিঃক্রিয়-অচঞ্চল অ-ইউরোপীয় নেটিভদের ওপর চাপিয়ে দিতে পেরেছে এমনটা কখনোই দেখা যায়নি; বরং সকল ক্ষেত্রেই নানান ধরনের প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই প্রতিরোধ অবশেষে বিজয়ে রূপ নিয়েছে।

সাম্রাজ্যিক সংস্কৃতির বিশ্বব্যাপী এক সাধারণ প্যাটার্ন, এবং সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা– এই দুই বিপরীত উপাদান গড়ে তুলেছে *কালচার এন্ড ইমপেরিয়ালিজম* গ্রন্থটি। ফলে, এটি আর ওরিয়েন্টালিজমের পারম্পর্যময় সম্প্রসারণ হয়ে থাকেনি, আরও অধিক কিছু বর্ণনায় লিপ্ত হয়েছে।

সংস্কৃতি প্রত্যয়টিকে সাঈদ দুটো সুনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করেন। সংস্কৃতি, প্রথমত, সেই সকল চর্চা যার মধ্যে রয়েছে বিশেষত বর্ণনের শৈলীসমূহ, যোগাযোগ এবং উপস্থাপনার (রিপ্রেজেন্টেশন) মতো বিষয়গুলো। যা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎপরতাসমূহ থেকে তুলনামূলকভাবে স্বাধীন এবং সচরাচর নান্দনিক অভিপ্রকাশ হিসেবে বিদ্যমান থাকে, যার প্রধান লক্ষ্য বিনোদন। সংস্কৃতির এমন চর্চার মধ্যে অবশ্যই আরও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পৃথিবীর দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ সম্পর্কিত জনপ্রিয় লোকজ অভিপ্রকাশগুলো এবং নৃতত্ত্ব, ইতিহাসতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান ও সাহিত্য-ইতিহাসের মতো অগ্রসর জ্ঞানকাণ্ডের বিশেষায়িত জ্ঞানভাণ্ডার। যেহেতু সাঈদের মনোযোগ-কেন্দ্র এখানে উনবিংশ ও বিংশ শতকের আধুনিক ইউরোপীয় সাম্রাজ্যগুলো, তিনি সাংস্কৃতিক অভিপ্রকাশ হিসেবে বিশেষত উপন্যাসকে বিচারে নিয়েছেন। কারণ, তার মতে, সাম্রাজ্যিক মনোভঙ্গি, রেফারেন্স পয়েন্ট ও অভিজ্ঞতা নির্মাণে উপন্যাস অপরিসীম গুরুত্ববহ। অবশ্য তিনি বলছেন না যে কেবল উপন্যাসই গুরুত্বপূর্ণ, তবে উপন্যাসের সঙ্গে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সম্প্রসারণশীল সাম্রাজ্যের সম্পর্ক নিবিড় অনুসন্ধানের দাবী রাখে। যেমন, আধুনিক বাস্তবধর্মী উপন্যাসের আদিরূপের প্রতিনিধি হলো *রবিনসন ক্রুসো* এবং কোনো দৈব-দুর্ঘটনা নয়, অনিবার্যভাবেই এই উপন্যাসের

নায়ক একজন ইউরোপীয়ান, যিনি নিজের জন্য দূরবর্তী অ-ইউরোপীয় এক দ্বীপে সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

আখ্যানমূলক (ন্যারেটিভ) ফিকশনগুলোর প্রতি আজকাল বিপুল সমালোচনাত্মক দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে, তবু ইতিহাস ও সাম্রাজ্যবাদী জগতের সাথে এর সম্পর্কের ওপর অতি সামান্য মনোযোগই দেয়া হয়েছে। সাঈদের যুক্তিপরম্পরা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আখ্যান অত্যন্ত গুরুত্ববহ। কারণ, পৃথিবীর অজানা অঞ্চল সম্পর্কে পরিব্রাজক ও ঔপন্যাসিকরা যা বলেন তা মূলত আখ্যান। উপনিবেশের অধীনস্ত মানুষের নিজস্ব পরিচয় নির্মাণ এবং তাদের নিজেদের বিদ্যমানতার ইতিহাস বর্ণনেও এই আখ্যানসমূহ একটা পদ্ধতি হিসেবে কাজ করে। সাম্রাজ্যবাদের মূল লড়াই ভূমির দখলদারিত্ব নিয়ে, কিন্তু যখন বিচারে আনা হয় কে এই ভূমির মালিক, কে সেখানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে ও কর্মতৎপরতা চালাচ্ছে, কে এই ভূমির কর্মপ্রবাহ সচল রাখছে, কে পুনর্দখল করছে, এবং কে এখন এই ভূমির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করছে, তখন দেখা যায় এই প্রসঙ্গগুলো প্রতিফলিত হয়েছে, প্রতিরুদ্ধ হয়েছে এবং এমনকি, এই ভূমির ভাগ্যও অনেক সময় নির্ধারিত হয়েছে আখ্যানের দ্বারা। আখ্যান বর্ণনের ক্ষমতা, কিংবা অন্য আখ্যানের গড়ে ওঠা ও আবির্ভূত হওয়া বাধাগ্রস্ত করার ক্ষমতা সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এদের মধ্যে সম্পর্কের প্রধানতম বাহনও। আরও গুরুত্বপূর্ণ যে, মুক্তি ও আলোকায়নের অতি-আখ্যানগুলোর ছোঁয়া একসময় সাম্রাজ্যের অধীনস্ত মানুষদের জাগিয়ে তুলেছিল এবং অধীনস্ততার জোয়ার ছুঁড়ে ফেলতে সাহায্য করেছিল। এই প্রক্রিয়ায়, অনেক ইউরোপীয় এবং মার্কিনীও এইসব কাহিনী ও তার প্রবক্তাদের দ্বারা উজ্জীবিত হয়েছিল; সাম্য ও মানবিক সমাজব্যবস্থার জন্য নতুন আখ্যান নির্মাণের পথে সামিল হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, সাঈদের কাছে সংস্কৃতি এমন একটা ধারণা যা প্রতিটি সমাজের জ্ঞাত ও কল্পিত শ্রেষ্ঠ বিষয়াবলীর ভাণ্ডার এবং যার মধ্যে রয়েছে পরিশুদ্ধি ও সমুন্নতকরণের ক্ষমতা। আধুনিক, আগ্রাসী,বাণিজ্যিক এবং নৃশংস শহুরে অস্তিত্বের ক্ষতগুলোকে পুরোপুরি সারিয়ে তুলতে না পারলেও সংস্কৃতি সেগুলোকে প্রশমিত করে। আমরা দান্তে বা শেক্সপিয়ার বা রবি ঠাকুর পড়ি জ্ঞাত ও চিন্তাযোগ্য সবচেয়ে ভাল কিছুর সাথে পরিচিত হতে এবং নিজেকে, নিজের জনগোষ্ঠীকে, সমাজকে ও ঐতিহ্যকে সবচেয়ে ভাল চেহারায় দেখার জন্য। কখনো কখনো সংস্কৃতি, সচরাচর আগ্রাসীভাবে, জাতি ও রাষ্ট্রের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে এবং 'আমরা' ও 'তারা' বিভেদ ঘটায়। আর বিভেদ তৈরি করতে গিয়ে বিদ্বেষও ছড়ায়। এই অর্থে সংস্কৃতি আত্মপরিচয়ের বোধও তৈরি করে। সাম্প্রতিক সময়ে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কাছে 'ফিরে' যাওয়ার ব্যাকুলতার মাঝে এর প্রকাশ দেখা যায়। এই দ্বিতীয় অর্থে সংস্কৃতি যেন একটা মঞ্চ, যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক আদর্শসমূহ একে অপরকে মোকাবিলা করে। সবসময় শান্ত প্রসন্নভাবে এই মোকাবিলা ঘটে না, সংস্কৃতি একটা যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ নেয় যেখানে এক একটা আদর্শ নিজেকে প্রকাশ করে এবং নিজের অবস্থান দাবী করে। সংস্কৃতির এই রূপ ধারণা নিয়ে সমস্যা হলো এটা নিজের সংস্কৃতিকে পুজো করতে শেখায়, একই সঙ্গে প্রতিদিনের পৃথিবী থেকে নিজের সংস্কৃতিকে বিচ্ছিন্ন করতেও শেখায়। ফলে এরূপ ধারণার ধারক অধিকাংশ পেশাজীবী মানবতাবাদী আর দাসত্ব, উপনিবেশবাদী ও জাতিবৈরী নিপীড়ন এবং সাম্রাজ্যবাদী

www.pathagar.com

বশ্যতার দীর্ঘ ঘৃণ্য চর্চার সাথে এই চর্চার সমর্থক কবিতা, ফিকশন ও সমাজ-দর্শনের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন না। যেমন দেখা যায়, ভারত বা আলজেরিয়া শাসন করতে গিয়ে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের কর্মকর্তারা 'অধীন' বা 'অধস্তন' জাতির যে ইস্টিরিওটাইপ ধারণা ব্যাপকভাবে লালন করতো সেগুলো নিয়ে ঐ দেশ দুটোর খুব কম শিল্পবেত্তাই চিন্তিত হয়েছেন। এমনকি, 'অধীন' বা 'অধস্তন' জাতির ধারণা ছিল তাদের কাছে গ্রহণীয় এবং তারা পুরো উনবিংশ শতক ধরেই আফ্রিকাতে সাম্রাজ্যবাদী ভূখণ্ড দখলকে উৎসাহিত করেছেন। তাই সমালোচকরা, সাঈদের মতে, কারলাইল বা রাসকিন কিংবা ডিকেন্সের সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ সমর্থক অধস্তন জাতি বা নিগার সম্পর্কীয় ধারণাসমূহকে সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় হিসেবে দেখেন।

ডিকেন্সের খুবই বিখ্যাত উপন্যাস *গ্রেড এক্সপেক্টেশন্স* (১৮৬১)। এই উপন্যাসটির মূল বিষয় আত্মবিভ্রম: পিপ, কোনো কঠোর পরিশ্রম বা অভিজাত আয়ের উৎস ছাড়াই, ভদ্রলোক হওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় লিপ্ত থকে। প্রথম জীবনে পিপ দণ্ডিত অপরাধী আবেল ম্যাগউইচের কিছু উপকার করে। অস্ট্রেলিয়ায় দ্বীপান্তরিত হওয়ার পর ম্যাগউইচ তার স্বল্প বয়স্ক মহৎ উপকারীকে বিনিময়ে বিপুল অঙ্কের টাকা দেয়। কিছুকাল পর ম্যাগউইচ অবৈধভাবে পুনরায় লন্ডনে ফিরে আসে।কিন্তু পিপের কাছে অবাঞ্ছিত থেকে যায়। কারণ, মানুষটির সকল কিছুই দুস্কৃতি ও অপ্রিয়তার তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পিপ ম্যাগউইচ ও তার বাস্তবতার সঙ্গে মিলিত হয়; সে অবশেষে ম্যাগউইচকে– তাড়াখাওয়া, আতঙ্কিত এবং ভয়ানক অসুস্থ– তার পালক পিতা হিসেবে মেনে নেয়, তাকে আর অস্বীকার করা বা ফেলে দেয়া যায় না। যদিও অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরত আসার কারণে বাস্তবে ম্যাগউইচ অগ্রহণীয়ই থেকে যায়। কারণ অস্ট্রেলিয়াকে দণ্ডিতদের কলোনি হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল ইংরেজ ক্রিমিনালদের পুনর্বাসনের জন্য, ফেরত আসার জন্য নয়। সকল না হলেও অধিকাংশ পাঠই এই অবিস্মরণীয় উপন্যাসটিকে সোজাসাপ্টাভাবে বৃটিশ ফিকশনের মেট্রোপলিটান ইতিহাসের ফ্রেমের মধ্যে ফেলে দেয়। কিন্তু সাঈদ মনে করেন, এই উপন্যাস এমন এক ইতিহাসের অন্তর্গত, যার বিপুল বিস্তৃতিকে এরূপ পাঠ ধারণ করতে পারে না। ডিকেন্সের পরে আমাদের আর দুই জনের– রবার্ট হিউজেসের কর্তৃত্বপূর্ণ *দ্য ফ্যাটাল শোর* এবং পল কার্টারের উর্বর ভাবনানির্ভর *দ্য রোড টু বোটানি বে*– গ্রন্থের অপেক্ষায় থাকতে হয় অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে মানসকল্পনা ও অভিজ্ঞতার ইতিহাসের বিপুল ভাণ্ডার উন্মোচনের জন্য। অস্ট্রেলিয়া আয়ারল্যান্ডের মতোই একটা 'সাদাদের' কলোনি ছিল, যেখানে আমরা ম্যাগউইচ ও ডিকেন্সের অবস্থান নির্ণয় করতে পারি, কেবল ইতিহাসের কোনো কাকতালীয় ঘটনা হিসেবে নয় বরং উপন্যাসের মাধ্যমে এবং ইংল্যান্ড ও তার সুদূর অধীন ভূখণ্ডের মধ্যকার দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে এই ইতিহাসে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে।

অস্ট্রেলিয়াকে অষ্টাদশ শতকের শেষ নাগাদ দণ্ডিতদের কলোনি হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল যেন ইংল্যান্ড তার সংশোধন-অযোগ্য, অনাকাঙ্ক্ষিত দাগী অপরাধীদের এমন একটা জায়গায় পাঠাতে পারে যা আমেরিকার হারানো কলোনিগুলোর অভাব পূরণ করবে। এই জায়গার প্রথম রূপরেখা পাওয়া যায় ক্যাপ্টেন কুকের মাঝে। মুনাফার ধান্ধা, সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং হিউজেস-এর ভাষায়, সামাজিক বর্ণবাদী নিধনযজ্ঞ

সমন্বিতভাবে আধুনিক অস্ট্রেলিয়ার জন্ম দিয়েছে। ১৮৪০ এর দশকে ডিকেন্স যখন প্রথমবারের মতো এই উপনিবেশের প্রতি আগ্রহ দেখালেন তখন অস্ট্রেলিয়া লাভজনক একটি জায়গা এবং সেখানে এক ধরনের 'অবাধ ব্যবস্থা' গড়ে উঠেছে। আর শ্রমিকরা, সুযোগ দিলে, নিজেদের মতো ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। তথাপি, ম্যাগউইচের মধ্যে ডিকেন্স অস্ট্রেলিয়ায় দ্বীপান্তরিত সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের সম্পর্কে ইংরেজ সমাজে প্রচলিত বেশকিছু ধারণা ভরে দেনঃ তারা সেখানে সাফল্যের মুখ দেখতে পারে কিন্তু বাস্তবে কখনোই সেখান থেকে ফিরে আসতে পারে না। আইনী দৃষ্টিতে তারা সাজার মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে পারে কিন্তু সেখানকার অভিজ্ঞতা তাদেরকে স্থায়ী আউটসাইডারে পরিণত করে।

কার্টারের ইতিহাস অনুসন্ধান একই অভিজ্ঞতার ভিন্ন ভাষ্য হাজির করে। এখানে অনুসন্ধানকারী, সাজাপ্রাপ্ত আসামী, নৃতাত্ত্বিক, বণিক ও সৈন্যরা বিশাল জনশূন্য মহাদেশের তথ্য জড়ো করে একই ডিসকোর্সের মধ্যে থেকে, যারা পরস্পর পরস্পরের সাথে ধাক্কা খায়, স্থানান্তরিত করে কিংবা পরস্পরকে জায়গা করে দেয়। *বোটানি বে* প্রথমত ভ্রমণ ও অনুসন্ধানের এক আলোকায়ন ডিসকোর্স এবং দ্বিতীয়ত একদল ভ্রমণরত আখ্যানকারীর বর্ণন, যাদের কথা, তথ্যাবলী এবং আকাঙ্ক্ষা এই অজানা ভূখণ্ড সাজায় এবং অবশেষে এই ভূখণ্ডকে 'আবাসস্থলে' পরিণত করে। ডিকেন্স-কল্পনায় পিপের জন্য, ম্যাগউইচের কাছে যিনি 'লন্ডনী ভদ্দরলোক', যে সমৃদ্ধ ভূমির চিত্র আঁকা হয় তা অস্ট্রেলিয়া নিয়ে ইংরেজদের সংকল্পের সাথে সাথে খাপে মিলে যায়।

আবার, *গ্রেট এক্সপেক্টেশন*-এর ম্যাগউইচের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা তা কেবল আইনগত নয়, সাম্রাজ্যিকও বটে: উপন্যাসের চরিত্রকে অস্ট্রেলিয়ার মতো জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু মেট্রোপলিটন ইংল্যান্ডে 'ফেরত' আসতে দেয়া যায় না। ডিকেন্সের সকল উপন্যাসেই এরকম দেখা যায়। হিউজেস ও কার্টারের মতো ব্যাখ্যাকাররা উনবিংশ শতকের ইংরেজ লেখায় অস্ট্রেলিয়ার অসম্পূর্ণ উপস্থিতির খাদ পূরণ করে অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসকে একটা পূর্ণাঙ্গতা দান করেন। গ্রেট এক্সপেক্টেশনের নির্ভুল পাঠ অবশ্যই তুলে ধরে যে,ম্যাগউইচের দুস্কৃতির মেয়াদ শেষ হলে পরে, পাপস্খালনের মতো করে প্রতিহিংসাপরায়ন এই বৃদ্ধের কাছে তার ঋণ স্বীকার করার পরে পিপ মূলত নিঃশেষ হয়ে যায় এবং দুটো ইতিবাচক উপায়ে পিপ উপন্যাসে পুনরাবির্ভূত হন। একজন নতুন পিপ জন্ম নেয়, যে অতীতের শৃঙ্খল দ্বারা খুব বেশি বাঁধা নয়, শিশু, তার নামও পিপ। আর বৃদ্ধ পিপ তার ছেলেবেলার বন্ধু হার্বার্ট পকেটের সাথে নতুন পেশায় লিপ্ত হন। এখন সে কোনো অলস ভদ্দরলোক নন, পূর্বে বাণিজ্যে লিপ্ত এক কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তি, যে-পূর্বে ইংল্যান্ডের অন্য কলোনিগুলো রয়েছে, যেখানে রয়েছে স্বাভাবিকতা যা অস্ট্রেলিয়াতে কখনোই দেখা যায়নি। ফলে ডিকেন্স অস্ট্রেলিয়ার জটিলতা নিরসন করলেও আরেক ধরনের সাম্রাজ্যিক মানসিক-কাঠামোর উদ্বোধন ঘটান যাতে প্রতিফলিত হয় পূর্বের সাথে ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্যিক অভিযান ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক। উপনিবেশের ব্যবসায়ী হিসেবে পিপ কোনো ব্যতিক্রমী চরিত্র নয়, কারণ ডিকেন্সের সকল ব্যবসায়ীই সাম্রাজ্যের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কের সম্পর্কিত। কেবল সাম্প্রতিক কালে এসেই এই সম্পর্কগুলো বিশ্লেষণী মনোযোগ পাচ্ছে। উপনিবেশউত্তর দেশগুলোর নতুন প্রজন্মের বুদ্ধিজীবী ও

www.pathagar.com

সমালোচকরা এই বিখ্যাত আখ্যানগুলোর মধ্যে 'হীন জাতি ও বর্ণের মানুষ', 'অজ্ঞ মানুষ' এবং অসংখ্য রবিনসন ক্রুসোর অভিযানের জন্য উন্মুক্ত দেশ– এমন ধারণাগুলোর সন্ধান করছেন।

উনবিংশ শতকের শেষ নাগাদ সাম্রাজ্য আর কোনো ধোঁয়াটে উপস্থিতি নয় কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত দাগী কয়েদীদের বসতি নয়, বরং কনরাড, কিপলিং বা গিড এর মতো লেখকদের লেখায় এক কেন্দ্রীয় অবস্থান অর্জন করে। কনরাডের *নসট্রোমো* (১৯০৪) উপন্যাসের উপজীব্য মধ্য আমেরিকার একটি প্রজাতন্ত্র, স্বাধীন (তার আগের উপন্যাসগুলোতে অবশ্য উপজীব্য হিসেবে আসে আফ্রিকা ও পূর্ব এশিয়ার উপনিবেশগুলো) এবং একইসাথে বিপুল রুপোর খনির জন্য বৈদেশিক স্বার্থের আধিপত্যাধীন। কোনো মার্কিনীর জন্য কনরাডের লেখায় সবচেয়ে যা চমক-লাগানো তা হলো কনরাডের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো: তিনি ল্যাটিন আমেরিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোতে নিরসন-অযোগ্য অশান্তি ও 'বিশৃঙ্খলা'র ভবিষ্যদ্বাণী করছেন এবং ল্যাটিন আমেরিকার পরিস্থিতি মোকাবিলা করার বিশেষ ধরনের প্রভাবিতকরণ কৌশলের কথা বলছেন যা পরিস্থিতির গতি নির্ধারক কিন্তু একই সাথে অধরাও। হোলরয়েড, যিনি সানফ্রান্সিসকোর একজন জগতশেঠ, সান টোম খনি মালিক বৃটিশ নাগরিক চার্লস গোউল্ডকে অর্থায়ন করেন। জগতশেঠ হোলরয়েড তার অনুগ্রহভাজন গোউল্ডকে সতর্ক করে বলছেন, বিনিয়োগকারী হিসেবে 'আমরা কোনো বড় ধরনের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বো না'। তবু 'আমরা বসে বসে পরিস্থিতি দেখতে পারি। কোনো একদিন অবশ্যই আমরা হস্তক্ষেপ করবো। আমরা সেটা করতে বাধ্য। কিন্তু তাড়াহুড়োর কিছু নেই। বিশ্বজগতের মালিক খোদাতালার দরবারে সময় নিজেই অপেক্ষা করতে থাকে। এই সুযোগে আমরা কেবল প্রতিশ্রুতি দিতে থাকবো...। তারপর সময় আসবে যখন আমরা আশপাশের দ্বীপপুঞ্জ ও দেশগুলো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেব। আমরা এই বিশ্বের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবো, এই বিশ্ব তা পছন্দ করুক, চাই না করুক। পৃথিবী এটা ঠেকাতে পারবে না, আমার মনে হয়, আমরাও না।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এবং স্নায়ুযুদ্ধ সমাপ্তির পরে মার্কিন সরকার 'নতুন বিশ্বব্যবস্থা' নিয়ে যে দম্ভপূর্ণ বুলি আওড়াচ্ছে– নিজের পিঠ চাপড়াচ্ছে, বিশ্বে তার দায়-দায়িত্বের কথা ঘোষণা করছে বিজয়ীর বেশে– সেগুলো যেনবা লিখে রেখে গেছে কনরাডের হোলরয়েড: আমরা এক নম্বর, আমরা নেতৃত্বদানে বাধ্য, আমরা স্বাধীনতা ও আইনের পক্ষে, ইত্যাদি। কোনো মার্কিনীই এই ধরনের চেতনা থেকে মুক্ত নয়। কনরাড ইশারা ইঙ্গিতে হোলরয়েড ও গোউল্ড এর চিত্রায়ণের মাধ্যমে যে আশঙ্কাগুলোর কথা বলে গেছেন তার প্রতিফলন দেখা যায় না চাপা পড়ে যায় সাম্রাজ্যিক পরিস্থিতিতে বিজয়ের কল্পনা ও উল্লাসের নিচে। এ ধরনের বুলির চর্চা নতুন নয়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, রাশিয়া, জাপান বা স্পেন চর্চা করেছে, আর এখন সদম্ভে উচ্চারণ করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

বিশ শতকের ল্যাটিন আমেরিকাতে যা ঘটছে কেবল তার আগাম বর্ণনাকারী হিসেবে কনরাডকে পড়লে পাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আজকের তৃতীয় বিশ্বের প্রতি পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির অগ্রদূত হলেন কনরাড। এই দৃষ্টিভঙ্গি এখন পাওয়া যাবে উপন্যাসিক গ্রাহাম

www.pathagar.com

গ্রিন, ভিএস নাইপল এবং রবার্ট স্টোনের মতো বিভিন্ন ধারার লেখকদের মধ্যে, হানা আরেন্থ এর মতো সাম্রাজ্যবাদের তাত্ত্বিকদের মধ্যে, ভ্রমণ কাহিনীকার, চলচ্চিত্রকার এবং যুদ্ধবাদীদের মধ্যে যারা বিশেষজ্ঞভাবে অ-ইউরোপীয় বিশ্বকে ইউরোপ-আমেরিকার পাঠকের কাছে হাজির করেন বিচার-বিশ্লেষণের জন্য এবং উগ্র আনন্দদানের জন্য। অ-ইউরোপীয় বিশ্ব সম্পর্কে কনরাডের পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি এতই বদ্ধমূল যে তিনি অন্ধের মতো অন্যদের ইতিহাসসংস্কৃতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা কিছুই দেখতে পান না। কনরাড কেবল এটুকুই দেখতে পান, পুরো পৃথিবীটাই পশ্চিমের আধিপত্যের অধীন, যেখানে পশ্চিমের সকল বিরুদ্ধতা কেবল পশ্চিমের অজেয় শক্তিকেই প্রমাণ করে। কনরাড এই বর্বর পুনরাবৃত্তির কোনো বিকল্প দেখেন না। তার মগজে ঢোকে না যে ভারত, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকাতেও প্রাণবান সত্তা ও সংস্কৃতির উপস্থিতি আছে, যার সম্পূর্ণটাই বহিরাগত সাম্রাজ্যবাদী ও সংস্কারকদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। তিনি বিশ্বাসও করেন না, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন দুর্নীতিমুক্ত হতে পারে।

নসট্রোমো উপন্যাসের চরিত্র ও প্লটের গুরুতর সীমাবদ্ধতাগুলো চোখে না পড়ে যায় না। উপন্যাসে কনরাড যেন সাম্রাজ্যবাদের পিতৃসুলভ দম্ভে বলছেন, 'আমরা পশ্চিমারাই ঠিক করবো কে ভাল নেটিব আর কে মন্দ। কারণ আমাদের স্বীকৃতির ওপরই তাদের টিকে থাকা না থাকা নির্ভর করে। আমরা তাদের দৃষ্টিদান করেছি, তাদেরকে কথা বলতে ও চিন্তা করতে শিখিয়েছি। তারা যখন বিদ্রোহ করে তখন কেবল আমাদের ধারণাকেই প্রতিপন্ন করে যে তারা দুষ্ট। সহজেই তারা পশ্চিমা প্রভুদের দ্বারা বোকা বনে যায়।' বর্তমানের পশ্চিমা নীতিনির্ধারক ও বুদ্ধিজীবীরা কনরাড যে ধারণা পোষণ করতেন তার থেকে খুব কমই অগ্রসর হয়েছেন। *নসট্রোমো* গভীর অমোচনীয় এক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। ভিন্ন সময়ে এসে তাই গ্রাহাম গ্রিনের দ্যা কোয়ায়েট আমেরিকান কিংবা ভি এস নাইপলের *আ বেন্ড ইন দ্যা রিভার*-এর মতো উপন্যাসে সম্পূর্ণ ভিন্ন এজেন্ডায় একইরকম নির্মম পশ্চিমা সাম্রাজ্যিক কল্পনা সম্ভব হয়ে ওঠে। একই চিন্তা-ভাবনা পল্লবিত হয়ে ওঠে অলিভার স্টোনের *সালভাদর,* ফ্রান্সিস ফোর্ড কোপোলার *এ্যাপোক্রিপস নাও,* কিংবা কনস্টানটাইন কোস্টা-গাভরাসের *মিসিং* এর মতো চলচ্চিত্রে। এসব চলচ্চিত্র এবং উপন্যাস *নসট্রোমোর* মতোই যুক্তি দেখায়, গুরুত্বপূর্ণ কর্মতৎপরতা এবং প্রাণের উৎস হলো পশ্চিম। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পশ্চিম বহির্ভূত অঞ্চলগুলোতে বলার মতো কোনো জীবন নেই।, ইতিহাস নেই বা সংস্কৃতি নেই, পশ্চিম ছাড়া নিজেকে তারা উপস্থাপনও করতে পারে না। কিন্তু কনরাড যেখানে ইউরোপের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যের যুগে বসে *নসট্রোমো* লিখেছিলেন, সাম্প্রতিক উপন্যাসিক ও চলচ্চিত্রকাররা তাদের কাজগুলো করছেন এখন সাম্রাজ্যউত্তর সময়ে যখন কিনা বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক এবং সৃজনকল্পনার ক্ষেত্রে বিপুল ওলটপালট ঘটে গেছে, যখন অপশ্চিমা বিশ্বের পশ্চিমা-উপস্থাপনা বিনির্মাণ করা হয়েছে, যখন ফ্রানজ ফেনন, আমিলকার ক্যাবরাল, ওয়াল্টার রডনি তত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছেন, যখন চিনুয়া আবেচে, নগুয়া ওয়া থিয়ং, ওল সোয়েঙ্কা, গ্যাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ এবং অন্য আরও অনেকের উপন্যাস ও নাটক লিখিত হয়ে গেছে।

ডিকেন্স বা কনরাডের সময়ের পৃথিবী এমনভাবে বদলে গেছে যা এখন মেট্রোপলিটন ইউরোপীয় বা মার্কিনীকে বিস্মিত করে, আতঙ্কিত করে। তারা এখন নিজেদের কোলের

www.pathagar.com

মধ্যেই বিপুল অ-শ্বেতাঙ্গ অভিবাসী নিয়ে বসবাস করছে। অশ্বেতাঙ্গরা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে এবং তাদের আখ্যানকে শুনতে বাধ্য করছে। উপনিবেশিক শক্তি এবং উপনিবেশিত শক্তি এখন সহাবস্থান করছে এবং পরস্পরের সাথে লড়াই করছে নিজ নিজ আখ্যান নিয়ে। এই প্রথম সাম্রাজ্যবাদ ও তার সংস্কৃতিকে আর একমাত্রিক কিংবা খুপরিবদ্ধ, আলাদা, স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পাঠ করা সম্ভব নয়।

সাম্রাজ্যবাদের সংস্কৃতি অদৃশ্য ছিল না কিংবা এর ইহজাগতিক সম্পৃক্ততা ও স্বার্থের কথাও গোপন করা হয়নি। সুস্পষ্টভাবেই এই সংস্কৃতির অবয়বের গুরুত্বপূর্ণ রেখাগুলো দৃশ্যমান ছিল। তবে এটাও ঠিক, সেগুলোর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া হয় নাই। আজ যে আগ্রহ জেগে উঠেছে তা পশ্চিমের প্রতি ঘৃণা ফেরত দেয়ার জন্য যতোটা না তার চেয়ে বেশি সম্পর্ক ও সমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষা থেকে। সাম্রাজ্যবাদের একটা সাফল্য হলো পৃথিবীকে তা নিকটবর্তী করতে পেরেছে, যদিও এই প্রক্রিয়াটা ঘটেছে অত্যধিক কূটতা এবং ঘোর অনৈতিক উপায়ে। অধিকাংশ লোকই এখন এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ভাগীদার। এখনকার কাজ হলো, সাঈদের মতে, ভারতীয় এবং বৃটিশ, আলজেরীয় ও ফরাসি এই রূপভাবে সংযুক্ত করে বিশ্লেষণ করা।

সাঈদের পদ্ধতি হলো প্রথমে খ্যাতিমান সৃষ্টিগুলো পাঠ করা এবং তার পর এগুলোকে সাম্রাজ্য ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত করা। তিনি মনে করেন না যে লেখকেরা মতাদর্শ, শ্রেণী বা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দ্বারা যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয়েছেন এবং তিনি সমাজ-ইতিহাসে বিশ্বাস রাখেন, এইসব লেখকরা তাদের সমাজের ইতিহাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে আবার নিজেরাও নিয়ন্ত্রণ করেছেন নানান মাত্রায়। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয়, রাশিয়ান, পর্তুগীজ, স্পেনীয় এবং অটোমান সাম্রাজ্য নিয়ে সাঈদ আলোচনা করেন নি। এর অর্থ এই নয় যে এদের সাম্রাজ্য স্থাপন কম শোষণমূলক বা কম বর্বরোচিত ছিল। কিন্তু তিনি বলতে চান ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং মার্কিন সাম্রাজ্যিক অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা পরম্পরা আছে। ইংল্যান্ড দীর্ঘকাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে থেকেছে এবং প্রায় দুইশত বছর ধরে ফ্রান্স এই সাম্রাজ্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় লিপ্ত ছিল। যেহেতু আখ্যান সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষায় ইন্ধন যোগাতে বিপুল ভূমিকা রাখে সেহেতু এটা বিস্ময়কর নয় যে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের মতো উপন্যাস লেখার ঐতিহ্য আর কোথাও দেখা যায় না। উনবিংশ শতকেই যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্যিক শক্তি হিসেবে মঞ্চে এসছে। কিন্তু বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসেই, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সকে সরাসরি অনুসরণ করে, একক সাম্রাজ্যিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে দেখা যায়, বৈশ্বিক আধিপত্য অর্জনের চেষ্টাকারী প্রতিটি শক্তিই একই কথা ও কাজের পুনরাবৃত্তি করেছে। অধস্তন জনগোষ্ঠীকে শাসন করতে গিয়ে সকল সময়েই ক্ষমতা ও জাতীয় স্বার্থের দোহাই দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে আমরা 'স্বতন্ত্র' 'সাম্রাজ্যবাদী নই', পুরনো ক্ষমাবানদের ভুলের পুনরাবৃত্তি করবো না। কিন্তু তারা একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করেছে– যেমন ভিয়েতনামে বা উপসাগরীয় যুদ্ধে। এর চেয়েও খারাপ কথা হলো, এই চর্চার সাথে বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাংবাদিকদের সম্পৃক্ততা। যারা নিজ দেশে প্রগতিশীল চিন্তার ধারক তারাই আবার বিদেশের মাটিতে সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক শক্তি। যদিও সাম্রাজ্যবাদ উনবিংশ ও বিংশ শতকে কৃপাহীন গতিতে এগিয়ে গিয়েছে, এর

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে প্রতিরোধও, সেই সঙ্গে প্রবল হয়েছে। পদ্ধতিগতভাবে সাঈদ এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তিকেই সনাক্ত করেছেন। তাই বলে তিনি কলোনির অধীনস্ত বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠীকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করেন না। উপনিবেশ-উত্তর তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে তাকালে জাতীয়তাবাদের আশীর্বাদ ও অভিশাপ একই সাথে চোখে পড়ে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ ও তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদ পরস্পরকে বলবান করেছে, তবু তারা একমাত্রিক ও নিমিত্তবাদী নয়। একইভাবে সংস্কৃতিও একমাত্রিক নয় এবং কারো একার সম্পত্তি নয়, না পূর্বের না পশ্চিমের; কিংবা কোনো একটা ক্ষুদ্র নারী বা পুরুষ গোষ্ঠীর দখলীকৃত সম্পত্তিও নয়। আশার কথা হলো, আজকাল নানান জায়গায় এক নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক বিবেকের উন্মেষ ঘটছে। যেমন বলা যায়, মধ্যপ্রাচ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন এসেছে। সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের অতি প্রিয় বাইনারী অপজিমনের দিন শেষ হয়েছে। এর বদলে আমরা অনুধাবন করছি, পুরনো কর্তৃত্বকে নতুন কোনো কর্তৃত্ব দিয়ে ঠেলে জায়গা করা আর সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের সীমানা-জাতীয়তা-বর্ণ অতিক্রমী এক বিন্যাস গোচরে আসছে। এই নতুন বিন্যাস আত্মপরিচয়ের স্থির-অপরিবর্তনীয় ধারণাকে এখন চ্যালেঞ্জ করছে। আর আইডেন্টিটির এই ধারণা ছিল সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির প্রাণস্বরূপ।

যুগান্তর, ৩ অক্টোবর '০৩

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড সাঈদ
এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের বিদায়

এনামুল হক

এডওয়ার্ড সাঈদ আর নেই। বিশ্বসাহিত্যের দিগন্ত থেকে এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের বিদায় এক বিশাল শূন্যতার প্রতীক। সমকালীন বিশ্বের এক শীর্ষস্থানীয় লেখক ও সাহিত্য সমালোচকই তিনি শুধু ছিলেন না, তিনি ছিলেন শক্তিশালী চিন্তাবিদ এবং ফিলিস্তিনীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার এক আপোসহীন আরব বুদ্ধিজীবী। গভীর মানবতাবাদী এই পুরুষ ১২ বছর ধরে লিউকেমিয়ার সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে গত ২৫ সেপ্টেম্বর নেন অন্তিম বিদায়। এডওয়ার্ড সাঈদ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যারয়ে অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর দুর্বার আকর্ষণ ছিল ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতে। অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি, সঙ্গীত ও সমালোচনা-সাহিত্যের ওপর অনেক উৎকৃষ্ট মননশীল গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও মৌলিক চিন্তার প্রভাব ব্যাপক পরিসরে বিস্তৃত হয়েছিল। তবে তাঁর যে গ্রন্থটি তাঁকে বিশ্বজোড়া খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল এবং পাঠকমহলে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল সেটির নাম *'ওরিয়েন্টালিজম'*। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত এ বইটি ২৬টি ভাষায় অনূদিত হয়। ওরিয়েন্ট বা প্রাচ্য সম্পর্কে পশ্চিমী ধারণার পিছনে যে ভাবাদর্শগত পক্ষপাতিত্ব কাজ করেছিল, এ গ্রন্থে তার স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এতে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ ও উপনিবেশবাদের মধ্যে অশুভ আঁতাতও দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। আগাগোড়া ধর্মনিরপেক্ষ ও যুক্তিবাদী এডওয়ার্ড সাঈদ এ গ্রন্থে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদকে যেভাবে সুতীব্র কষাঘাত হেনেছিলেন তা অনেকের কাছে স্ববিরোধী মনে হয়েছিল। কিন্তু তার পরও *'ওরিয়েন্টালিজম'* আজও সুবিশাল প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং মধ্যপ্রাচ্য ও ইসলাম সম্পর্কে একাডেমিক চর্চার গতিপথ বদলে দিয়েছে।

এডওয়ার্ড সাঈদের প্রভাব শুধু শিক্ষা বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আমেরিকার এই সুপারস্টার বুদ্ধিজীবী একজন অপেরা সমালোচক, পিয়ানোবাদক টিভিব্যক্তিত্ব, রাজনীতিক, মিডিয়া বিশেষজ্ঞ, জনপ্রিয় প্রাবন্ধিক ও ভাষ্যকার হিসাবেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

এডওয়ার্ড সাঈদের জন্ম ১৯৩৫ সালে জেরুজালেমের এক সমৃদ্ধ ফিলিস্তিনী খ্রিস্টান পরিবারে। জেরুজালেম তখন ব্রিটিশশাসিত ফিলিস্তিনের অংশ। বাবা ওয়াদি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। পরে এক সম্ভ্রান্ত প্রোটেস্ট্যান্ট

www.pathagar.com

ব্যবসায়ী হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যে ফিরে আসেন। একদিকে ধনী ব্যবসায়ী এবং সেই সঙ্গে আমেরিকান নাগরিকত্ব–ওয়াদির দামই ছিল আলাদা। মাজারেথের এক ব্যাপ্টিস্ট মন্ত্রীর মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

১৯৯৯ সালে প্রকাশিত *'আউট অব প্লেস'*–এ এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর শৈশব ও তারুণ্যের বিবরণ দিয়েছেন। বাবা ছিলেন রাশভারি ও কর্তৃত্বপরায়ণ। মার্কিন নাগরিক হিসাবে তাঁর পরিচিতির ওপর জোর দিতে গিয়ে তিনি উইলিয়াম নাম ধারণ করেছিলেন। বাবার সংস্কারাবদ্ধ নৈতিক কঠোরতা সাঈদের মধ্যেগভীর ভীতিবোধের সঞ্চার করেছিল, যা কাটিয়ে ওঠার জন্য তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় চেষ্টা করেছিলেন। তবে বাবার কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন প্রবল কর্মোদ্যোগ, যা পরবর্তীকালে তাঁর জীবনে অসাধারণ সাফল্য বয়ে এনেছিল। *'আউট অব প্লেস'*-এর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন : "অবসর বা আরাম-আয়েশের কোন ধারণা আমার নেই। আরও বড় কথা, সাফল্য নিয়ে তেমন আত্মপ্রসাদও নেই আমার। আমার কাছে প্রতিটি দিন যেন স্কুলে নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরু, যেখানে রয়েছে এক সুদীর্ঘ ও নিঃসঙ্গ গ্রীষ্ম এবং তার পরে রয়েছে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যত।"

ওয়াদি সাঈদ তাঁর নিজের সম্পর্কে কিংবা অর্থের উৎস সম্পর্কে পরিবারের কাউকে কিছু বলতেন না। তবে সন্তানদের কোন অভাব রাখতেন না। এডওয়ার্ড ও তাঁর বোনেরাও কিছু চাইতেন না বাবার কাছে। হয়ত কোন অভাব তাঁদের ছিল না বলে। কিংবা চাইবার মতো কোন মানসিকতা তাঁদের গড়ে ওঠেনি। কোথাও বেড়াতে গেলে অসংখ্য নফর-গোলাম তাঁদের সঙ্গে যেত। সামারে তাঁরা লেবাননের ধুর-আল-শিউরে যেতেন। ট্রান্সলান্টিক লাইনারে করে বিলাসবহুল ডিনার সারতেন। এডওয়ার্ড সাঈদ *'আউট অব প্লেস'*-এ তাঁর মায়ের কথা বলেছেন। মাকে যথেষ্ট ভক্তি করতেন সাঈদ। তাঁর ভাষায় মা ছিলেন ব্রিলিয়ান্ট। তবে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারা ছিল কঠিন। মা সবসময়ই এমন একটা ধারণা দিতেন যে, "তিনি আমাকে বিচার করে দেখেছেন এবং আমার মধ্যে এই এই ঘাটতি লক্ষ্য করেছেন।" সাঈদের সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগের জন্ম হয়েছে মায়ের প্রভাবে। মা-ই তাঁর মধ্যে এমন অনুভূতির সঞ্চার করেছেন।

এডওয়ার্ড সাঈদের নামের প্রথম অংশটি অ-আরব খ্রিস্টান হওয়ায় তাঁর কৈশোরের সত্তাটি খণ্ডিত হয়েছিল দু'টি অংশে। একটি এডওয়ার্ড– তাঁর বহির্সত্তা, অন্যটি হলো তাঁর শিথিল দায়িত্বহীন, ফ্যান্টাসিজর্জরিত অন্তর্সত্তা। কলেজ জীবনে তিনি যেমন একজন উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ছাত্র ছিলেন, তেমনি ছিলেন বিদ্রোহী স্বভাবের। কায়রোর ব্রিটিশ স্টাইলের পাবলিক শিক্ষালয় 'ভিক্টোরিয়া কলেজে' প্রায়ই ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের কারণ হয়ে দাঁড়াতেন তিনি। স্মরণ করা যেতে পারে, এই কলেজেরই ক্যাপ্টেন মাইকেল সালুব পরবর্তীকালে ওমর শরিফ নামে একজন খ্যাতিমান অভিনেতা হয়েছিলেন।

বাবা এসব লক্ষ্য করে এডওয়ার্ডকে পাঠিয়ে দেন আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসের প্রাইভেট স্কুল 'মাউন্ট হারমনে'। সেখানকার লেখাপড়া তাঁর বেশ ভাল লেগে যায়। বিশেষ করে প্রবন্ধ রচনার আমেরিকান রীতি কায়রোয় অনুসৃত ব্রিটিশ রীতির চেয়ে অনেক বেশি কল্পনাশক্তি পূর্ণ ও প্রাণোদ্দীপক বলে মনে হয় তাঁর কাছে। লেখাপড়ায় তিনি বেশ ভাল করেন। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের সঠিক মনোভঙ্গির অভাবের জন্যই তিনি একজন

www.pathagar.com

অসাধারণ ছাত্র হিসাবে স্বীকৃতি পাননি। শিক্ষাক্ষেত্রে নিজের মেধা ও প্রতিভার বিকাশ এবং অন্যদিকে সেটার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির অভাব–এই দুই বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব তাঁর মনোলোকে গভীর দাগ কেটে বসেছিল। এডওয়ার্ড পরে বলেছিলেন যে, তাঁর এই অভিজ্ঞতা এবং তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবপুরুষ আরপি ব্ল্যাকসুর, এন্টানিও গ্রামসি, থিওডর এডর্নো, রিমন্ড উইলিয়ামস প্রমুখের রচনাবলী তাঁর মধ্যে কর্তৃত্ববিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারে যথেষ্ট প্রভাব রেখেছিল।

ফিলিস্তিনের সঙ্গে এডওয়ার্ড সাঈদের আবেগগত সম্পৃক্ততার শিকড় অনেক গভীরে। জেরুজালেমে তাঁর এক ফুপু ছিলেন। নাম নাবিহা। ১৯৪৮ সালের পর নাবিহা কায়রোর ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে কাজকর্মের মধ্যেই নিজের গোটা জীবন নিয়োগ করেছিলেন। তিনি এডওয়ার্ড সাঈদের উপস্থিতিতে ফিলিস্তিন বিরোধের রাজনৈতিক দিক নিয়ে কখনও আলোচনা না করলেও ফুপুর প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ তাঁকে ফিলিস্তিন ইস্যুর সঙ্গে জড়িয়ে যেতে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তবে ত্রিশের কোঠায় পদার্পণের আগ পর্যন্ত এডওয়ার্ড সাঈদ মূলত তাঁর পড়াশোনার পিছনেই ব্যস্ত সময় কাটিয়েছিলেন। এ সময় প্রিন্সটন ও হার্ভার্ডের মতো স্বনামধন্য শিক্ষানিকেতনের পরিমণ্ডলের মধ্যে তিনি নিজেকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করে তোলেন। তবে পড়াশোনার পাশাপাশি সঙ্গীতের দিকে, বিশেষ করে পিয়ানোর প্রতি তিনি গভীরভাবে ঝুঁকে পড়েন। পিয়ানো বাজানোয় তাঁর নৈপুণ্য ও কুশলতা প্রায় পেশাদারী পর্যায়ে উন্নীত হয়।

১৯৫৭ সালে তিনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী ও পরে হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ও তুলনামূলক সাহিত্যে অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন এবং তখন থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেখানে কর্মরত ছিলেন।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের অধিকাংশ সময় এডওয়ার্ড সাঈদ স্বদেশের রাজনীতি নিয়ে কোনভাবে মাথা ঘামাননি বললেই চলে। তবে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইলের হাতে আরবদের পরাজয় এবং তারপর ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তুর ঢল তাঁকে এত ব্যথিত করে তোলে যে, তিনি রাজনীতির দিকে ক্রমাগত ঝুঁকে পড়তে থাকেন। ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন-নীতির তিনি শাণিত সমালোচনা করতে থাকেন। ১৯৭৭ সালের মাঝামাঝি তিনি ফিলিস্তিন জাতীয় পরিষদে (পিএনসি) নির্দলীয় বুদ্ধিজীবী হিসাবে নির্বাচিত হন। ফিলিস্তিনী উপদলীয় লড়াইয়ে অংশগ্রহণ তিনি পরিহার করলেও তাঁর হস্তক্ষেপের কারণে বিভিন্ন সময় এসব বিরোধ মিটে গিয়েছিল। এডওয়ার্ড সাঈদ ফিলিস্তিনীদের লক্ষ্য অর্জনের পথ হিসাবে সশস্ত্র সংগ্রাম সমর্থন করেননি। ফিলিস্তিনী-ইসরাইলী সমস্যার দ্বিরাষ্ট্রিক সমাধানের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রবক্তা। এর দ্বারা পরোক্ষভাবে ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকারও করে নেয়া হয়েছিল। ১৯৮৮ সালে আলজিয়ার্সে পিএসসির বৈঠকে এই নীতি গৃহীতও হয়। এর পরিণতিতে মার্কিন-পিএলও সংলাপ, মাদ্রিদ সম্মেলন এবং অসলো শান্তি প্রক্রিয়া সূচিত হয়েছিল। তবে শান্তিপ্রক্রিয়া জোরদার হয়ে ওঠার পর কিছু কিছু মৌলিক প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দেয়ায় এডওয়ার্ড সাঈদ উত্তরোত্তর এই প্রক্রিয়ার এবং সেই সঙ্গে পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। ১৯৯১ সালে তিনি পিএনসি

www.pathagar.com

থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি বলেন, অসলো ঘোষণায় ইসরাইলের দিকেই পাল্লাটা বেশি করে ঝুঁকেছে। এর দ্বারা ফিলিস্তিনীদের স্বার্থ বিকিয়ে দেয়া হয়েছে। অসলো ঘোষণা হয়ে দাঁড়িয়েছে ফিলিস্তিনীদের ভার্সাই চুক্তির নামান্তর। এভাবে এডওয়ার্ড সাঈদ শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এমন রূপ ধারণ করে যে, সর্বাধিক সুপরিচিত ও খ্যাতিমান ফিলিস্তিনী প্রবাসী,যিনি ছিলেন মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির পতাকাবাহী, তিনিই তাঁর নিজ জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে সেন্সরশিপের শিকার হয়ে পড়েন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিদের হাতে ইহুদী নিধনযজ্ঞের ধুয়া তুলে অনেক সময় ফিলিস্তিনীদের ওপর ইসরাইলী উৎপীড়নকে আড়াল করা হয়। এডওয়ার্ড সাঈদ এই দিকটির প্রতি বহুবার বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত তাঁর *'পলিটিক্স অব ডিসপজেশন'* গ্রন্থে লিখেছিলেন : "আর কতকাল ফিলিস্তিনীদের ওপর ইসরাইলী অত্যাচার উৎপীড়নকে আড়াল করার জন্য ইহুদী বিরোধিতা ও ইহুদী নিধনযজ্ঞের ইতিহাসকে ব্যবহার করা হবে? আর কতকাল আমরা এ কথা অস্বীকার করে চলব যে, গাজা ও পশ্চিম তীরের জনগণের কান্নার সঙ্গে নাৎসিবাদের যারা শিকার হয়েছিল, তাদের কান্নার কোন যোগসূত্র নেই... বরং ঐ কান্না ইসরাইলী সরকারের ফিলিস্তিনবিরোধী নীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।"

এডওয়ার্ড সাঈদের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *'দি কোয়েশ্চেন অব প্যালেস্টাইন'* (১৯৭৯), *"আফটার দি লাস্ট স্কাই'* (১৯৮৬) এবং *'কালচার এ্যান্ড ইম্পিরিয়ালিজম* (১৯৯৩)। *'কালচার এ্যান্ড ইম্পিরিয়ালিজম'*সহ ইংরেজী সাহিত্য এবং পাশ্চাত্যের ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের ওপর তাঁর রচনাবলীর মধ্যে এই সুর কোথাও সূক্ষ্মভাবে এবং কোথাও প্রবলভাবে উপস্থিত যে, তিনি নিজে একজন ব্রাত্যজন।তাঁর নায়ক থিওডর এডর্নোর মতো সাঈদ নিজেও ছিলেন মূলত একজন বুদ্ধিজীবী, যিনি তাঁর পক্ষের হোক আর বিপক্ষের হোক সকল ব্যবস্থা বা তন্ত্রকে সমান বিরাগ মনোভাব নিয়ে ঘৃণা করে গেছেন।

বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এডওয়ার্ড সাঈদ ছিলেন এক নিপুণ শিল্পী। তিনি ছিলেন একজন খ্রিস্টান মানবতাবাদী। অথচ ইসলামের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধের কোন অভাব ছিল না। তিনি ছিলেন একাডেমিক এলিট শ্রেণীর একজন। অথচ একাডেমিক পেশাদারিত্বকে শানিত বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হননি। শিল্প-সাহিত্যের যে ভুবনে তিনি বিশেষত্ব অর্জন করেছিলেন তাঁর বাইরে অন্যান্য পরিমণ্ডলে বিচরণেও তিনি ছিলেন নৈপুণ্যে ভাস্বর। তিনি বরাবরই জোর দিয়ে বলেছেন যে, "একজন প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা অবশ্যই হবে একজন এ্যামেচারের মতো। কেননা একজন এ্যামেচারই কেবল পুরস্কার বা ক্যারিয়ারের লোভনীয় হাতছানির দ্বারা প্রলুব্ধ হন না, অভিভূতও হন না। আর সে কারণেই তিনি ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধের সঙ্গে নিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থভাবে সম্পৃক্ত হতে সক্ষম।" এডওয়ার্ড সাঈদের পটভূমিটাই এমন যে, তাঁর মধ্যে ব্যতিক্রমী ধরনের জটিলতা ছিল–তিনি ছিলেন সুবিধাভোগী শ্রেণীর, অথচ যাঁর অবস্থান ছিল প্রান্তিক। তিনি ছিলেন সম্পদশালী অথচ ক্ষমতাহীন। এই বিশেষ পটভূমির জন্যই তিনি অধিকারবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে, বিশেষ করে জায়নবাদ ও এর পশ্চিমী সমর্থকদের হাতে লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনগণের সঙ্গে এক সত্তায় লীন হয়ে যেতে পেরেছিলেন। ইহুদীদের সার্বিক

www.pathagar.com

অর্জন ও সাফল্যের অহঙ্কার নিউইয়র্কে যত উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত, অন্য কোন নগরীতে তেমন নয়। অথচ সেই নগরীর সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য পুরোমাত্রায় উপভোগ করেও এডওয়ার্ড সাঈদ এ অবস্থান থেকে এতটুকু নড়েননি, কি বিচ্যুত হননি। জীবনের শেষ বছরগুলোয় এডওয়ার্ড সাঈদের স্বাস্থ্য একটু একটু করে ভেঙ্গে পড়েছিল। অমোঘ মৃত্যুর ছায়া তাঁর শরীরে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠছিল। বছর দুয়েক আগে তিনি সব রকমের রাজনৈতিক বিতর্ক থেকে সরে দাঁড়িয়ে সঙ্গীতের পিছনে তাঁর অবশিষ্ট সকল কর্মোদ্যম নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৯৯ সালে ইসরাইলী নাগরিক ও সঙ্গীতজ্ঞ ড্যানিয়েল বারেনবইমের সঙ্গে একত্রে তিনি গড়ে তুলেছিলেন দি ওয়েস্ট ইস্টার্ন ডিভান অর্কেস্ট্রা। এডওয়ার্ডের মতো এই বারেনবইম পশ্চিমতীরের ফিলিস্তিনী ছাত্রদের সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করে ইসরাইলী দক্ষিণপন্থীদের রোষানলে পড়েছিলেন।

২০০০ সালে দক্ষিণ লেবানন থেকে ইসরাইল সৈন্য প্রত্যাহৃত হবার পর একদিন এক অবকাশ মুহূর্তে এডওয়ার্ড সাঈদ গিয়েছিলেন কাঁটাতার ঘেরা সীমান্তে। সেখান থেকে ইসরাইলের দিকে তিনি একটা ছোট্ট পাথর ছুড়ে মেরেছিলেন। সে দৃশ্য পত্রিকায় ছাপা হলে এডওয়ার্ড সাঈদ সেটাকে 'আনন্দের এক প্রতীকী দৃশ্য' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। এ নিয়ে দারুণ সমালোচনা ও হৈ চৈ হয়। একাডেমিক ক্ষেত্রে তাঁর পদাবনতির দাবিও তোলা হয়। কিন্তু সেদিন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দৃঢ়ভাবে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

জনকণ্ঠ, ৩ অক্টোবর '০৩

www.pathagar.com

নির্বাসিতের বেদনা
এডওয়ার্ড সাঈদের চিন্তাজগৎ

ফাহ্‌মিদ-উর-রহমান

এডওয়ার্ড সাঈদের কবি বন্ধু ফিলিস্তিনের বিপ্লবী কণ্ঠস্বর মাহমুদ দারবীশের কবিতার পঙক্তি দিয়ে এ আলোচনা শুরু করা যাক। সাঈদের মৃত্যুতে তার জন্য শ্রদ্ধা বা শোকাশ্রু নিবেদনের এর চেয়ে উত্তম কোন বিকল্প এ মুহূর্তে আমার হাতের কাছে নেই। দারবীশের এ বিখ্যাত পঙক্তি দুটো যা সাঈদ নিজে ১৯৮৪তে লেখা তার খুবই একটা জনপ্রিয় ও বিখ্যাত প্রবন্ধ Reflections on exile-এ উদ্ধৃত করেছিলেন, সম্ভবত তার নিজের মনের গভীর বেদনা উচ্চারণ করার জন্য। দারবীশের কবিতার পঙক্তি দুটো এরকম : আমাকে একটা খেলনা করে নিয়ে যাও, বাড়ীর একখণ্ড ইটের মত সঙ্গে নাও আমাকে/যাতে আমাদের সন্ততিরা মনে রাখে যে, তাদের ফিরে আসতে হবে।

সাঈদের Reflections on exile প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হচ্ছে স্বভূমি থেকে নির্বাসিত মানুষের বেদনা। Exile শব্দের মধ্যে নির্বাসিত, মুহাজির মানুষের যন্ত্রণা যে এত গভীরভাবে ধরা দেয় সাঈদই তা বোধহয় প্রথম আবিষ্কার করেছেন। ফিলিস্তিন ছিল সাঈদের এক তীব্রতম যন্ত্রণার উপাখ্যান, যা তার হৃদয়ে রক্তক্ষরণের এক অমোঘ উৎস হয়ে বিরাজ করেছে। ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত এই বুদ্ধিজীবী আমৃত্যু নির্বাসনের যন্ত্রণা বহন করে বেড়িয়েছেন।

এডওয়ার্ড সাঈদের জন্ম ১৯৩৫ সালে, জেরুজালেমে। তার বয়স যখন ১৩ তখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে বিশেষ করে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের ভয়ানক রকম মুসলিম বিদ্বেষের তলা থেকে ভূমিষ্ঠ হল এক অদ্ভুত রাষ্ট্র ইসরাইল। আপন জন্মভূমি থেকে উৎখাত হলেন ফিলিস্তিনের অসংখ্য নিরীহ মানুষ। কারণ হিসেবে বলা হল, ইতিহাসের কোন এক বাঁকে স্বভূমি থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়া ইহুদীরা তাদের স্বভূমি ফেরত পেতে চায়। এ ব্যাখ্যা কতদূর ইতিহাস সম্মত আর কতদূর সাম্রাজ্যবাদীদের মনগড়া সেটা অবশ্য বিবেচ্য। কারণ যাই হোক এর আশু ফল হল ফিলিস্তিনীদের দুর্দশার সীমা রইল না। এক দল মানুষকে স্বভূমি ফেরত দিতে চাওয়ার কারণে আর এক দল মানুষ স্বভূমি থেকে বিতাড়িত হলেন। এ এক অতুলনীয় ঘটনা। সাঈদের ভাষায় : To have been exiled by the exiles- নির্বাসিতদের তাড়নায় নির্বাসিত হওয়া।

অন্য অনেক মানুষের মত সাঈদের পরিবারও সেদিন নির্বাসিত হলেন, নতুন ঠিকানা হল কায়রো। স্কুল ছেড়ে কলেজে পা দিলেন সাঈদ। ষোল বছরের এই তরুণ এ সময় আবার

www.pathagar.com

স্থানান্তরিত হলেন। এবার নতুন পৃথিবী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ঠিকানা। ১৯৬৩ থেকে তিনি নিউইয়র্কের বাসিন্দা। ১৯৬৬ থেকে আমৃত্যু নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। বিষয় : তুলনামূলক সাহিত্য।
আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সৃষ্টিশীল জীবন্ত ও মুক্তচিন্তার পরিবেশ ছিল তার কাছে খুব প্রিয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন ছিল তার কাছে "The last remaining Utopia"-শিক্ষক ও ছাত্রের শেষ কল্পসর্গ। এদিক দিয়ে এডওয়ার্ড সাঈদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টিশীলতার একান্ত শরীক হয়েও এর রাষ্ট্রীয় অনাচারের তিনি ছিলেন তীব্র সমালোচক। এ কারণেই সাঈদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্পস্বর্গে অবস্থান করেও ফিলিস্তিনের মুক্তিযুদ্ধ থেকে নিজেকে তিলমাত্র বিচ্ছিন্ন করেননি। সেই ষাটের দশক থেকে তিনি ফিলিস্তিনী মুক্তিযুদ্ধের শরীক। কেবলমাত্র লেখালেখি ও চিন্তা-ভাবনায় নয়, রীতিমত আন্দোলনেও। এ জন্য তাকে ও তার পরিবারকে গালিগালাজ করা হয়েছে, আমেরিকার ইহুদী ও বর্ণবিদ্বেষীরা তাকে রীতিমত হত্যার হুমকি দিয়েছে। মৃত্যুর আগে তিনি দুরারোগ্য লিউকেমিয়ায় ভুগছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের মঞ্চ থেকে তিনি বেশ কিছুদিন সরে থাকলেও ফিলিস্তিন আর ফিলিস্তিনীদের নিয়ে তার লেখা ছিল বরাবরই সচল, সজীব। ফিলিস্তিন থেকে নির্বাসন তার কাছে শুধুমাত্র একটা বিচ্ছিন্ন বেদনার নাম ছিল না। তার চিন্তা-ভাবনার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণেও এক গভীর আগ্রহী ভূমিকা রেখেছে। তাই নির্বাসনকে তিনি কখনো প্রকৃত অর্থে নির্বাসন দিতে পারেননি। এই নির্বাসন ভাবনাই তার চিন্তা কাঠামোর মূল কেন্দ্রে অবস্থান করেছে, তার জীবনদর্শনের মৌলিক বিন্দু হয়ে উঠেছে। কি সেই দর্শন? সাঈদের ভাষায় : Seeing 'the entire world as a foreign land' makes possible originality of vision.
কেন এরকম চিন্তা? একি পরাজিতের মনোভঙ্গি নয়? সাঈদ এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের জানান দিয়েছেন : অধিকাংশ মানুষ প্রধানত একটি সংস্কৃতি, একটি পরিপ্রেক্ষিত, একটি বাসভূমিতে অভ্যস্ত, নির্বাসিতরা অন্তত দু'টির সম্বন্ধে সচেতন এবং দৃষ্টির এই বহুত্ব একই সঙ্গে কোন বিষয়ের একাধিক মাত্রা সম্বন্ধে চেতনা জাগ্রত করে, যে চেতনাকে সঙ্গীতশাস্ত্রের ভাষা ধার করে বলা যায়– বহুস্বর। সাঈদের এই নির্বাসনের দর্শন,যা তার জীবনদর্শনও বটে, যা শুধু প্রচলিত অর্থে নয়। গভীরতর অর্থে। কারণ এই বোধ তিনি নিজের জীবন থেকে নিজের নির্বাসিত অস্তিত্ব থেকে অর্জন করেছেন আবার তা তিনি জীবনের কষ্টিপাথরে যাচাই করেও নিয়েছেন। এজন্যই তিনি অনায়াসে বলতে পারেন : Exile is never the state of being satisfied, placid or Secure- নির্বাসিতের পক্ষে কখনও পরিতৃপ্ত, অচঞ্চল ও নিশ্চিত থাকা সম্ভব নয়। সাঈদও তা ছিলেন না, আমৃত্যু বিপ্লবী ও মুক্তিযোদ্ধা এই বুদ্ধিজীবী পৃথিবীর সব মুক্তিকামী মানুষের জন্য লড়াই করে গেছেন। চরম অতৃপ্তির মধ্যে হয়ত এই ছিল তার পরম পাওয়া।

২.

এডওয়ার্ড সাঈদ স্বনামধন্য, তার এই আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতার মূলে আছে তার *Orientalism* নামক বইটি। তার এ বই মূলত একটা সমালোচনামূলক গ্রন্থ। কিন্তু এখানে তিনি সমালোচনার প্রথাগত একাডেমিক পদ্ধতি অনুসরণ করেননি এবং করেননি

www.pathagar.com

বলেং   স্বরাষ্ট্র তথা পশ্চিমের একাডেমিক মূল ধারায় অভাবনীয় প্রভাব ফেলেছে এটি। একটি .ভ্যতা কিংবা জনগোষ্ঠী অন্য সভ্যতা বা ‾‾গোষ্ঠীকে কিভাবে দেখে, কিভাবে ভাবে, কিভাবে মূল্যায়ন করে, আবার ঐ দেখার, ভ.ার ও মূল্যায়নের ভেতর দিয়ে সে নিজের ব্যাপারে এবং যাকে 'অপর' হিসেবে জ্ঞান করেছে সেই ভিন্ন সত্তা সম্বন্ধে সে কি চিন্তা-ভাবনা নির্মাণ করে– এখানে সেটাই হচ্ছে দেখবার বিষয়। আবার সেই ধারণাগুলো কি করে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক ক্রিয়াকর্মগুলো নিয়ন্ত্রণ করে সেই প্রক্রিয়াগুলোর প্রতি নজর দেয়ার জন্য সাঈদ আমাদের তাগিদ দিয়েছেন। পশ্চিমের এই জ্ঞান কাঠামোটি না বুঝতে পারলে ওরিয়েন্টালিজমের দৃষ্টিভঙ্গিটা কারও কাছে পরিষ্কার হবে না। এডওয়ার্ড সাঈদ পশ্চিমের বর্ণবাদী জ্ঞান কাঠামোর দিকে আঙ্গুল তুলে আমাদের বর্ণবাদ, ঔপনিবেশিকতা, সন্ত্রাস এবং সাংস্কৃতিক বা যে কোন আত্মপরিচয়ের লড়াই সম্বন্ধে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করার পথ খোলাসা করেছেন। তার *Orientalism* গোটা দুনিয়াকে ভাবতে শিখিয়েছে, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ইতিহাস ও বর্তমানকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শিখিয়েছে। পশ্চিমী দুনিয়ার সাংস্কৃতিক চেতনা এবং সেই চেতনার আয়নায় তৃতীয় বিশ্বের বিশেষতঃ মুসলিম দুনিয়ার অবস্থান সম্পর্কে সাঈদের মৌলিক চিন্তার এক আশ্চর্য পরিচয় এই *Orientalism* গ্রন্থ। মূলতঃ আরব জনগণ ও আরব সভ্যতার প্রতি পাশ্চাত্যের বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোজগতের একটা বিচার তিনি এখানে করেছেন। সাঈদ এ বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন : আরব ও মুসলমানদের সম্পর্কে বর্ণবাদী চিন্তার জাল, ছককাটা সংস্কৃতি চিন্তা, রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ এবং নির্মাণবিক ইডিওলজি স্বাভাবিকই খুব শক্তিশালী...।

সাঈদ জোরের সাথে যেটা বলতে চেয়েছেন তা হল– পশ্চিমের সাম্রাজ্যিক ও আগ্রাসী মনোভঙ্গী মূলতঃ তার সাংস্কৃতিক চেতনার সাথে মিশে আছে। পশ্চিমের বহুবছর লালিত সাংস্কৃতিক চেতনাই তার জনগণকে 'অপর' সম্বন্ধে হীনজ্ঞান করতে শিখিয়েছে এবং নিজের সম্পর্কে একটা বাড়তি বায়বীয় ধারনা লালন করতে উৎসাহিত করেছে। এরকম একটা পরিস্থিতি বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী অনাচারকে নানা সময় জায়েজ করার চেষ্টা করেছে, সাঈদ তা আমাদের বলতে দ্বিধা করেননি।

সাঈদের আর একটা প্রখ্যাত কাজ হচ্ছে *Culture and Imperialism*। মূলতঃ এটি আমার কাছে *Orientalism*-এর একটি সহগামী গ্রন্থ মনে হয়েছে। মূলগত বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে দুটো গ্রন্থের উদ্দেশ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। সংস্কৃতি কিভাবে সাম্রাজ্যবাদের বাহন হয়েছে। সাংস্কৃতিক চেতনা কিভাবে পশ্চিমের মানুষকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, লুন্ঠন, জুলুমবাজির দিকে উৎসাহিত করেছে, সংস্কৃতি কিভাবে পশ্চিমের মানুষকে মুসলিম বিদ্বেষে উদ্বুদ্ধ করেছে অথবা সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গী লালন করতে সাহায্য করেছে সে প্রক্রিয়াগুলো বোঝা এখানে খুবই মূল্যবান। *Orientalism* এবং *Culture and Imperialism* সে প্রক্রিয়াগুলো আমাদের ধরিয়ে দিয়েছে। আগেই বলেছি, ফিলিস্তিন ছিল সাঈদের অনন্ত যন্ত্রণা ও রক্তক্ষরণের উৎস। সেই ফিলিস্তিন নিয়ে, ফিলিস্তিনের মানুষ ও সমস্যা নিয়ে তিনি আমৃত্যু বিস্তর লেখালেখি করেছেন। আরব ও মুসলমানদের সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈরী নীতি ইত্যাদি নানান রাজনৈতিক বিষয়েও তিনি নানান সময় প্রজ্ঞাবান মন্তব্য করেছেন।

www.pathagar.com

এমনকি ১১ সেপ্টেম্ব   হানা পরবর্তী দিনগুলোতে যখন আমরা টিভি পর্দায় দিনের প ন সন্ত্রাস, সন্ত্রাস দমন, ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের মত লাখ লাখ শব্দের লড়াই শুনেছি কিংবা এসব শব্দে আমাদের কান ভারী হয়ে উঠেছে তখন কিছু কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি, তবে পাইনি। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসের জবাবে সন্ত্রাসই বেছে নিচ্ছে কিনা কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই একটা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র কিনা বা তার কর্মকাণ্ড ও নীতিমালা পৃথিবী জুড়ে সন্ত্রাসের প্রসার ঘটাচ্ছে কিনা সেই নিতান্ত প্রাথমিক প্রশ্নগুলোর উত্তর পাশ্চাত্যের নানারকম টেলিভিশন শোভন বুদ্ধিজীবী ও প্রসাদজীবী বিদ্বানদের কাছে আমরা পাইনি। সে জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে এডওয়ার্ড সাঈদের মত ভিন্ন কণ্ঠস্বরের জন্য।

সাঈদের আরও দুটো মূল্যায়ন গ্রন্থ হচ্ছে *The Question of Palestine* এবং *Covering Islam*। এখানে তিনি আরব, ইসলাম, প্রাচ্য বিশেষতঃ মধ্যপ্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্য মানে ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটা তুলনামূলক সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তার নিজের ভাষায় এ দুটো বই হচ্ছে Orientalism সিরিজের বাকি অংশ। সাঈদ এখানে বলতে চেয়েছেন, ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চত্যের ঐতিহাসিক ভুল বোঝাবুঝিগুলো কেমন করে আধুনিককালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহের বর্ণনাকে প্রভাবিত করছে। এর প্রকৃত চেহারা কখনো কখনো বদলে ফেলছে কিংবা আড়াল করে দিচ্ছে এবং মিডিয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞতা বা পূর্ব পরিকল্পিত অভিসন্ধিবশতঃ ইসলামের একটি খারাপ চিত্র খাড়া করে দিচ্ছে। সাঈদ লিখেছেন : The media have therefore covered Islam : they have portrayed it, characterized it, analyzed it, given instant courses on it, and consequently they have made it "known". সুতরাং মিডিয়া যে ইসলাম বা মুসলমানের চিত্র তুলে ধরছে তা কেবল মিডিয়ার তৈরী, এর সাথে সত্যের সম্পর্ক গৌণ। সাঈদ অবাক হয়েছেন এই ভেবে, সমকালে ইসলামের সাথে যেরকম বৈরী আচরণ করা হচ্ছে তা কখনই অন্য কোন ধর্ম কিংবা জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে করা হয়নি। তার নিজের ভাষায় : Of on other religion or cultural grouping can it be said so assertively as it is now said of Islam that it represents a threat to western civilization.

কেন এরকম হচ্ছে এটি সাঈদকে অবশ্যই ভাবিয়েছে : What is about Islam that provokes so quick and unrestrained a response?

সাঈদের মতে, ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের সাধারণ ধারণা আজও আঠার ও উনিশ শতকের ওরিয়েন্টালিস্টদের মত ছককাটা সাংস্কৃতিক বৃত্তে রয়ে গেছে। ওরিয়েন্টালিজম মতবাদ হিসেবে এমন একটা সাংস্কৃতিক ধারণা যা কিনা পৃথিবীর ভূগোলকে 'ওরা ও আমরা' এই দুই ভাগ করে দেখতে শিখিয়েছে পশ্চিমের জনগণকে আর অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রাচ্য যে একটা খুব খারাপ জিনিস সেটা এই চেতনার কেন্দ্রে থাকছে না। আর ইসলাম যেহেতু মূলগত দিক দিয়ে প্রাচ্যের অংশ, সুতরাং ওটি ঘৃণা ও অসূয়ার বিষয়, কখনো কখনো পাশ্চাত্যের ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বী, এটা তাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা চাই। একই কারণে আজও ইসলাম পাশ্চাত্যের মধ্যযুগীয় মনোভঙ্গী অতিক্রম করে সেখানকার মিডিয়া ও নীতিনির্ধারকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। সাঈদ মনে করেন :

It is only a slight overstatement to say that Muslims and Arabs are essentially covered, discussed, apprehended either as oil suppliers or as potential terrorists

Very little of the detail, the human density, the passion of Arab-Muslim life has entered the awareness of even those people whose profession it is to report the Islamic world. What we have instead is a limited series of crude, essentialized caricatures of the Islamic world presented in such a way as, among other things, to make that world vulnerable to military aggression.

এডওয়ার্ড সাঈদের 'নির্বাসিতের দর্শন' তাকে একটা প্রতিবাদের ধ্বনি যুগিয়েছে। নির্বাসিতরা কখনো প্রতিবাদহীন থাকতে পারে না। এই জীবনবোধ তাকে একটা প্রান্তিক অবস্থানে নিয়ে গেছে। নির্বাসিতরা সবসময় একটা প্রান্তে অবস্থান করে, কখনো পুরোপুরি মূলস্রোতে মিশতে পারে না, আবার পুরোপুরি মূলস্রোতে হারিয়েও যায় না। এই প্রান্তিকতা একজন বুদ্ধিজীবীরও প্রয়োজন। তাতে নিজের অবস্থান ও স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখা যায়। গোটা পৃথিবীটাকে বিদেশ বলে গণ্য করে নির্বাসিত মানুষ, ফলে তার দৃষ্টিতে নতুনত্ব ও মৌলিকত্ব আভাসিত হয়। এর ভেতর থাকে এক ধরনের বিদ্রোহ। খাঁটি বুদ্ধিজীবীর বৈশিষ্ট্যও এরকম। নির্বাসিত মানুষের মত তিনি প্রতিবাদমুখর হন, কখনো প্রান্তিক মানুষের মতই গোটা পৃথিবীর সামনে একাই বুক চিতিয়ে দাঁড়ান। সাঈদ স্পষ্ট করে বলেছেন, বুদ্ধিজীবীর জন্য এই নির্জনতা, একাকিত্ব জরুরী। না হলে তার মৌলিকত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিজীবিতার ইতিহাসে এ কথাটা মর্মান্তিকভাবে সত্য। রাজনীতি ও ক্ষমতা এদেশের বুদ্ধিজীবীদের কিভাবে পোষ মানিয়ে ফেলছে, কিভাবে তাদের মুক্তচিন্তাকে হনন করছে, আবার বুদ্ধিজীবিতর নামে এক ধরনের চাটুকার ও খয়েরখাঁর কালচারের উত্থান ঘটছে-এর নজির বোধহয় আমাদের দেশের চেয়ে উত্তম কোথাও আছে বলে মনে হয় না। আজকাল মঞ্চের আলোর সামনে আসার জন্য এসব হালুয়াভোজী বুদ্ধিজীবীরা রীতিমত লড়াই ও অভিযান শুরু করেছেন। এদের জন্য এডওয়ার্ড সাঈদের উপমা হাজির করতে চাই– একটু নির্জনে থাকার অনুরোধ করি। সাঈদ আরও একটা জরুরী কথা বলেছেন। নির্জনে থাকা মানে বুদ্ধিজীবীর সামাজিক দায়কে এড়িয়ে চলা নয়। বুদ্ধিজীবীকে তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। সাঈদ এ কাজটি করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে। নিজের বিদ্যাচর্চাকে লঘু না করে, একজন একাডেমিসিয়ানের দায়িত্বে বিন্দুমাত্র হেলা না করে তিনি নিজের সামাজিক অঙ্গীকার রক্ষা করে গেছেন। শুধু ফিলিস্তিনের মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়ে নয়, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতির একজন তীক্ষ্ম বিশ্লেষক হিসেবেও।

সাঈদ লিখেছেন : to function as a kind of memory- বুদ্ধিজীবীকে এক ধরনের জনস্মৃতির ভূমিকা পালন করতে হবে। সাধারণ মানুষ যে কথা ভুলে যায় বা নগণ্য মনে করে তাকে মনে করিয়ে দেয়া, যেসব ঘটনা মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে দেখে তার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করা কিংবা সামান্যের মধ্যে অশেষের সন্ধান করা– এগুলো হচ্ছে বুদ্ধিজীবীর কাজ। আজকালকার মানুষ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টিভি ও নানারকম তথ্য মাধ্যমের সংবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়। কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা সেটা বোঝাও তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়ে। এই গোলকধাঁধার ভিতর থেকে তাদের বের করে আনাও হচ্ছে বুদ্ধিজীবীর কাজ এবং এই কাজ সততার সাথে করতে হলে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরত্বে থাকা চাই। নইলে বুদ্ধিজীবীর চিন্তার স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। বুদ্ধিজীবীকে বৃহত্তর প্রয়োজনেই নিজের অবস্থানকে স্পষ্ট করতে হবে। নিজেকে ধোঁয়াশার মধ্যে রাখা চলবে না বা দায়িত্ব

www.pathagar.com

এড়ানোর মত কিছু করা যাবে না। সাঈদ লিখেছেন, এভাবে কাউকে দায়িত্ব এড়াতে দেখলে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। তিনি নিজে দায়িত্ব এড়াননি। ফিলিস্তিনীদের ন্যায় যুদ্ধের পক্ষে তিনি তার অবস্থান আমৃত্যু ঘোষণা করে গেছেন। ইসরাইলের অন্যায় দখলদারী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেই দ্বিগুণ অন্যায় সমর্থনের প্রতিবাদে তার লেখা ঝাঁঝালো শাণিত হবে এটা খুব স্বাভাবিক। ইসরাইলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এ্যারিয়েল শ্যারনকে তিনি obese old warmonger হিসেবে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে লক্ষণীয় তিনি ইয়াসির আরাফাতকেও ছাড়েননি। ইসরাইলের ওই অন্যায় দখলকে শেষমেশ মেনে নেয়ার জন্য তিনি আরাফাতকে তিরস্কার করেছেন। Is Israil Secure Now? নামক একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন : Arafat is hemmed in on all sides, an ironic consequences of his bottomless wish to be all thing Palestinian to everyone, enemies and friends a like.

এডওয়ার্ড সাঈদ যে দায়িত্ব এড়াননি তার আরো দু'একটি নজির দেয়া যেতে পারে। ভিএস নাইপল ও স্যামুয়েল হান্টিংটনের লেখালেখি ও বিশ্লেষণকে তিনি বাতিল করেছেন অজ্ঞতা ও অভিসন্ধিমূলক হিসেবে।

প্রথমজন নাইপল একুশ শতকের প্রথম নোবেল পুরস্কার হাতিয়ে নিয়েছেন এবং অবশ্যই তা সাম্রাজ্যবাদীদের যোগসাজশে। নাইপল একটা বই লিখেছেন Among the Belivers : An Islamic gurney ১৯৮১-তে সাঈদ সে বইটির একটা সমালোচনা লিখেছিলেন। সেখানে তিনি নাইপলের ইতিহাস সম্পর্কে অপূর্ণ জ্ঞান, ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে তার বিপুল অজ্ঞতা অথচ পণ্ডিতম্মন্যতার ভাবকে উন্মোচন করে দিয়েছেন। তিনি তীব্র ভাষায় নাইপলকে তিরস্কার করেছেন। তিনি লিখেছেন : Naipaul, demystifier of the west crying over the spit milk of Colonialism... এবং অন্যত্র : The writer of travel Journalism- unencumbered with much knowledge or information, and not much inters lid in imparting any... সাঈদ নাইপলের গভীর অন্তঃসারশূন্যতাকে (Deep emptiness) তথ্য ও যুক্তি দিয়ে আমাদের ধরিয়ে দিয়েছে, তিনি দেখিয়েছেন কত কম জেনে, কত অগভীর জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে এই ভ্রমণ সাংবাদিক ইসলাম সম্পর্কে কিরকম বেসামাল মন্তব্য করেছেন। নাইপলের ইসলাম জ্ঞান সম্পর্কে সাঈদের সুশোভন অথচ তির্যক মন্তব্য : After such knowledge what forgiveness. নাইপলের এই ইসলাম জ্ঞান নিয়ে সাঈদের কঠোর সমালোচনার পেছনে আছে এক ধরনের তীব্র প্রতিবাদ। পশ্চিমী দুনিয়া ইসলামকে যেভাবে দেখে (নাইপলের ইসলাম ধারণা তারই একটি ক্ষুদ্র অংশ) তা আসলে একটা ভ্রষ্টাচার, খণ্ডদর্শন নয়; ভ্রান্তিদর্শন, সেই ভ্রান্তির স্বরূপ উন্মোচন করতে, ইসলামের ভুল ছবি যারা দেখাচ্ছে তার বিরুদ্ধে সাঈদ ক্রমাগত লিখে গেছেন।

নাইপলের মত হান্টিংটনের সভ্যতার সংঘাতের ব্যাধিকেও (তত্ত্ব নয়?) তিনি সমানে আক্রমণ চালিয়েছেন। স্যামুয়েল হ্যান্টিংটন এখন জগৎবিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, অন্ততঃ সাম্রাজ্যবাদী মিডিয়া তার সেই অবস্থান তৈরী করে দিয়েছে। আর তার তত্ত্ব পশ্চিমীদের কৃপায় বেস্ট সেলারের মর্যাদা পেয়েছে। সমাজতন্ত্রের পতন এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পর পুরো পশ্চিম এক কল্পিতশত্রুর সন্ধানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এবং সেই সম্ভাব্য শত্রুর

www.pathagar.com

তালিকায় ইসলাম শীর্ষে রয়েছে। হান্টিংটন এই অসূয়ার তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরী করেছেন। হান্টিংটন প্রথমে একটি প্রবন্ধ লেখেন, তার নাম The Clash of civilization? এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে Foreign of Fairs পত্রিকায়। বছর তিনেক পর এই প্রবন্ধটি বর্ধিত করে তিনি একটি বই-এর আকার দেন। তার নাম রাখেন : *The Clash of Civilizations and the Remaring of World order.*

তবে বই এর চেয়ে তার প্রবন্ধটি নাম করে বেশী আর Clash of Civilization এই শব্দবন্ধটি করে বাজিমাৎ। হান্টিংটনের কথা হচ্ছে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের শেষে পৃথিবীর পুরনো বিভাজন প্রক্রিয়াগুলো বাতিল ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। মানবজাতির মধ্যে এখানকার সংঘাতের চরিত্র হবে সাংস্কৃতিক এই দ্বন্দ্বে ইসলামী সভ্যতা ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমের খ্রিস্টীয় সভ্যতা মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ হান্টিংটন বলতে চেয়েছেন পুরনো ধরনের শ্রেণী সংগ্রাম কিংবা কোন রাজনৈতিক আদর্শের দ্বন্দ্ব মধ্যযুগীয় ব্যাপারই বোঝেন, অন্তত এই ব্যাপারে তারা এতই দৃঢ় আস্থাশীল যে, ইসলাম কখনো আধুনিক, প্রগতিশীল কিংবা কল্যাণকামী হতে পারে না। ১১ সেপ্টেম্বর ঘটনার পর হান্টিংটন তত্ত্ব নতুন করে তরতাজা হয়েছে। এই আক্রমণকে পণ্য করা হয়েছে সন্ত্রাসী ইসলামের কাজ হিসেবে এবং একে প্রতিরোধ করার কথা বলা হচ্ছে সভ্যতার সংঘাতের প্রমাণ হিসেবেই।

এডওয়ার্ড সাঈদের কথা হচ্ছে হান্টিংটন এমন একটা ধারণা প্রচার করেছেন যা আগে থেকেই তিনি ধ্রুব সত্য বলে স্থিরীকৃত করে রেখেছেন। সাঈদ লিখেছেন, হান্টিংটন মোটেই নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন সভ্যতার তুলনামূলক বিচার করেননি, তিনি নিজেই একটি পক্ষের হয়ে লড়াই করছেন, একটি সভ্যতাকে অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে মহত্তর প্রমাণের জন্য ওকালতি করছেন এবং সেটা করতে গিয়ে এই অপরাষ্ট্র বিজ্ঞানী (?) বেছে নিয়েছেন ছলচাতুরীর পথ। একটা সংস্কৃতির জটিল বহুমাত্রিক ও জঙ্গম চরিত্রের পূর্ণ বিশ্লেষণে না গিয়ে তিনি কিছু চালাকির তত্ত্ব হাজির করেছেন। সভ্যতার সংঘাতের তত্ত্ব একটা নিছক চালাকি ছাড়া কিছু নয়। সাঈদ আর একটা জিনিস উল্লেখ করেছেন, সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য হান্টিংটন যাদের গুরু মেনেছেন তারা কেউই যথার্থ পণ্ডিত নন, অজ্ঞতা, অস্বচ্ছতা, অগভীরতা যাদের বিদ্যাবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে আছে। হান্টিংটনের এরকম একজন গুরুর নাম হচ্ছে বার্নাড লুইস। ইসলাম বিশেষজ্ঞ ওরিয়েন্টালিস্ট হিসেবে পশ্চিমে তিনি বেশ নাম কুড়িয়েছেন। আসলে তিনি একজন ঘোর সাম্প্রদায়িক ও ইসলাম বিদ্বেষী। এই ব্যক্তিটির একটি প্রবন্ধ থেকে হান্টিংটন Clash of Civilization শব্দবন্ধটি ধার করেছেন। ১৯৯০ সালে বার্নাড লুইসের লেখা ঐ প্রবন্ধটির নাম ছিল The Roots of Muslim Rage। নামটিই আমাদের বুঝিয়ে দেয় এই পণ্ডিতের দৃষ্টি কতখানি তমসাচ্ছন্ন। (লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, নাইপলও ইসলাম সম্পর্কে লিখতে গিয়ে অহরহ Rage শব্দটি ব্যবহার করেছেন, রতনে রতন চেনে আর কি!)

সংস্কৃতি ও সভ্যতা নিয়ে হাল আমলে যেসব গবেষণা ও লেখালেখি হয়েছে তার সাথে হান্টিংটন সাহেবদের পরিচয় থাকলে তারা বুঝতেন কোনটা তত্ত্ব আর কোনটা অতত্ত্ব। একি অজ্ঞতা? পশ্চিমী নীতিনির্ধারকরা অবশ্য একেই আজকাল আলোকপ্রাপ্ত হিসেবে চালাতে চাইছেন। এই অজ্ঞতার সাথে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র মিলে এখন যা দাঁড়াচ্ছে তা হচ্ছে এক অভিশাপ। ১১ সেপ্টেম্বরের পর এ অভিশাপের চেহারা আমরা দেখেছি।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানে, তারপর ইরাকে। সভ্যতার নামে বেগুনাহ্ শিশু হত্যা, নারী হত্যা, জনপদ ধ্বংসকে পৈশাচিক দুরভিসন্ধি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। পশ্চিমে তো বটেই, আমাদের চারপাশেও অনেক হান্টিংটনের ভক্তকুল বিরাজ করছেন। যাদের অনেকেই বিজ্ঞের মত বলে থাকেন, আসলে সমস্যাটা মুসলমানদের নিয়েই, ইসলামের মধ্যেই যতসব সমস্যা। তা না হলে এদেশের বিজ্ঞজনেরা দলবেঁধে তালেবানদের বৌদ্ধমূর্তি ভাঙ্গায় প্রতিবাদ করতে পারেন, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভ্যতা বিরোধী, মানবতা ধ্বংসী যুদ্ধের বিপক্ষে দাঁড়াতে পারেন না।

হান্টিংটনের পরিকল্পিত তত্ত্বের ঘোরে পড়ে আমরা ভুলে গেছি সভ্যতা সভ্যতায় দেয়া-নেয়াও চলে, চলে আলাপ-আলোচনা কথোপকথন। এডওয়ার্ড সাঈদের ভাষায় : a great of ten, silent exchange and dialogue। সভ্যতা-সভ্যতায় এই দেয়া-নেয়ার গভীরতা না বুঝলে আমরা শুধু পারস্পরিক রক্তক্ষয় ও ধ্বংসকামিতার জোর আওয়াজই শুনতে পাব। এডওয়ার্ড সাঈদ জীবনব্যাপী সাধনায় সভ্যতার দ্বন্দ্ব নয়, মিলনতত্ত্বের বাঁশি বাজিয়েছেন। সভ্যতায় সভ্যতায় সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির কথা জোর দিয়ে বলেছেন। এ কারণেই তাকে লড়াই করতে হয়েছে মানবতা বিনাশী সব প্রকল্পের বিরুদ্ধে। তার সেই লড়াইয়ের আওয়াজ আরো তীব্রভাবে আজ শুনতে পাচ্ছি।

ইনকিলাব, ৩ অক্টোবর '০৩

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড সাঈদ : নিপীড়িতের কণ্ঠস্বর

নাদিম হক মণ্ডল

জীবনানন্দ দাশ বহু আগে লিখেছিলেন,

'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই- প্রীতি নেই- করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের পরামর্শ ছাড়া।'

কী লিখতেন জীবনানন্দ আজ বেঁচে থাকলে? আঁধার, আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে যা হাজার গুণ তীব্র এখন. যথার্থ ভাষা কি আছে তাকে ধরবার মত? আমরা দেখতে পাই তীব্র সংকল্পে ফিলিস্তিনী 'Stone child'দের লড়তে ইসরাইলী ট্যাংকের বিরুদ্ধে অথবা ইরাকি শিশুদের বিভৎস মুখ টিভি, সংবাদপত্রে এসেই কীভাবে হারিয়ে যায় সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। আধিপত্যবাদী শক্তিকে চিনতে এবং তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কৌশল নির্ধারণে এডওয়ার্ড সাঈদ আজন্ম লড়িয়ে।

সাঈদ তাঁর কাগজ ও কলমের দুর্দান্ত বোঝাপড়ার মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন আন্দোলন মানে স্রেফ সশস্ত্র আন্দোলন নয় বরং; আধিপত্যের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের বিবিধ রাস্তা রয়েছে: প্রত্যক্ষ আঘাত যেমন সশস্ত্র সংগ্রাম, বিক্ষোভ ইত্যাদির সাথে সাথে সংস্কৃতি, মিডিয়া পরিসরও নিপীড়িতের পক্ষে কাজের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

সাঈদ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন, চলে গেছেন এমন দুনিয়ায়, শারীরিকভাবে সেখান থেকে ফিরে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু তার গভীর চিন্তা, দর্শন, ব্যাখ্যাকে 'আমাদের' লড়াইয়ে ব্যবহারের সুযোগ আছে। আমাদের নিজেদের লড়াইয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক পাটাতন তৈরিতে এডওয়ার্ড সাঈদের চিন্তা সম্পর্কিত উপলব্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই তৃতীয় দুনিয়ার মানুষজনদের লড়াইয়ের স্বার্থে নিপীড়িতের চিরকালের বন্ধু এডওয়ার্ড সাঈদের ভাবনা পাঠকদের সাথে যৌথতার ভিত্তিতে ভাগাভাগির তাগিদ থেকেই এই লেখাটি উৎসারিত। বুদ্ধিবাদি বিকল্প সমাজ, রাজনৈতিক কৌশলে নিপীড়ককে প্রতিহত করার দিকদর্শক, ফিলিস্তিনী জনতার মুখপাত্রের প্রয়াণে বিকল্প পথ তৈরির দায় আমরা এড়াতে পারি না প্রান্তিক তৃতীয় বিশ্বের শোষিত আমজনতার অংশ হিসেবে। বদমায়েসীর মুখোশ আমাদের খুলতে হবে যখন কিনা আধিপত্যবাদী শক্তি এই মুহূর্তে নয়া নয়া দেশ আক্রমণ ও ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংকট জিইয়ে রাখার স্পষ্ট ভূমিকা বাছাই করেছে। এই সংকটে

www.pathagar.com

স্বস্তি এনে দেয় সাঈদের চিন্তা পদ্ধতি, যা পাঠ করে আমরা নিজেদের কর্তব্যকে ঠিক করে নেই, নিতে পারি, নির্ধারণ করতে পারি আমাদের নিজেদের সম্ভাব্য কর্মপন্থা-পশ্চিমা ও অপরাপর ক্ষমতা, আধিপত্য, দখল, হত্যার বিরুদ্ধে।

নিপীড়িত আমাদের হৃদয়বন্ধু এডওয়ার্ড সাঈদ আর নেই এই সত্যের মোকাবিলাতে প্রান্তিক কলোনী, তৃতীয়বিশ্ব, দক্ষিণ এবং আরব অঞ্চলের জনতার হৃদয় উৎসারিত হাহাকারই এই মুহূর্তের অমোঘ সত্য। তিনি চলে গেছেন জীবনের পরপারে। নিপীড়িত ফিলিস্তিনপক্ষীয় মানুষজনদের চৈতন্যে নানাবিধ আন্দোলন সংগ্রামের নীতি নির্ধারণ এবং পশ্চিমা ক্ষমতার আধিপত্যবাদী ভূমিকার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও শিকড় উৎপাটনে এখন আমরা কোথায় কার কাছে যাবো? এই জিজ্ঞাসা ক্ষণে ক্ষণে না উঠে কি পারে যেখানে সাঈদ তার জীবনের প্রায় সবটাই শুধু ফিলিস্তিনীদের অধিকার নিয়ে যে লেখালেখি করেছেন তাই নয়, ফিলিস্তিনীদের প্রত্যক্ষ আন্দোলন এবং নীতি নির্ধারণের সাথেও যুক্ত ছিলেন।

'নিউইয়র্ক, আমার সমালোচক হয়ে ওঠাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে'– তিনি প্রায়ই বলতেন। সেই প্রিয় শহর নিউইয়র্কেই তিনি মারা গেলেন। নিউইয়র্ক ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৩ থেকে বাস করলেও লড়িয়ে বন্ধু এবং পণ্ডিত সাঈদের জন্ম ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ শাসিত ফিলিস্তিনে। ইসরাইলী দখল, আধিপত্যের প্রত্যক্ষ শিকার সাঈদ পরিবার সমেত কায়রো চলে আসেন। এরপর সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্র।

তেলের জন্য যুদ্ধ এবং সাঈদ প্রস্তাবিত কার্যকর বিকল্প ভাবনা পদ্ধতি

চিন্তাপদ্ধতি, যুক্তি এবং লেখার ধার এই প্রত্যেক বিবেচনাতেই তিনি ছিলেন তার সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে পশ্চিমা আধিপত্যের চেহারা চিনতে সাঈদ ছিল পয়লা বাছাই, বিশেষ করে নিপীড়িতের পক্ষালম্বনকারী সকলেরই। চমস্কিসহ অপরাপর অনেক মার্কসবাদী যেখানে 'ইরাক যুদ্ধ' মধ্যপ্রাচ্য সংকট, ইত্যাদিকে স্রেফ 'তেলের জন্য যুদ্ধ' 'মার্কিন স্বার্থ' দ্বারা বিচার করেন সেখানে সাঈদ পরিষ্কার অর্থেই অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী মার্কসীয় বিশ্লেষণকে মানতে নারাজ ছিলেন। তার মতে, যেমনটা ইরাক যুদ্ধ তেমনি ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংকট স্রেফ অর্থনৈতিক কারণ উৎসারিত নয় বরং আরব (মুসলিম) দুনিয়া ও পশ্চিমের মুখোমুখিতা অব্দি এর সীমা বিস্তৃত যাতে যুক্তরাষ্ট্রের ইসরাইল পক্ষাবলম্বন সেই ইতিহাসের 'ধারাবাহিকতা' যে ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই আধুনিক ইউরোপ ও আরবদের সংঘর্ষকে। অর্থাৎ ফিলিস্তিন জনগণ এবং ইসরাইল রাষ্ট্রের মধ্যকার লড়াই-এর ভিত্তি দীর্ঘসময়ে সৃষ্টি হওয়া 'ঐতিহাসিক সম্পর্ক' যার অন্তর্গত ১৯৪৮ সন হতে একটি সমাজের ধ্বংসসাধন,উচ্ছেদ, দখল যেমন, তেমনি পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তি নেপোলিয়ানের ১৭৯৮ সনে আরব আক্রমণও। তাই সাঈদের যুক্তিতে যে ফিলিস্তিনি যোদ্ধা রামাল্লার রাস্তায় জীবন দেয় অথবা যে বিক্ষোভকারী কাঁপিয়ে তোলে বাগদাদ, জেনিন, তেহরানের রাস্তা যে শুধু ইহুদীবাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে লড়ছে তা নয় তার ক্ষোভ যতটা ইসরাইলের প্রতি ততটাই পশ্চিমের প্রতি, ইতিহাসের প্রতি, যে ইতিহাসে আমরা পশ্চিমকে পাই আরব/মুসলিম/প্রাচ্য আক্রমণকারী হিসেবে, নিপীড়ক হিসেবে। পশ্চিম আরবদের ক্রুসেডের বিপরীত পক্ষ হিসেবে দেখে, সাঈদই আমাদের এটা ওয়াকিবহাল করেছিলেন।

www.pathagar.com

'প্রাচ্যবাদ' পশ্চিমা মর্জিতে ইসলাম ও প্রাচ্যের 'নির্মাণ'

এডওয়ার্ড সাঈদের কাজের বিস্তার নানামুখী হলেও তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান নিঃসন্দেহে *Orientaism* (১৯৭৮) গ্রন্থটি যা প্রকাশের পরই আন্তর্জাতিক এবং আন্তঃজ্ঞানশাস্ত্রীয় তর্কের মুখ্য বিষয়ে পরিণত হয়। এই গ্রন্থটির লক্ষ্য ছিল পশ্চিম তথা ইউরোপ কর্তৃক ইসলামিক প্রাচ্য'র 'নির্মাণ' পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ। সাঈদ 'প্রাচ্যবাদ' প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন সেই প্রক্রিয়াটিকে চিহ্নিত করতে যা দ্বারা 'পশ্চিম' তার হাজার বছরের ইতিহাসে নানা সাংস্কৃতিক উৎপাদ এবং বিজ্ঞানের লেবেল আঁটা একাডেমিক ডিসিপ্লিন যেমন ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, নৃবিজ্ঞান, ভ্রমণকাহিনী, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাচ্যবাসী বা ইসলামিক মানুষজনদের নেতিবাচক চরিত্র নির্মাণ করেছে।

সাঈদ 'প্রাচ্যবাদ' গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন ইসলাম ও প্রাচ্য'র পরিচিতি 'নির্মাণ'-এর পশ্চিমা প্রজেক্টটিকে নতুন ভাববার কারণ নেই, বহু যুগ ধরেই এ রাজনীতি চলমান। ১৯৭৮-এ প্যালেস্টাইন বংশোদ্ভূত তরুণ অধ্যাপকটি পশ্চিমের 'প্রাচ্যবাদ'কে লাইব্রেরী বা আর্কাইভের সাথে তুলনা করেন সেখানে প্রাচ্য তথা ইসলামী মানুষজনদের চরিত্র, আচরণ, বিশ্বাস, পরিবেশ ইউরোপ কর্তৃক নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রণ করতে নির্মিত ও বিন্যস্ত।

তিনি ইতিহাসে ফিরে বলেন, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর ইসলামের ব্যাপক প্রসার খৃস্টানিটি এবং পশ্চিমের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমে পারস্য, সিরিয়া, মিশর এবং পরে তুরস্ক, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, সিসিলি, ফ্রান্সের অংশবিশেষ, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া বিজয় এবং অটোম্যান সাম্রাজ্যের আধিপত্যের ফলে খৃস্টান সভ্যতার দাপট হুমকির মুখোমুখি হলে তার মোকাবিলাতে পশ্চিমা জগত নমনীয় অথচ বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে প্রয়াসী হয়। ইসলাম ও প্রাচ্য বিরোধী পশ্চিমা রাজনীতিরই ফলাফল হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানকাণ্ডের জন্ম এবং তা হতে উৎপাদিত হয় বিভিন্ন টেক্সট। 'কলোনিয়াল ডিসকোর্স', 'ওরিয়েন্টালে ডিসকোর্স' এর হাওয়াতেই জ্ঞানকাণ্ডগুলো নিজস্ব 'অবজেক্ট অব নলেজ' আবিষ্কার করে। পশ্চিমা পৃষ্ঠপোষকতায় যৌনতত্ত্ব যেমন, তেমনি সামজবিজ্ঞান সমাজকে আকর করে প্রাচ্য ও ইসলামের নেতিবাচক চরিত্র পয়দা করে।

'অপশ্চিমা' ইসলামী মানুষজনদের 'পরিবেশন' বিষয়ে সমসাময়িক ইউএস মিডিয়া ডিসকোর্স ও ইউএস পলিসি মিলেমিশে কাজ করে। সাঈদের মতে, এটা এক ধরনের 'চাপ' যার ফলে সমস্ত সাংস্কৃতিক জগত ও মিডিয়া পাগলের মতো যুক্তি ছাড়াই সাম্রাজ্যবাদী পরিচয় ও নীতি নিরীখে ভূমিকা রাখে। তিনি দেখান, মিডিয়া পাগলপ্রায় হয়ে ফিলিস্তিনীদের পর ইসরাইলী নিপীড়নকে বৈধতা প্রদান করে, জায়েজ করে এবং যা এক ধরনের 'মেলোড্রামা'। এর মূল বৈশিষ্ট্য 'অনৈতিহাসিকতা'। 'আত্মঘাতী' হামলাকারীরা অবলীলায় মিডিয়াতে 'সন্ত্রাসবাদী' হিসেবে চিহ্নিত হয় যাতে অনুচ্চারিত থাকে অথবা এড়িয়ে যাওয়া হয় হেতুকে, যে কোন কারণে মানুষজন সন্ত্রাসবাদী হয়, কেন নিজের প্রিয় জীবনকে বিসর্জন দিয়ে বোমা ফাটায় 'আত্মঘাতী' ফিলিস্তিনী তরুণী-তরুণ কিশোরী-কিশোররা। পাঠক, দর্শককে দিনের পর দিন মিডিয়াতে পড়তে, দেখতে, শুনতে হচ্ছে কীভাবে ফিলিস্তিনী জনগণ উৎসর্গীকৃত ইসরাইল রাষ্ট্রের ধ্বংসে; কীভাবে ফিলিস্তিনীদের 'সন্ত্রাসী' চরিত্র শান্তিকে অসম্ভব করে তুলেছে এবং কীভাবে ফিলিস্তিনীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও পূর্ণ মানবাধিকারের দাবি ইসরাইলের'নিরাপত্তা হুমকি' হচ্ছে। সাঈদ

www.pathagar.com

বলেন, মিডিয়া ফিলিস্তিনী প্রতিরোধ চেষ্টার সাথে ইসরাইলী ভায়োল্যান্সের যে জঘন্যতা তা প্রকাশ করে না। ইসরাইলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনীদের সংগ্রামকে ফিলিস্তিনীদের উপর অভিবাসনকারী সেটেলারদের নির্যাতনের সাথে সম্পর্কিত করেও দেখে না।

সাঈদ বিশ্বাস করেন জগতে বহু ধরনের 'ক্ষমতা' আছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলী যে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে তা সত্যের একটা অংশ। এই দেশদ্বয় প্রভুত্বের ক্ষেত্র তৈরি করতে চেয়েছে শুধু সামরিক দিক থেকে নয়, বরং 'সতর্ক ও বৈজ্ঞানিকভাবে' পরিকল্পিত প্রচারণা দ্বারা; যে প্রচারণা বিশ্ব দরবারে তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিপীড়িতদের ক্রিয়াদীকে' নস্যাৎ করে।

সাঈদ যা বলতে চেয়েছেন তাকে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির প্রত্যক্ষ দখলদারিত্বের অবসান ঘটলেও সাংস্কৃতিকভাবে 'প্রাচ্যবাদ' এখনও সক্রিয়। ক্ষমতা– সম্পর্কের সাথে যুক্ত মিডিয়া এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশন পশ্চিমা স্বার্থের স্ট্র্যাটেজি প্রোটেকশনের অন্যতম পরিকল্পনা নয়া ঔপনিবেশিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে বিভাজনকে জিইয়ে রাখবার বরাতে।

মার্কিন স্বার্থ, মধ্যপ্রাচ্যে অনুশীলিত মার্কিন নীতি এবং '(অ) শান্তি' আলোচনার ফসল একপক্ষীয় চুক্তি

মার্কিন স্বার্থ এবং মধ্যপ্রাচ্যে অনুশীলিত মার্কিন নীতি সম্পর্কে সাঈদের একটি পরিষ্কার উপলব্ধি ছিল। তাঁর মতে, ইসরাইল ফিলিস্তিন সংকট তৈরি এবং জিইয়ে রাখবার দায়িত্ব মহান যত্নে সমাধান করেছে (এবং করছে) প্রথমে ঔপনিবেশিক শক্তি এবং পরে তার সম্প্রসারণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। তার মতে, ইসরাইলী ফিলিস্তিন সংকট যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, মতাদর্শিক, ভূ-রাজনৈতিক (Geo-political) এই প্রত্যেকটি স্বার্থ সংরক্ষণেরই উর্বর জমি।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি না আসবার মূল কারণ যে যুক্তরাষ্ট্রের অনিচ্ছা তা সাঈদ নানান সময় বলতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন কিসিঞ্জারদের 'অচলাবস্থা', 'আলোচনা নয়', 'শক্তি প্রয়োগ' শব্দ ব্যবহারের যুগ থেকে ক্লিনটন অথবা বুশের মুখে 'শান্তি' শব্দটি একবার হলেও যে আসছে সেটা অধিকৃত আতলে অথবা দুনিয়ার অপরাপর জায়গায় ইসলামি মিলিট্যান্টদের তরফে দীর্ঘকালীন সিরিজ চ্যালেঞ্জের ফলাফল।

আজকের কাগজ, ২ অক্টোবর '০৩

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবী এবং মুক্তির উচ্চারণ
এডওয়ার্ড সাঈদের চিন্তা-ভাবনা

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

বুদ্ধিজীবীর কণ্ঠস্বর তখনি সবচেয়ে সমৃদ্ধ, যখন তাঁর বক্তব্য প্রচলিত শাসন অনুশাসন বিধি-নিষেধকে অতিক্রম করে সামাজিক স্থিতাবস্থায় অস্থিরতার কাঁপন তোলে। সেই প্রেক্ষিতে সর্বজনীনতার অর্থ হচ্ছে নিজস্ব পরিবেশ পটভূমি ব্যক্তি গোষ্ঠীর নিরাপত্তার নিশ্চয়তাকে লঙ্ঘন করে ক্ষমতা বলয়ের মুখোমুখি ক্ষমতাহীনদের অধিকারকে তুলে ধরার ঝুঁকি নেয়া। শক্তির পাদপীঠে আত্মসমর্পণ নয়, নিঃশঙ্ক সত্যভাষণই বুদ্ধজীবীর দায়িত্ব। অনেকে বলবেন স্বপ্ন বিলাস অথবা নির্বুদ্ধি আদর্শবাদ। কারণ সামাজিক প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির 'রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক অথবা অর্ধসত্য পরিবেশনার সুদৃঢ় বৃত্তের বাইরে অবস্থান করে পরিবর্তনের প্রয়াস প্রায় অসম্ভব। অথচ সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রচেষ্টা ছাড়া ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতায়ন কখনও হতে পারে না। হয়তো তার ফলশ্রুতি বন উজাড়ের অক্ষম সাক্ষী হিসাবে একজন বুদ্ধিজীবীর নির্জন স্বগত উচ্চারণ। কিন্তু নীতিহীন স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর যতই একলা হোক না কেন, তার অনুরণন ঘটে সেই বৃহত্তর এবং নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাদের মানবাধিকার মুষ্টিমেয় সাক্তের দম্ভে নিরন্তর পদদলিত। বুদ্ধির মুক্তির রোমাঞ্চ তখনই শিহরণ আনে, যখন একজন বুদ্ধিজীবী প্রতিনিধিবিহীন জনমানুষের বেঁচে থাকার অধিকারের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের মূল সূত্র ওই ভয়শূন্য চিত্তের মধ্যে নিহিত। এডওয়ার্ড সাঈদের ইংরেজীতে বলতে গেলে "Speaking truth to power is no Panglossian idealism: It is carefully weighing the alternatives, picking the right one and then intelligently representing it where it can do the most good and cause the right change" (Representations of the Intellectual, Page 102).

এ্যান্টনিও গ্রামসি তাঁর কয়েদখানার নোট বইয়ে লিখেছিলেন যে, একভাবে দেখতে গেলে সব মানুষই বুদ্ধিজীবী যেমন কর্মকর্তা, কেরানী, মালিক-রায়ত, শিক্ষক-ছাত্র, সাংবাদিক-সাহিত্যিক, শিল্পী-রূপকার ইত্যাদি। কিন্তু সমাজে সত্যভাষণের দায়িত্ব সব মানুষের নয়, বরং কয়েকজন নির্জন এবং প্রান্তিক মানুষের। তাঁরা শুধুমাত্র দক্ষ পেশাদার নন, বরং সংবেদনশীল অপেশাদার। তাঁদের দৃষ্টি বিশেষ জ্ঞানের সঙ্কীর্ণ বেড়াজালে আকীর্ণ নয়, বরং সামগ্রিক এবং স্বচ্ছ। সে জন্যেই তাঁরা প্রথাগত গোঁড়ামিকে অস্বীকার করে সমাজপতির কাছে অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলে ধরতে পারেন। প্রাতিষ্ঠানিক বাণিজ্যিক

www.pathagar.com

আমন্ত্রণ তাঁদেরকে সহজে লুব্ধ করতে পারে না। তাঁরা সেই সব বিষয়ে উচ্চকণ্ঠ, যা কিনা গালিচার নিচে ঝাড়ু দিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। যে মানুষেরা শক্তিবৃত্তের বাইরে, বুদ্ধিজীবী তাঁদের সপক্ষে। বুদ্ধিজীবীর প্রতিনিধিত্বের শিকড় সেই মাটিতে প্রোথিত, যে মাটি তার সকল সন্তানকে সমতায় সিঞ্চিত এবং সঞ্জীবিত করে। এক কথায় বলতে গেলে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের এবং সকল সৃষ্টির স্বাধীন সৃজনের আনন্দে আপন ভুবন গড়ে তোলার অধিকার। যখনই সেই অধিকার লাঞ্ছিত, তখনই বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা আগ্রাসনকে লিপিবদ্ধ করা, চিত্রায়িত করা। সেই প্রকাশের মধ্যে অন্তর্লীন রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ। সে জন্যেই প্রয়োজন অবিশ্রান্ত এবং সতর্ক অভিজ্ঞান। যেন প্রমাণবিহীন ধ্যানধারণা অথবা অর্ধসত্য দৃষ্টিকে অস্বচ্ছ না করে। প্রয়াসটি অবিরাম এবং বিবর্তনের প্রেক্ষিতে বার বার পরিবর্তিত। অসম্পূর্ণতায় তার পূর্ণতা। অভিপ্রেত যে লক্ষ্য তার মধ্যেও বিভিন্নতা রয়েছে। যেমন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ, তার সামনে দু'টি প্রশ্ন। একটি স্বাধিকার। আরেকটি, বিদেশী উর্দি চলে গেলে স্বদেশী উর্দি কি তার স্থান নেবে? মূল লক্ষ্য কিন্তু উর্দির মানুষের পরিবর্তন নয়, মানুষের আত্মার পুনরুজ্জীবন। মুহূর্তের আকাঙ্ক্ষা যেন আমাদের সামগ্রিক স্বপ্নকে বিকারগ্রস্ত না করে, সেই দায়িত্বের ধারক-বাহক বুদ্ধিজীবীর নৈতিক অভিজ্ঞান।

কারণ যদিও একজন বুদ্ধিজীবী সমাজবদ্ধ মানুষ এবং সে হিসাবে সমাজের দাবি তিনি অস্বীকার করতে পারেন না, তবুও এক অর্থে তিনি নিজ গৃহে পরগৃহী অথবা স্বদেশে পরবাসী। এক কথায় প্রান্তিক মানুষ। কেননা যে ঘরে আমরা বাস করি, তার গণ্ডির সঙ্গে সম্পৃক্ত আমাদের স্বজন-পরিজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য স্বার্থসুযোগ। ঘরের বাইরে যে অস্থিরতা, অসুখ-অসুবিধা, তা আমাদের দৃষ্টির সীমানায় আসে না। তখন বুদ্ধির মুক্তি স্বার্থান্ধ; জনমানুষের অনুক্ত উচ্চারণ তখন কণ্ঠে আসে না। থিয়োডোর এ্যাডোর্নোর ভাষায় "It is past of morality to be not at home in one's own home."

সে জন্যেই বোধ হয় একজন প্রান্তিক বুদ্ধিজীবীর পক্ষে কোন আদিষ্ট রাস্তায় হাঁটা সম্ভব নয়। প্রবহমান নদী যেমন তার নিজের পথ নিজেই খুঁজে নেয়, তিনিও তেমনি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ থেকে মুক্তির সড়ক নিজেই খুঁজে বের করেন। আবার এডওয়ার্ড সাঈদের অপূর্ব বর্ণনায় ফিরে যাচ্ছি :

"The exilic intellectual does not respond to the logic of the conventional, but to the and a city of daring and to representing change, to moving on, not standing still. (Page 64)

নিঃসন্দেহে এ ধরনের যাত্রাপথ বিপদসঙ্কুল। পরিভ্রমণে অনেক বিঘ্ন, মাঝে মাঝে প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য বাধার প্রাচীর এড়িয়ে যেতে পারলে কোন বিপত্তি থাকে না, হয়ত সাফল্যের দরজা খুলে যায়। আবার ভাষান্তর না করে সাঈদের নিবন্ধের মূল উদ্ধৃতিতে ফিরে যাচ্ছি :

"You do not want to appear too political; You are afraid of seeming controversial; You want to keep a reputation of being balanced, objective, moderate; You hope is to be asked back, to consult, to be on a board of prestigious committee ...some day you hop to get an honorary degree, a big prize, perhaps even an ambassadorship." (Page 100)

সমাজপতিদের অনুশাসনকে মেনে নিয়ে জাগতিক সাফল্য এবং উজানে সাঁতার কেটে

বিবেকের মতো তাদের মুখোমুখি একলা দাঁড়িয়ে থাকা, এ দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরোধ স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা সত্যিকারের বুদ্ধিজীবী, তাঁরা সেই হাতে গোণা কয়েকজন যারা প্রভুর নির্দেশিত স্বাচ্ছন্দ্যকে পরিহার করে নিঃশঙ্ক সত্য ভাষণকে বেছে নিয়েছেন। বুদ্ধির মুক্তির বলিষ্ঠতা প্রতিবাদের উচ্চারণে, প্রতিরোধের নির্ভীকতায়।

জনকণ্ঠ, ২৮ নভেম্বর, '৯৭

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড সাঈদের প্রাচ্যভাবনা

শফি আহমেদ

এডওয়ার্ড সাঈদ চলে গেলেন। কিছুটা আকস্মিক হলেও তাঁর মৃত্যুর জন্যে অনেকেই প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর দেহে দীর্ঘদিন থেকে কর্কট রোগ বাসা বেঁধেছিল। ১৯৭৮ সালে বেরিয়েছিল তাঁর সেই সাড়া জাগানো, দুনিয়া কাঁপানো গ্রন্থ *ওরিয়েন্টালিজম*। সেই থেকে ২০০৩ সাল–এই পঁচিশ বছরে আমাদের চিন্তার ভুবনে তিনি মহীরুহের ছায়া বিলিয়ে গেছেন। প্রাচ্যকে তিনি যে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, তা-ই যে একেবারে নিরঙ্কুশ, একথা অনেকে হয়তো মানেনইনি; ভিন্নমতের আধিপত্যটা একটা প্রায় দুর্ভেদ্য বলয় সৃষ্টি করেছিলো বলেই তো সাঈদের মধ্যে অমন মননভূমি গড়ে উঠেছিলো। জন্মসূত্রে তিনি প্যালেস্টাইন, লেখাপড়া করেছেন কায়রোতে, আর তারপর ওই বিদ্যাচর্চার অভিপ্রায়ে সেই যে গেলেন পাশ্চাত্যের নতুন দুনিয়া-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সেখানেই অভিবাসন ঘটলো তাঁর। একে স্বেচ্ছা-পরবাস বলেই সংজ্ঞায়িত করা যায়। কিন্তু প্রবাসের মধ্যে যে পেলব অতীতচারিতা বা রোমান্টিকতা থাকে, তার কোনো সংক্রমণ ঘটেনি সাঈদের রচনায়। এবং তা যে তিনি শুধু সৃজনধর্মী লেখক নন বলেই নয়, একথা যে-কোনো যত্নবান পাঠক সহজেই অনুধাবন করতে পারেন। আলাদা অথচ নিজস্ব একটা জন্মভূমির ব্যক্তিক বৃত্তটা তাঁকে আবেগিক শিহরণে কতটা আলোড়িত করতো তার সাক্ষ্য তেমনভাবে প্রবল হয়ে ওঠেনি তাঁর রচনায়। কারণ দৈশিক সীমানা অতিক্রম করার মানসজাত এমন সব রসদ সঞ্চিত হয়েছিলো তাঁর নিরন্তর ভাবনায় যে, 'ঘরের-ফেরার' আকাঙ্ক্ষা কোনো ব্যাকুল ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারেনি। অন্যদিকে গভীর অধ্যবসায় নিয়ে ইতিহাস, নৃ-তত্ত্ব, শিল্পকথা ও সমাজবিজ্ঞানের পাঠ তাঁর মধ্যে গড়ে তুলেছিলো এক অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব বিশ্লেষণী ধারা যা ফেলে যাওয়া ভূগোলের প্রতি ফিরে চাওয়ার চেয়ে ইতিহাসের পথ ধরে পর্যবেক্ষণের তাত্ত্বিক গবেষণায় তাঁকে প্ররোচিত করেছিলো। পাশ্চাত্যের যে নয়া ঔপনিবেশিক কেন্দ্রে তিনি নিজেকে স্থিত করেছিলেন, অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় সেখান থেকেই তিনি স্ব-ভূমির দূরত্বটা অনেক ভালোভাবে পরিমাপ করতে পেরেছেন, বুঝতে পেরেছেন কোন দৃষ্টিতে এরা তাকায় অন্যদের প্রতি। ইউরোপ এবং আমেরিকার উপনিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে নিজস্ব গরিমাবোধ ক্রিয়াশীল, তা থেকেই তাবৎ 'অন্যজনরা' যে নিম্নবর্গীয় এমন যোগফল-বিয়োগফল অনিবার্য হয়ে *ওঠে*– এই বোধ এডওয়ার্ড সাঈদের মধ্যে দানা বেঁধে *ওঠে*। স্বদেশের বেদনাগান তাঁর অন্তরে বাজে; তিনি ইতিহাসের আর্বতে অসহায় মানবগোষ্ঠীর আর্তি শুনতে পান। প্রত্নতাত্ত্বিকের সকল

www.pathagar.com

সুখ ছিলো তাঁর, তাই ইতিহাসের কানাগলি পরিক্রমণে তিনি পারঙ্গম। রাজনৈতিক আধিপত্যবাদী উপনিবেশবাদের বাস্তব সংকোচন যে নয়া বিশ্বব্যবস্থা সৃষ্টি করছে, তার মধ্যেও এশীয় দেশগুলোর প্রতি সেই পুরানো 'বর্ণবাদী' দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষুণ্ণ থেকে যায়। এই বোধের তাড়নায় সাঈদ তন্নতন্ন করে খুঁজে বের করেন উপনিবেশবাদীদের প্রাচ্যকাহিনী; উপস্থাপন করেন এক অবিস্মরণীয় প্রাচ্যভাবনা।

এইসব প্রাচ্যকাহিনীর রচয়িতাবৃন্দ তাদের সমগোত্রীয় পাঠককুলের জন্যই লিখেছেন উপন্যাস, তাদের অভিজ্ঞতার বিবরণী। প্রাচ্য মানে মায়ার খেলা, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কুহক ছায়া–এমন একটা ধারণা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। এই ধারণার মধ্যে একটা বিস্ময়ের ঘোর আছে, কৌতূহলের হালকা নেশা আছে। কিন্তু এইসব বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় নিন্দাকথনের প্রচ্ছায়া। মূল যে বার্তাটা পাঠকের কাছে পৌঁছে যায় তা হলো, প্রাচ্যের মানুষেরা দীন-হীন, পশ্চাৎপদ। নানা সংস্কারের জাল বিছানো তাদের সমাজচিত্রে, তারই মধ্যে মানুষ বেড়ে ওঠে। তারা যুক্তির পথ দিয়ে হাঁটে না, ভালোবাসে মোহের আবেশ। এই যে প্রাচ্য, এডওয়ার্ড সাঈদ বলতে চাইছেন, তা হলো ইউরোপীয় বা উপনিবেশবাদীদের নিজস্ব সৃজন বা আবিষ্কার। এ যেন এক আলাদা জগৎ, কল্পকথার জন্মভূমি। এই ধারণার বাইরে প্রাচ্যের যে বাস্তব ও বহতা জীবন আছে, তা দেখে পাশ্চাত্যের অনেক পর্যটক আবার হা-হুতাশ করেন; ঐতিহ্য যেন ধসে পড়ছে, এমন বেদনার সুর ঝরে পড়ে তাদের লেখায়। প্রাচ্য সম্পর্কে এই যে ধারণা, তা গড়ে উঠেছে কাল পরম্পরায়।

এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর প্রাচ্যভাবনায় যে কেন্দ্রীয় সত্যের ওপর জোর দিয়েছেন তা হলো, প্রাচ্যের সীমানা ও সংজ্ঞাও উপনিবেশবাদীরা তাদের নিজস্ব প্রয়োজন ও বিবেচনায় বিনির্মাণ করেছেন। আর এই প্রাচ্য বা ওরিয়েন্ট যেহেতু ভৌগোলিক বিচারে অনতিদূর এবং এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগের অনেকাংশই ইউরোপীয় উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই পাশ্চাত্য মানসে এইসব দেশ নিয়ে আলাদা একটি অভিজ্ঞতার ভুবন গড়ে উঠেছিলো। এসব দেশের ছিলো অনেক সম্পদ, আর সেসব নির্বিচার লুটপাটের মধ্য দিয়েই ইউরোপের আধুনিক অর্থনীতির ভিত মজবুত হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু সম্পদ আহরণ করতে এসেই পাশ্চাত্যের মানুষেরা নতুন করে আবিষ্কার করলো এসব দেশের ভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতির বিপুল ও সগৌরব ভান্ডার। তাদের মনে হলো সভ্যজীবন ও সংস্কৃতির পরিচর্যায় এই প্রাচ্য ব্যাপক অর্থেই তাদের যোগ্য প্রতিযোগী। যদিও সে কথা স্বীকার করার মানসিকতা তারা হারিয়ে ফেলেছে। ইউরোপ যে এই প্রাচ্য থেকে নিয়েছে অনেক কিছু, তা তো আর বাস্তব অর্থে নাকচ করা যাবে না। আবার, উপনিবেশ বিস্তারের সূত্রে তারা তো প্রাচ্যভুবনের শাসক ও হর্তাকর্তা। এই ক্ষমতাই তাদের উচ্চমার্গীয় স্তরে সংস্থাপিত করেছে। উপনিবেশের বাসিন্দাদের শাসন করার জন্যেই তাদের বুঝিয়ে দেয়া দরকার যে, শাসকশ্রেণী শুধু বন্দুকের ক্ষমতায় ও গাত্রবর্ণেই তাদের চেয়ে উঁচুশ্রেণীর মানুষ নয়, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানদণ্ডেও তারা অনেক বড়সড়। এভাবেই উচ্চমন্যতার এবং তাত্ত্বিকভাবে 'ভিন্নতার' সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, আর ওরিয়েন্ট বা প্রাচ্য নামে একটা সুবিশাল বলয় সৃষ্টি হয়। উপনিবেশবাদীদের নিজস্ব ও বাস্তব সুবিধার্থেই স্বীকৃত হয়ে যায় বিবিধ সীমানা, নিকটপ্রাচ্য, পশ্চিম এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া মাইনর, দূরপ্রাচ্য,

www.pathagar.com

ইন্দোচীন, ইন্ডিয়া ইত্যকার প্রাচ্যবিভাগ। বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যকে পণ্য না করে শাসকের দৃষ্টি খুঁজে ফেরে এক অভিন্ন মানদণ্ড, আর তা হলো তথাকথিত আঞ্চলিক পশ্চাৎপদতা। এই দৃষ্টিই যুগ যুগ ধরে প্রাচ্যের স্থাপত্য সৃষ্টি করেছে পাশ্চাত্যবাসীর উপভোগের জন্য। এডওয়ার্ড সাঈদ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে শনাক্ত করেছেন তাঁর বিপুল পঠনের শ্রমে ও প্রাচ্যবাসীর আহত গৌরববোধ নিয়ে। তিনি উপনিবেশবাদকেই চিহ্নিত করেছেন প্রাচ্যের এমন পরিকল্পিত ও খণ্ডিত পাঠের প্রধান উপাদান হিসেবে। তাই তিনি যেসব রচনার উল্লেখ করেছেন, তার সিংহভাগই ইংরেজি ও ফরাসিদের লেখা। প্রাচ্যের নিজস্বতা এবং পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে এই বিশাল অঞ্চলের (তাদের ভাষায়) অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন ও আবার প্রতীচ্যের একটা ভিন্নতর এবং উন্নততর ভাবমূর্তি সংগঠনে সাহায্য করেছে। এর মাধ্যমে প্রাচ্যতত্ত্বও গড়ে উঠেছে তাদেরই ভাবনার সূত্র ধরে। উপন্যাস লেখা হয়েছে। এইসব উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা প্রাচ্যদেশীয়, তাদের সঙ্গে হয়তো শ্বেতবর্ণী চরিত্রের দেখা হয়, কথা হয়, কিন্তু প্রাচ্যের মানুষেরা শুধু তাদের প্রণেতাদের ভাবনার অগ্রাধিকার বিবেচনায় আচরণ করে। অর্থাৎ তারা কখনোই তাদের নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করে না। উপনিবেশবাদীদের চোখে যা বর্ণনীয় মনে হয়েছে, তারই প্রকাশ ঘটেছে। ভ্রমণকাহিনী বা আত্মজৈবনিক রচনার নানা প্রকরণেও তা ফুটে উঠেছে। এইসব রচনার বর্ধিতকলেবর ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য মানসে এমন এক ধারণাকে দিন দিন সংহত করে তুলেছে যে, *ওরিয়েন্টালিজম* বলতে যে তত্ত্ব আমরা বুঝি তার অনেকটা কাঁচামালই ব্যবহৃত হয়েছে এইসব রচনা থেকে। সাঈদ এই বিষয়টাকে নানা তথ্য সহযোগে উপস্থাপন করেছেন, বোঝাতে চেয়েছেন কিভাবে বিপুল সংখ্যক ইউরোপবাসীর প্রাচ্য সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াই কত ভিন্নতরভাবে তাদের মধ্যে নিরন্তর প্ররোচনামূলক প্রাচ্যভাবনা অনুপ্রবেশ করেছে এবং এইভাবে এই ধারণা তাদের ভিন্নমাত্রিক মনস্তাত্ত্বিক অনুশীলনে সহায়তা করেছে।

উপনিবেশবাদের সঙ্গে যেমন রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক লাভালাভের প্রশ্ন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তেমনি এই স্বার্থবোধ সংরক্ষণ ও বিস্তারে সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার একটা তত্ত্বগত বৃত্ত রচনাও অনিবার্য হয়ে ওঠে। হীনমন্যতার আবহকে যতই দীর্ঘতর করা যাবে শাসনের দৈর্ঘ্যও ততই দক্ষতার সঙ্গে বাড়ানো যাবে। প্রাচ্যে নিজেদের আর্থিক বা বাস্তব স্বার্থরক্ষায় রাজনীতির খেলায় নানা কৌশল গৃহীত হয়েছে। সাঈদ এই পরিপ্রেক্ষিতকে নির্দেশ করেছেন,কিন্তু প্রাচ্যভাবনাকে তিনি সাংস্কৃতিক ধারার সংযোজন-বিয়োজন ও সংঘাত হিসেবে দেখেছেন এবং এর প্রকৃতি বিবেচনায় পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যকেই তিনি চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সময়নীতি প্রাচ্যের ধারণায় নানা উপাদানের যোগসাধন করেছে এবং তার মাধ্যমে এই বিশাল ভূখণ্ড নিয়ে ইউরোপীয় ও পরবর্তীকালে আমেরিকানদের মধ্যে বিবিধ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং এসবের সম্মিলনে প্রাচ্যভাবনার একটা মুহূর্ত রূপ গড়ে উঠেছে।

সাঈদের মতে, *ওরিয়েন্টালিজম* যদিও পাশ্চাত্যবাসীর এক নিজস্ব আবিষ্কার, কিন্তু এর প্রকাশ ঘটেছে বহুমাত্রিক যোজনায়। এই ভাবনা যেমন শুধুই রাজনৈতিক বিষয় নয়, তেমনি তা শুধু বিভিন্নজনের রচনায় প্রতিফলিত প্রাচ্য সম্পর্কিত বিবরণীর সমাহারও নয়। প্রাচ্য সম্পর্কে কৌতূহল জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা বিস্তারে সহায়তা করেছে, নানা

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানেরও জন্ম হয়েছে এ কারণে। কিন্তু সাঈদ একথা বলার চেষ্টা করেননি যে এসবের মাধ্যমে সর্বদাই সুপরিকল্পিতভাবে প্রাচ্যকে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ ও সংস্কৃতিচিন্তার বিষয়টাকে সাঈদ দুই দিক থেকে দেখেছেন। তিনি বলছেন, উনবিংশ শতক বা তার আগের লেখকরাও সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। উনিশ শতকের প্রধান কয়েকজন লেখকের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন, যেমন- জন স্টুয়ার্ট মিল, আর্নল্ড, টমাস কার্লাইল, নিউম্যান, মেকলে, রাসকিন, জর্জ এলিয়ট এবং ডিকেন্স। এঁদের সকলেরই বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে পরিণত ও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল,তাঁদের লেখায় সেসবের প্রতিফলন লক্ষ করা গেছে। জন স্টুয়ার্ট মিল বেশ কিছুকাল ইন্ডিয়া অফিসে কর্মরত ছিলেন। তিনি তাঁর দুই বই On Liberty এবং Representative Government-এ এমন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, বিবৃত বিষয়াবলি ভারতের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না, কারণ সভ্যতার দিক থেকে এই দেশটি অনেক পিছিয়ে রয়েছে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সাঈদ বলতে চেয়েছেন তা হলো– 'এটা ঠিক যে, সাহিত্য রচনা, বিদ্যাচর্চা ও ইতিহাস প্রণয়নে সাম্রাজ্যবাদী ভাবধারা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এই প্রভাব অনিবার্যভাবেই সংস্কৃতির অবক্ষয় সাধন করে। বিপরীত দিক থেকে এমন ভাবনাই সঙ্গত যে, উপনিবেশবাদীদের বিরোধিতা এবং একই সঙ্গে শাসিত জাতিসমূহ বিষয়ে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহল অনেক সময়ই স্বদেশী লেখক ও গবেষকদের তাদের স্বরূপ-অন্বেষণে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে।' সাঈদের এই উদারপন্থী মন্তব্য আমাদের জন্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আমরা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের মেট্রোপলিটন বিদ্যাচর্চার কথা উল্লেখ করতে পারি। পাশ্চাত্যের অভিঘাতে আমাদের সমাজে তখন নানা ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজিয়ানার প্রতি আকর্ষণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিকৃতির জন্ম দিলেও তার মাধ্যমে সমাজে উদার মতবাদের বিস্তার যেমন ঘটেছে, তেমনি স্বদেশকে নতুনভাবে আবিষ্কারের একটি অনুপ্রেরণাও পাওয়া গেছে একই সূত্র থেকে। রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজ ও সংস্কৃতির ধারায় যে উদারপন্থা সূচনা করার ব্রতে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন তার পেছনে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাচ্য সম্পর্কে ধারণার প্রভাব ছিল। অবশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রত্যক্ষ অবদানকেও অস্বীকার করা যাবে না। মাইকেল মধুসূদনের সাহিত্যও এদিক থেকে খুবই উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ভিনদেশী হয়েও ডিরোজিও যে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিলেন সেখানেও উপনিবেশবাদের উপাদান শনাক্ত করা যায়। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হলো, সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারা শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা মস্তিষ্কের কিছু অংশ দখল করে নেয় এবং তার মাধ্যমেই স্বদেশের যাবতীয় কীর্তি অবলোকনে প্ররোচিত করে। পক্ষান্তরে উপনিবেশবাদীদের দেশে তাদের সৃজিত ওরিয়েন্ট সম্পর্কে নিজস্ব প্রতিক্রিয়া আবর্তিত হতে থাকে।

ওরিয়েন্ট সম্পর্কে এই ভাবনার বিস্তার আবশ্যিকভাবেই ইংরেজি ও ফরাসি উপনিবেশের বিস্তারের সঙ্গে যুক্ত। সাঈদ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন ওরিয়েন্ট নিয়ে কৌতূহল ও নিজস্ব বক্তব্য কিন্তু ইউরোপের চিন্তাজগতে সন্নিবেশিত হয়েছে বহুকাল আগে থেকেই। তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার সূত্রপাত ঘটেছে সেখান থেকেই। চসার, শেক্সপিয়ার,

www.pathagar.com

ম্যান্ডেভিল, ড্রাইডেন, পোপ এবং বায়রন প্রাচ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সাঈদ তাঁর আলোচনার প্রথম দিকেই হাউজ অফ কমন্সের একটি বিতর্কের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। ১৯১০ সালের জুন মাসের ১৩ তারিখ। মিসরের বিষয়ে তখন আলোচনা চলছে। আর্থার জেমস ব্যালফুর নামে এক সদস্য অন্য আরেকজনের মন্তব্যকে আক্রমণ করে প্রশ্ন করছেন, 'যেসব মানুষজনকে নিজেদের ইচ্ছায় ওরিয়েন্টাল বলা হচ্ছে, তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে উচ্চমন্যতার এই অধিকার আপনি কোথায় পেলেন?' তাঁর বক্তৃতায় ব্যালফুর বলেছিলেন, 'উচ্চমন্য মানসিকতার কোনো অবকাশ নেই। প্রাচ্যের দেশসমূহ সম্পর্কে শুধু ভাসাভাসা জ্ঞান থাকার জন্যই এমন মন্ত ব্য করা সম্ভব।' ইতিহাস যদি মনোযোগ দিয়ে পড়া যায় তবে দেখা যাবে, এঁরা অনেকেই অতীতে সভ্যতার উচ্চস্তরে পৌঁছেছিলেন। সাঈদ ব্যালফুরের বক্তৃতার বেশ দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করেছেন এবং তার ভাবসম্প্রসারণ করেছেন।

সাঈদ তাঁর *ওরিয়েন্টালিজমের* আলোচনায় মিশরের কথা বারবার এনেছেন, আমরা যে অঞ্চলকে মধ্যপ্রাচ্য বলে চিনি তার উল্লেখ আছে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তিনি অনেকটা তার নিজের অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি ঘটানোর প্রচেষ্টায়, ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গির অসম্পূর্ণতা ও একদেশদর্শিতার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাচ্যভাবনার সঙ্গে ইসলাম বিষয়ে প্রতীচ্যের মনোভাব বিশ্লেষণ খুবই যৌক্তিক। কিন্তু প্রাচ্যের বিশাল এলাকা তার ফলে বাইরে পড়ে থাকে। অবশ্য এই সীমাবদ্ধতাকে বড় করে দেখার কিছু নেই। তিনি পাশ্চাত্যের শতাব্দী-অতিক্রান্ত যেসব রচনা উল্লেখ করে তাদের প্রাচ্য সম্পর্কে ধারণার বিষয়াবলি বিশ্লেষণ করেছেন তার নিরিখেই উপনিবেশবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী মনোভঙ্গির যথেষ্ট স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মূল বক্তব্য হলো, প্রাচ্যভাবনা বলে যা পরিচিতি লাভ করেছে তার গোড়াতেই গলদ ছিল এবং উপনিবেশ বিস্তারের মাধ্যমে তা শুধু আরো ক্ষতিকর শক্তি ও ব্যাপকতা অর্জন করেছে। *ওরিয়েন্টালিজম গ্রন্থের* সমালোচনা করতে গিয়ে Observer পত্রিকায় লেখা হয়েছিলো, 'এ এক দারুণ উত্তেজনাবর্ধক, সুঠাম ও লড়াকু বই, যা আসলে কবুতরদের খোঁয়াড়ে বিড়াল ছেড়ে দেয়ার মতো ঘটনা'। আমরা সবাই এই মন্তব্যের ভেতরের কথাটা বুঝতে পারি। সুদীর্ঘকাল ধরে প্রতীচ্যের মনোভাবের যে উচ্চমন্যতা প্রাচ্য সম্পর্কে ভাবনাকে সারা পৃথিবীতে (প্রাচ্যের দেশসমূহসহ) বিপণন করছিলো, তার ওপর এক সত্যিকারের বিশাল আকারের পণ্ডিতমন্য আঘাত হেনেছিলেন এডওয়ার্ড সাঈদ। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের কথা যেন সর্বদাই সর্বজনমান্য হয়ে উঠেছিলো। ১৯৭৮-এ তখনো বহু ছোট ছোট উপনিবেশ ভালো করে মুক্ত বাতাসের স্বাদ নিতে যেন দ্বিধাগ্রস্ত, তেমন এক সন্ধিক্ষণে, উত্তর-ঔপনিবেশিক দ্রোহের এক অসামান্য দলিল রচনা করেছিলেন তিনি যা একদিকে পশ্চিমা তাবড় তাবড় ঐতিহাসিককে লজ্জিত করেছে,অন্যদিকে প্রাচ্য বলে অভিহিত এই বিরাট অবহেলিত ভূ-ভাগের আত্মবিশ্বাস জাগাতে সাহায্য করেছে। সাঈদ পরবর্তীকালে আরো অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁর অগ্রন্থিত রচনাসমূহ, বিভিন্ন সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ ও টেলিভিশনের পর্দায় আলোচনা ইত্যাদি তাঁকে দুনিয়াময় খ্যাতি এনে দিয়েছে। বিশেষত তিনটি গ্রন্থ The Question of Palestine, After the Last Sky এবং Covering Islam বিদ্বৎসমাজে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এইসব

www.pathagar.com

আলোচনার এক অনিবার্য সূত্র যেন গাঁথা আছে তাঁর ওরিয়েন্টালিজম গ্রন্থের সঙ্গে।
ভাবনা ও চিন্তার রাজ্যে উপনিবেশবাদী আধিপত্য বিষয়ে তাঁর মৌলিক ও যুগান্ত কারী দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের যুগপৎ বিস্মিত ও তাড়িত করে। তিনি পাশ্চাত্যের কেন্দ্রে বসেই এই বই লিখেছেন। তা কিন্তু দুদিক থেকেই অর্থবহ। জায়নবাদের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক আমেরিকার কেন্দ্রে থেকে তিনি প্যালেস্টাইন আত্মপরিচয়ের যে শক্তিমত্তা প্রদর্শন করেছেন তা যেমন আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তেমনি এই কেন্দ্রে বসতি তাঁর অন্য ধরনের সমঝোতার প্রতিই ইঙ্গিত করে। আরেকজন বিশ্বখ্যাত ভারতীয় তাত্ত্বিক আইজাজ আহমদ তাঁর আলোচনায় (Orientalism and After) সাঈদের তীব্র সমালোচনা করেছেন, প্রধানত এই পাশ্চাত্য কেন্দ্র বেছে নেবার জন্য। আহমদ একথাও উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর গ্রন্থে সাঈদ যে ভারতীয় পণ্ডিত রণজিৎ গুহের প্রসঙ্গ (Subaltern Studies খ্যাত) এনেছেন, তিনিও ভারতে ব্রিটিশ রাজ্যের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষককুলের ওপর যে কুপ্রভাব সৃষ্টি হয়েছিলো– সে সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান পর্যালোচনা করার পর পাশ্চাত্য কেন্দ্রকেই নিজের পেশা ও বসবাসের জন্য নির্বাচন করেছেন। সাঈদ অবশ্য নিজেই একথা স্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন, 'পাশ্চাত্যে বিশেষ করে আমেরিকায় যে কোনো আরবীয় অথবা প্যালেস্টাইনের জীবন খুবই দুঃখের অভিজ্ঞতায় ভরপুর। বর্ণবাদ, সাংস্কৃতিক ধারার একমুখীনতা, রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ, মানবতাবিরোধী আদর্শবাদ তাদের এক কষ্টকর নিয়তির সঙ্গে জুড়ে দেয়। সাঈদ তাঁর প্রাচ্য ভাবনার সমর্থনে তিনজন বিশ্বখ্যাত চিন্তকের প্রসঙ্গ এনেছেন বারবার। এঁরা হলেন মার্কস (Marx), গ্রামসি (Gramsci) এবং ফুকো (Foucault)। তাঁর ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে যেসব যুক্তির অবতারণা করেছেন, সেক্ষেত্রে এঁদের দর্শন তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

সাঈদ তাঁর বিশ্লেষণের ধারায় দুই ধরনের বুদ্ধিজীবীদের নির্দেশ করেছেন, একদলকে তিনি বলেছেন উপনিবেশবাদী এবং অন্যদের উত্তর-উপনিবেশবাদী। ত্রিনিদাদের বিখ্যাত কম্যুনিস্ট লেখক ও বহুখ্যাত Black Jacobins গ্রন্থের প্রণেতা C.L.R. James-কে এবং আরেক সাড়া জাগানো বই The Arab Awakaning-এর প্রণেতা ঐতিহাসিক জর্জ এন্টোনিয়াসকে তিনি উপনিবেশবাদী লেখক বলে চিহ্নিত করেছেন, আবার মালয়েশিয়া ও ভারতের দুই বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী আলাতাস এবং রণজিৎ গুহকে উত্তর উপনিবেশবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। অভিধার এমন বিশ্লেষণ নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকতেই পারে, কিন্তু ১৯৭৮ সালে, যখন সারা বিশ্ব রিগ্যান আর থ্যাচারের তত্ত্বাবধানে রক্ষণশীলতার পক্ষে সারা পৃথিবী যুদ্ধংদেহী হয়ে উঠেছিলো, সেই ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে, সমাজতন্ত্র-বিরোধিতাও মার্কসবাদ-উত্তর বিশ্বব্যবস্থায় Orientalism বা সাঈদের প্রাচ্যভাবনা সত্যিই দুনিয়া কাঁপিয়ে দিয়েছিলো। আর আজ যখন বুশ আর ব্লেয়ারের সহিংস উন্মাদনা সভ্যতাকে প্রশ্নাকীর্ণ করে তুলছে, তখন সাঈদের প্রাচ্যভাবনার মর্মবাণী আমাদের জন্য গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

কালি ও কলম, মার্চ, '০৪

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড সাঈদ

সুজাত ভদ্র

("Edward Said helps us to understand who we are and what we must do if we aspire to be moral agents, not servants of power".) – নোয়াম চমস্কি।

২৬শে সেপ্টেম্বর ২০০৩। দৈনিক সংবাদপত্রগুলো দুঃসংবাদ বহন করে আনল : নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ও তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক, ভূবন খ্যাত সাহিত্য সমালোচক ও সর্বোপরি প্যালেস্তাইন মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগণ্য কণ্ঠস্বর, প্রবাসী প্যালেস্তাইনী এডওয়ার্ড সাঈদ চলে গেলেন। ১৯৯২ সালেই ধরা পড়েছিল তাঁর কালান্তর ব্যাধি : লিউকোমিয়া। প্রগতিশীল দুনিয়া হারালো এক বিরল সৃষ্টিশীল প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীকে যিনি কখনও ক্ষমতার কাছে নতিস্বীকার করেননি। প্যালেস্তানীয় সংগ্রামী যোদ্ধারা হারালো তাঁদের মুক্তি আন্দোলনের তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট কণ্ঠস্বরকে, প্রতিনিধিকে। মানবাধিকার ও ন্যায়ের সপক্ষের আন্দোলন হারালো তার এক পরম সুহৃদকে, শাণিত ক্ষুরধার কলমকে।

সাঈদের অতি বিতর্কিত '*ওরিয়েন্টালিজম*' (১৯৭৮) গ্রন্থটিকে ঘিরে উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের, পোস্টস্ট্রাকচারালিস্টদের, মার্কসবাদীদের (বিশেষ করে আইজাজ আহমেদ, ব্রায়ান ডি পারমার), মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়া স্টাডির সাথে যুক্ত গবেষকদের তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি পড়তে হয়েছিল সাঈদকে। তবু,সবকিছুকে ছাপিয়ে তাঁর এই সৃষ্টিশীল কাজ এশিয়ার উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে কতদূর প্রযোজ্য তা নিয়ে গবেষণার পর গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। গান্ধীর বা ফ্রানজ্ ফ্যাননের লেখায় ইতিপূর্বেই ঔপনিবেশিক শাসনের নিপীড়ন উন্মোচিত হয়েছিল। সাঈদ দেখালেন সেই বৃটিশ, ফরাসী ঔপনিবেশিক আধিপত্যের সাথে কীভাবে সংপৃক্ত তার আধিপত্যবাদী ভাবাদর্শ। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক এই গ্রন্থটিকে এক 'উপাদান গ্রন্থ" (source-book) বলে অভিহিত করেছেন, কারণ এর মধ্য দিয়ে প্রান্তিক মানুষ "can speak and be spoken, even spoken for"।

উল্লেখ্য, গ্রন্থটি কিন্তু তাঁর পরিকল্পিত পরপর তিনটি বইয়ের প্রথম বই ছিল। দ্বিতীয় গ্রন্থটি ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়; '*Question of Palestine*'। তিনি দেখালেন, পশ্চিমী দুনিয়ায় প্রচারিত প্রাচ্য সংক্রান্ত এক আদিকল্পের আড়ালে চাপা পড়ে যাওয়া প্যালেস্তানীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলন; ইজরায়েল-এর 'জিওনিস্ট' নাৎসীবাদী নীতিকে বিশ্লেষণকে

www.pathagar.com

করলেন একটি নমুনা বা 'কেস হিস্ট্রি' হিসাবে। তাঁর তৃতীয় গ্রন্থে–*Covering Islam* (১৯৮১) – সাঈদ দেখলেন কীভাবে সত্তর দশকের শুরু থেকেই পশ্চিমী দুনিয়া, বিশেষ করে মার্কিনী জগৎ মুসলিম সমাজকে, ইসলামকে, ইসলামীয় সভ্যতাকে কুৎসিৎ ব্যাখ্যা দিচ্ছে, প্যালেস্তানীয় আন্দোলনকে ইজরায়েল ও তার সহযোগী সমর্থক আমেরিকার প্রশাসন কত কদর্যভাবে চিত্রায়িত করছে। নোয়াম চমস্কির ভাষায়; এই আন্দোলনকে 'প্রতিক্রিয়াশীলরা তুলে ধরেছে সন্ত্রাসবাদের একান্ত প্রতীক' হিসেবে। তাদের প্রচারের মহিমায় হারিয়ে যেতে বসেছিল অসহায়,দুর্দশাগ্রস্ত অসংখ্য প্যালেস্তানীয় উদ্বাস্তুদের ছবি। তাদের ইতিহাস, সমসাময়িক করুণ পরিণতি। সাঈদ সেই ইতিহাসকে হারিয়ে যেতে দেননি। একের পর এক গ্রন্থে, নানা প্রবন্ধে, সাক্ষাৎকারে অক্লান্তভাবে শেষদিন পর্যন্ত তিনি তুলে ধরেছেন কীভাবে ১৯৪৮ সাল থেকে প্যালেস্তানীয় সম্প্রদায় স্বদেশচ্যুত হলো, অধিকার বিচ্যুত হলো। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অস্তিত্ব বজায় রাখতে বাধ্য হলো। ইজরায়েলে প্যালেস্তানীয়দের সংখ্যা (১৯৭০-এর প্রথম দিকে) ছিল প্রায় ৬,৫০,০০০-মত। গাজা এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে ১.৩ মিলিয়ন এবং নির্বাসনে প্রায় ২ মিলিয়ন প্যালেস্তানীয়। দেখালেন, কতশত হাজার প্যালেস্তানীয় মার্কিনী-ইজরায়েলের যৌথ বর্বরোচিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে নিহত হলো। কতজন ক্ষতচিহ্ন নিয়ে বেঁচে রইল। বা কর্পূরের মত গায়েব হয়ে গেল। তুলে ধরলেন বিশ্বের কাছে এমন এক সম্প্রদায়ের বেদনার কাহিনী যারা শুধু অধিকার বিচ্যুত (dispossessed) নয়, শুধু ছত্রভঙ্গ (dispersed) ও কেন্দ্রভূমি-চ্যুত (decentered) নয়, রাষ্ট্রবিহীন নির্বাসিত সম্প্রদায় নয়, তারা তাদের স্বদেশভূমির অধিকারের দাবিতে, আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলনে রত এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রত্যয়ী সম্প্রদায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত প্যালেস্তাইনকে ঘিরে দখলের রাজনীতিতে ইউরোপের ভূমিকা ছিল ন্যাক্কারজনক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, সেই ভূমিকার পরিবর্তন ঘটে, ইউরোপের বদলে আমেরিকার আধিপত্য কায়েম হয়। এবং আমেরিকার মদতে প্যালেস্তাইন অঞ্চলে ইজরায়েলের প্রায় নিরঙ্কুশ শাসন 'প্রতিষ্ঠিত' হয়। সাঈদের মতে, ইজরায়েলে "is the recipient of more US aid than any foreign state in history." পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে যে, প্রতি ইজরায়েলী নাগরিক মাথাপিছু আমেরিকার ১,৪০০ ডলার বাৎসরিকভাবে অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত। সর্বোপরি, "each member of the Israeli military is underwritten by the US at about $ 9,750 per year." তথ্য প্রমাণ নথিপত্র ঘেঁটে দেখালেন জোয়ান পিটারের "গবেষণা' (যা পশ্চিমী দুনিয়ায় প্রশংসিত ও পুরস্কৃত)–প্যালেস্তানীয়দের কোনদিন কোন স্বদেশভূমিই ছিল না!– কতদূর জাল, কী ধরনের চরম মিথ্যাচার। বিশেষ করে তাঁর দ্বিতীয় বাসভূমির সহ-নাগরিকদের কাছে মেলে ধরলেন অন্য এক প্যালেস্তানীয় মানুষের ছবি– প্যালেস্তানীয় মাত্রই ধর্মান্ধ মুসলমান নয়, সন্ত্রাসবাদী নয়। সেও অন্যান্য সমাজ, ধর্মভুক্ত সম্প্রদায়ের মানুষের তাই সৃষ্টিশীল, কর্মদক্ষ, সংবেদনশীল, প্রতিবাদী, মজাদার, দরদী, ক্রোধী, আক্রমণাত্মক, রক্ষণাত্মক, আকর্ষণীয়–এসব চরিত্রের সাধারণ দোষ-গুণ নিয়েই সে রক্তমাংসের মানুষ। সাঈদ দেখিয়েছেন ১৯৭০ সালের মধ্যভাগ থেকেই ইজরায়েল-এর নীতি ছিল প্যালেস্তানীয় জাতীয়তাবাদকে পরিপূর্ণভাবে অস্বীকার করা এবং তার জন্য তারা PLO-কে যেন তেন প্রকারে "সন্ত্রাসবাদী" আখ্যা দেওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

www.pathagar.com

মুক্তির পথ হিসাবে সাঈদ সন্ত্রাসকে কখনই সমর্থন করেননি, 'রাজনৈতিক ভুল' হিসাবে সেই পথকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন। ২০০১-২০০২ সালে এই ধরনের চোরাগোপ্তা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হিংসাকে তাই তিনি তীক্ষ্ণভাবে সমালোচনা করেছেন। সাথে সাথে অবশ্যই তিনি ঘোষণা করেছেন–প্যালেস্তানীয় সন্ত্রাসের থেকে একটি গোটা ইজরায়েলি রাষ্ট্র পরিচালিত সন্ত্রাস সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর। অন্যত্র বলেছেন, "the disproportion between the state violence and (so to speak) private violence is always, and always has been, vast."

ক্ষমতার আধিপত্যের–ইজরায়েল ও তার দোসর আমেরিকার–বিরুদ্ধে এসব কথা বলতে গিয়ে তাঁকে কম গালমন্দ শুনতে হয়নি; জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিতে হয়েছে, রাষ্ট্রপুঞ্জে বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। 'পশ্চিমী-বিরোধী' থেকে শুরু করে 'সন্ত্রাসের অধ্যাপক' বিশেষণে তাঁকে ভূষিত করা হয়েছে।

তিনি বিতর্কিত হতেন না, গালমন্দ শুনতেন না যদি না তাঁর বৌদ্ধিক জীবনের রূপান্তর ঘটতো। রূপান্তরকে তিনটি পর্বে বিভাজন করা সম্ভব– (১) প্রাক-১৯৬৭ সাল, যখন তিনি "টিচিং-মেশিনের" অন্তর্গত এক বিশেষজ্ঞ মাত্র, ক্লাস রুমের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ এক প্রথাগত অধ্যাপক। (২) ১৯৬৭ সাল থেকে, তার চিন্তার, সামাজিক-রাজনৈতিক ভাবনার পরিবর্তন ঘটলো। প্রেক্ষাপট–১৯৬৭ সালে ইজরায়েলের ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ও গাজা দখল, ১৯৮২ সালে প্যালেস্তানীয় জাতীয়তাবাদের উত্থান (যার মূর্ত প্রকাশ ঘটেছিল PLO-এর মধ্যদিয়ে), লেবানন আক্রমণ, ১৭,৫০০ লেবানীয় ও প্যালেস্তানীয়দের হত্যা, সারবা ও সাটিলার গণহত্যার ঘটনাসমূহ। আত্মজীবনী (out of Place, 1991)-তে তাঁর চৈতন্যের এই রূপান্তরকে স্বীকার করেছেন সাঈদ। গ্রামশির "জৈব বুদ্ধিজীবীতে" রূপান্তরিত সাঈদ সক্রিয় হয়ে উঠলেন, "প্যালেস্তানীয়দের বিবেক" হিসাবে পরিচিত হলেন। দ্ব্যর্থহীনভাবে সবধরনের, সব সমাজের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিত্বকারী ভূমিকাকে চিহ্নিত করলেন। ক্ষমতার নির্দেশিত পথে হাঁটা নয়, ক্ষমতার দাসানুদাস হয়ে থাকা নয়, ক্ষমতার সামনে অকুতোভয়ে সত্যকে তুলে ধরা, প্রতিস্পর্ধা দেখানো। (৩) ১৯৯১ সাল থেকে তাঁর সক্রিয়তা কমতে থাকে। সাংগঠনিক স্তরে তার প্রভাব পড়ে–১৯৭৭ সাল থেকে যুক্ত ছিলেন প্যালেস্তাইন ন্যাশনাল কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে, ১৯৯১ সালে তিনি পদত্যাগ করলেন। রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে হতাশা, আশাভঙ্গ, আরব দেশগুলোর সংকীর্ণ স্বার্থে প্যালেস্তানীয় মুক্তি আন্দোলনকে ব্যবহার করার ঘৃণ্য কৌশল, আরাফতদের নেতৃত্ব সম্পর্কে হতাশা ও উত্তরোত্তর সমালোচনা, বিশেষ করে গোপনে অসলো শান্তিপর্বে আরাফতের ভূমিকা, বিকল্প পথের সন্ধান–সবমিলিয়ে সাঈদকে সক্রিয়তা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছিল। কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত প্যালেস্তানীয় মুক্তি আন্দোলনের আদর্শ ও নীতির প্রতি তিনি দায়বদ্ধ ছিলেন।

প্যালেস্তাইন সম্পর্কে সাঈদের স্বপ্ন অধরা থেকে গেল; কবে তার মীমাংসা হবে কেউ জানে না। আরও কত বছর প্যালেস্তানীয়দের তাঁর প্রিয় কবি মাহমুদ দারওয়াইসের প্রশ্নকে প্রতিধ্বনিত করতে হবে কে জানে : "Where should we go after the last frontiers, where should the birds fly after the last sky".

আমাদের মত নানা আন্দোলনের সাথে যুক্ত মানুষের ভাবতে হবে, সাঈদের মত আর কেউ কি এত স্পষ্টভাবে বুদ্ধিজীবীদের কশাঘাত করে বলতে পারবেন : "বিনা বিচারে

www.pathagar.com

আটকের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে আপনি সরব হয়েছেন, পৃথিবীর নানা দেশের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন; কিন্তু যেখানে আপনার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে, দলের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আনুগত্য রয়েছে, কোন না কোনভাবে ক্ষমতার সাথে গাঁটবন্ধন রয়েছে, সেখানে আপনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সতর্কভাবে নীরবতা পালন করেছেন। সবকিছুকে সহ্য করে মেনে নিয়েছেন। আপনি সত্যের নিরিখে বিচ্যুত হয়েছেন।"

সাঈদ সর্বমোট ২০টি গ্রন্থের লেখক: অসংখ্য প্রবন্ধ নানা চেনা, বা স্বল্পখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। কিছু কিছু নির্বাচিত প্রবন্ধের সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম নিচে দেওয়া হল :

1. Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography.
2. Beginnings: Intention and Method
3. Oritentalism
4. The Question of Palestine
5. Covering Islam
6. The Wared, theText, and critic
7. After the Last sky (with jean Mohr)
8. Blaming the Victims (with Christopher Hitchens)
9. Culture and Imperialism
10. The Politics of Dispossession
11. Representation of the Intellectual
12. Peace and its Discontents
13. The Pen and the Sword
14. Out of Place : a memoir
15. The End of the Peace Process
16. Reflection on exile.

অনীক, নভেম্বর '০৩

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড সাঈদ
খ্যাতিমান ফিলিস্তিনি বোদ্ধা ও যোদ্ধা

সাঈফ ইবনে রফিক

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এডওয়ার্ড সাঈদের আয়ু ছিল মাত্র ৬৭ বছর। ফিলিস্তিন মুক্তি সংগ্রামের অর্ধশতাব্দিব্যাপী দীর্ঘ ইতিহাসের চূড়ান্ত দফারফা না হলেও মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে এই শক্তিশালী ও বিশ্বব্যাপী খ্যাতিমান ফিলিস্তিনি-মার্কিন কলম সৈনিক গত ২৫ সেপ্টেম্বর ভোরে ফিলিস্তিনিদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে পরলোকে চলে গেছেন। দীর্ঘ ১১ বছর লিউকোমিয়ায় ভুগছিলেন তিনি। এডওয়ার্ড সাঈদ এ অর্ধশতাব্দিব্যাপী ফিলিস্তিন মুক্তিসংগ্রামের বৈধতা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষণই শুধু করেননি, বরং তার নিজেরও সক্রিয় রাজনীতিতে অংশীদারিত্ব ছিল। নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি এবং তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক এডওয়ার্ড সাঈদ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেরও সমঝদার ছিলেন। ১৯৩৫ সালে জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করলেও ১৯৪৮ সালে পরিবারের সঙ্গেই দেশ ছাড়া হন সাঈদ। মিসরে বসবাস শুরু করলেন, শৈশবের স্কুলপাঠ কায়রোতেই। তবে উচ্চশিক্ষাসহ জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও তিনি ফিলিস্তিনি সমস্যার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য এবং ইসরাইলের সমালোচনায় ভীতিহীন ছিলেন। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড ছাড়াও ইরাক বা আফগানিস্তানে মার্কিন হস্তক্ষেপেরও তিনি ঘোর বিরোধিতা করেছেন। আরববিশ্বের প্রধান দৈনিকগুলোতে স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন কলাম প্রকাশ করছিলেন এডওয়ার্ড সাঈদ। আল-আহরাম নামে একটি সাপ্তাহিকে তিনি তার কলামে ইরাক প্রসঙ্গে বেশ খোলামেলা বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, 'আমরা আরব ও মুসলিম বিশ্বের ওপর সরাসরি মার্কিন শাসনের দিন থেকে অনেক পেছনে আছি। অন্তত ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিনীদের কৌশলগত স্বার্থ হচ্ছে প্রচুর তেলের সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং দ্বিতীয়ত অতিরিক্ত ব্যয় বহন করে হলেও আশপাশের দেশগুলোতে ইসরাইলের দাপট টিকিয়ে রাখা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদীই নিজেকে এবং বিশ্বকে বোঝাতে চায় যে তারা অন্য সাম্রাজ্যের মতো নয় এবং লুট ও নিয়ন্ত্রণ নয় বরং তারা কোনও স্থান বা জাতিকে শিক্ষিত ও মুক্ত করার মিশন নিয়ে এসেছে। যদিও এ ধারণাগুলো স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হয় না, ফলে তাদের দৃষ্টিকোণ বহুলাংশেই সরাসরি বিপরীত। দুঃখজনক, অবশ্যই মর্মান্তিক যে মার্কিনীদের আরব ও ইসলাম সম্পর্কে তথ্যের উৎস অপর্যাপ্ত এবং এই অপর্যাপ্ততা

www.pathagar.com

পূরণের জন্য পদক্ষেপ আমেরিকা নেয়নি।

ফিলিস্তিনি ইস্যুতে ইহুদিরা এডওয়ার্ড সাঈদকে 'সন্ত্রাসের শিক্ষক' উপাধি দিয়ে থাকেন। কলাম্বিয়ায় তার অফিসে ইহুদিরা অগ্নিসংযোগ করেছিল। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি ফিলিস্তিন জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৯৩ সালের হোয়াইট হাউসের মদদে ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যে স্বাক্ষরিত ওসলো শান্তি চুক্তির বিরোধিতার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গণে সাঈদ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে তার অবস্থান পরিষ্কার করেন। অপরিচ্ছন্ন এবং সংশয়পূর্ণ পৃথিবীতে তিনি আলোকবর্তিকা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দিশেহারা আরবদের নিজস্ব পরিচয় খুঁজে দেওয়ায়ও তার অবদান কম নয়। ১৯৭৮ সালে এডওয়ার্ড সাঈদ ওরেন্টালিজম নামে একটি বই লিখে চিন্তার জগতে আলোড়ন তুলেছিলেন। মধ্যপ্রাচ্য সভ্যতার উপাদানের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তার ওরিয়েন্টালিজম তত্ত্বটি। উপনিবেশ পরবর্তী পৃথিবী সম্পর্কে তার বিশ্লেষণও বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে নাড়া দিয়েছে। শক্তি এবং সংস্কৃতির সম্পর্ক নির্ণয়ে তার মতবাদ মূলত এডওয়ার্ড সাঈদকে চিন্তার জগতে জনপ্রিয় করে তোলে। সাহিত্য ও রাজনীতি সম্পর্কে সমান্তরাল ধারণাই তাকে পরিচ্ছন্ন করে তুলেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। ইংরেজি সাহিত্যের জেন অস্টিনের সাহিত্যকর্ম থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি-অনেক চিন্তা সম্পর্কেই তিনি স্বতন্ত্র ধারণা দিয়ে গেছেন। পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের দ্বন্দ্বে এডওয়ার্ড সাঈদ নিশ্চিতভাবেই মধ্যপ্রাচ্যের কৌসুলি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এডওয়ার্ড সাঈদের ওরেন্টালিজম নিয়ে বিতর্ক এখনও চলছে। মোটাদাগে বললে এডওয়ার্ড সাঈদের ওয়েরন্টালিজম হচ্ছে এমন এক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে পাশ্চাত্য মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে শতাব্দিব্যাপী সম্পর্ক টিকিয়ে রেখেছে। বিশাল আরব ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক পাঠ তার আগে পাশ্চাত্য ও ইসরাইলের কাছে এক অর্থে ধরাছোয়ার বাইরেই ছিল। আরব ও মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে মার্কিন এবং ইসরাইলিদের একপেশে মনোভাবের কঠোর সমালোচনা শেষ পর্যন্ত ইসরাইলিদের কানেও জল ঢেলেছিল। যে কারণে তার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত বার্তায় ইসরাইলের হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইলান পাপে লেখেন– 'ইহুদিবাদী রাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান অন্ধকার এবং সন্দেহের মধ্যে সাঈদ ছিলেন নৈতিকতা এবং সচেতনতার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ চরের নির্দেশবাহী বাতিঘর।'

সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা এডওয়ার্ড সাঈদের চরিত্রে মজ্জাগত। এডওয়ার্ড বারবারই বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদ কখনও শুধু সামরিক ক্ষমতার ওপর ভরসা করে না, বরং যা ক্ষমতাকে সক্রিয় করে তার ব্যবহার এবং প্রত্যাহিক অত্যাচার, দণ্ডাজ্ঞা এবং কর্তৃত্ব চর্চার মাধ্যমে ক্ষমতাকে আরও মজবুত করে। উদাহরণ হিসাবে সাঈদ এনেছেন ভারতসহ গোটা বিশ্বের উপনিবেশ রাষ্ট্রগুলোর কথা। ব্রিটেন বিশাল ভারত ভূমি শাসন করেছে মাত্র কয়েক হাজার ঔপনিবেশিক কর্মকর্তা আর কয়েক হাজার সেনা দিয়ে, যার অধিকাংশ ছিল ভারতীয়। ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকা ও ইন্দোচিনে একই কাজ করেছে। ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ায়, পর্তুগিজ আর বেলজিয়ানরা আফ্রিকায়।

ফিলিস্তিনের ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক আরাফাত ও সশস্ত্র ইসলামী দলগুলো ছাড়াও আরবেও একটা স্বাধীন দল গড়ে উঠেছে– দ্যা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ন্যাশনাল

www.pathagar.com

ইনিমিয়েটিভ। ফিলিস্তিনে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিত সংগঠনটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এডওয়ার্ড সাঈদ জড়িয়ে পড়েছেন মধ্যপ্রাচ্য রাজনীতিতে। দলটি স্বাধীনভাবে দেশীয় গণতন্ত্রের ওপর জোর দেওয়ায় এটা মার্কিন বা ইসরাইলিদের নজর কাড়েনি। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দেশহীন জাতির মুক্তি এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যেভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন তা রীতিমতো দৃষ্টান্ত হতে পারে। কয়েক দশক ধরে ন্যায় বিচার এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নিশ্চিতভাবেই তাকে স্মরণীয় করে রাখবে ফিলিস্তিনি মুক্তিকামী এবং ফিলিস্তিনি মুক্তিকামীদের সমর্থনকারী অসংখ্য মানুষের মুক্তিপ্রবণ স্মৃতিতে।

আজকের কাগজ, ১ অক্টোবর '০৩

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড সাঈদ
এক ফিলিস্তিনি কণ্ঠস্বরের বিদায়

মূল : রবার্ট ফিস্ক
অনুবাদক : তৌফিক আজিজ

শেষবার যখন প্রয়াত এডওয়ার্ড সাঈদের সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখন আমি তাকে অবসর নিতে বলেছিলাম। আমি এডওয়ার্ডের ব্লাড ক্যান্সার আছে জানতাম। তিনি প্রায়ই বলতেন, এ রোগের চিকিৎসায় তাকে এক ইহুদী ডাক্তার সাহায্য করছেন। এ চিকিৎসা সেবাকে এডওয়ার্ড বলতেন 'স্টেট অব দ্য আর্ট' বলে। তার ইহুদী সমালোচকরা এডওয়ার্ডকে লক্ষ্য করে যতই কাদা ছুঁড়ুক না কেন, তিনি সব সময় তার ইহুদী বন্ধু ও সহযোগীদের সম্মান করেছেন। এদের মধ্যে ড্যানিয়েল বারেনবোইমের নাম উল্লেখযোগ্য। ৮০'র দশকের কথা। বৈরুতে এক বুফেতে মধ্যাহ্ন ভোজে ব্যস্ত এডওয়ার্ড সাঈদের সঙ্গে আমার দেখা। সে সময় খুব উত্তেজিত ছিলেন তিনি। বিশেষ করে ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাতের ওপর। কারণ আরাফাত সে সময় ইসরাইলিদের কিছু শর্তে ছাড় দেন। আমি এ নিয়ে তাকে একটা প্রশ্ন করতেই সৈনিকের মতো তার জবাব ছিলো, 'আমি খুব শিগগির মরছি না। কারণ খুব বেশি সংখ্যক মানুষ আমার মৃত্যু কামনা করছে।' শেষ পর্যন্ত বিদায় নিলেন তিনি।

লেবাননের গৃহযুদ্ধের শুরুর দিকে এডওয়ার্ড সাঈদের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপচারিতা। আমি তার নাম শুনেছিলাম। তিনি একজন বুদ্ধিজীবী, যোদ্ধা, ভাষাবিদ এবং সঙ্গীতজ্ঞ। তাই ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, কারণ ৭০'র দশকে এডওয়ার্ডের এ বহুমুখি প্রতিভা আমার জানা ছিল না। বৈরুতের হামরা স্ট্রিটের একটি এ্যাপার্টমেন্টে আমাকে যেতে বলা হলো। এডওয়ার্ডের ঠিকানায় পৌছাবার সময় রাস্তায় গোলাগুলি হচ্ছিল। যেন বৈরুতে গৃহযুদ্ধ তখন নিত্যদিনের ব্যাপার। কিন্তু আমি যখন এডওয়ার্ডের এ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করলাম তখন শুনতে পেলাম অপূর্ব পিয়ানোর সুর।

আমি দীর্ঘ ১০ মিনিট এ্যাপার্টমেন্টের দরোজার বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। এডওয়ার্ড তার পিয়ানো বাজানো শেষ করলে এ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করি। আলাপচারিতার শুরুতেই এডওয়ার্ড বললেন, 'তুমি আমার বই নিশ্চয়ই পড়েছো রবার্ট। তবে আমি নিশ্চিত আমার সঙ্গীতজ্ঞান সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা নেই।' আসলে তখন পর্যন্ত এডওয়ার্ডের কোনও বই পড়ার সৌভাগ্য হয়নি আমার। তাই এ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়েই আমি একাধিক বই কিনলাম আমার সংগ্রহে রাখার জন্য। বিশেষ করে ফিলিস্তিনিদের ওপর

www.pathagar.com

লেখা প্রতিটি রচনা, ইয়াসির আরাফাতের ব্যর্থতা এবং এ্যারিয়েল শ্যারনের বর্বরতার বিরুদ্ধে এডওয়ার্ডের কলম কখনও ক্লান্ত হয়নি। জীবদ্দশায় এডওয়ার্ড সাঈদকে শুধু উদার ভাবাটা ভুল ধারণা হবে। তিনি মিথ্যার সমালোচনায় সব সময় ছিলেন হৃদয়হীন। তিনি রাগান্বিত হতেন চরমভাবে। একদিন বিকেলে, আমি এডওয়ার্ডের বোন জেনের বৈরুতের বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করতে যাই। জেন নিজেও একজন লেখিকা। ১৯৮২ সালে লেবাননে ইসরাইলি দখলদারিত্বের ওপর জেনের লেখা 'বৈরুত ফ্র্যাগমেন্টস' এখনও জীবন্ত। যা হোক, জেনের বাড়িতে গিয়ে দেখি এডওয়ার্ড সোফার ওপর আয়েশি ঢং-এ বসে। আমি তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, 'ক্যান্সারের চিকিৎসা নিতে নিতে আমি ক্লান্ত। তবে আমি থামব না। যাত্রা অব্যাহত রাখব।' আসলে এডওয়ার্ড ছিলেন একজন প্রচণ্ড মনোবলের মানুষ। এক কথায় ইসরাইলি দখলদারিত্বের শিকার ফিলিস্তিনিদের সবচেয়ে বাকপটু কণ্ঠস্বর এবং ফিলিস্তিনি নেতৃত্বের সবচেয়ে বলিষ্ঠ সমালোচক ছিলেন এডওয়ার্ড সাঈদ। আরাফাত তার বই নিষিদ্ধ করে প্রমাণ করেছিলেন এডওয়ার্ডের বুদ্ধিদীপ্ততাকে।

৭০ দশকের শেষ দিকে বৈরুতে প্রথম আলাপচারিতায় আমি এডওয়ার্ড সাঈদকে আরাফাত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'বৈরুতে গতকালই আরাফাতের একটি বৈঠকে যোগ দিয়েছি। ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ভবিষ্যত নিয়ে আরাফাতকে প্রশ্ন করতেই তিনি উত্তরে বলেছেন, এ প্রশ্নটি প্রত্যেক ফিলিস্তিনি শিশুকে কর। উত্তর পেয়ে যাবে। আরাফাতের এ উত্তরে তালির ঢল নামলো। কিন্তু এতে তিনি কি বোঝালেন তা কেউ বোঝেনি। কারণ এর অর্থ কিছুই ছিল না।' আরাফাত যখন অসলো চুক্তি করলেন তখন সাঈদই প্রথম ব্যক্তি যিনি এর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, আরাফাত ইসরাইলি অধিকৃত এলাকায় ইহুদী বসতি দেখেননি। তাই এ চুক্তি করতে পেরেছেন আর চুক্তির সময় একজন ফিলিস্তিনি আইনজীবীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আর এডওয়ার্ড সাঈদের এ সমালোচনার উত্তরে বলা হয়েছিল, যারা অসলো চুক্তির বিরোধিতা করে তারা শান্তির বিরোধী এবং সন্ত্রাসের সমর্থক।

প্রয়াত এডওয়ার্ড সাঈদ তার শত্রুদের হাতে বহুবার নির্যাতিত হয়েছেন। তার অফিসে বোমা হামলা হয়েছে এবং তাকে মার্কিন ইহুদীরা প্রতিহিংসাপরায়ণ বলে চিহ্নিত করেছেন। এমনকি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লিটারেচারের অধ্যাপক এডওয়ার্ড সাঈদকে তার শিক্ষকতা থেকে সরিয়ে দেয়ারও ষড়যন্ত্র হয়েছে। মার্কিন ইহুদীরা ছিল এ ষড়যন্ত্রের মূল হোতা। যখন হার্ভার্ডের ইহুদী প্রধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'এন্টি-সিমিটিজম'-এর উত্থানে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তখন সাঈদ সরাসরি লিখলেন তার রচনা 'কমপ্লেইনস এবাউট এন্টি-সিমিটিজম।' তার এ লেখাটি হার্ভার্ড এবং কলম্বিয়ার মধ্যে ইন্টেলেকচুয়াল দ্বন্দ্বটা প্রমাণ করেছিল। স্বাস্থ্যের অবনতির ধারা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও এডওয়ার্ড বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক ছিলেন। অনেকে তার এ অতিথি অধ্যাপনাকে ব্যবসা বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন? মারাত্মক অসুস্থ এ ব্যক্তিটি প্রায়ই আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছেন কিছু বলার জন্য, শিক্ষার্থীদের কিছু দেয়ার জন্য। সাঈদ তার ইহুদী বন্ধু বারেনবোইমের সঙ্গে মরক্কোতে পিয়ানো বাজিয়েছেন যা তার উদারতার পরিচয় বহন করে। এমনকি রামাল্লায় একটি কনসার্টে যখন বারেনবোইমকে প্রবেশের

www.pathagar.com

অনুমতি দেওয়া হয়নি তখনও তিনি তার ইহুদী বন্ধুকে ছাড়েননি।
শেষবার যখন দেখা হলো তখন এডওয়ার্ড সাঈদ খুবই উৎফুল্ল ছিলেন। কারণ তার ছেলের বিয়ে ছিল সেদিন তবে এ আনন্দঘন মুহূর্তেও এডওয়ার্ড তার স্বজাতিকে ভোলেননি। আমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল বোস্টন সফর নিয়ে। সেখানে বক্তব্য রাখবেন তিনি। আর বিষয়বস্তু ফিলিস্তিনিদের তাদের নিজ ভূমিতে ফেরত আসার অধিকার নিয়ে। অন্যসব নিষ্ঠানবান বুদ্ধিজীবীর মতো তিনিও নির্ভূলতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তবে জীবনে তার সবচেয়ে বড় দুঃখ ছিল যখন এক সমালোচক তাকে 'সত্যিকার ফিলিস্তিনি শরণার্থী নন' বলে চিহ্নিত করেন। কারণ ফিলিস্তিনিদের উৎখাতের সময় এডওয়ার্ড কায়রো ছিলেন। এডওয়ার্ডের সাংবাদিকতায়ও দক্ষতা ছিল। বিশেষ করে ইসলাম প্রশ্নে। ইরানে বিপ্লব নিয়ে তার সংবাদভিত্তিক প্রতিবেদন প্রশংসনীয়।
তবে মার্কিন টিভিকে তিনি মোটেও সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে দেখতেন না। একবার এডওয়ার্ড বলেছিলেন, 'যখন আমার টক শো চলছিল তখন নিউইয়র্কে নিযুক্ত ইসরাইলি কনসোল বললেন, আমি একজন সন্ত্রাসী এবং আমাকে হত্যা করা উচিত। অথচ টক শো'র উপস্থাপক আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'ইসরাইলি কনসোলকে আপনি হত্যা করতে চান কেন?' প্রকৃতপক্ষে এডওয়ার্ড ছিলেন ইন্টেলেকচুয়াল বিশ্বের এক দুষ্প্রাপ্য পাখি। তিনি ছিলেন একজন আইকন।

আজকের কাগজ, ২৯ সেপ্টেম্বর '০৩

www.pathagar.com

বিশ্বস্ত বন্ধুকে হারালাম

মূল : আহদাফ সৌফ

মিসরীয় লেখিকা সাহিত্যিক আহসাফ সৌফ গার্ডিয়ান পত্রিকায় এক নিবন্ধে স্মৃতিচারণ করেছেন এডওয়ার্ড সাঈদের। তিনি লিখেছেন : ১২ বছর আগে গ্রীষ্মের এক পড়ন্ত বিকালে এডওয়ার্ড আমাকে ফোন করলেন। বললেন, এই মাত্র রোগ পরীক্ষায় ধরা পড়েছে যে, তাঁর লিউকেমিয়া হয়েছে। তাঁর কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক ছিল না, বিষণ্নতা ছিল না, হতাশা ছিল না। তাঁর বিস্ময় ছিল, ক্রোধ ছিল। বললেন, "অনুমান করতে পারো ব্যাপারটা, আমার সেই সর্বনাশা লিউকেমিয়া হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে বলা যায় আমি মরতে যাচ্ছি।" আমি বললাম, 'তুমি মরতে পারো না।'

আমার কাছে তাঁর মৃত্যুটা অসম্ভবই ছিল এবং আজকের দিনটির আগ পর্যন্ত তা অসম্ভবই থেকে গিয়েছিল। আমরা যে কী হারিয়েছি তার পরিমাপ করে দেখা সম্ভব নয়। ২২ বছর ধরে এডওয়ার্ড ছিলেন আমার বন্ধু। বন্ধুত্বটা যেভাবে শুরু হয়েছিল সেটা শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই সাজে। তিনি শুনেছিলেন আমি নিউইয়র্কে এসেছি। আমার প্রথম প্রকাশিত গল্পটি পড়েছিলেন তিনি। ফোন করে আমাকে ও আমার স্বামীকে তাঁর বাড়িতে ডিনারের আমন্ত্রণ জানালেন। সেখানে তাঁর স্ত্রী মরিয়ম, ছেলে ওয়াদি, মেয়ে নাজলা এবং আরও দু'একজনের সঙ্গে পরিচয় হলো। ডিনার শেষ হবার পর তিনি আমাকে ও ইয়াশকে বাইরে নিয়ে গেলেন। লিফটের দরজায় দাঁড়িয়ে আমরা করমর্দন করলাম। তারপর তিনি হাত দু'খানি মেলে ধরে আমাকে বিশাল এক আলিঙ্গন করলেন। আমরা পুরনো বন্ধু বনে গেলাম।

এখন নিজেকেই নিজে শোনাচ্ছি : তাঁর বয়স ছিল ৬৮ বছর। ভারি চমৎকার একটা ফ্যামিলি ছিল। ছেলেমেয়েরা তাঁর চোখের সামনে বড় হয়ে উঠেছে। ওদের নিয়ে তাঁর আনন্দ-গর্বের সীমা ছিল না। আমাদের জন্য তিনি রেখে গেছেন তাঁর কর্ম। সারা বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছেন, প্রভাবিত করেছেন তিনি। পরিশেষে মৃত্যু তার হিমশীতল হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাঁর দিকে, যেমনটি দেবে আমাদের প্রত্যেককে। মৃত্যু শুধু বেদনাই নিয়ে আসে।

তাঁর পরিবারের যে কী অপরিসীম ক্ষতি হয়ে গেল তা আর বলার নয়। আমরা, তাঁর বন্ধুরাই হয়ে গেলাম অনাথ। তাঁকে হারিয়ে এখন কী করব আমরা? বন্ধুত্বের সঙ্গে তিনি ভালবাসা, উদ্বেগ, আনুগত্য,মুগ্ধতা যোগ করেছিলেন এবং সদাসর্বদা সেগুলোর উৎকর্ষ সাধনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আপনার সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা সেটা আপনি টের পাওয়ার আগেই তিনি সাহায্য নিয়ে তৈরি হয়ে থাকতেন। বহুবার এমন হয়েছে যে,

www.pathagar.com

আমি একটা অপরিচিত শহরে একাকী এসেছি। আমার হোটেলের ফোন বেজে উঠত। এডওয়ার্ডের কোন বন্ধু করেছেন। বলতেন : "এডওয়ার্ড আমাকে আপনার দেখাশোনা করতে বলেছেন। অতএব আপনাকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটু পরেই আমি আসছি।" গত বড়দিনের সময় আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম যে, আমি রোম যাচ্ছি। তিনি আমাকে এক মহিলার ফোন নম্বর দিয়ে বলেছিলেন, "এর সঙ্গে যোগাযোগ রেখো। চমৎকার মহিলা। তোমার ভাল লাগবে। মহিলাটি ছিলেন তাঁর গানের শিক্ষক। পঞ্চাশ বছর আগে তাঁকে গান শেখাতেন। বাড়ি কায়রোয়। এখনও ভালবাসেন এডওয়ার্ডকে। বললেন, এডওয়ার্ড কখনই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেননি। জানালেন, তিনি ও তাঁর স্বামী প্রতিরাতেই তাঁর জন্য প্রার্থনা করেন। ওঁর বন্ধুদের নিয়ে আমাদের একজন কথাটাকে এভাবে বলেছেন : "এডওয়ার্ড এবং তাঁর তিন হাজার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।" ওঁর সঙ্গে থাকলে সর্বদাই একটু ভিন্নরকম অনুভূতি হতো। তিনি লক্ষ্য করতেন আপনি চুলটা ঠিকমতো আঁচড়িয়েছেন কিনা। তিনি আপনার পোশাক নিয়ে মন্তব্য করতেন। কী খাবার খেতে আপনার পছন্দ তা নিয়ে মন্তব্য করতেন। সম্প্রতি ওঁকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে করে যাচ্ছিলাম। ক্যাসেটে মিসরের সমকালীন জনপ্রিয় শিল্পীর গান বাজছিল। তিনি বললেন, "এই বিচ্ছিরি চিৎকারটা বন্ধ করবে?" তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন : "কিন্তু এমন গানই যদি তোমার এত ভাল লাগে তাহলে মিসরে না থেকে পারো কী করে?"

ওঁর বন্ধুত্বের গভীরতা কত তার একটা পরিচয় দিই। দু'বছর আগের কথা। একদিন রাতে একাকী ছিলাম। আমার স্বামীর ফুসফুসের ক্যান্সার ধরা পড়েছে। খবরটা সবে ফ্যাক্স করে দিয়েছি নিউইয়র্কে এডওয়ার্ড সাঈদের কাছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তিনি ফোনে আমার সঙ্গে কথা বললেন। ডাক্তার মেডিক্যাল সেন্টার এবং তাঁর যে সব বন্ধুর এমন ক্যান্সার হয়েছিল এবং সেরে উঠেছেন তাঁদের ফোন নম্বর দিলেন। তাঁদের সঙ্গে যখন যোগাযোগ করলাম জানতে পারলাম ইতোমধ্যে তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং অনুরোধ করেছেন যে, আমার দিকে তাঁরা যেন খেয়াল রাখেন। তাঁর শেষ দুটো অনুষ্ঠানে আমি তাঁর সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলাম– একটা ব্রাইটনে, অন্যটা হে'তে।

অনুষ্ঠান শেষে লোকে এসে তাঁকে স্পর্শ করে যাচ্ছিল, যেন তিনি একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ। তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ব্যাপারটা। বলেছিলেন, "তুমি তো আমাকে জানোই। আমি স্রেফ এক বুড়ো বক্তৃতাবাজ।"

কিন্তু তা মোটেই ছিলেন না তিনি। তিনি ছিলেন একজন পথপ্রদর্শক ও মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত। একান্ত ঘরোয়া সংলাপে হোক আর প্রকাশ্য জনসভায় হোক সর্বদাই তিনি ছিলেন মানবিক, সর্বদাই নিষ্কলুষ,সর্বদাই সবকিছুকে নিজের ভিতরে ধারণ করতে উদগ্রীব। সম্প্রতি এক বিতর্কসভার পর তিনি প্রশ্ন করেছিলেন : "এসব লোকের কী? ন্যায় আর সত্যের কথা কেউ আর উল্লেখ করছে না কেন" ওরা কেউ উল্লেখ করে না ঠিকই। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন, সারাবিশ্বের সাধারণ মানুষ এখনও ন্যায় ও সত্যের কথাভাবে। তাঁকে হারিয়ে আমার ও আরও অনেকের জীবন নিঃসঙ্গ নিরানন্দ হয়ে গেল।

জনকণ্ঠ, ৩ অক্টোবর '০৩

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড সাঈদ ও ওরিয়েন্টালিজম

জাকারিয়া শিরাজী

...as thy empire must extend
-John Milton: *Paradise Regained*

এডওয়ার্ড সাঈদ একটা নাম যা গত কয়েক বছর ধরে সারা দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ও একাডেমিগুলিতে এবং বিদ্বৎ সমাজে ঝড় তুলেছে। তাঁর *Orientalism* বর্তমান বিশ্বের সচেয়ে আলোচিত বইগুলির একটি। কিন্তু তাঁর নাম সাধারণের কাছে পরিচিত হয়ে যাবার ফলে বাজারে তাঁর সম্পর্কে কিছুটা ভ্রান্তিও আছে। যদি প্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাইটার অংশ বিশেষ তুলে আনা হয় তাহলে মনে হতে পারে তিনি বোধ হয় ইসলাম ধর্মের পক্ষে একজন প্রচারক, অত্যন্ত বিদগ্ধ ও কৃতবিদ্য প্রচারক যিনি দর্শন ও ইতিহাসের যুক্তির ওপর তাঁর অভিসন্দর্ভ দাঁড় কারাতে চান, পূর্বসূরি সৈয়দ আমির আলি বা সমকালীন মরিস বুকাইলির মতো। ব্যাপারটা তা নয়। এডওয়ার্ড সাঈদ ধর্মে খ্রিস্টান, জাতিতে ফিলিস্তিনি। তবে মুসলিম আবহে তিনি লালিত, তাঁর শিক্ষাগুরু ও সহকর্মীরা মুসলিম। বন্ধুরাও মুসলিম। ইতোমধ্যে তাঁর আত্মজীবনী *Out of Place* প্রকাশিত হয়েছে। জন্ম জেরুজালেমে। বিদ্যালয় শিক্ষা কায়রোতে। শিক্ষক ও সহপাঠীদের মধ্যে থেকে যেসব নাম তিনি উল্লেখ করেছেন সেগুলো হলো হামদোল্লাহ্ আলি হালিম, উসামা আবদুল হক, শিক্ষক ফুয়াদ এতায়িম, শিক্ষক আজমি এফেন্দি। ফিলিস্তিনিরা, আমরা জানি, পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চশিক্ষিত জাতি। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও একাডেমিগুলো আংশিকভাবে ফিলিস্তিনিদের দ্বারা শাসিত। এডওয়ার্ড সাঈদ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক। ইসলাম তাঁর রচনায় বিরাট স্থান জুড়ে আছে প্রাচ্য সভ্যতার এক গৌরবময় অধ্যায়রূপে যেটা প্রাচ্যের অন্যান্য বিষয়ের মতোই পাশ্চাত্যের অপপ্রচার, ভ্রান্তি ও অবজ্ঞার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। ক্রুসেডের উল্লেখ যে নেই তা নয়, তবে বিশেষ জোর সেটার ওপর নেই। সাঈদের প্রধান বিবেচ্য রাজনৈতিক সংঘাত নয়, বুদ্ধিবৃত্তিক বিভ্রান্তি ও অপপ্রচার এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার ঔপনিবেশিক স্বার্থে ব্যবহার, বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীতে। যেমন ইসলাম সম্বন্ধে তিনি বলছেন, 'কেমব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইসলাম' ইসলাম ধর্মকে দারুণভাবে বিকৃত করে উপস্থাপিত করেছে। এই বিশ্বকোষে ধ্যান-ধারণা ও সুশৃঙ্খল চিন্তন প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত যেটা এ-ধরনের একটা উদ্যোগের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ঘটনা বইকি। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলছেন, আরব ইতিহাস বা ইসলামি ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানও যার আছে সেই স্বীকার করবে অষ্টম শতাব্দী থেকে

www.pathagar.com

একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আব্বাসাইড যুগ ইসলামি সভ্যতার চরমোৎকর্ষের যুগ, যা ইতালীয় রেনেসাঁর সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু এই বিশ্বকোষের চল্লিশটা পৃষ্ঠার কোথাও তার কোনো ইঙ্গিত নেই।

মূলত এডওয়ার্ড সাঈদ সাহিত্য সমালোচক। তিনি সমসাময়িক সাতিহ্যের সেই ধারার পুরোধা যেটাকে একটু শিথিলভাবে পোস্টমডার্নিজম বলা হয়। আমি পোস্টমডার্ন শব্দটাই ব্যবহার করব, উত্তরাধুনিক নয়। কারণ, আমার কাছে মনে হয়েছে বাংলাদেশের তরুণ কবিরা যেটাকে উত্তরাধুনিক বলছেন তার সঙ্গে পোস্টমডার্ন সাহিত্যের কিছুটা পার্থক্য আছে। এটা অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ; আপাতত দুয়েকটা বাক্যেই শেষ করব। পোস্টমডার্ন ধারার অবয়ব এখনো অস্পষ্ট থাকলেও কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্যযোগ্য। পোস্টমডার্ন সাহিত্য যুদ্ধবিরোধী, বর্ণবাদবিরোধী, নারীবাদী। অতএব প্রাচ্যবাদ বা প্রাচ্যের সাহিত্য সম্বন্ধে পক্ষপাতদুষ্ট নয়। বাংলাদেশের তরুণ কবিদের যে সাহিত্য-ভাবনা সেখানে এ-সব উপাদান যে নেই তা নয়। এবং পোস্টমডার্নদের মতো উত্তরাধুনিকরাও সাহিত্যের সরলীকরণ করেছেন এবং সাহিত্যকে আশাবাদী লক্ষ্যে পরিচালিত করছেন। এই আশাবাদই হচ্ছে মডার্নিজম ও পোস্টমডার্নিজমের সুস্পষ্ট ভেদরেখা। আমরা যারা মডার্নিস্ট ধারার অনুপন্থী, বিশ্বাস করি না যে নৈরাশ্য ছাড়া, শূন্যতাবোধের যন্ত্রণা ছাড়া, মহৎ সাহিত্য সম্ভব। কিন্তু সেটা আরেক প্রসঙ্গ।

কিন্তু বাংলাদেশের উত্তরাধুনিকরা কবিতায় ভূমিজ উপাদান ও লোকজ ঐতিহ্য দেখতে চান। আমার কাছে মনে হচ্ছে যেন তাঁরা বিষয়টা লোকসাহিত্যের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। পোস্টমডার্ন সাহিত্যে ভূমিজ উপাদানের ওপর জোর নেই, জোর আছে multiculturalism বা যৌগিক সংস্কৃতির ওপর। পোস্টমডার্নিজমের কোনো প্রবক্তা যেমন ইহাব হাসান বা গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক বা সুজান সন্টাগ অথবা এডওয়ার্ড সাঈদকে যদি জিজ্ঞেস করি যে পোস্টমডার্নিজম মানে কি লোকজ ঐতিহ্যের সাতিহ্যে রূপায়ণ? তাঁদের উত্তরটা হয়তো এ-রকম হবে- "আপনারা লোকজ উপাদানের ওপর জোর দিচ্ছেন, এটা তো ভাল কথা। এর গুরুত্ব আছে। কিন্তু পোস্টমডার্নিজমের প্রধান বৈশিষ্ট্য এটা নয়। আমাদের কাছে সংস্কৃতির বহুত্ব প্রধান। আমাদের কাছে origin বা শেকড় গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে Phenomenon বা চলমান অবস্থা। ইউক্লিডের জ্যামিতি কোন্ ভূমির ফসল সেটা কি আজ খুব প্রাসঙ্গিক বিষয়? কোথায় উৎপত্তি মার্ক্সের অর্থনীতির?"

এই পোস্টমডার্ন সাহিত্যালোচনার অন্যতম পুরোধা হিসেবেও এডওয়ার্ড সাঈদের নাম অগ্রগণ্য। সাঈদের আরো একটা দিক আছে যেটা একজন আরবের পক্ষে যেমন ব্যতিক্রমী তেমনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তিনি পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী সংগীত বিষয়ে একজন প্রামাণ্য সমালোচক। বইপত্র আছে। এই বিষয়টা যেহেতু আমাদের জ্ঞান ও রুচির সঙ্কীর্ণ বৃত্তের বাইরে তাই এই প্রসঙ্গে আর আলোচনা না করাই ভালো। এডওয়ার্ড সাঈদের সাহিত্য দর্শন যে চলতি অর্থে পোস্টমডার্ন, আগেই তার উল্লেখ করেছি। তাঁর সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্রন্থের নাম *The World, the Text and the Critic*। এখানেও তাঁর প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। পোস্টমডার্নদের যে সাহিত্যের প্রতি পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। *The World, the Text and the Critic* বইতে সাঈদ বলেছেন, তাঁর কলেজ জীবনের এক পুরানো বন্ধু যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগে কাজ করত যখন ভিয়েতনামে

www.pathagar.com

বি-৫২ দিয়ে বোমা বর্ষণ পূর্ণোদ্যমে চলছে। তাঁর বন্ধু বিবৃত করছেন, "আমি মূঢ়ের মতো জানবার চেষ্টা করছিলাম কী ধরনের মানুষ এই প্রতিরক্ষাওয়ালারা। দূরের একটা এশীয় দেশে মার্কিন স্বার্থ সংরক্ষণ ও কম্যুনিজম ঠেকোবার নামে রোজ বোমারু বিমান পাঠিয়ে দিচ্ছে।" তারপর বন্ধু বলছেন, "মন্ত্রী এক জটিল চরিত্র। সাম্রাজ্যবাদী ঠান্ডা মাথার নরঘাতক বলতে আমরা যা বুঝি সেই চিত্রকল্পে সে বে-মানান। তার টেবিলে আমি ডুরেলের Alexandria Quartet দেখেছি।" এখন সাঈদ বলছেন, তাঁর বন্ধুর কথার সারাংশ হলো সাহিত্যের যে অনুরাগী তার পক্ষে হাজার হাজার ভিনদেশী লোকের হত্যার নির্দেশ দেয়া কেমন করে সম্ভব। এর উত্তরও সাঈদ নিজে দিয়েছেন, মানবতাবাদী এবং বুদ্ধিজীবীরা মেনে নিয়েছেন যে আপনি সাহিত্য পড়তে পারেন এবং হত্যা-জখমও চালিয়ে যেতে পারেন। কারণ, সাংস্কৃতিক জগৎটাই এক ধরণের camouflaging বা ছদ্মাবরণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সমাজ-ব্যবস্থা সংস্কৃতিকে সংস্কৃতি-বহির্ভূত বিষয়ে আত্মক্ষেপের অনুমতি দেয়নি। তাই এখানে একজন উচ্চ পর্যায়ের শাসনকর্তার সত্তার সাথে সাহিত্য পাঠকের সত্তার খণ্ডন অনুমোদিত।

সাঈদ অ্যান্টনি ইডেনের কথা বলেননি, কিন্তু তাঁর কথাও এখানে প্রাসঙ্গিক। আমরা জানি, ইডেন ছিলেন পঞ্চাশের দশকে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকালে সেক্রেটারি অফ ওয়ার। পৃথিবীর সবচেয়ে সুবেশধারী লোকদের একজন তিনি নাকি ছিলেন, যেজন্য উপহাস করে তাঁকে বলা হতো tailor's model। ১৯৫৬ সালে মিশরের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সুয়েজে যুদ্ধ জাহাজ পাঠাতে একটুও দ্বিধা করেননি। বিস্মিত হবার কিছু নেই, কিন্তু বিস্ময় জাগে তখন যখন দেখি অক্সফোর্ড থেকে তিনি কোন্ বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি নিয়েছিলেন– আরবি ভাষা ও সাহিত্য। (প্রাচ্যবিদ্যার অংশ হিসেবে) সাংস্কৃতিক জগতের ছদ্মাবরণের আরেকটা নিদর্শন। তাছাড়া সাহিত্য পাঠের সাথে দেশ শাসনের কী সম্পর্ক। সাঈদ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপর সমালোচনা গ্রন্থ এরিখ আউয়েরবাখ (Erich Auerbach)-এর 'মাইমেসিস'কে (এরিস্টটল-সুলভ শিরোনাম লক্ষণীয়)। বইটা লেখা হয়েছিল যুদ্ধকালে ইস্তাম্বুলে যখন লেখক সমকালীন সমালোচনা জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ সাহিত্যের গোঁড়া পাশ্চাত্য ভাবনা থেকেও বিচ্ছিন্ন এবং তিনি ছিলেন যুদ্ধাবস্থার মধ্যে আবদ্ধ যখন মানব সভ্যতা বিনাশ থেকে রক্ষা পাবে কি পাবে না, সেটাই ছিল তাঁর প্রধান বিবেচ্য। এখানে শুধু text নয়, world প্রাধান্য পাচ্ছে। সাঈদ বলছেন, আউয়েরবাখ ইস্তাম্বুলে বসে তাঁর গবেষণা পরিচালনা করেছেন যেটা তাঁর কাজকে অধিকতর নাটকীয়তা দান করেছে। পাশ্চাত্যের কাছে ইস্তাম্বুল তো এক ভয়ঙ্কর তুর্কি, এবং সেই তুর্কি যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তবু আউয়েরবাখ বলছেন যে পাশ্চাত্য থেকে দূরত্বের কারণেই তিনি মাইমেসিসকে আরো ভালভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই পাশ্চাত্য ধারার স্বরূপ সম্বন্ধে সাঈদ জন স্টুয়ার্ট মিলকে উদ্ধৃত করে যা বলেছেন তাতে অনেক কিছুই স্পষ্ট হয়ে যায়। আমরা জানি জন স্টুয়ার্ট মিল বিমুক্তির প্রবক্তা এবং তাঁর বাবা স্যার জেমস মিল ছিলেন একজন ভারত বিশারদ এবং রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু। লেখক ও দার্শনিক ছাড়াও জন স্টুয়ার্ট মিলের আরেকটি প্রসিদ্ধি এই যে কিশোর বয়সের মধ্যেই তাঁর মতো প্রগাঢ় বিদ্যার অধিকারী হয়েছে, মানব ইতিহাসে এমন আর কোনো কিশোর সম্বন্ধে জানা নেই। জ্ঞানের রাজ্যে precocity বা অকালপক্কতা যাকে বলে তার

www.pathagar.com

এক চরম উদাহরণ ছিলেন মিল। সেই জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর On Liberty-তে বলেছেন যে তাঁর সূত্রগুলি সেইসব দেশের বেলায় প্রযোজ্য যেগুলির সভ্যতা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অর্থাৎ ভারত তার মধ্যে পড়ে না। বাবা স্যার জেমস মিলের মতোই তিনি মনে করতেন ভারত স্ব-শাসনের উপযুক্ত নয়। তবে স্টুয়ার্ট মিলের প্রতি সুচিবার করতে হলে এটাও বলতে হবে যে মিল ইংল্যান্ডেও ভোটাধিকার কেবল শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সীমিত রাখতে চেয়েছিলেন।

যা হোক, আলোচ্য বিষয় সাঈদের সাহিত্য দর্শন নয়, প্রাচ্য দর্শন এবং সাধারণের কাছে তাঁর প্রসিদ্ধিও এই কারণে। তবে এডওয়ার্ড সাঈদকে বুঝতে হলে পোস্টমর্ডানিস্ট সমালোচনার বিশেষ ঝোঁকগুলি অবশ্যই বুঝতে হবে। এবং এই প্রসঙ্গ বারবার আসবে। প্রথমেই বলে রাখতে চাই এডওয়ার্ড সাঈদ Orientalism-কে নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন, নতুন অর্থে ব্যবহার করেছেন। Orientalism সাঈদের অর্থে একটা পক্ষপাতদুষ্ট, খণ্ডিত, বিদ্বেষমূলক জ্ঞান-শৃঙ্খলা। Orientalism সাঈদের অর্থে প্রাচ্যবিদ্যা নয়, পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা প্রাচ্য সম্বন্ধে যে সত্য মিথ্যার মিশেল তথ্যসম্ভার গড়ে তুলেছে যার সাথে কিছুটা পৃষ্ঠপোষণ বা দূর থেকে অভিব্যক্ত প্রীতির সংশ্লেষও থাকতে পারে, সেই ঐতিহ্য। এটা একটা অসুস্থ ভাবনা, ফ্যাসিজম বা কলোনিয়ালিজমের মতো। কিন্তু এটা অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা। সাঈদ ঔপনিবেশিকতার সাথে ওরিয়েন্টালিজমের একটা যোগসূত্র দেখিয়েছেন। পোস্টমডার্ন সাতিহ্যকে পোস্টকলোনিয়াল সাহিত্যও বলা হয়। তবু সাঈদের ওরিয়েন্টালিজমে উপনিবেশ বিরোধী লেবেল এঁটে দিলেই এর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে না। বিষয়টা আরেকটু জটিল। সে আলোচনায় পরে আসছি। সাঈদ বলেছেন, তিনি মিশেল ফুকোর দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। মিশেল ফুকো সম্বন্ধে আলোচনা একটু পরে করব। ফিরে আসি পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদদের প্রসঙ্গে। আমরা জানি, পাশ্চাত্যের জ্ঞান সাধকদের মধ্যে যেমন প্রাচ্যবিদ্বেষী আছে, তেমনি প্রাচ্যপ্রেমী আছেন। লর্ড মেকলের নামের সাথে যুক্ত একটা অত্যুদ্ধৃত কথা সবার জানা আছে। A shelf in a Western library is worth more than all the wisdom of the East। সাধারণের কাছে এটা মেকলের উক্তি হিসিবে এসেছে। যে কথা নিশ্চিতভাবে মেকলে তাঁর ১৮৩৫ সালের বিখ্যাত বা কুখ্যাত Minutes বা সারসংক্ষেপে বলেছিলেন তা এই যে নেটিভ প্রজাদের কাছ থেকে আমরা ব্রিটিশরা যা শিখতে পারি তার চেয়ে অনেক বেশি নেটিভদের ব্রিটিশদের কাছ থেকে শেখার আছে। একদিকে যেমন মেকলে তেমনি আমরা জানি ভারতপ্রেমী প্রাচ্যবিদদের কথা– ঘম্যা ঘর্ল্যা, ম্যাক্স মূলার এবং অবশ্যই স্যার উইলিয়াম জোনস। মেকলের ঐ কথার উল্লেখ Orientalism বইটাতে আছে এবং বইটার যে এপিগ্রাফ বা শিরোলিপি সেখানে আছে ডিজরেইলির একটা উদ্ধৃতি - The East is a career। এবং আমরা জানি যে ডিজরেইলি ছিলেন ইহুদি বংশোদ্ভূত। একজন ইহুদি তো পুরোপুরি পাশ্চাত্যের লোক হতে পারে না, আশকেনাজিম বা সেফারডিম যে ধারারই হোক। কিন্তু প্রাচ্য তাঁর কাছে গোলড্ রাশ বা স্বর্ণাহরণের সম্ভাবনাময় career বা পেশা।

আর এ ধরনের প্রাচ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কি শুধু পাশ্চাত্যের লোকদের বা শ্বেতাঙ্গদের? কিশোরগঞ্জের এক বাঙালি, এক্সেনট্রিক বিদগ্ধ জ্ঞানতাপস যিনি তাঁর *'এক অজানা ভারতীয়ের আত্মজীবনী'* শীর্ষক বইটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ

www.pathagar.com

করেছিলেন, আজ শতবর্ষে পদার্পণ করেও The last Englishman অভিধা নিয়ে অক্সফোর্ডে বসে ঝিমোচ্ছেন। কখন উপমহাদেশে আবার ব্রিটিশ উপনিবেশের পত্তন হবে, কিশোরগঞ্জে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট আসবে। ইংল্যান্ড বদলেছে, multiculturalism অনেকখানি স্বীকৃতি পেয়েছে, অনেক ইংরেজ দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে, কিন্তু the last Englishman থেকে গেছেন।

ম্যাক্স মূলার ও জার্মান প্রাচ্যবিদদের প্রতি এডওয়ার্ড সাঈদ একটু সদয় কারণ জার্মানির কোনো উপনিবেশ ছিল না আর তাই জার্মান প্রাচ্যবিদরা কোনো জাতীয় স্বার্থের অনুবর্তী না থেকে বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা করে গেছেন। (ম্যাক্স মুলার পরবর্তীকালে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেও এখানে তাঁকে জার্মান প্রাচ্যবিদ ধরছি।)

স্যার উইলিয়াম জোন্‌সের প্রতিও মোটামুটিভাবে সদয় তবে এটুকু যোগ করতে ছাড়েননি যে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য ইসলামিক বিশ্বের বাইরে ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছিল আর পৃথিবীর বাকি অংশের আবিষ্কার পূর্ণোদ্যমে চলছিল। ভ্রমণ কাহিনী, কাল্পনিক ইউটোপিয়া, নৈতিক অভিযান, বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন ইত্যাদির কারণে প্রাচ্য সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াল। যদি ওরিয়েন্টালিজম আঁকেতিল-দুপেরোঁ (Anquetil-Duperron) ও উইলিয়াম জোনসের গবেষণার কাছে ঋণী থেকে থাকে, সেটার পেছনে প্রেরণা হিসেবে নাকি কাজ করেছে ক্যাপটেন কুক ও বুগাঁইভিলের (Bougainville) অভিযান। যার সরলার্থ, স্বর্ণাহরণ ও উপনিবেশ। তবু ভারতের ওপর বিশেষ জোর বইটাতে দেয়া হয়নি। লেখকের মূল উপজীব্য আরব ও তুর্কিদের সম্পর্কে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদদের রচনা ও ধারণা এবং বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে জটিল মিথস্ক্রিয়া। সে-সময় আরবকে Levant বলা হতো, লেখক যদিও শব্দটা ব্যবহার করেননি।

ভারতকে যে সাঈদ বিশেষ গুরুত্ব দেননি তা বইয়ের শুরু থেকেই স্পষ্ট যখন তিনি বলছেন ভৌগলিকভাবে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সন্নিকটে। সাঈদের ওরিয়েন্টালিজম উপনিবেশবাদের সমার্থক হলে ভূগোল, সামাজিক লেন-দেন এবং চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সংক্রামের প্রশ্নটা এতখানি গুরুত্ব পায় কী করে? যেমন সাঈদ বলছেন, দীর্ঘদিন ধরে য়ুরোপ একটা ঐতিহ্যকে লালন করছে আমি যাকে বলব প্রাচ্যবাদ। এটা প্রাচ্যের সঙ্গে আপোস করার একটা প্রক্রিয়া; পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রাচ্যের যে বিশেষ অবস্থান রয়েছে, তারই ওপর এর ভিত্তি। প্রাচ্য য়ুরোপের কেবল নিকটবর্তীই নয়, এটা য়ুরোপের সবচেয়ে সমৃদ্ধ, মহত্তম ও প্রাচীনতম উপনিবেশগুলির অবস্থান, এর সভ্যতা ও ভাষাগুলির উৎস, এর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগী এবং এক গভীর ও পৌনঃপুনিক কল্পচিত্র The Other বা অপর পক্ষের। সাঈদও উল্লেখ করেছেন The Other এর যেটা লক্ষণীয়। এই The Other-এর ধারণা পোস্টমডার্ন সমালোচনার এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক। সে কথায় পরে আসছি। সাঈদ আরো বলেছেন, এ-ছাড়া প্রাচ্য সাহায্য করেছে য়ুরোপকে (অর্থাৎ পাশ্চাত্যকে) সংজ্ঞায়িত করতে এক বিপরীত ভাবচিত্রে, ধারণায়, ব্যক্তিত্বে, অভিজ্ঞতায়। তবু এই প্রাচ্যের কোনো অংশই কেবল কল্পনাপ্রসূত নয়। এই প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার ও কৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ওরিয়েন্টালিজম ঐ অংশটিকে অভিব্যক্ত করে এবং তার প্রতিনিধিত্ব করে ..স্কৃতিকভাবে, এমন কি মতাদর্শের দিক থেকে। এমন প্রাচ্যবিদদের সম্বন্ধে আমরা জানি, যাঁদের আরব সম্বন্ধে আগ্রহ ও কৌতূহল এতই তীব্র ছিল যে তাঁরা খ্রিস্টান হওয়া

www.pathagar.com

সত্ত্বেও মুসলিম ছদ্মবেশে হজ্ব করেছিলেন। যেমন বার্টন (Anatomy of Melancholy-এর লেখক সপ্তদশ শতাব্দীর রবার্ট বার্টন নয়, উনবিংশ শতাব্দীর পরিব্রাজক ও প্রাচ্যবিদ এবং আরব্য উপন্যাসের অনুবাদক রিচার্ড বার্টন।) শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্পর্ক নিয়ে বার্টন যা লিখেছেন সেটাকে মেকলের উক্তির খণ্ডন বলা যায়, এ-কথা লিখেছেন সাঈদ। তারপরও, জীবন সাধানায় প্রাচ্যকে জানার চেষ্টার পরও, প্রাচ্য সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে একটা প্রভুত্বের সুর নাকি বার্টনের লেখনীতে ধরা পড়ে। বার্টন লিখেছেন, "মিশর একটা রত্নভাণ্ডার যেটা ছিনিয়ে নিতেই হবে; বসফোরাসে ইস্তাম্বুলের পোতাশ্রয়ের চেয়েও বেশি লোভনীয়।"

আরেকজন খ্রিস্টান "হাজি" সম্বন্ধে আমরা জানি– বুর্কহার্ট (Burckhardt)। বুর্কহার্টও দুজন আছেন। একজন হলেন সুইস পরিব্রাজক জোহান লুডভিগ বুর্কহার্ট, যাঁর কথা বলছি। আফ্রিকাতে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল সেখানকার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য। ফেরার পথে সিরিয়ার আলেপ্পোতে দুবছর প্রাচ্যের ভাষা অধ্যয়ন করেন। ১৮১৪ সালে তিনি মক্কায় যান। সেখানে কেবল একজন প্রকৃত মুসলিমই নয়, একজন ইসলামি আলেমরূপেও পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু সাঈদের বই-তে জোহান লুডভিগ বুর্কহার্টের উল্লেখ নেই, উল্লেখ আছে অপর বুর্কহার্টের, ঐতিহাসিক জেকব বুর্কহার্টের। এই জেকব বুর্কহার্ট ইসলাম সম্বন্ধে অনেক বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করেছেন যেটা সাঈদের ক্ষোভের বিষয়। এডওয়ার্ড সাঈদ তীব্র সমালোচনা করেছেন দুই বিখ্যাত ফরাসি আরব বিশারদের– সিলভেস্টর দ্য সাসি (Sylvestre de Sacy) ও আর্নেস্ট রেনাঁ। (Earnest Renan)। সাসির কাজকে বলেছেন মূলত গ্রন্থনা। এবং তাঁর কাজের শেষ ফল, সাঈদের মতে, The orient became less important than what the orientalist made of it। আর আর্নেস্ট রেনাঁ? তাঁর তো ছিল notorious race prejudice against the very oriental semites whose study has made his professional name। তাহলে Orientalism বলে যে বিদ্যা এতাবৎকাল পরিচিতি ছিল তার স্বরূপটা কী দাঁড়াল? প্রথমত, তারা প্রাচ্যকে পরিচিত করবে প্রাচ্যের লোকের কাছে, তারপর প্রাচ্য সম্পর্কে কিছু সত্যাসত্য মিলিয়ে একটা জ্ঞানবৃক্ষ য়ুরোপে রোপণ করবে এবং সেই transplanted এবং hybridised (শব্দ দুটি সাঈদ ব্যবহার করেননি) বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে যাবে প্রাচ্যের ছাত্ররা এবং নিজের দেশ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ডক্টরেট বা জ্ঞানাচার্যের তকমা এঁটে দেশে ফিরে এসে ছাত্রদের জ্ঞানদান করবে। সাঈদের কথায়, Eurocentricity and racism has created a body of knowledge regarding the East that was not only false but the inverse of what the East held as its own superiority। ফ্রান্‌জ ফাননের *The Wretched of the Earth* বইটার ভূমিকায় জ্যাঁ পোল সার্ত্রে যা লিখেছেন তাও এখানে উদ্ধৃত করতে পারি ঃ "য়ুরোপীয় সেরাংশ (elite) একটা দেশীয় সেরাংশ তৈরির কাজে হাত দেয়। তারা প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের বেছে নেয়; পশ্চিমী সংস্কৃতির ছাপ স্থায়ীভাবে তাদের শরীরে এঁকে দেয়, তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে শরীরে দাগ কাটার মতো করে। তাদের মুখে ঠেসে দেয় গালভরা সব বুলি। শাসনকেন্দ্রে কিছু দিন রাখার পর তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠায়, একটা ধোপ দিয়ে। একটা চলমান মিথ্যা হয়ে যখন তারা ফেরত আসে, নিজেদের ভাইদেরকে আর তাদের কিছু বলার থাকে না, তারা শুধু প্রতিধ্বনি করে।" যেমন মিশর সম্বন্ধে বলছেন

www.pathagar.com

রবার্ট ক্যাফ (Kapf): প্রথম দিকে ওরিয়েন্টালিস্টরা প্রাচ্যের ব্যাখ্যাতা সাজে, মিশরকে পরিচিত করে মিশরবাসী পাঠকদের কাছে এবং দিনে-দিনে ওরিয়েন্টালিস্ট কল্প-কাহিনীর ভাণ্ডার এমন স্তরে পৌঁছেছে যে কল্প-কাহিনীই একটা প্রাচ্য সৃষ্টি করে ফেলেছে।

সাঈদ প্রাচ্যবাদের অর্থের আরো ব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন, শুধু একাডেমির মধ্যে এর ব্যঞ্জনা সীমিত রাখেননি। ভ্রমণ, বাণিজ্য ও যুদ্ধাভিযানেও এর প্রকাশ। তাঁর কাছে প্রাচ্যবাদ একটা রাজনৈতিক মতবাদ যা পাশ্চাত্য প্রাচ্যের ওপর বলপূর্বক আরোপ করছে, কারণ প্রাচ্য দুর্বল। আরেকভাবে বলতে গেলে, সাঈদের মতে এই বৃহত্তর অর্থের প্রাচ্যবাদ যেভাবে প্রাচ্যের বিবরণ দেয়, সমালোচনা করে এবং বিশেষায়িত করে সেটা এতখানি Eurocentric বা য়ুরোপকেন্দ্রিক যে প্রকৃত প্রাচ্যের প্রতিচ্ছবি এখানে সম্পূর্ণ দুমড়ানো এবং প্রাচ্যকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। এবং সাঈদ প্রাচ্যবাদকে দুভাবে ভাগ করেছেন। প্রকাশ্য ও গূঢ় (manifest and latent) প্রাচ্যবাদ। গূঢ় প্রাচ্যবাদ টেক্সচুয়াল এবং কল্পনাপ্রসূত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভিন্নতা সম্পর্কে অপরিবর্তনীয় ও ঐকান্তিক অনুচিন্তন। আর প্রকাশ্য প্রাচ্যবাদের উদ্ভব হয়েছে পাশ্চাত্যের ভৌগলিক ও স্থানিক বোধের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে সেটা থেকে। যার ফলে প্রাচ্যকে দেখা হচ্ছে একটা ভৌগলিক ক্ষেত্র হিসেবে যেটা কর্ষিত হবে, যেখানে ফসল তোলা যাবে এবং যেটার সংরক্ষণেরও দায়িত্ব এসে যাবে, যেটাকে অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে শাসন করতে হবে।

প্রাচ্য যখন একটা বাস্তব ভূখণ্ড, যখন এটা পাশ্চাত্যের চোখে একটা মূর্ত ভৌগলিক ও স্থানিক ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল, প্রকাশ্য ওরিয়েন্টালিজমের শুরু এখান থেকেই। যুগ-যুগ ধরে প্রাচ্যকে এভাবে বিচারের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যকে গিলে ফেলা কতখানি ন্যায়সঙ্গত, এটা ব্রিটিশ ও ফরাসিদের বিচার্য ছিল না, তাদের বিচার্য ছিল এই কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাদের অনুভূতি কী? গূঢ় প্রাচ্যবাদকে তিনি সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে : "একটি প্রায় অবচেতন (এবং অবশ্যই অ-স্পর্শযোগ্য) প্রতীতি যেটা প্রাচ্য সম্পর্কে ভাসা-ভাসা তবু অকাট্য ধারণা, বিশ্বাস, আপ্তবাক্য ও জ্ঞানের ধারক।" এই ধারণাগুলিকে নিয়ে আরো পরিশুদ্ধ করে প্রাচ্যকে বিশেষায়িত করার জন্য কিছু মৌল সূত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে- প্রাচ্যের কামুকতা, একনায়কত্বের প্রবণতা, বিকৃত মানসতা, সূক্ষ্ম চিন্তার অভাব, এর পশ্চাদপদতা। এই ভিনদেশীয়, উদ্ভট ও বিকৃত প্রাচ্যের ছবি উনবিংশ শতাব্দীর বড় লেখকরাও এঁকেছেন যখন তাঁরা পরিব্রাজক বা অভিযাত্রীর ভূমিকায় নেমেছেন। যেমন গুস্তাভ ফ্লোবেয়ার। ফ্লোবেয়ার এক মিশরীয় নর্তকীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাকেই প্রাচ্যের নারীর প্রতিনিধি মনে করে বসলেন। এই গূঢ় প্রাচ্যবাদ সম্পর্কে সাঈদের মতবাদ হল এটা একটা বর্ণবাদী, সাম্রাজ্যবাদী এবং জাতিতত্ত্বকেন্দ্রিক (ethnocentric) ভাবনা।

এডওয়ার্ড সাঈদ প্রাচ্যবাদের বিভিন্ন প্রয়োগ যাচাই করে বলেছেন এর অস্তিত্ব নির্ভর করছে সেই অবস্থার ওপর যখন অন্য একটি সংস্কৃতির চোখে পৃথিবীতে সাধারণভাবে এর গুরুত্বহীনতা প্রতিপন্ন হবে। তাঁর যুক্তির সমর্থনে সাঈদ উদ্ধৃতি দিয়েছেন রেনাঁ, সাসি, ফ্লোবেয়ার, নার্ভাল, এমন কি মার্কস থেকে। জেরার্দ দ্য নার্ভালের ভ্রমণ কাহিনীর (Trip to the Orient) সাঈদ এত গুরুত্ব কেন দিচ্ছেন বোঝা গেল না। নার্ভালের মুখ্য পরিচয় একজন ফরাসি রোমান্টিক কবিরূপে। তিনি ছিলেন ভিক্তর উগো ও থিওফিল গোতিয়ের এবং পরবর্তীকালে হাইনের বন্ধু। তিনি বাইজান্টিয়াম ও মিসর ভ্রমণ করেছিলেন ঠিক

www.pathagar.com

(১৮৪২) কিন্তু তখন তিনি প্রায়-উন্মাদ। মারা যান উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে। মহিলাদের এপ্রনের একটা ফিতা তাঁর হাতে এসে পড়ল। তাঁর বিকারগ্রস্ত কল্পনায় এটা তাঁর কাছে মনে হলো বাইবেলে বর্ণিত কুইন অফ শেবার কোমরবন্ধ। নিজেকে ঝোলাবার জন্যে এর চেয়ে মহত্তর রজ্জু আর কী হতে পারে। অতএব –

ফিরে আসি সাঈদের বক্তব্যে। তিনি বলছেন, Along with all the other peoples variously designated as backward, degenerate uncivilized and retarded, the orientals were viwed construed out of biological determinism... Orientals were rarely seen or looked at, they were seen through, analysed not as citizens or even people, but as problems to be solved.

ক্রুসেডের উল্লেখ থাকলেও এ-বিষয়ে যে গুরুত্ব দেয়া হয়নি আগেই বলেছি। কারণ, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সংঘাত সাঈদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। বিগত কয়েক শ বছরের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক অন্বেষায় এবং ভ্রমণ ও কারবারি লেনদেনে প্রাচ্যকে কেমন বিকৃতভাবে প্রতিপন্ন করা হচ্ছে, সেটাই এডয়ার্ড সাঈদের Orientalism। কিন্তু আগেই বলেছি, সাঈদের ওরিয়েন্টালিজমকে উপনিবেশিক জ্ঞানচর্চা বললে অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা হয়ে যায়। মিশেল ফুকোর দর্শনের উল্লেখ তিনি বারবার করেছেন। সেই কথায় আসি। আসলে সাঈদ প্রাচ্যের জাত্যভিমান বা পাশ্চাত্যের প্রতি বৈরিতা কোনোটাই প্রকাশ করছেন না। এবং ওরিয়েন্টালিজমকে উপনিবেশবাদের সমার্থকও বলছেন না। সাঈদ বলছেন-

রাজনীতি সাম্রাজ্যবাদের আকারে সাহিত্য, বিদ্যাচর্চা, সামাজিক ইতিহাস, সামাজিক তত্ত্ব এবং ইতিহাস-লিখনকে প্রভাবিত করেই থাকে। কিন্তু এ-কথা বলার এই অর্থ দাঁড়ায় না যে পরিণামে সংস্কৃতির অমর্যাদা হয়েছে বা সংস্কৃতি কোনোকিছুর অবমূল্যায়ন ঘটাচ্ছে। বরং তার উলটো। সাঈদ বলছেন, আমার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো যে সংস্কৃতির মতো সর্ববিস্তৃত ও আধিপত্যময় ব্যবস্থাগুলির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের বোধ আরো উন্নত হবে যখন আমরা উপলব্ধি করব যে এ-সব ব্যবস্থা লেখক এবং চিন্তাবিদদের মনে যে অন্তর্ভূত চাপ সৃষ্টি করে তা সুফলবাহী, ঐকান্তিকভাবে দমনকারী নয়। এইখানেই সাঈদ মিশেল ফুকোর কাছে ঋণী। এর আগেই সাঈদ মিশেল ফুকোর কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করে বলছেন, আমার বক্তব্য এই যে, যে-বিশাল ও সুস্থিত জ্ঞান-শৃঙ্খলা দ্বারা পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি প্রাচ্যকে Post – Enlightenment যুগে রাজনৈকিতভাবে, সমাজতাত্ত্বিকভাবে, সামরিকভাবে, মতাদর্শের দিক দিয়ে, বৈজ্ঞানিকভাবে এবং ভাবগতভাবে পরিচালনা, এমনকি উন্মোষিত করতে পেরেছে সেটা হয়তো বোঝা সম্ভব নয় যদি ওরিয়েন্টালিজমকে একটা 'ডিসকোর্স' বা প্রতর্ক রূপে ব্যবচ্ছেদ না করা হয়। স্পষ্টতই সাঈদ 'ডিসকোর্স' শব্দটা পোস্টমডার্ন অর্থে বা ফুকোর অর্থে ব্যবহার করেছেন যেখানে এর অর্থ সুসমন্বিত কতকগুলো বক্তব্য যা সত্য সম্বন্ধে একটা আত্মপ্রমাণনীল বিবরণ দেয় এবং বিষয়কে চিহ্নিত করার জন্য যে-সব ধারণা বিশ্লিষ্ট হবে, তারও জন্ম দেয়। যেমন মেডিক্যাল ডিসকোর্স, লিটেরারি ডিসকোর্স। তারপর তিনি বলেছেন, য়ুরোপীয় সংস্কৃতির শক্তি ও পরিচিতি বেড়েছে, প্রাচ্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে, যে প্রাচ্য তার অধোলোকের সত্তা। এইখানেই আবার এসে গেলাম The Other এর ধারণায় এবং এই The Other এর প্রশ্নেও এডওয়ার্ড সাঈদ সুদৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়ে যাচ্ছেন পোস্টমডার্ন চিন্তাধারার সঙ্গে। পোস্টমডার্নিজমের বহু সুর, কোনো ঐক্যতান নেই, কিন্তু একটা অভিন্ন উপাদান তাদের

www.pathagar.com

মধ্যে আছে - The Other বা অপর পক্ষের ধারণা। বাহ্যত যেটা সাংস্কৃতিক একক সত্তা তার অখণ্ডতাকে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে তারই একটা অংশকে বাদ দিতে হচ্ছে বা বহিরাগত বা The Other বা অপর হিসেবে দেখাতে হচ্ছে যে-অপর অবশ্যই নিকৃষ্ট। একটা শ্রেণীগত দ্বৈততা এখানে স্বীকৃতি পেয়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সর্বত্রই নাকি The Other-এর উপস্থিতি আছে। শেক্সপিয়রেও আমরা The Other -এর মুখোমুখি হচ্ছি। ওথেলো অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একটা চরিত্র এবং সকল নায়কোচিত গুণাবলির অধিকারী। তবু কোথায় যেন সে ওপর তলার ভেনেশিয়ান সংস্কৃতির সাথে বেমানান; এবং শেষ পর্যন্ত একটা ঘটনা সে ঘটিয়ে দিল। বাংলা সাহিত্যেও প্রচুর নজির আছে। দারোয়ান তো প্রায় সবক্ষেত্রেই ভোজপুরি। মালি হচ্ছে "ঝুটিবাঁধা উড়ে" আর বাঙালি ভদ্রলোক তার মনিব, এ-সব বিষয় রবীন্দ্রনাথে আমরা পাই। আর 'বল দেখি তুই মালী' ধরনের কথা 'সহজ পাঠ'-এ লিখে রবীন্দ্রনাথ শিশুদের মগজের মধ্যেই এই Otherness-কে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সঙ্গত কারণেই জ্যোতি বসু সরকার রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'- কে পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ দিয়েছে।

পোস্টমডার্নরা যে বর্ণবাদ-বিরোধী সেটা জন্মসূত্রেই। এই The Other-কে তারা আত্তীকৃত করে নিয়েছে। পোস্টমডার্ণরা Cultural Unity-এর বদলে Culturial Pluralism-কে গ্রহণ করেছে। Origin-এর দিকে তাকালেই বিপদ, তাই Phenomenon-এর দিকে তাকাও।

এই দিক দিয়ে মিশেল ফুকো সাংস্কৃতিক সমালোচনাকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছেন। ফুকো ছিলেন ফ্রান্সের ইকোল নর্মাল সুপিরিয়রে জাক দেরিদার শিক্ষক, কিন্তু দেরিদার ডিকনস্ট্রাকশন বা বিযোজনবাদের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল দ্বিধাপূর্ণ। ফুকো ইতিহাসবিদদের অ্যানালেস ধারা (Annales) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, যদিও তিনি নিজে এই গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন না। অ্যানালেস ধারারও সূচনা প্রধানত ফ্রান্সে। এই ধারার অনুসারীরা মনে করতেন ঐতিহাসিকদের মুখ্য বিষয় হওয়া উচিত সমাজ, দৈনন্দিন জীবনের কৃষ্টি এবং মানসতা। গত কয়েক দশকে ব্রিটেনের বাইরে যে ইতিহাসচর্চা সেখানে সামাজিক ইতিহাসের ওপর জোর বেশি। (দেখা যাচ্ছে যুগোপযোগী সব প্রগতিবাদী চিন্তাধারা থেকে ব্রিটেন ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে)। ফুকো সংস্কৃতিকে বিবেচনা করতে চেয়েছেন ক্ষমতা সংক্রান্ত সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে, কিন্তু সেই সম্পর্ক সব সময়েই সংঘাতের নয়। ফুকোর কাছে ক্ষমতা এমন কিছু নয় যা একটা প্রভূত্বকারী শ্রেণী আরেকটা অনুগত শ্রেণীর ওপর খাটাবে। তাঁর কাছে ক্ষমতা মানে নিষ্পেষণমূলক ক্ষমতা নয়, কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণীর অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নয়। ক্ষমতা বিভিন্ন শক্তির এক মিলিত ও জটিল প্রক্রিয়া। যা কিছু ঘটে তা এই জটিল প্রক্রিয়ার সৃষ্টি। ফুকো ১৯৮৪ সালে মারা যান ৫৮ বছর বয়সে। অকাল মৃত্যুই বলতে হবে। তিনি ছিলেন এইডস রোগের প্রথম দিকের ভিকটিম।

সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আমরা সব সময় দেখেছি সংঘাত ও সংঘর্ষ রক্ত ঝরিয়েছে, কিন্তু পরিণাম অনেক ক্ষেত্রেই সুফলবাহী হয়েছে। য়ুরোপে রেনেসাঁ হয়েছে তুর্কি ও আরবদের সঙ্গে য়ুরোপের ধাক্কা লেগে; বাংলায় রেনেসাঁ হয়েছে ইংরেজদের সঙ্গে ধাক্কা লেগে; প্রাচীন ভারতে বৈদিক সংস্কৃতির উন্মেষ হয়েছে আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের ধাক্কা লেগে। একাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে নর্মান বিজয় সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। মনে নেই কে বলেছিল Where swords clash, cultures meet। তাই আধিপত্যবাদের বদলে multiculturalism

www.pathagar.com

বা যৌগিক সংস্কৃতি মেনে নিলে এবং অরিজিনের পরিবর্তে ফেনোমেনন বা চলমান পরিস্থিতিকে স্থান দিলে সমস্যা থাকে না। ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে হুসেন শাহী আমলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হওয়ার ফলেই বাংলাতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা সংঘাতপূর্ণ হয়নি। কারণ, গৌরাঙ্গদেব কেবল যে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন তাই নয়, তিনি রাজশক্তির ওপর মানব সম্পর্ককে স্থান দিয়েছিলেন। গোপাল হালদারের 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা' থেকে উদ্ধৃত করছি : "বাঙলা সাহিত্যের চৈতন্যযুগ (খৃঃ ১৫০০-খৃঃ ১৭০০) অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব সাংস্কৃতিক বিকাশের যুগ– যদিও বৈষ্ণব প্রেরণা ছিল প্রতিরোধের প্রেরণা, সে প্রতিরোধ রাজনৈতিক নয়, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক।" তার একটু আগে গোপাল হালদার লিখছেন : "উপরতলার হিন্দু সমাজ ও উপরতলার মুসলিম সমাজও অনেকটা পরস্পরের সন্নিকটে হতে চলেছে। তার ফলে, পরাগল খাঁর মতো উচ্চবর্গের মুসলমানরাও যেমন রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির পাঁচালি গান শুনছিলেন, উচ্চবর্গের হিন্দুরাও তার চেয়ে বেশি ফারসি, আরবি প্রভৃতি পড়ে রাজদরবারের ম্লেচ্ছ- আচার কিছু না কিছু গ্রহণ করছিলেন।" সাহিত্যকে যেহেতু পোস্টমডার্নিস্টরা একটু জোলো করে দিয়েছেন তাঁদের পক্ষে এমন সৌভ্রাত্র, সামাজিক সুষমা ও মানবিক আদর্শে বিশ্বাস করা সাজে। আমরা মনে করি যুদ্ধ ও বিরোধ মানব-সভ্যতার মৌলিক উপাদান। দুজন ব্যক্তির মধ্যে একটিমাত্র সম্পর্ক সম্ভব; একজনের হাতে থাকতে হবে চাবুক, আরেকজনের হতে হবে রক্তাক্ত পিঠ। তবে সেই চাবুক যে চিরদিন একই শ্রেণী বা গোষ্ঠীর হাতে থাকবে এমন কোনো কথা নয়। এতদিন চাবুক ছিল পুরুষের হাতে, আজকে নারীর হাতেও আসতে পারে। একদিন চাবুক ছিল রোমের হাতে, রোম কার্থেজকে গ্রাস করল; রোমকে গ্রাস করল বারবেরিয়ানরা। সভ্যতা জাগল, তারপর বিদায় নিল। তুচ্ছ করি' রাজ্য ভাঙা গড়া, এই লীলা চিরন্তন। প্রকৃতির মধ্যেও কোনো সুষমা নেই। প্রকৃতির যে সৌন্দর্য সেটা রক্তারক্তির সৌন্দর্য। ব্যাঙ খাচ্ছে কীট, ব্যাঙকে খাচ্ছে সাপ, ঈগল খাচ্ছে সাপকে। তাই নৈরাশ্যবাদী আধুনিক জীবনানন্দ দাশই পেরেছিলেন পেঁচার ইঁদুর ধরা নিয়ে কবিতা লিখতে।

সাঈদ বিশ্বাস করেন, জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলো বিভিন্ন প্রচাপনে অপরিসর এবং এগুলির ওপর ক্রিয়া করে সমাজ, সামাজিক ঐতিহ্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং স্থিতিময় প্রভাবগুলি যেমন বিদ্যালয়, লাইব্রেরি, সরকার। লেখনী, তা পাণ্ডিত্যপূর্ণ হোক বা সৃজনশীল হোক, তার ভাবচিত্র, প্রমাণসিদ্ধতা এবং লক্ষ্য সীমিত হতে বাধ্য। ফলত 'ওরিয়েন্টালিজম' নামে যে 'বিজ্ঞান'কে আমরা একাডেমিক মর্যাদা দিচ্ছি তার বস্তুনিষ্ঠতা আমরা যতটা ধারণা করি ততটা নয়।

জ্ঞানীদের হাতে যখন প্রাচ্যবিদ্যার এই দশা তখন আজকের তথাকথিত তথ্যযুগে টেলিভিশনের দর্শকরা যারা চমকপ্রদ তথ্য ছাড়া কিছুই গ্রহণ করে না, তাদের পক্ষে প্রাচ্য সম্বন্ধে কতটা সঠিক প্রতীতি লাভ সম্ভব? কয়েক বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী একজন পাকিস্তানি অধ্যাপক মুসলিম মৌলবাদ সম্পর্কে ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটা জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পড়েছিলেন। পরে তাঁকে প্রশ্ন করা হলো পাশ্চাত্যের টেলিভিশন দেখে তো মনে হয় প্রত্যেক মুসলিম সন্ত্রাসী এবং ভারতে শুধু ইঁদুরের পূজা হয়। এটা কি সত্যি? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, সাধারণ মুসলিমের সাথে মৌলবাদ ও সন্ত্রাসের সম্পর্ক দূরতম এবং ভারত একটি বৈজ্ঞানিক ও প্রযৌক্তিক পরাশক্তি। কিন্তু টেলিভিশনে সে-সব তথ্যই

www.pathagar.com

পরিবেশিত হয় যেটা সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর এবং প্রচলিত সংস্কার ও লোকবিশ্বাসকে আরো দৃঢ়মূল করতে পারে। তাই Orientalism -এর কতটা সংস্করণ ও কত কপি বিক্রি হয়েছে সেটা বড় কথা নয়, এটা পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যের প্রক্ষেপণে খুব বেশি সফল হবে বলে আমি মনি করি না।

বইটাতে যে সব তথ্যসূত্র আছে, বলাই বাহুল্য তা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এমন অনেক লেখক ও গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা আছে যার নামের সাথেও আমরা পরিচিত নই। এডওয়ার্ড সাঈদের বইয়ের যে বিশাল গ্রন্থতালিকা সংযোজনী তার একটা অংশ অণুসরণ করলেও জ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃতি লাভ করবে। কিন্তু এমন কোনো লাইব্রেরি আমাদের নেই। আর লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের কার্ড নম্বর টিপে বা ISBN নম্বর টিপে কম্পিউটারের স্ক্রিনে যে কোনো বই পড়া যাবে, এমন প্রযুক্তি ইন্টারনেট থেকে এখন বহুদূরে। আসলে প্রযুক্তি বহুদূরে নয়, কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার- Intellectual Properties Right। জ্ঞানের নগ্ন বাণিজ্যকরণ। ভারতীয়দের আবিস্কৃত শূন্য রাশি ব্যবহারের সময়, চীনের আবিস্কৃত চাকা ব্যবহারের সময়, মিসরের বর্ষপঞ্জি ও ইরাকের প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান কাজে লাগাবার সময় ইনটেলেকচুয়্যাল প্রপার্টিজ রাইটসের কথা মনে থাকে না। ইন্টারনেটের কাছে তথ্য চাইলে খুব প্রাথমিক তথ্যই পাওয়া যায়, অর্থাৎ একটা বইয়ের ফ্ল্যাপে যেটুকু থাকে, সেটুকুই। এর বেশি জানতে চাইলে কড়ি ফেলো।

এই প্রবন্ধ যখন লেখা হয়েছিল (১৯৯৮), তখন নীরদ চৌধুরী জীবিত ছিলেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের বই সম্পর্কে

www.pathagar.com

একটু দূরে থাকুন, একটু নির্জনে

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

আমাকে একটা খেলনা করে নিয়ে যাও,
বাড়ির একখণ্ড ইটের মতো সঙ্গে নাও আমাকে/
যাতে আমাদের সন্ততিরা মনে রাখে যে তাদের ফিরে আসতে হবে।

– প্যালেস্তাইনি কবি মাহমুদ দরবেশ-এর দুটি পঙ্ক্তি। তাঁর একটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন এডওয়ার্ড সাঈদ। উদ্ধৃত করেছেন *Reflections on Exile* প্রবন্ধে। ১৯৮৪ সালে লেখা প্রবন্ধটির বিষয়: স্বভূমি থেকে নির্বাসিত মানুষের মন। Exile শব্দটির যন্ত্রণা 'নির্বাসিত' ছাড়া আর কোন শব্দে ধরা যায়?

এডওয়ার্ড সাঈদ স্বনামধন্য। তাঁর *Orientalism* গোটা দুনিয়াকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ইতিহাস ও বর্তমানকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শিখিয়েছে। সাঈদের সুদীর্ঘ এবং সমৃদ্ধ গ্রন্থতালিকা উল্লেখ করার কোনও প্রয়োজন নেই। এখানে তাঁর যে বইটি আলোচ্য, সেটি একটি সঙ্কলন। গত পঁয়ত্রিশ বছরে লেখা ছেচল্লিশটি প্রবন্ধ দুই মলাটের মধ্যে। শিরোনাম: *Reflections on Exile and other literary and cultural essays.* প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত, কেবল সঙ্কলনের শেষ লেখাটি (The Clash of Definitions) এই গ্রন্থেই প্রথম প্রকাশিত হল। প্রায় অর্ধশত প্রবন্ধ নিয়ে একটি লেখায় আলোচনার প্রশ্ন ওঠে না, বিশেষত সেই প্রবন্ধাবলির বিষয়বৈচিত্র এবং আলোচনার গভীরতা, দুইই যখন অলোকসামান্য। এই সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বিষয়ের নমুনা: সাহিত্যিক জোসেফ কনরাড (কনরাডই সাঈদের আদি গবেষণার বিষয়), টি ই লরেন্স, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, ভি এস নইপল; সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপমান; বাখ, শ্যুমান, শপ্যাঁ এবং রসেনের সঙ্গীতসৃষ্টি (সাঈদ কেবল পশ্চিমী ধ্রুপদী সঙ্গীতের বিশিষ্ট বোদ্ধা নন, তিনি নিজে উচ্চমানের পিয়ানোবাদক); দার্শনিক মিশেল ফুকো; ঐতিহাসিক এরিক হবসবম। অন্য এক ধরনের লেখার তালিকায় আছে জ্ঞানের রাজনীতি, সত্তা এবং স্বাধীনতা, সমালোচনার ভবিষ্যৎ। কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া তথা মিশরের সমাজ নিয়ে দুটি অন্য স্বাদের লেখা আছে, স্মৃতিকথা এবং ভ্রমণকাহিনীর ছকে। তালিকা বাড়াব না, শুধু আর একটি লেখার উল্লেখ করব। সেটির শিরোনাম Jungle Calling. শুনলেই জন ক্লেইটন, লর্ড গ্রেস্টোক-এর কথা মনে পড়ে যায়? যাঁর চেনা নাম– টার্জান? কোনও ভুল নেই, এই প্রবন্ধটির বিষয় টার্জান। জনি ওয়েসমুলার অভিনীত টার্জান। পশ্চিম দুনিয়ার সাংস্কৃতিক চেতনা এবং সেই চেতনায় তৃতীয় বিশ্বের অবস্থান

www.pathagar.com

সম্পর্কে এডওয়ার্ড সাঈদের মৌলিক চিন্তার এক আশ্চর্য পরিচয় এই প্রবন্ধ। তার চেয়ে আশ্চর্য তাঁর বিষয় নির্বাচন। এ আলোচনাটি নিয়েই একটা আলাদা দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা যায়।

আপাতত আমরা এই প্রবন্ধ সংকলনের একটি বিশেষ অঞ্চলে মনোনিবেশ করব। অনেক বিষয়কে একটু একটু করে না দেখে একটি বিষয়কে একটু ভালভাবে বোঝার চেষ্টা আর কী। সেই বিষয়টি, এক কথায় বললে, নির্বাসন।

এডওয়ার্ড সাঈদের জন্ম ১৯৩৫ সালে, জেরুজালেমে। তাঁর যখন তেরো বছর বয়স, আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিচিত্র লীলায় ভূমিষ্ঠ হল এক নতুন রাষ্ট্র। তার নাম ইজরায়েল। স্বভূমি থেকে উৎখাত হলেন প্যালেস্তাইনের অগণিতমানুষ। উৎখাত হলেন, কারণ অন্য এক দল মানুষ তাঁদের 'স্বভূমি' ফিরে পেতে চান। সেই অন্য দলের পূর্বপুরুষরা কোনও এক সুদূর অতীতে ওই ভূখণ্ড থেকে উৎখাত হয়েছিলেন। বহু শতাব্দীর উজান বেয়ে এ বার, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উত্তরলগ্নে, সেই বিতাড়িত ইহুদি সমাজের উত্তরসূরিরা স্বভূমি পুনর্দখল করলেন। আর তার ফলে বিতাড়িত হলেন প্যালেস্তাইনের মানুষ। এ এক অ-তুলনীয় ঘটনা, সাঈদের ভাষায়, To have been exiled by exiles – নির্বাসিতদের তাড়নায় নির্বাসিত হওয়া।

অন্য অনেক স্বজনের সঙ্গে নির্বাসিত হলেন এডওয়ার্ড সাঈদের পরিবারও। নতুন ঠিকানাঃ কায়রো। স্কুল জীবন শেষ করে কলেজে উত্তরণ। অল্প দিন পরেই ষোলো বছরের তরুণ স্থানান্তরিত হলেন। আবার। এ বার নতুন পৃথিবী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেই থেকে সাঈদের বসতি আমেরিকাতেই। ১৯৬৩ থেকে তিনি নিউইয়র্কের বাসিন্দা। ১৯৬৬ থেকে নিরবচ্ছিন্ন পঁয়ত্রিশ বছর ধরে অধ্যাপনা করে চলেছেন নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিষয়ঃ তুলনামূলক সাহিত্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রতিষ্ঠানটি সাঈদের কাছে অনন্য, তার নাম বিশ্ববিদ্যালয়। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তচিন্তার পরিবেশ তাঁর মতে এক নির্বিকল্প সম্পদ, ছাত্র ও শিক্ষকের 'শেষ কল্পস্বর্গ'– the last remaining utopia. এডওয়ার্ড সাঈদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনচেতা, উদার, সাহসী সত্তার গর্বিত শরিক, ঠিক যেমন তার রাষ্ট্রীয় অনাচারের কঠোর সমালোচক।

এবং সেই আলোকিত সত্তারই প্রতীক তাঁর ঠিকানা—শহর, নিউইয়র্ক। এই শহর "অস্থির, উত্তাল, অবিরত বৈচিত্রময়, স্বপ্রাণ, স্থিতাবস্থায় আঘাত-করা, প্রতিরোধে প্রস্তুত এবং সর্বগ্রাহী– একশো বছর আগে প্যারিস যা ছিল, আজ নিউইয়র্ক তা-ই, এই সময়ের রাজধানী।" সাঈদ অবশ্য কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে, নিউইয়র্কের চরিত্রে বয়সের ছাপ পড়েছে, প্রভাব পড়েছে ক্ষমতার, বাণিজ্য এবং বিত্তের আন্তর্জাতিক রাজধানী তার নিজস্ব বিদ্রোহী এবং পরিবর্তনকামী স্বভাব অনেকখানি হারিয়েছে। কিন্তু তার পরেও, নিউইয়র্ক – নিউইয়র্ক। তাঁর জীবনে ও চিন্তায় এই মহানগরের ভূমিকা বিরাট। "....প্যালেস্তাইনি মানুষের রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে উত্থান এবং সেই আন্দোলনে আমার যোগদানের ফলেই আমার পক্ষে সে দিন বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছিল এবং নিউইয়র্কই সেটা সম্ভব করে তুলেছিল... ।"

প্যালেস্তাইন এডওয়ার্ড সাঈদের তীব্রতম যন্ত্রণার নাম, হৃদয়ে রক্তক্ষরণের অমোঘ উৎস। সেই ষাটের দশক থেকে এডওয়ার্ড সাঈদ প্যালেস্তাইনের মুক্তিযুদ্ধের শরিক, কেবল চিন্তায়

www.pathagar.com

ও বাক্যে নয়, আন্দোলনেও। সে জন্য এক সময় তিনি এবং তাঁর পরিবার বিস্তর গালিগালাজ এবং আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছেন, এমনকী হত্যার হুমকিও শুনতে হয়েছে তাঁকে। সাম্প্রতিককালে শারীরিক অসুস্থতার কারণে আন্দোলনের মঞ্চ থেকে সরে আসতে হয়েছে, কিন্তু প্যালেস্তাইন প্রশ্নে তাঁর লেখনী আজও সজাগ, সচল। এবং প্যালেস্তাইন থেকে নির্বাসন তাঁর কাছে একটি বিচ্ছিন্ন বেদনা মাত্র নয়; তাঁর চেতনায়, বিশ্ববীক্ষায় ও চিন্তার তাত্ত্বিক কাঠামোয় নির্বাসন এক ধ্রুবপদের মতো। ১৯৮৪ সালে লেখা প্রবন্ধটিতে তার নানা নজির।

একটি অসামান্য কাহিনী শুনিয়েছেন সাঈদ এই প্রবন্ধে। তখন তিনি বেইরুটে। পাকিস্তানে সে সময় জেনারেল জিয়াউল হকের সামরিক শাসন, সেই শাসনের নির্দেশে নির্বাসিত হয়েছেন প্রসিদ্ধ পাকিস্তানি কবি– সাঈদ বলেছেন 'সমকালীন উর্দু কবিদের মধ্যে মহত্তম'– ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ, তিনিও বেইরুটে স্থিত হয়েছেন। সেই প্রবাসে স্বভাবতই প্যালেস্তাইনিরা তাঁর সব চেয়ে কাছের মানুষ। কিন্তু মনের মিল থাকলেও নানা ব্যাপারে দূরত্ব আছেই– ভাষায়, জীবন-ইতিহাসে, কাব্যরীতিতে। সাঈদ কবিকে দেখেন, তাঁর সঙ্গে সময় কাটান এবং বুঝতে পারেন, এই দূরত্ববোধ তাঁকে সর্বদা অতৃপ্ত রাখে। এক দিন ফয়েজের এক স্বদেশি বন্ধু এলেন বেইরুটে, কবি ইকবাল আহমেদ, তিনিও নির্বাসিত। দু'জনে দেখা হল বেইরুটের এক অতি সাধারণ রেস্তোরাঁয়, তাঁরা মুখোমুখি, সাঈদও আছেন সেখানে। ফয়েজ তাঁর কবিতা পড়তে শুরু করলেন। তারপর ইকবাল আহমেদও। তাঁরা কবিতা পড়েন এবং সাঈদের জন্য সেই কবিতা অনুবাদ করে দেন। "এক সময় তাঁরা অনুবাদ করা বন্ধ করে দিলেন, কিন্তু রাত্রি যত গভীর হতে লাগল, আমি দেখলাম তাঁরা বুঝিয়ে না দিলেও কোনও ক্ষতি নেই। আমি যা দেখছি সে দৃশ্য অনুবাদের অপেক্ষা রাখে না: সে এক ঘরে ফেরার দৃশ্য, যেন এক তীব্র প্রতিবাদ– সমস্ত বঞ্চনাকে নস্যাৎ করে ঘোষণা করা: ওহে জিয়া, আমরা এখানে।"

এক দিকে নির্বাসিতের যন্ত্রণা, অন্য দিকে তার দৃপ্ত প্রতিবাদ– এই দ্বন্দ্বেই নিহিত আছে, সাঈদের মতে, নির্বাসনের গভীর তাৎপর্য। নির্বাসন মানুষকে কেবল তার স্বভূমি থেকে বিতাড়িত করে না, তার সত্তাকে অস্বীকার করতে চায়, সে অস্বীকৃতি চরম অমর্যাদার। সাঈদ মনে করিয়ে দিয়েছেন অগণিত উদ্বাস্তু কৃষক-শ্রমজীবীর কথা, যাঁরা কোনও দিন স্বদেশে ফিরতে পারবেন না বা ফেরার আশা হারিয়েছেন, যাঁরা পরভূমিতে পরিচয়হীন, শিকড়হীন, কেউ শরণার্থী শিবিরের একটি নম্বর মাত্র, কেউ তা-ও নয়।

কিন্তু ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের মতো মানুষ সেই অসম্মানের মধ্যে থেকেই মর্যাদা আহরণ করেন, নিজস্ব সত্তাকে জাগ্রত রাখেন সহস্র প্রতিকূলতাতেও। আর তাই নির্বাসিত কবি, শিল্পী, বিজ্ঞানী, চিন্তাশীল মানুষের অবদানে ক্রমাগত সমৃদ্ধ হয়েছে দুনিয়ার সংস্কৃতি ও সভ্যতা। সাঈদ লিখেছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাজগতে, বিদ্যাজীবী সমাজে, নান্দনিক ভুবনে আজ চিন্তা ও চেতনা যেখানে পৌঁছেছে সেটা সম্ভব হয়েছে শরণার্থীদের জন্যই, যে শরণার্থীরা ফ্যাসিবাদ, কমিউনিজম এবং অন্যান্য অসহিষ্ণু শাসন থেকে বিতাড়িত হয়ে এ দেশে এসেছেন।" (Intellectual শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ নিয়ে অশান্তির শেষ নেই। জনারণ্যে 'বুদ্ধিজীবী' চলে গেছে বটে, কিন্তু অর্থ বিচারে সেটি মোটেই সন্তোষজনক নয়। সম্প্রতি অসীম চট্টোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে *(বাঙালি কি স্বভাবত*

www.pathagar.com

বামপন্থী, দেশ, ৪ জানুয়ারি, ২০০২) 'বিদ্যাজীবী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি হয়তো ঠিক Intellectual অর্থে এই শব্দ প্রয়োগ করেননি। কিন্তু শব্দটি বেশ মনে ধরল, তাই এ বার থেকে বুদ্ধিজীবীর বদলে বিদ্যাজীবী লিখব বলে সাব্যস্ত করলাম। জানি না, কোনও দিন হয়তো আরও ভাল প্রতিশব্দ মিলবে।)

এই আলোচনার সূত্র ধরেই পৌঁছে যাওয়া যায় সাঈদের চিন্তা কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে, তাঁর মৌলিক জীবনদর্শনে। কী সেই দর্শনের মূল কথা? তাঁর ভাষায়: Seeing 'the entire world as a foreign land' makes possible originality of vision. কেন? তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, "অধিকাংশ মানুষ প্রধানত একটি সংস্কৃতি, একটি পরিপ্রেক্ষিত, একটি বাসভূমিতে অভ্যস্ত; নির্বাসিতরা অন্তত দু'টির সম্বন্ধে সচেতন, এবং দৃষ্টির এই বহুত্ব একই সঙ্গে কোনও বিষয়ের একাধিক মাত্রাসম্বন্ধে চেতনা জাগ্রত করে, যে চেতনাকে সঙ্গীতশাস্ত্রের ভাষা ধার করে বলা যায়– বহুস্বর।" নির্বাসন মানুষকে একই সঙ্গে নানা স্বর, নানা মাত্রা সম্বন্ধে সচেতন করে, সচেতন রাখে। এই 'নির্বাসন-দর্শন'ই এডওয়ার্ড সাঈদের জীবনদর্শন, কেবল প্রচলিত অর্থে নয়, গভীরতর এক অর্থেও, কারণ এই বোধ তিনি নিজের জীবন থেকে, নিজের নির্বাসিত অস্তিত্ব থেকে অর্জন করেছেন, আবার তাকে জীবনের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিয়েছেন। তিনিই অনায়াসে তীব্রতায় উচ্চারণ করতে পারেন: Exile is never the state of being satisfied, placid or secure.

সংকলনের অনেক লেখাতেই এই দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে নানাভাবে, নানা পরিপ্রেক্ষিতে। একটি দৃষ্টান্ত: On Deflance and Taking Positions. ১৯৯৬ সালে লেখা এই প্রবন্ধে সাঈদ একজন শিক্ষাব্রতীর সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমেই যে কথাটি তিনি বলে নিয়েছেন সেটা প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল। এই শিক্ষকের নিঃসংশয় বিশ্বাস: শিক্ষকের প্রথম ও প্রধান ভূমিকা তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রটিতে, অর্থাৎ 'আমার ছাত্ররাই আমার প্রধান লক্ষ্য', বাইরের কোনও কাজ বা দায়িত্ব, তা সে যত মহৎ হোক, যত জরুরি হোক, ছাত্রদের প্রতি দায়বদ্ধতার বিকল্প হতে পারে না। শুধু তা-ই নয়, নিজের বিষয়ের শৃঙ্খলার প্রতি (the rigors of the discipline) ষোলো আনা দায়বদ্ধতাই শিক্ষক বা গবেষকের কাছে প্রাথমিক দাবি, কোনও যুক্তিতেই তিনি এই বিশৃঙ্খলার প্রশ্নে আপস করতে পারেন না।

এই শর্ত পূরণ করা সহজ নয়। যাঁরা শিক্ষক বা গবেষক হিসাবে যথেষ্ট উচ্চমানের নন, তাঁদের কথা ধর্তব্য নয়, কিন্তু যাঁরা আপন বিষয়ে প্রথম সারির পণ্ডিত তাঁরাও অনেক সময়েই নানা কারণে সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে বিষয়শৃঙ্খলার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত থাকতে পারেন না, দলীয় বা গোষ্ঠীগত রাজনীতির মন রাখতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ তাঁর শাস্ত্রের শৃঙ্খলা অমান্য করে শিথিল মন্তব্য করে বসেন, ইতিহাসবিদ এমনভাবে কিছু সত্য উদঘাটন করেন এবং কিছু অনুল্লিখিত রাখেন যা তিনি আপন ইতিহাস চর্চার শৃঙ্খলা মানলে করতে পারতেন না। এবং আমাদের দেশে অনেক সময়েই এই শৃঙ্খলাহীনতাকে ক্রটি বলে গণ্য করা হয় না, বরং প্রশংসা করা হয়, বলা হয়– 'উনি শুকনো পণ্ডিত নন, ওঁর হৃদয় ঠিক জায়গায় আছে, সে হৃদয় গরিবের জন্য কাঁদে।' গরিবের জন্য হৃদয় কাঁদলে সেটা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়,কিন্তু সে জন্য তত্ত্ব এবং যুক্তির শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা চলে না, হৃদয় কখনও মস্তিষ্কের বিকল্প হতে পারে না। এডওয়ার্ড সাঈদ যথাযর্থ হৃদয়বান

www.pathagar.com

বলেই বিষয়ের শৃঙ্খলাকে ষোলো আন মান্য করেন, করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে অমর্ত্য সেনের কথা, যাঁর হৃদয় কখনও যুক্তির পথ আটকে দাঁড়ায় না, অথচ তাঁর চিন্তায় চেতনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কিন্তু শৃঙ্খলা যেন শৃঙ্খলে পরিণত না হয়। শিক্ষক ও গবেষকের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক গুণ হল বিচারবোধ– critical awareness. বিদ্যাচর্চার অত্যধিক বিশেষীকরণের ফলে শিক্ষক ও গবেষকরা ক্রমশই তাঁদের বিষয়ের মূলস্রোতে নির্বিচারে শামিল হয়ে পড়ছেন, ভাষায় ও চেতনায় তাঁরা হয়ে পড়ছেন বাঁধা গতের সাধক। শৃঙ্খলা শৃঙ্খলের রূপ নিচ্ছে। সাঈদ এই প্রসঙ্গেই বলেছেন- সাবধান! প্রশ্ন এবং সংশয়ের কোনও বিকল্প নেই। এই সংশয়ের শিক্ষাই শিক্ষকের কাছে ছাত্রের সবচেয়ে জরুরি প্রাপ্য। সংশয়ের শিক্ষক প্রসঙ্গে যাঁর কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে তিনি অবশ্যই বার্ট্রান্ড রাসেল। কিন্তু তাঁর সংশয়বাদ বহু-আলোচিত, আমরা তার পুনরাবৃত্তিতে যাব না। আমরা বরং স্মরণ করব এক বাঙালি শিক্ষককে। অর্থনীতির সেই অসামান্য শিক্ষক, বিনয় কুমর সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯) তাঁর ছাত্রদের বলতেন– আমার উচ্চারিত প্রত্যেকটি বাক্য যখন তোমরা নস্যাৎ করে দেবে তখন জানব আমার শিক্ষকতা সার্থক হয়েছে। এডওয়ার্ড সাঈদও এই সার্থকতার সাধক। এবং এই মৌলিক সংশয়বাদ তাঁর জীবনদর্শনের অঙ্গীভূত, যে জীবনদর্শন উঠে এসেছে নির্বাসিতের উপলব্ধি থেকে। আর এক বার স্মরণ করুন তাঁর ওই উক্তিটি: Exile is never the state of being satisfied, placid or secure. 'পরিতৃপ্ত,, অচঞ্চল অথবা নিশ্চিত' থাকা নির্বাসিতের পক্ষে সম্ভব নয়, যথার্থ শিক্ষাব্রতীর পক্ষেও সম্ভব নয়।

আর শিক্ষক/গবেষক যখন নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা বিদ্যাচর্চার অন্দরমহল থেকে বৃহত্তর সমাজের মঞ্চে এসে দাঁড়ান? শিক্ষাব্রতী যখন বিদ্যাজীবীর বৃহত্তর এবং সামাজিক ভূমিকায়? সেই ভূমিকাও তো সাঈদের মতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেবল সমাজের পক্ষে নয়, শিক্ষাব্রতীর নিজের পক্ষেও গুরুত্বপূর্ণ। সাঈদ স্বয়ং সেই ভূমিকা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছেন, আপন বিদ্যাচর্চাকে এতটুকু লঘু না করে, আপন বিষয়শৃঙ্খলার প্রশ্নে এতটুকু আপস না করে তিনি একজন বিদ্যাজীবী হিসেবে নিজের সামাজিক দায়িত্ব পালন করে চলেছেন, কেবল প্যালেস্তাইনের মুক্তিযুদ্ধের শরিক হয়ে নয়, সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতির সমকালীন ঘটনাবলির বিচার বিশ্লেষণে সক্রিয় থেকেও। গত ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাস-হানা এবং তার পরবর্তী ঘটনাচক্রেও তাঁর সেই ভূমিকা উজ্জ্বল।

শিক্ষাব্রতীর সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সাঈদ বলেন, এ যুগে বিদ্যাজীবীকে এক ধরনের জন-স্মৃতির ভূমিকা পালন করতে হবে (to function as a kind of public memory)। সমাজের মানুষ যা ভুলে যায় বা যাকে নগণ্য মনে করে, তিনি সেগুলিকেই মনে করিয়ে দেবেন। সমাজের মানুষ যে সব ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে, তিনি সেগুলির মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে দেবেন, তাদের একটি বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে রেখে নতুন আলো ফেলবেন, বৃক্ষদর্শন থেকে মানুষকে পৌঁছে দেবেন অরণ্যদর্শনে। এ কালে এই ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সাধারণ নাগরিক প্রতিনিয়ত চতুর্দিক থেকে অগণিত সংবাদ আর তার রকমারি ব্যাখ্যার সম্মুখীন হচ্ছে, সকালের খবরের কাগজ থেকে রাত্রির টেলিভিশন– পাঠক-দর্শকের মগজ লক্ষ করে অজস্র তত্ত্ব আর

www.pathagar.com

তথ্যের ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ চলছেই। এই গোলকধাঁধায় পথ দেখানোর দায়িত্ব পালন করতে হবে যথার্থ বিদ্যাজীবীকেই।

এবং এই দায়িত্ব সৎভাবে পালন করতে চাইলে একটি বিষয়ে সচেতন থাকা চাই। সমাজে যাঁরা ক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত, তাঁদের সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। তা না হলে বিদ্যাজীবীর চিন্তার স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। এই সতর্কতাও অনেকাংশে এ যুগের নিজস্ব প্রয়োজনে জরুরি। সাঈদ লিখছেন, সামাজিক নীতি বা বিদেশ নীতি সম্বন্ধে যে বিতর্ক এখন শোনা যায় তার কাঠামো এবং আলোচ্য বিষয় অনেকটাই স্থির করে দেন রাষ্ট্রনীতির পরিচালকরা। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যখন ভিন্ন মতের সওয়াল-জবাব চলছে তখনও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব কাজ করে, কারণ কী নিয়ে তর্ক হবে, কোন পরিপ্রেক্ষিতে তর্ক হবে, তর্কটাকে কোন অবধি নিয়ে যাওয়া হবে, কোন প্রশ্ন তোলা যাবে, কোথায় থামতে হবে– নানা ব্যাপারেই কতকগুলো নিয়ন্ত্রণ কাজ করছে, দৃশ্যত ধুন্ধুমার বিতর্কও সেই লক্ষ্মণরেখা ছাড়ায় না।

এই সত্যটাই আমরা এখন ক্রমাগত দেখতে পাই টেলিভিশনের পর্দায় হাজার রকমের বিতর্কসভায়। যেমন গত ১১ সেপ্টেম্বরের পরবর্তী দিনগুলিতে। সন্ত্রাসবাদ, সন্ত্রাস দমন, ব্যক্তিস্বাধীনতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি প্রশ্নে লক্ষ লক্ষ শব্দের লড়াই শুনেছি, কিন্তু কিছু মৌলিক প্রশ্ন এই সব বিতর্কের আসরে খুব কমই শোনা গেছে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসের জবাবে সন্ত্রাসের আশ্রয় নিচ্ছে কি না, সেই নিতান্ত প্রাথমিক প্রশ্নটিও দেশবিদেশের টেলিভিশনশোভন অভিমানী পণ্ডিতরা সচরাচর তোলেননি, সে জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে নোয়াম চমস্কি বা এডওয়ার্ড সাঈদের মতো ব্যতিক্রমী কণ্ঠস্বরের জন্য। ঠিক একইভাবে ১৩ ডিসেম্বর ভারতীয় সংসদ ভবনে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের পরে অনেক কথা চালাচালি হয়েছে, কিন্তু এই গোড়ার কথাটি বিশেষ কেউ বলেননি যে– সশস্ত্র এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসম্পন্ন সেনাবাহিনী যদি কাশ্মীরে সাধারণ মানুষের ওপর হামলা চালায়, সেটাই বা সন্ত্রাস বলে গণ্য হবে না কেন এবং সংসদ আক্রমণের চেয়ে সেটা কেন কম ঘৃণ্য ও ভয়ঙ্কর বলে বিবেচিত হবে? দিনের পর দিন বিশেষজ্ঞের পর বিশেষজ্ঞ দৈনন্দিন ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করেন, এই প্রশ্ন কেউ তোলেন না। হ্যাঁ, সেনাবাহিনীর অত্যাচার তথা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সমালোচনা শোনা যায় ঠিকই, কিন্তু সেটা করা হয় স্বতন্ত্রভাবে, জাতীয় নিরাপত্তা বা সন্ত্রাস দমনে রাষ্ট্রনীতির বৃহৎ আলোচনায় তার স্থান হয় না। মানবাধিকারের প্রশ্নগুলিকে ক্রমশই আমরা একটা কোণে সরিয়ে দিচ্ছি। কোনও কোনও সহনাগরিককে অপরিসীম অবজ্ঞায় 'মানবাধিকারওয়ালা' শব্দটি উচ্চারণ করতে শুনেছি। (নিজের অধিকার রক্ষায় অবশ্য তাঁরা অতিমাত্রায় সচেতন।) স্বাধীনতা,অধিকার ইত্যাদি প্রশ্নে বিদ্যাজীবীদের কণ্ঠস্বর উত্তরোত্তর রাষ্ট্রের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি হয়ে উঠছে। এই কারণেই বিদ্যাজীবীর প্রতি এডওয়ার্ড সাঈদের সুপারিশ: একটু দূরে থাকুন, নির্জনে থাকুন। 'It strikes me as difficult but necessary to try to be somewhat marginal, rather than to be right in the middle of some office making policy'. এই বাক্যে একটি শব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ– marginal, অর্থাৎ প্রান্তিক। এই প্রান্তিকতাই নির্বাসিতের স্বভাবধর্ম। নির্বাসিত মানুষ সব সময়, অনিবার্যভাবে একটা প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে, মূল স্রোতে মিশতে পারে না। মূলস্রোতে হারিয়েও যায় না। এই প্রান্তিকতাই বিদ্যাজীবীর

www.pathagar.com

কাম্য। তাঁর পক্ষে একটু তফাতে থাকা শ্রেয়, তাতে নিজের অবস্থানটিকে নিজের রাখা সহজ হয়। নির্বাসিত মানুষ 'গোটা পৃথিবীটাকে বিদেশ' বলে গণ্য করে, তার ফলে সেই মানুষের দৃষ্টিতে একটা মৌলিকতা থাকে। আর মৌলিক দৃষ্টিই তো যথার্থ বিদ্যাজীবীর চরিত্রলক্ষণ।

লক্ষণীয়, সাঈদ খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ডান বা বাম– সব ধরনের বিদ্যাজীবীর পক্ষেই এই নির্জনতা জরুরি। পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই কথাটি কত বড় সত্য তা আমরা জানি। বামপন্থী গোঁড়ামি কীভাবে বামপন্থী মুক্তচিন্তাকে বিনাশ করতে পারে, গণনাট্যের ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। আবার, ক্ষমতাসীন বামপন্থী কীভাবে বিগত দিনের স্বাধীনচেতা বিদ্যাজীবীদেরও পোষ মানিয়ে ফেলে, নিতান্তই অপদার্থ চাটুকারদের পাশাপাশি প্রকৃত পণ্ডিত বা প্রতিভাবান মানুষও কীভাবে ক্ষমতার অলিন্দে টুল পেতে বসে থাকতে পারে, পশ্চিমবঙ্গে গত সিকি শতাব্দীতে তার নানা নজির দেখেছি। দেখেছি, এক দিন যাঁরা প্রান্তের কাছাকাছি ছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁদের অনেকেই ক্ষমতার কেন্দ্রের উষ্ণ সান্নিধ্যে সমাগত। বাঁ দিক ও ডান দিক, দু'দিক থেকেই মঞ্চের মাঝখানে আসার এই অভিযান চলছে এবং, নির্ঘাত, চলবেও। এই প্রসাদপ্রার্থী বিদ্যাজীবীদের উদ্দেশ্যে সাঈদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে করে: একটু নির্জনে থাকুন। এই নির্জনতা আসলে নির্বাসিতের নির্জনতা, যা কখনও সন্তুষ্টি দেয় না, নিরপত্তা দেয় না, যা কখনও নিস্তরঙ্গ নয়।

On Defiance and Taking Positions শিরোনামটি এই পরিপ্রেক্ষিতেই তাৎপর্যপূর্ণ। সাঈদের মতে, শিক্ষাব্রতী তথা বিদ্যাজীবীকে স্পষ্টভাবে বলতে হবে: মানি না। এবং সে কথা বলতে হবে স্পষ্ট ভাষায়, নিজের অবস্থান কোথায় সেটা নিঃসঙ্কোচে জানিয়ে দিতে হবে সর্বসমক্ষে। 'না, না, আমি কোনও বিতর্কে জড়াতে চাই না' বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না। সাঈদ বলছেন, এভাবে কাউকে দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করতে দেখলে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যায়। তিনি নিজে দায়িত্ব এড়াননি। প্যালেস্তাইন প্রশ্নে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজের অবস্থান ঘোষণা করে চলেছেন। তার একটি নজির দেওয়া যাক। সে জন্য এই বইয়ের গণ্ডি থেকে একটি বার বাইরে বেরোনো দরকার। ইজরায়েলের অন্যায় দখলদারি এবং তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিগুণ অন্যায় সমর্থনের প্রতিবাদে তাঁর লেখনী ক্ষুরধার হবে সেটা নিতান্ত স্বাভাবিক, ইজরায়েলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, আরিয়েল শ্যারনকে তিনি 'obese old warmonger' বলে অভিহিত করবেন, সেটাও– obese শব্দটি একটু কানে লাগলেও– অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু লক্ষণীয় হল, একই সঙ্গে ইজরায়েলের ওই অন্যায় দখলকে মেনে নেওয়ার জন্য ইয়াসের আরাফতও সাঈদের নির্মম কলমে তিরস্কৃত হয়েছেন। অতি সম্প্রতি, ২০০১ ডিসেম্বরে লেখা 'Is Israil Secure Now?' নামক একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন : Arafat is hemmed in on all sides, an ironic consequence of his bottomless wish to be all things Palestinian to everyone, enemies and friends allike.

কিন্তু সৌখিন ভদ্রতা বা এড়িয়ে-যাওয়া কূটনীতির তোয়াক্কা না করে নিজের অবস্থান স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সাঈদের একটি গ্রন্থ সমালোচনা: Among he Believers. নামটি পরিচিত। গত বছরের নোবেলজয়ী বিদ্যাধর সূর্য প্রসাদ নইপেলের

www.pathagar.com

একটি বইয়ের নাম Among the Belleves, Among the Believers: An Islamic Journey. ১৯৮১ সালে সেই বইটির সমালোচনা লিখে ছিলেন সাঈদ। প্রবন্ধটি স্বল্পকায়, কিন্তু সেই অল্প কথাতেই নইপলের ইতিহাসবোধের মৌলিক অপূর্ণতা এবং ইসলাম ও মুসলিম দুনিয়ার সম্পর্কে তার বিপুল অজ্ঞতা আর বিপুলতার পণ্ডিতন্মন্যতাকে সাঈদ উন্মোচন করেছেন, তিরস্কার করেছেন। প্রবন্ধের দ্বিতীয় বাক্য : 'Naipaul, Demystifier of the West crying over the spilt milk of colonialism... এবং তৃতীয়টি: 'The writer of travel Joumalism- unencumbered, with much knowledge of Information, and not much interested in imparting any....'

ভি এস নইপলের গভীর অন্তঃসারশূন্যতাকে (deep emptines) সাঈদ চিনিয়ে দিয়েছেন নির্দিষ্ট তথ্য ও যুক্তি দিয়ে। দেখিয়েছেন, কত কম জেনে, কত বিচ্ছিন্ন ও অগভীর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই 'ভ্রমণ-সাংবাদিক' বিরাট বিরাট প্রশ্নে নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বসেন। কুয়ালালামপুরের এক হোটেলে দুই তরুণ মুসলমানের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেন নইপল, তাদের একজন একটি বই তাঁকে পড়তে দিয়ে যায় এবং তাতেই তিনি (যুক্তিবর্জিত, সৃষ্টি-অক্ষম)। 'ইসলাম' আর (সৃষ্টিশীল, যুক্তিবাদী) 'পশ্চিম'-এর প্রমাণ আবিষ্কার করে ফেলেন। হাঁড়ির দু'একটা ভাত টিপেই নইপল জানিয়ে দেন: ইসলামের কোনও নিজস্ব প্রাণশক্তি নেই, ইসলাম যেসব রাজনৈতিক প্রশ্ন তুলেছে সেগুলির যথার্থ সমাধানের পথ বলতে পারেনি, কেবল শিখিয়েছে- বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। এই (অন্ধ) বিশ্বাস থেকে যে রাজনৈতিক ইসলামের জন্ম, তা এক মূর্তিমান আক্রোশ, এক নৈরাজ্যের প্রতিমূর্তি। (This political Islam was rage, anarchy.)

নইপলের এই ইসলাম-বোধ সম্পর্কে এডওয়ার্ড সাঈদের মিতবাক মন্তব্য: After such knoledge what forgiveness? নইপল এই সমালোচনার জবাব দিয়েছিলেন কি না, জানি না। এখন অবশ্য তিনি সব সমালোচনার ঊর্ধ্বে, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম সাহিত্য-নোবেল তাঁর পকেটে। তবে সাঈদের এই সমালোচনা-প্রবন্ধটি পড়ে একটা অত্যন্ত স্বার্থপর আনন্দ হল। ভি এস নইপল যখন যেটুকু পড়েছি, বরাবরই মনে হয়েছে– বেশ লেখেন, কিন্তু এত অগভীর কেন, এত দাম্ভিকই বা কেন? ভয়ে কাউকে বলতে পারিনি, ছোট মুখে বড় কথা বলতে নেই। এবার থেকে নইপল-ভক্তদের সামনে সবিনয়ে এডওয়ার্ড সাঈদকে পেশ করব।

নইপলের ইসলাম-বোধ সম্পর্কে সাঈদের এই কঠোর সমালোচনার মূলে আছে এক গভীর ক্ষোভ এবং প্রতিবাদ। পশ্চিম দুনিয়া সচরাচর যেভাবে ইসলামকে দেখে, তা কেবল খণ্ডদর্শন নয়, ভ্রান্ত দর্শন। এই ভ্রান্তির স্বরূপ উন্মোচন করতে এডওয়ার্ড সাঈদ ক্রমাগত লিখে চলেছেন। যাঁরা ইসলামের ভুল ছবি দেখাচ্ছেন, তাঁদের সমালোচনা সেই প্রয়াসের জরুরি প্রকরণ। এই ধারাতেই লেখা সাঈদের প্রবন্ধ: The Clash of Definitions. প্রবন্ধটি শেষ হয়েছে এইভাবে:

".....efforts to return the community of civilizations to a primitive stage of narcissistic struggle must be understood not as descriptions about how in fact they behave but rather as incitements to wasteful conflict and unedifiying chauvisism. And that seems to be exactly what we do not need."

www.pathagar.com

অর্থাৎ,

"দুনিয়ার বিভিন্ন সভ্যতাকে একটা আদিম আত্মকেন্দ্রিক স্তরে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, যখন তারা কেবল একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করে। এই সংঘাতের তত্ত্বকে বিভিন্ন সভ্যতার প্রকৃত আচরণের সত্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ বলে মনে করার কোনও কারণ নেই, আসলে এটা হল তাদের এক অসুস্থ আত্মম্ভরিতায় দীক্ষিত করার প্রয়াস, পরস্পর লড়িয়ে দেওয়ার প্ররোচনা, যে লড়াই কেবল বিপুল অপচয় ডেকে আনবে। এবং এই বিপদটাই আমাদের সর্বাগ্রে প্রতিহত করতে হবে।"

সাঈদের এই লেখাটি একটি প্রবন্ধের সমালোচনা। সেই প্রবন্ধের শিরোনাম: The Clash of Civilizations? লেখক: স্যামুয়েল হান্টিংটন। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হান্টিংটনের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৩ সালে, Foreign Affairs পত্রিকায়। তার তিন বছর পরে এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্যকে বিস্তৃত করে হান্টিংটন একটি বই লেখেন: The Clash of Civilizations and the Remaking of World order. মূল প্রবন্ধের শিরোনামে প্রশ্নচিহ্ন ছিল, গ্রন্থনামে আর কোনও প্রশ্ন নেই, তত দিনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নিজের তত্ত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছেন। তবে বইয়ের চেয়ে প্রবন্ধটি বেশি নাম কিনেছে, আর সব চেয়ে বেশি নাম কিনেছে শিরোনামের ওই শব্দবন্ধ: Clash of Civilizations. সভ্যতার সংঘাত।

হান্টিংটনের মূল বক্তব্য হল, (ঠান্ডা লড়াই তথা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অবসানের পরে) আন্তর্জাতিক রাজনীতির এক নতুন পর্ব শুরু হয়েছে। এই পর্বে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিশ্বের পুরনো বিভাজন আর প্রাসঙ্গিক নয়, প্রাসঙ্গিক নয় ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্রের সংঘাত, এবার "মানবজাতির অভ্যন্তরীণ বিভেদ হবে চরিত্রে সাংস্কৃতিক, সেই বিভেদই হবে সংঘাতের মূল উৎস... বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভুত্ব বিস্তার করবে সভ্যতার সংঘাত।" ছটি (বা সাতটি) প্রধান সভ্যতার উল্লেখ করেছেন হান্টিংটন– চিনা (তিনি বলছেন Sinic, অর্থাৎ চিনে এবং চিনের বাইরে বসবাসকারী চিনা বংশোদ্ভূতদের), জাপানি, হিন্দু, ইসলামি, পশ্চিমী, লাতিন আমেরিকান এবং ('সম্ভবত') আফ্রিকান। তবে আসলে তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে অন্যান্য সভ্যতার সংঘাত। এবং, এই অন্যান্য সভ্যতার তালিকায় আবার প্রথম ও প্রধান হল 'ইসলামি সভ্যতা'। আর, পশ্চিমী সভ্যতা বলতে তিনি বোঝেন মূলত পশ্চিমী-খ্রিস্টীয় সভ্যতা, যার নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

অর্থাৎ হান্টিংটনের মতে, শ্রেণীসংগ্রাম নয়, রাজনৈতিক আদর্শের দ্বন্দ্ব নয়, দুনিয়ায় এখন মূল সংগ্রাম একটাই 'আধুনিক' পশ্চিম বনাম 'মধ্যযুগীয়' ইসলাম। গত ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের পরে হান্টিংটনের এই তত্ত্ব নতুন প্রাণ পেয়েছে, এই আক্রমণকে পশ্চিমের ভরকেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'ইসলামিসন্ত্রাসবাদ' বা 'সন্ত্রাসবাদী ইসলাম'-এর আক্রমণ হিসেবে দেখা হচ্ছে এবং সন্ত্রাস ও তার প্রতিরোধকে গণ্য করা হচ্ছে সভ্যতার সংঘাতের প্রমাণ হিসেবেই।

এডওয়ার্ড সাঈদের বক্তব্য: স্যামুয়েল হান্টিংটন একটি ধারণা প্রচার করতে আসরে নেমেছেন যে, ধারণা তিনি আগেই সত্য বলে স্থির করে নিয়েছেন। "হান্টিংটন মোটেই নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন সভ্যতার তুলনামূলক বিচার করেননি, তিনি নিজেই একটি পক্ষের হয়ে লড়াই করছেন, একটি সভ্যতাকে অন্যান্য সভ্যতার চেয়ে মহত্তর প্রমাণের জন্য ওকালতি করছেন।" এবং সেটা করতে গিয়ে এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বেছে নিয়েছেন ফাঁকির

www.pathagar.com

সহজ পথ। একটি জটিল এবং বহুমাত্রিক বিষয়কে তিনি নিজের সুবিধে মতো তরল করে নিয়েছেন এবং কিছু চালাক-চালাক কথা তত্ত্বের আকারে পেশ করেছেন, 'সভ্যতার সংঘাত' তেমনই একটি চালাকি।

হান্টিংটনের এই তত্ত্বের সমালোচনার সূত্রে উন্মোচিত হয়েছে এডওয়ার্ড সাঈদের নিজের চিন্তা। তাঁর মতে, একটি সংস্কৃতি বা সভ্যতার সংজ্ঞা নির্ধারণ, সেই সংস্কৃতি বা সভ্যতার শরিক সমাজের কাছে তার অর্থ নিরূপণ– এই কাজগুলি কখনওই একটা বাঁধা পথে চলতে পারে না, তা নিয়ে ওই সমাজের নিজের ভিতরে একটা 'গণতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা' (democratic contest) থাকবেই। সভ্যতার স্বরূপ নিয়ে তর্কবিতর্ক চলবেই, তর্কাতীতভাবে 'এটাই এই সভ্যতা' বলে কোনও ধ্রুব সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে না কখনও। ইসলামের ক্ষেত্রেও এই কথা সত্য, যেমন সত্য পশ্চিমী সভ্যতার ক্ষেত্রে।

ইসলামের বহুমাত্রিক এবং জঙ্গম চরিত্রের কথা বলতে গিয়ে সাঈদ বিভিন্ন দেশের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেমন, ইরান, আলজিরিয়া, মিশর। ইরানে আইন, স্বাধীনতা,ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং কর্তৃত্বের কঠোর সমালোচনা হচ্ছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অন্দরমহলে এবং তার বাইরে। শরিয়তের কাঠামোকে ব্যবহার করে, সেই কাঠামোর ভিতরে দাঁড়িয়ে বিদ্যাজীবীরা এই সমালোচনা চালাচ্ছেন এবং চালাতে পারছেন। আলজিরিয়ায় জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট (এফএলএন) ১৯৬২ সালের স্বাধীনতার পরে একটি নতুন সত্তা সন্ধানের সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিল, যে সত্তা হবে বহুমাত্রিক– আলজিরীয়-আরব-মুসলিম। ক্ষমতার গদিতে বসে বৈপ্লবিক এফএলএন ক্রমশ একাধিপত্যের পরিচিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়,মুক্তি ফ্রন্ট পরিণত হয় এক শ্বাসরোধকারী গোষ্ঠীতন্ত্রে। সেই গোষ্ঠীতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয় নতুন আন্দোলন। সেই আন্দোলনে ধর্মীয় নেতারা যেমন যোগ দেন,তেমনই যোগ দেয় সমাজের নানা অংশ, যেমন সংখ্যালঘু Berber গোষ্ঠীর মানুষ, যাঁদের স্বাতন্ত্র 'বৃহৎ আলজিরীয়' সত্তার মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে যে দ্বন্দ্ব সে দেশে দেখা গেছে তাকে নিছক ইসলামি গোষ্ঠী বনাম অন্যদের দ্বন্দ্ব মনে করলে বড় ভুল হবে, সেটা রাজনৈতিক সংঘাত। বস্তুত, এই দ্বন্দ্বে আলজিরীয় সত্তার সংজ্ঞা নিয়েই মৌলিক প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে সেই সত্তা কতটা ইসলামি, সেটা কী ধরনের ইসলাম। মিশরে এক বিদ্যাজীবী এবং এক চলচ্চিত্রকারের ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় অনুশাসন চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মামলা হয়েছিল, দুটিতেই ধর্মীয় কট্টরপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীরা জয়ী হয়েছেন। এই সব ঘটনা ও তার তাৎপর্য নিয়ে পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমে আলোচনা বিরল। অথচ এই ঘটনাগুলিই বলে দেয়, ইসলাম কোনও একমাত্রিক ব্যাপার নয়, 'ইসলামি সভ্যতা' বলে কোনও অচলায়তনকে চিহ্নিত করা যায় না।

ঠিক তেমনই, পশ্চিমী সভ্যতা বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে আমেরিকান সভ্যতার অন্দরমহলেও টানাপোড়েনের শেষ নেই। সাঈদ উল্লেখ করেছেন, কীভাবে আমেরিকার আদি অধিবাসীরা তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন এবং মার্কিন সভ্যতার সংজ্ঞা বা চরিত্র নিরূপণে সেই সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেওয়ার দাবি তুলেছেন। কালো আমেরিকানদের নিজস্ব সভ্যতা-চিন্তাও ক্রমশ প্রবল এবং স্বাভিমানী হয়ে উঠছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ বিভিন্নভাবে আমেরিকান সভ্যতাকে দেখে। "কোনটা প্রকৃত আমেরিকা?

www.pathagar.com

সেই প্রকৃত আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করা বা তার সংজ্ঞা নির্ধারণের অধিকার কে দাবি করতে পারে?" পশ্চিমী সভ্যতার মূল আদর্শ কী, তা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে [illegible] তুমুল তর্ক শোনা গেছে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কী পড়ানো হবে, কোন ইতিহাস শেখানো হবে, সমাজ-সংস্কৃতির বৃহত্তর ভুবনের সঙ্গে অ্যাকাডেমিক ভুবনের সম্পর্ক কী হবে, এই সব প্রশ্নে স্ট্যানফোর্ড বা কলম্বিয়ার মতো প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ে তীব্র বাকবিতণ্ডা হয়েছে এই কারণেই যে, প্রশ্নগুলো নিছক সিলেবাস সংশোধনের ব্যাপার নয়, 'পশ্চিম'-এর সংজ্ঞা সম্পর্কিত মৌলিক প্রশ্ন। অথচ হান্টিংটন কত সহজে 'পশ্চিম' বলে একটি সুগোল ধারণাকে খাড়া করে দেন।

সাঈদ লিখেছেন, হান্টিংটন তাঁর তত্ত্ব খাড়া করতে যে সব পণ্ডিতকে গুরু মেনেছেন তাঁরা কেউই যথার্থ বিশেষজ্ঞ নন, তাঁদের জ্ঞান অগভীর, দৃষ্টি অস্বচ্ছ। এঁদের অন্যতম হলেন বার্নার্ড লুইস, যাঁর একটি প্রবন্ধ থেকে হান্টিংটন Clash of Civilizations শব্দবন্ধটি কুড়িয়ে পেয়েছেন। ১৯৯০ সালে প্রকাশিত লুইসের এই প্রবন্ধের নাম ছিল The Roots of Muslim Rage নামটিই বুঝিয়ে দেয়, এই পণ্ডিতের দৃষ্টি কতখানি নিরপেক্ষ। (লক্ষ করার বিষয়, লুইসও ইসলাম সম্পর্কে লিখতে গিয়ে rage শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। [illegible] এক ভাবেই ভেবে থাকেন বটে।) সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর সমকালে যে সমৃদ্ধ গবেষণা হয়েছে তার খোঁজ রাখলে হান্টিংটন বুঝতে পারতেন কোনটি কী, কোনটি কী নয়। অবশ্য তা হলে এমন হাতে-গরম বেস্টসেলার লিখে ফেলতে পারতেন না। [illegible]

অজ্ঞতার সঙ্গে যদি ঔদ্ধত্য জোট বাঁধে তবে সেটা অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। ১১ সেপ্টেম্বরের পরে সেই অভিশাপের চেহারা আমরা দেখেছি। আমাদের চার পাশে হান্টিংটনের বহু ভক্ত এখন নিজের মতো বলতে শুরু করেছেন— সমস্যা তো মুসলমানদের নিয়েই, ইসলামের ভেতরেই সমস্যাটা আছে। আমরা এইভাবে ভাবলে সবচেয়ে সুবিধে ওসামা বিন লাদেন বা মুহম্মদ ওমরদের, যাঁরা নিজেদের 'ইসলাম'-এর প্রতিনিধি এবং রক্ষাকর্তা হিসেবে খাড়া করতে চান এবং 'পশ্চিম বনাম ইসলাম' ধর্মযুদ্ধের নামে নিজেদের হিংস্র প্রবৃত্তিকে চালনা করতে চান।

হান্টিংটনের [illegible] 'সভ্যতার সংঘাত' তত্ত্ব একটি সহজ সত্যকে আড়াল করে দেয়। [illegible] আমরা ভুলে যাই, বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে ক্রমাগত লেনদেন চলেছে, আদানপ্রদান চলেছে, প্রায়শই অলক্ষ্যে, কিংবা নীরবে ([illegible] and dialogue)। সাঈদ একটি গভীর প্রশ্ন তুলেছেন এই প্রসঙ্গে: মিশরীয়, গ্রিক, ইহুদি, রোমান, ইসলামিক, চিনা বা ভারতীয়— এমন কোন সংস্কৃতির [illegible] বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে বহু দীর্ঘ, ঘনিষ্ঠ এবং [illegible] বিভিন্ন সংস্কৃতির পারস্পরিক আদানপ্রদানের গুরুত্ব [illegible] হান্টিংটনের মতো 'আমাদের' [illegible]। সেই [illegible] বিচ্ছিন্নতাবোধ বেশি হয়।

সংস্কৃতির [illegible] সাংস্কৃতিক লেনদেনের কথা

ভারতের সমকালীন পরিস্থিতিতেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও জরুরি। রাজনৈতিক হিন্দুত্ববাদের প্রবক্তারা এই বহুত্ব এবং লেনদেনের গৌরবময় অতীত এবং সম্ভাবনাময় বর্তমানকে অস্বীকার করতে চান, তুচ্ছ করতে চান, তার বদলে খাড়া করতে চায় একটি একমাত্রিক সংস্কৃতির অবয়ব, যার সঙ্গে অন্য সংস্কৃতির সম্পর্ক বিরোধের, প্রতিদ্বন্দ্বিতার। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্রবীণ ঐতিহাসিক রমিলা থাপারের একটি সাম্প্রতিক মন্তব্য: "... religious bigotry is beginning to replace both cultural and religious pluralism and the initial moves to secularize civil society." সমাজ সংস্কৃতির এই বহুত্বকে চাকার নিচে দলিত করে, বিশেষত ইসলামকে 'অপর' হিসেবে গণ্য করেই হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির রথযাত্রা চরিতার্থ হয়েছে। এডওয়ার্ড সাঈদকে এই মুহূর্তে আমাদের বড় প্রয়োজন।

না, তাঁকে আমাদের প্রয়োজন কেবল হিন্দুত্ববাদীদের ভুল এবং বিকৃত ইতিহাস-দর্শনের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের জন্য নয়, বস্তুত সেটা নিতান্তই সামান্য কাজ, কারণ ওই ইতিহাস তখন মোটা দাগের, সামুয়েল হান্টিংটন এঁদের মতো স্থূল নন। সাঈদকে আমাদের প্রয়োজন তাঁর মৌলিক চিন্তাকাঠামোর জন্য, যাকে তিনি নির্বাসিতদের চেতনা বলে চিহ্নিত করেছেন। এই প্রবন্ধ সঙ্কলনের ভূমিকা শেষ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, নির্বাসিতের অবস্থানটিকে তিনি সমালোচনারস্বার্থে ব্যবহার করেছেন (using the exile's situation to practice criticism)। এখানেই তাঁর প্রকৃত গুরুত্ব। আমরা যথার্থ সমালোচনা করতে ভুলে যাচ্ছি। আমরা কেবল স্তাবকতার ব্যাধিতে আক্রান্ত নই, আমাদের আপাত-সমালোচনাও প্রায়শই রাজনৈতিকভাবে ঠিকঠাক (politically correct) থাকার চেষ্টা ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে না থাকলে সমালোচনা করা যায় না।

তাই বলছিলাম, একটু দূরে থাকা ভাল, একটু নির্জনে। নির্বাসিতের মতো।

রিফ্লেকশনস অন একজাইল অ্যান্ড আদার লিটারারি অ্যান্ড কালচারাল এসেজ—এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ।
দেশ, ৪ ফেব্রুয়ারী '০২

www.pathagar.com

'বাসভূমের বাইরে'
এডওয়ার্ড সাঈদের আত্মজীবনী

সালাহউদ্দীন আইয়ুব

অনুবাদের জন্য যুতসই শব্দবন্ধ খুঁজে পেলাম না, কিছুদিন আগেই Out of place নামে এডওয়ার্ড সাঈদের আত্মজীবনী নিউইয়র্ক থেকে বেরিয়েছে। খুব বড় নয়, তিনশো পৃষ্ঠার বই, নিউইয়র্কের এক হাসপাতালে রোগশয্যায় বসে লেখা। লুকেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে লং আইল্যান্ডের এক ইহুদি হাসপাতালে অনেকদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেন সাঈদ, 'মৃত্যু' নিশ্চিত জেনে নিজের জীবন নিয়ে শেষ লেখায় হাত দেন তিনি। হয়ত ওই মরণব্যাধিতে আক্রান্ত না হলে আত্মজীবনী লেখার কথা সাঈদ ভাবতেনই না। এ গ্রন্থে তিনি জীবনের সবটা গল্প বলেননি, এ গ্রন্থে বিশ্ববিখ্যাত, সব অর্থে চরিতার্থ, একালের সেরা একজন ভাবুক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত প্রফেসর এডওয়ার্ড সাঈদকে আমরা পাব না। উত্তরকালের সফলকাম কৃতবিদ্যা পাবলিক বুদ্ধিজীবী ও অসাধারণ সাহিত্য-সংস্কৃতির সমালোচক এডওয়ার্ড সাঈদকে আমরা এমননিতেই অনেকখানি জানি।

এডওয়ার্ড সাঈদের জন্ম ১৯৩৫ সালে, জেরুজালেমে, এক বিত্তশালী বুর্জোয়া পরিবারে। পিতা উইলিয়াম সাঈদ অন্য অনেকের মত বন্দরের জাহাজ থেকে নেমে ঢুকে পড়েন আমেরিকায় এবং পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন। সাঈদের বাবার আসল নামছিল ওয়াদি ইবরাহিম, আমেরিকায় অনেকদিন বাস করে প্যালেস্টাইনে ফেরার পর– ততদিনে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক– তিনি নাম বদলান। নিজের নাম ও পিতার নামের এই ইংরেজিপনা নিয়ে সাঈদ দীর্ঘ কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা পরিবেশ করেছেন। নিজের নাম নিয়ে সাঈদ অনেক কৌতুক-ব্যাঙ্গ করেছেন; তাঁর বক্তব্য হল, তিনি যদি আরব হন তার নামে 'এডওয়ার্ড' শব্দ জুড়ে দিয়ে ইংরেজিভাব আনার আদৌ কোনো দরকার ছিল কিনা। একদিকে ফিলিস্তিনি আরব, অন্যদিকে নামের শুরুতে এডওয়ার্ড-এর মত একটা ইংরেজি বনেদি শব্দ, এই দুই মিলে বহুস্থানে তিনি খামকা কিছু সংশয় ও অস্পষ্টতার মধ্যে পড়েছেন, সে জন্যে অনেক সময় নানা মামুলি প্রশ্নের জবাবও তাকে দিতে হয়েছে। সাঈদ লিখেছেন, নাম নিয়ে অস্বস্তি তার চিরকাল ছিল। নাম নিয়ে প্রশ্ন করলে তার মা তাকে প্রায়ই বলতেন, প্রিন্স অব ওয়েলসের নামানুসারেই এডওয়ার্ড নাম রাখা হয়। কিন্তু যখনি কোথাও তিনি নাম উচ্চারণ করেছেন, সবাই বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করতো: কি নাম যেন? এডওয়ার্ড? সাঈদ? কোথায় জন্ম? জেরুজালেমে? যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক? আরব? মুসলমান? খ্রিস্টান? আমেরিকান বলছেন; কিন্তু নাম তো অমন নয়,

www.pathagar.com

তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে তো ছিলেনও না বোধ হয়; দেখতেও তো আপনাকে আমেরিকান মনে হয় না। এ ধরনের রাজ্যের নানা প্রশ্ন বহু বহুবার তাকে শুনে যেতে হয়েছে।

সাঈদের 'বাসভূমের বাইরে' (১৯৯৯) নামক এই আত্মজীবনী তার ভাবুকতা, কাজ ও মনন বুঝবার অনেকগুলো পথ পরিষ্কারভাবে খুলে দেয়। এ বইয়ের নায়ক কিন্তু 'সাঈদ' নিজে নন, তার বাবা ওয়াদি ইবরাহিম। সাঈদের বেড়ে ওঠার গল্প চিত্তাকর্ষক; কিন্তু যত চিত্তাকর্ষকই হোক না কেন সে আখ্যান, সাঈদ শিশুকাল থেকে একেবারে অন্যভাবে বেড়ে ওঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত স্বপ্নই থেকে গেছে। বাবার পাশাপাশি তার মাও এই আত্মজীবনীর কেন্দ্রে। সাঈদ পরিবারের একমাত্র পুত্রসন্তান এবং সবার বড়। আর আছেন চার বোন। বাবা, মা, বোন কারো সঙ্গে এডওয়ার্ড সাঈদের মন-মানসিকতার কোনো দিক থেকে কোনোরকম মিল কখনো যে ছিল না, সেই গল্পই আমরা পাঠ করি এই আত্মজীবনীতে।

এই অনুচ্ছেদ পাঠ করার পর স্বভাবতই অনেক প্রশ্ন দেখা দেবে। আমাদের মনে হতে পারে নিজের জীবন সম্পর্কে একটা বিশেষ ছকের গল্প তৈরি করার জন্যেই সাঈদ হয়ত বা তার আখ্যানগুলোকে একটা নির্দিষ্ট ধরনে বিন্যাস করেছেন। সেটা অবশ্যই হতে পারে, এবং হয়ে থাকে। সাঈদের আত্মজীবনী অত্যন্ত সুলিখিত এবং এও মনে রাখা দরকার এটা কোনো সাধারণ মানুষের রচনা নয়। এডওয়ার্ড সাঈদ সমালোচনা-সাহিত্যে খ্যাতির শীর্ষে অবস্থানকারী ব্যক্তিত্ব। তবে আমি অত্যন্ত সংশয়ী মন নিয়ে বইটি পড়েছি। আমার ধারণা ছিল নিজের 'সমালোচক-জীবন'কে জাস্টিফাই অথবা ডিফেন্ড করার জন্যে তিনি এ বই লিখেছেন। বইটি পড়ে আমার ধারণা পাল্টে যায়। এ বই পড়ে 'অধ্যাপক এডওয়ার্ড সাঈদের' বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ইতিহাস জানা যায় না। কখনো এমনও মনে হয়েছে, তিনি যা হয়েছেন তা না হয়ে তার অন্য কিছু হবার কথা ছিল।

সাঈদের পিতার নাম পরিবর্তন ও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণের কথা তো বলেছি। কিন্তু সাঈদের বাবা ছিলেন একেবারে অন্য ধরনের মানুষ। সাঈদ যা নন, তিনি ছিলেন তাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকায় আসেন তিনি এবং মার্কিন সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়ে যুদ্ধেও যোগ দেন। কিন্তু ভদ্রলোক নিজের জীবনের অতীত ঘটনার কিছুই সাঈদ বা তার পরিবারের অন্য কাউকে জানতে দেননি। পরিবারের অনেক ইতিহাস নানা কাঠখড় পুড়িয়ে সাঈদকে সংগ্রহ করতে হয়, যদিও তা শেষাবধি অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ ও নানাভাবে বিকৃত। 'আরবের' চেয়েও সাঈদের পিতার কাছে বড় পরিচয় ছিল তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই তার দেশ, প্যালেস্টাইন নয়। অত্যন্ত কঠোর মনোভাবসম্পন্ন আত্মপ্রত্যয়ী লোক ছিলেন তিনি এবং নিজের একমাত্র পুত্রের কাছেও ভদ্রলোক সহজ ছিলেন না। সাঈদের ধারণা, সব সময় নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন তিনি এবং কখনো নিজের কথা, আসল কথা, ঘরের কথা খুলে বলেননি সবচেয়ে অন্তরঙ্গতম মুহূর্তেও। তবে একটা গল্প প্রায়ই, সুযোগ পেলেই,তিনি বলতেন এবং তা হল সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সীমানায় ঢুকে পড়ার কাহিনী। তার মূল অভিপ্রায় ছিল নিজের অতীতকে অস্বীকার করা এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বকে নিজের জীবনের প্রারম্ভিক মুহূর্ত হিসেবে প্রমাণ করা। সাঈদের বাবা ওয়াদির জন্ম জেরুজালেমে, ১৮৯৫ সালে; সাঈদের জন্মের সময় ১৯৩৫-তার বাবার বয়েস চল্লিশ, মা হিলদার বয়স

www.pathagar.com

বিশ : 'He never told me more than ten or eleven things about his past' সাঈদ লেখেন; কিন্তু সাঈদের মতে, সেসব জিনিসের মধ্যেও কোনো কংক্রিট বস্তু পাওয়া যায় না : জেরুজালেমে জন্ম হলেও তিনি তার জন্মস্থানকে ঘৃণা করতেন, 'জেরুজালেম' তার কাছে ছিল 'মৃত্যু'র প্রতীক (কিন্তু, সাঈদ লিখেছেন, জেরুজালেমে তাদের পুরনো বাড়ি ইসরাইলের সৈন্যদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর তার বাবার মধ্যে কি প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এবং কি গভীর দুঃখ ও বেদনায় প্লাবিত হয়ে পড়েছিল তাদের পরিবার)। লিখেছেন, তাদের পরিবারের এবং তার নিজের নামগুলোর কোনো বংশগত ইতিহাস নেই, সবই ধার করা, এক ধরনের মুখচ্ছদ। তিনি তার বংশের ইতিহাস সম্ভবপর সমস্ত প্রক্রিয়ায় তন্ন তন্ন করে দেখেছেন, কিন্তু তার কোথাও 'সাঈদ' 'এডওয়ার্ড' উইলিয়াম– এসবের অস্তিত্ব মেলে না। তার দাদার নাম আবু আসাদ। দাদির নাম হাননে। সাঈদের বাবা ১৯১১ সালে প্যালেস্টাইন ত্যাগ করে যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন; এবং ১৯২০ সালে মার অনুরোধে দেশে ফিরে যান। সাঈদের বাবা কখনো দেশে ফিরতে চাননি; তার লক্ষ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রে আইন ব্যবসা করা। পড়ালেখায় নয়, খেলাধুলায় ভাল ছিলেন ওয়াদি; তবে যুক্তরাষ্ট্রে ওয়েস্টার্ন রিসার্ভ ইউনিভার্সিটিতে তিনি কিছুদিন পড়ালেখা করেন। যুক্তরাষ্ট্রে এক রং কোম্পানিতে সেলসম্যানের কাজ নেয়ার পর তার মধ্যে ব্যবসায়িক প্রতিভার জাগরণ ঘটে, এবং অতঃপর নিজেই ব্যবসা খোলেন। একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে নিজেকে তৈরি করার শিক্ষা তিনি অর্জন করেন আমেরিকা থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের সিটিজেনশিপ নিয়ে ১৯২০ সালে প্যালেস্টাইনে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথমে ওখানে ও পরে কায়রোতে গগনচুম্বী ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করেন ওয়াদি ইবরাহিম। ১৯৩২ সালে সাঈদের মা হিলদাকে যখন তিনি বিয়ে করেন তখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাদের বিয়ে সামাজিকভাবেই স্থির হয়। বিয়ের পর দম্পতি হানিমুন উপলক্ষে ইউরোপে যান তিন মাসের জন্যে। সাঈদ লিখেছেন যে, তার মাও বাবার মত নিজের অতীতের খুব সামান্যই তাকে জানতে দিয়েছেন। জন্ম ১৯১৪ সালে, নাযারেথে; তার ছিল চার ভাই। বাবা ছিলেন গির্জার পাদ্রি, কঠোর মৌলবাদী খ্রিস্টান। ভাল ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও কলেজে বেশিদিন পড়ালেখা করতে পারেননি পিতার অমতের জন্যে। বৈরুতের জুনিয়র কলেজে পড়ার সময়–যা এখন লেবানিজ আমেরিকান ইউনিভার্সিটি-আঠার বছর বয়সে সাঈদের বাবার সঙ্গে তার বিবাহ হয় এবং পড়ালেখায় ছেদ পড়ে। বলা বাহুল্য, এভাবে জোর করে ধরে বিয়ে দিয়ে দেয়া হিলদার মোটেও ভাল লাগেনি, কেননা বৈরুতের জুনিয়র কলেজের ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী হিসেবে তার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল।

প্যালেস্টাইনে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত যৌথভাবে ব্যবসা চালানোর পর সাঈদের বাবা মিসরের কায়রোতে তার বাণিজ্য সম্প্রসারিত করেন। কায়রোতেই সাঈদের বাল্যকাল ও স্কুল জীবন অতিবাহিত হয়। সাঈদের বাবা খুব সংরক্ষণবাদী ছিলেন, কিন্তু রক্ষণশীল নয়। যাকে বলে আপাদমস্তক প্রাগমেটিক বুর্জোয়া, ওয়াদি ছিলেন তাই। এ আত্মজীবনীর বৃহদংশ পিতৃতান্ত্রিক অনুশাসন, রীতি-নীতি ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতার বর্ণনায় ভরপুর। মা ও বাবাকে সাঈদের কখনো ঠিক স্বাভাবিক মানুষ মনে হয়নি। নিজেদের খাঁটি পরিচয় ও নিগূঢ় সত্তাকে তারা কখনো প্রকাশিত হতে দেননি। প্রথম সন্তানের হাসপাতালে মৃত্যুর পর হিলদা তার দ্বিতীয় ও একমাত্র পুত্রসন্তান সাঈদের জন্মদানের জন্যে কায়রো ছেড়ে

www.pathagar.com

জেরুজালেম চলে যান। সাঈদের জন্ম কায়রোতে না হয়ে যে জেরুজালেমে হলো, তার কারণ এই। কিন্তু সাঈদের পরিবার ধর্মমনস্ক ছিল, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। বাবা ছিলেন প্রোটেস্টান্ট, ব্যবসায়ী, মার্কিন নাগরিকত্ব লাভকারী গর্বিত বুর্জোয়া। সাঈদকে তিনি কায়রোর একটা নামকরা ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করান ইউরোপীয় মূল্যবোধে মানুষ হবার জন্যে। সাঈদের প্রতি তার মা দরদি ও আবেগপ্রবণ ছিলেন, বটে, কিন্তু সব সময় নয়; কখনো কখনো তার কঠোর বুর্জোয়া পিতার সঙ্গে তার শীতল, কৃত্রিম স্বভাবের কোনো তফাত সাঈদ দেখেননি। ওদিকে ওয়াদির সঙ্গে হিলদার শুরু থেকেই খুব বনিবনা ছিল না। ওয়াদি প্রায়ই নানান ছুতোয় হিলদাকে বকাঝকা করতেন। হিলদার ভাইয়েরা সাঈদের বাবার কাছ থেকে টাকা-পয়সা ধার নিয়ে ফেরত দেয়নি, এই ছিল ঝগড়ার একটা প্রধান সূত্র। অন্যদিকে হিলদার একটা ক্ষোভ ছিল এই যে, মেধাবী ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও বিয়ের কারণে তার পড়ালেখা এগোতে পারেনি। তবে মতান্তর সত্ত্বেও একটা বিষয়ে তাদের গভীর মিল ছিল, তা হল মরিয়া হয়ে মর্যাদাবান হওয়ার অভিলাষ এবং ছেলে-মেয়েদের বুর্জোয়া মানসিকতায় মানুষ করার প্রবল বাসনা।

নিজের পরিবারে ওয়াদি ইবরাহিম ছিলেন নিরঙ্কুশ শাসক ও নায়ক। সবার বড় ও একমাত্র পুত্র হওয়া সত্ত্বেও পিতার সাম্রাজ্যে সাঈদের বিন্দুমাত্র কোন অধিকার ছিল না। তাই নয় শুধু, 'অধিকার' যে কখনো থাকবে না সে কথা তিনি পরিষ্কারভাবে পুত্রকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। অত্যন্ত ছোটবেলায় সাঈদকে তিনি বলেছিলেন, 'আমার সম্পত্তির কোনকিছু তুমি পাবে না।' টাকা-পয়সা ছেলেকে তিনি দিয়েছেন, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশিই দিয়েছেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হিসাবও নিয়েছেন। তবে যে বিষয়টি সাঈদকে সারাজীবন পীড়িত করেছে তা হল তার ওপর অবিশ্বাস। সাঈদের কোন গুণ বা যোগ্যতা আছে, এটা তারা কোনভাবে বিশ্বাস করতে পারেননি– মাও নন, বাবাও নন। কায়রোর বৃটিশ স্কুলে পড়ার সময় সাঈদ দুষ্টু প্রকৃতির ছিলেন, ইংরেজ শিক্ষকদের আচার-আচরণ নিয়ে সাঈদ ও তার বন্ধুরা মিলে নানা হাসি-তামাশা করতেন; স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ করার কারণে স্কুল থেকে সাঈদ বহিষ্কৃতও হন। এসব কারণের জন্য এ ছেলে যে মানুষ হবে না, সে বিষয়ে সাঈদের পিতা-মাতা চিরদিনের জন্য নিশ্চিত হয়ে যান এবং ছেলেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু অন্যদিকে সাঈদ ইংরেজি ও অংকে খুবই প্রতিভাবান ছিলেন এবং ইংরেজি লেখার অসাধারণ ক্ষমতা কায়রোর বৃটিশ স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছে কোন অজ্ঞাত ব্যাপার ছিল না। কিন্তু সাঈদের গুণগুলো সাঈদের শিক্ষকদের মত তার বাবা-মাও কখনো স্বীকার করেননি। গুণ স্বীকারে কুণ্ঠা, অসমর্থন ও সার্বিক অবিশ্বাসের প্রতিকূলতায় সাঈদ বাল্যকাল থেকেই নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যতা বিষয়ে খুব সন্দিহান ছিলেন। পিতার হাতে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হওয়া সাঈদের জন্য এক নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। লাঠিপেটা খেয়ে গুরুতর আহত হওয়াও কোন ব্যতিক্রম ঘটনা নয়। সাঈদ যখন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট ছাত্র, তখনও পিতার হাতে তিনি শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন।

কায়রোর স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কিছুদিন পর তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন। সাঈদকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণের পেছনে কারণ ছিল দুটো : (ক) চেনা পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা, (খ) মার্কিন নাগরিকত্বের শর্তবিধি অনুসারে মার্কিন নাগরিকের ভিন্ন দেশে

www.pathagar.com

জন্মগ্রহণকারী সন্তানের নাগরিকত্ব অর্জনের নিয়মানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচ বছর বাস করার শর্ত পূরণ। যুক্তরাষ্ট্রে এর আগেও একবার বেড়িয়ে যান সাঈদ, ১৯৪৮ সালে; তার বাবা-মার সঙ্গে। ১৯৪৮ সাল একটা তীব্র বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা হিসেবে তার আত্মজীবনীর অনেকগুলো পৃষ্ঠা অধিকার করে আছে যদিও তখন তিনি মাত্র তের বছরের বালক এবং কোনকিছু ভালভাবে বুঝবার বয়স হয়নি, তবু তিনি বেশ কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন প্যালেস্টাইনের পতন তার পরিবারের জন্য এক নির্মম শোকাবহ ঘটনা। তার বাবা-মা পুরো ব্যাপারটাই সাঈদের কাছ থেকে গোপন রাখার চেষ্টা করেন। তবু তার বাবার মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়া বাক্য– 'আমাদের আর কিছুই থাকলো না'– তাকে ভাবিত করে। ব্যবসা-বাণিজ্য, সম্পত্তি,সবই কায়রোতে ঠিকঠাক থাকার পরও কেন ওই কথা তার বাবা বললেন, বালক সাঈদ তা বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন। জেরুজালেমের কথা সাঈদের খুব মনে নেই। ওখানকার এক স্কুলে কিছুদিন পড়েন তিনি, কিছু কিছু মানুষের মুখ, আশপাশের বাড়িঘর, সড়ক, দোকানপাট– এইসব মনে ভাসে। তার স্মৃতির সবটুকু কায়রোর জীবনকে ঘিরে, যা তাকে ত্যাগ করতে হয় ষোল বছর বয়সে এবং যেখান থেকে আরো কয়েক বছর পর তার বাবা-মাকে পালিয়ে যেতে হয় লেবাননে।

১৯৫১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন এডওয়ার্ড সাঈদ এবং তারপর যুক্তরাষ্ট্রই হয়ে ওঠে তার ঠিকানা। এ বই যখন সাঈদ লিখছেন তখন তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত; তার মাও ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। অসুস্থ অবস্থাতেই লেখা ধরেন এবং অসুস্থ অবস্থাতেই শেষ করেন। কিন্তু শুধু নিউইয়র্কে বসে নয়, বিভিন্ন স্থানে, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে এ বইয়ের বিভিন্ন অংশ লেখা হয়। অসুস্থ হওয়ার পর তিনি ইসরাইল যান; কায়রো ঘুরে আসেন– তার স্মৃতির শহর। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। যে কোন লেখার ক্ষেত্রে 'উদ্দীপন বিভাব' একটা গুরুতর ভূমিকা রাখে; এডওয়ার্ড সাঈদের মনের মধ্যে বিষয়-আশয়ের অভাব না থাকলেও 'আত্মজীবনী' যেহেতু স্মৃতিশাসিত ও সত্যভাষী সেজন্যে লেখার ফাঁকে নিজের পুরনো ঠিকানাগুলোর অনুসন্ধান তার বেশ কাজে লেগেছে। একে প্রায় নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতির ফিল্ডওয়ার্ক বলতে পারি। তিনি কায়রো গেছেন বহু বহুদিন পর, দীর্ঘ পনের বছর পর; গেছেন বর্তমান ইসরাইলে, জেরুজালেমে, প্যালেস্টাইনে; দেখেছেন পুরনো মানুষজনের মুখ, চেনা সড়ক, বাড়িঘর, নগরী; দেখেছেন বহুদিনের স্মৃতিবিজড়িত জায়গাগুলো, বসতবাটি, দোকানপাট, লোকালয়– কি আমূল বদলে গেছে সময়ের ব্যবধানে। সাঈদের আত্মজীবনীতে তার শৈশবের কায়রো নগরীর অপূর্ব অনুপুঙ্খ বর্ণনা পাই, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় জেমস জয়েসের কথা– যিনি বলেছিলেন কোন কারণে 'ডাবলিন' শহর ধ্বংস হয়ে গেলেও তার সাহিত্য থেকে তা অবিকল পুনরুদ্ধার করা যাবে।

আমরা জেনেছি, স্কুলের পড়ালেখা অসমাপ্ত রেখেই এডওয়ার্ড সাঈদ যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। যুক্তরাষ্ট্রে তিনি ভর্তি হন মাউন্ট হারমন স্কুলে, নিউ ইংল্যান্ডে। মাউন্ট হারমন কায়রোর ভিক্টোরিয়া কলেজ নয়; পরিবেশ, ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক, চলাফেরা সবই স্বতন্ত্র। নিউ ইংল্যান্ডের এই নির্জনতম স্কুলে কায়রোর স্মৃতি অনবরত হানা দিতে থাকে। সাঈদের মনে পড়ে তার বাড়ি, বন্ধু-বান্ধব, ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। দেখতে দেখতে

www.pathagar.com

হাইস্কুল গ্রাজুয়েশন হয়ে যায়, সাঈদ প্রিন্সটনে পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রিন্সটনে পড়ার সময় সাঈদ এভা'র প্রেমে পড়েন, কিন্তু বয়সে সাঈদের চেয়ে সাত বছরের বড় এবং খুব আকর্ষণীয় না হবার কারণে তার বাবা-মার অনুমোদন মেলেনি। এভা'র সঙ্গে সাঈদ ঘুরেছেন অনেক, প্রিন্সটন থেকে বৈরুতও গেছেন এক সঙ্গে; কিন্তু সম্পর্ক কখনো গভীরতরভাবে অন্তরঙ্গ হতে পারেনি প্রধানত পারিবারিক নিষেধ ও অনিচ্ছার কারণে।
মাউন্ট হারমন স্কুলে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে এডওয়ার্ড সাঈদ প্রিন্সটনে ভর্তি হন। এর ভেতরে নানা ঘটনা ঘটে– তার বাবার অসুস্থতা, কায়রোতে তার পরিবারের সামাজিক ও বাণিজ্যিক বিপর্যয়, লেবাননে গৃহযুদ্ধ, ইসরাইলি আগ্রাসন ইত্যাদি। তবে সাঈদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটে তার অন্তর্লোকে, মন ও চৈতন্যে। পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও চেনা পরিপার্শ্ব থেকে দূরে বছরের পর বছর একা বসবাস করে এডওয়ার্ড সাঈদ আত্ম আবিষ্কারের পথ খুঁজে পান। মা-বাবা ও বাড়িঘরের নস্টালজিয়া ত্যাগ করে এডওয়ার্ড সাঈদ নিজেকে নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রিন্সটনে তিনি নিজেকে উন্মোচন করার সুযোগ পান এবং সকল রকম গৃহকাতরতা ত্যাগ করেন। বাড়িঘর আর পরিবারের কথা ভেবে ভেবে সাঈদ নিজেকে চেনার ও নিজের প্রতিভাকে শনাক্তকরার অবসর পাননি। নস্টালজিয়ার পরপারে এসে এবার তিনি পরিষ্কারভাবে নিজেকে পরীক্ষা করার সংকল্প গ্রহণ করেন।
অনেকেই হয়ত জানেন, এডওয়ার্ড সাঈদ সঙ্গীতের গুণী বোদ্ধাদের একজন। তবে সাঈদ শুধু সঙ্গীতের সমঝদার বা সমালোচকই নন, একজন সেরা পিয়ানোবাদকও। অনেক সমালোচকের ধারণা, এডওয়ার্ড সাঈদ 'পিয়ানোবাদক' হিসেবে পাশ্চাত্যের খ্যাতিমানদের একজন হতে পারতেন। এ শুধু প্রশংসা নয়, এটা বাস্তব সত্য। প্রিন্সটনে সেরা সঙ্গীতজ্ঞদের নিকট পাঠগ্রহণ করলেও 'সাহিত্য'ই হয়ে ওঠে তার স্বক্ষেত্র। সঙ্গীত নিয়ে সাঈদ বই লিখেছেন, কিন্তু সঙ্গীতকে তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেননি। তবে গ্রহণ করতে পারতেন এবং গ্রহণ করে সাহিত্যের মতোই সফলকাম হতে পারতেন। এখনো সাঈদ পিয়ানো বাজান, কালেভদ্রে, অনুষ্ঠানে-আয়োজনে।
সাঈদ প্রিন্সটনে ব্যাচেলরস করে হার্ভার্ডে এমএ পিএইচডি করেন, এ তথ্য আমরা জানি এবং মজার ব্যাপার হল তার আত্মজীবনীতে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ উল্লেখ পাই, কিছু মন্তব্যও তার নাম আর,পি ব্লাকমুর। সাঈদের বিশ্বাস, প্রফেসর ব্লাকমুরের কাছ থেকেই সাহিত্য সমালোচনার দীক্ষা তিনি গ্রহণ করেন। 'আইভি লিগ বিশ্ববিদ্যালয়' হলেও, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি তেমন কিছু শেখেননি বলেই সাঈদের ধারনা। তার গড়ে ওঠার পেছনে কোন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা থাকলে তা পঞ্চাশ দশকের 'অরাজনৈতিক' প্রিন্সটনের এবং কোন ব্যক্তির অবদান থাকলে তার নাম আর,পি ব্লাকমুর।
প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি সেই পঞ্চাশের দশকে, একদিকে যেমন ছিল রাজনীতিমুক্ত, অন্যদিকে বেশি পরিমাণে রক্ষণশীল, পুরুষশাসিত, নারীহীন। শনিবারে মেয়েদের সঙ্গে ছেলেরা মেলামেশা করতে পারত, অন্য কোনদিন নয়। প্রিন্সটনে সাঈদের অধ্যায়নকাল পাঁচ বছর : ১৯৫৩-৫৭। প্রথম দু'বছর এভা'র অসফল প্রেমে নিমজ্জিত থাকার কারণে মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভবপর ছিল না। প্রিন্সটনে তখন কোন কৃষ্ণাঙ্গ দেখা যায়নি, শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই ছিল সাদা; বিদেশী ছাত্রদের বেশিরভাগই ছিল গ্রাজুয়েট

www.pathagar.com

স্টুডেন্ট; তবে বেশকিছু আরব ছাত্র পড়তে আসে তখন; যাদের সঙ্গে সাঈদের সম্পর্ক ছিল। প্রিন্সটনে তখন ছিল একটা ছোট পরিসরের কলেজ মাত্র, যা এখন পরিবর্তিত হয়ে একটা জাঁকালো আইভিলিগ ইউনিভার্সিটিতে পরিণত। মজার ব্যাপার হল, প্রিন্সটনে সাঈদ 'সাহিত্যে' মেজর না করে 'হিউম্যানিটিস' এ বিএ করেন যার ফলে দর্শন সাহিত্য ফরাসি, ইংরেজি প্রভৃতি ব্যাপক বিষয়ে তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম হন। প্রিন্সটনে সাঈদ ছিলেন প্রবলভাবে উদ্যমী, প্রফুল্ল, উত্তেজিত, নতুন নতুন বিদ্যার দিগন্তে অফুরন্তভাবে ভ্রাম্যমান এবং তার প্রেরণার কেন্দ্রে ছিলেন মহৎ অধ্যাপক আরপি ব্লাকমুর। সাঈদ লিখেছেন, 'প্রফেসর ব্লাকমুর ছিলেন একজন স্বশিক্ষিত প্রতিভাবান মেধাবী সৃষ্টিশীল শিক্ষাগুরু– যার ডক্টরেট দূরে থাক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ডিগ্রিও ছিল না। ব্লাকমুরের সঙ্গে কোন ক্লাসে তিনি রেজিস্ট্রেশন না করলেও তার ক্লাসে গিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে থাকা ছিল তার রোজকার আনন্দ ব্লাকমুরের লেখা ও বক্তৃতার ভাষা ছিল জটিল,দুর্বোধ্য,অনুসরণ অযোগ্য; আর সেজন্যই ব্লাকমুর ছিলেন সাঈদের দৃষ্টিতে আদর্শ ব্যক্তিত্ব; কবিতা আর উপন্যাস কিভাবে পড়তে হয়,তা সাঈদ শেখেন এই মহৎ অধ্যাপকের কাছ থেকে .

প্রফেসর ব্লকমুরের কাছ থেকে সাঈদ 'Explanation' নয়, 'interpretation'-এর গোপন সূত্রগুলো শেখার প্রয়াস পান (পৃ. ২৭৬)। বলাবাহুল্য 'interpretation' শব্দটি তিনি পাউল রিকর নির্দেশিত অর্থে ব্যবহার করেছেন। প্রিন্সটনে সাঈদের থিসিসের বিষয় ছিল 'আন্দ্রে জিদ ও গ্রাহাম গ্রিন'। পরীক্ষা কমিটির সদস্য হিসেবে এ থিসিস বিষয়ে প্রফেসর ব্লাকমুর লিখিতভাবে মন্তব্য করেন 'great power of analysis' (পৃ. ২৭৭)। ১৯৬৫ সালে প্রফেসর ব্লাকমুরের মৃত্যু হয়।

সাঈদ লিখেছেন, স্কলার ও অধ্যাপক হিসেবে তার যা কিছু অর্জন তার পেছনে প্রিন্সটনের ভূমিকা সর্বাধিক। দর্শন, সাহিত্য ও সঙ্গীতের গভীরতর প্রদেশগুলোতে এ সময়ই তিনি বিচরণের সুযোগ পান। একটা সঙ্গতিপূর্ণ স্বাধীন স্বভাবের মন তৈরি হয়ে ওঠে এসময়টাতেই। আর্থার গোল্ড ছিলেন সাঈদের সবচেয়ে মেধাবী সহপাঠী। প্রিন্সটন সাদকে একদিকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে, অন্যদিকে সেই বিচ্ছিন্নতা ত্বরান্বিত করে তার বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীন স্বতন্ত্র বিকাশ। এসবের পরও তার মনের ভেতর এখনো দ্বন্দ্ব ও দোটানা অব্যাহত ঃ একদিকে কায়রোতে ফিরে যাওয়ার প্রবল আগ্রহ, অন্যদিকে অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবী হবার সাধ। সঙ্গীতে গভীর গভীরতরভাবে নিমজ্জিত হতে থাকেন তিনি প্রিন্সটনের বছরগুলোতে।

যেমন সাঈদ লিখেছেন এবং আমি উল্লেখ করেছি, সে সময় প্রিন্সটন ছিল খুব অরাজনৈতিক। সাঈদের সহপাঠী আর্থার গোল্ডের সঙ্গে তার ইসরাইল বিষয়ে মতবিরোধ ছিল, যদিও তা পরবর্তীতে কেটে যায়। সাঈদের সহপাঠী ও সহবাসী টম ফেরার ইহুদি হওয়া সত্ত্বেও 'ইসরাইলে'র আগ্রাসননীতির কঠোর সমালোচক ছিলেন। প্রিন্সটন ছিল রক্ষণশীল; মার্কসিস্ট হওয়ার কারণে অধ্যাপক ম্যাকআর্থির চাকরি চলে যাওয়ার কথা সাঈদ উল্লেখ করেছেন (পৃ. ২৭৯)। রাজনীতি ছিল না বটে, কিন্তু ছাত্রদের বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন ছিল; ইহুদি ছাত্রদের এরকম একটা সংগঠন ছিল যার নাম 'হিলেল ফাউন্ডেশন'। সাঈদ ভদ্রলোকের নাম উল্লেখ করেননি, তিনি ছিলেন এই ইহুদি সংগঠনের

www.pathagar.com

রেবাই যার সঙ্গে ক্যাফেটেরিয়ায় যাওয়ার পথে সাঈদের দেখা হয়। 'তুমি তো মিসর থেকে এসেছ, তাই না'? জবাব দেয়ার পর সাঈদ বুঝতে পারেন ওই রেবাই এমনকি তার কায়রোর বাড়ির ঠিকানাও জানেন। 'পড়ালেখা শেষ করার পর তোমার পরিকল্পনা কি?' সাঈদ প্রশ্নটা বোঝেননি, মনে করেছেন প্রিন্সটনে ব্যাচেলরস করার পর তিনি এমএ পড়বেন কিনা এ কথাই বোধ হয় ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেছেন। সরলভাবে বললেন, বিএ পাস করার পর এমএ পড়ব। এমন উত্তর দেয়ার পর রেবাই সংশোধন করে বললেন, 'না না আমি বলতে চাচ্ছি বি.এ, এম.এ-সব লেখাপড়া সমাপ্ত করার পর তুমি কি করবে?' সাঈদ কোন কিছু বলার আগেই রেবাই নিজেই কয়েক বাক্যের একটা উপদেশ প্রদান করেন :

'তোমার অবশ্যই ফিরে যাওয়া উচিত। তোমাকে দেশের লোকদের প্রয়োজন। ওদের ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষক দরকার। আরবরা অজ্ঞতা, দুরবস্থা ও অসুস্থতায় নিমজ্জিত,সেখানে তুমি হবে একটা সম্পদ।'

মুরুব্বিয়ানা করে রেবাই তরতর করে চলে যান সাঈদের পক্ষ থেকে কোন কথা শোনার তোয়াক্কা না করেই। রেবাই-এর উপদেশ ও সংশ্লিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করার পর আত্মজীবনীতে সাঈদ এ নিয়ে কোন কথা বলেননি। যদিও সাঈদের কোন মন্তব্য পাই না; আমার দৃঢ়বিশ্বাস এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। হয়ত এ ঘটনাই স্থির করে দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হবে তার উত্তরকালের কর্মক্ষেত্র। মানুষের জীবনে অনেক আপাত তুচ্ছ ঘটনা পরিণতির দিক থেকে দিক নির্দেশক হয়ে ওঠে, সাঈদের সঙ্গে উক্ত রেবাইয়ের সংক্ষিপ্ত কথোপকথন কি রকম প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল আমরা জানি না।

প্রিন্সটনে সাঈদ আরেক মেয়ের প্রেমে পড়েন, সে ছিল সাঈদের বড় বোনের বান্ধবী। তখনো এভা'র সঙ্গে সাঈদের সম্পর্ক একেবারে চুকে যায়নি। সাঈদ যেভাবে তার প্রেমের বর্ণনা দিয়েছেন তা কৌতুহলোদ্দীপক। তার অভিজ্ঞতায় প্রেম হল এক তীব্র অতৃপ্ত বাসনা। এভা কিংবা এই মেয়ে তার বোনের বান্ধবী, কারোরই শরীরের স্বাদ তিনি নিতে পারেননি। এমন নয় যে সম্পর্ক তাদের ঘনিষ্ঠ কিংবা গভীর ছিল না, কিন্তু শরীরের অধিকার থেকে তিনি বরাবরই বঞ্চিত হয়েছেন। দু'জনের প্রতি সাঈদের আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল 'শরীর', যার ওপর তিনি হস্তক্ষেপ করতে ব্যর্থ হন।

এ সময় সাঈদ প্রথম বিয়ে করেন এবং সে বিয়ে বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। বনিবনা না হওয়ায় সাঈদ তার মাকে জিজ্ঞেস করেন 'স্ত্রী' নিয়ে কি করবেন। মার সোজা ঠাণ্ডা উত্তর ছিল 'ছেড়ে দাও'। নিজের সিদ্ধান্ত কিংবা মার দ্বিধাহীন নির্দেশ, যে কারণেই হোক তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ওই মেয়ে সম্পর্কে দু'বাক্যের বেশি সাঈদ ব্যয় করেননি। বর্তমান স্ত্রী 'মরিয়ম' বিষয়েও কোন আলোচনা বইতে নেই। এভা ও অন্য মেয়েটি সম্বন্ধেই তিনি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখেছেন। ওদের কথা যেভাবে লিখেছেন তাকে 'প্রেম' বলা কতটা সঙ্গত হবে বলা কঠিন। লোভাতুর বাসনা, রিরংসা ও শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার অপ্রতিরোধ্য কামনা ছাড়া সাঈদের অভিধানে প্রেমের আর কোন গভীরতর অর্থ আছে, এমন মনে হয় না। যে অর্থেই হোক না কেন, প্রিয় রমণীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তার বাসনা সবসময়েই অচরিতার্থ থেকেছে।

প্রিন্সটনে ব্যাচেলর্স-এ খুব ভাল করার পরও সাঈদ আত্মআবিষ্কারে সফলকাম হননি।

www.pathagar.com

কায়রোতে ফিরে গিয়ে বাবার ব্যবসার ভার নেবেন, অমনই ছিল তার চিন্তা এবং ওসবই তার মাথায় ঘুরপাক খেতো। প্রিন্সটন পর্বের এডওয়ার্ড সাঈদ তার নিজেরই জবানিতে এভাবে প্রতিকৃত : আরব, সঙ্গীতজ্ঞ, একাকী ও উন্নাসিক, তরুণ ভাবুক, রাজনৈতিকভাবে অভিযোজন–ব্যর্থ একজন নিষ্ঠাবান ছাত্র। সাঈদ তার বাবা-মার কথা যেভাবে লিখেছেন, তা থেকে মনে হয় নিজের বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি না হওয়ার পেছনে ওদের অবদান নগণ্য ছিল না। সাঈদের প্রতিভা তারা ধরতে পারেননি, অন্যদিকে তার অনেক প্রত্যক্ষ 'গুণ' স্বীকার করতেও তারা কুণ্ঠিত ছিলেন। এই কুণ্ঠার নোংরা প্রকাশ ঘটে প্রিন্সটনে সাঈদের গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠানে। সাঈদের বাবা-মা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন এবং সাঈদের কৃতিত্বের কথা অধ্যাপকদের মুখে মুখে তখন। সাঈদের বাবা এক প্রফেসরকে প্রশ্নই করে বসেন, 'আচ্ছা, ও কি আসলেই খুব ভাল করেছে'? এ ধরনের অশোভন ও কুৎসিত প্রশ্ন শুনে ওই অধ্যাপক ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং পাল্টা তাকেই জিজ্ঞেস করেন 'আসলেই ভাল করেছে' এ ধরনের কথার মানেটা কি?

১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত হার্ভার্ড ইউনির্ভাসিটিতে 'সাহিত্য' পড়েন এডওয়ার্ড সাঈদ। হার্ভার্ডের প্রাণপ্রণালি ও শিক্ষা ব্যবস্থা সাঈদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গতানুগতিক ছিল। পর্বে পর্বে ভাগ করা প্রথাগত সাহিত্য অধ্যয়নের বাইরে অন্য কোনকিছু সাঈদ হার্ভার্ডে লক্ষ্য করেননি। অধ্যাপক কি পড়াবেন, কি বলবেন এবং ছাত্ররা এ্যাসাইনমেন্টে কি লিখবে তা যেন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অধ্যাপকরা নতুন কিছু আশা করতেন না। হার্ভার্ডে আর.পি. ব্লাকমুরের মত কোন ব্যতিক্রমী ভাবুকের দেখা সাঈদ পাননি। সাঈদ যা শেখেন তা নিজের ইচ্ছা ও উদ্যমে, আর প্রতিভাবান সতীর্থদের সাহচর্যে। সতীর্থদের মধ্যে তিনজনের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন : আর্থার গোল্ড,মাইকেল ফ্রাইড ও টম কারণেসেলি। সাঈদের মতে, হার্ভার্ডের বছরগুলোতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এ সময় তার মন ও চৈতন্যের চৌহদ্দি থেকে 'মধ্যপ্রাচ্যে'র ভাবনা সম্পূর্ণ সরে যায়। সাঈদের মতে, হাইডেগার, সার্ত্র, মার্লো-পোন্তি, ভিকোর New Science' ও জর্জ লুকাচের History and Class Consciousness তাঁর চিন্তার স্বাভাব ও দিগন্ত সম্পূর্ণ বদলে দেয় এবং এসব পঠন-পাঠনের স্বাক্ষর বিধৃত হয়ে আছে তার পিএইচডি অভিসন্দর্ভে। সাঈদের অভিসন্দর্ভের বিষয় : যোশেফ কনরাড। তার গবেষণা-নির্দেশক ছিলেন মনরো এনজেল ও হ্যারি লেভিন। এদের বিষয়ে নামোল্লেখ ছাড়া আর কোন কথা আত্মজীবনীতে নেই। সাঈদ লিখেছেন, সমালোচক আই. এ রিচার্ডসের অধীনেই তিনি পিএইচডি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এই বিশৃঙ্খল অধ্যাপকের নির্দেশ ও পরামর্শে অভিসন্দর্ভ লেখা স্বভাবতই অসম্ভব ছিল। হার্ভার্ডে কোন আর পি ব্লাকমুর ছিলেন না, তবে,সাঈদ লিখেছেন, মাঝে মধ্যে যেসব অতিথি অধ্যাপক আসতেন তাদের বক্তৃতা ও আলোচনা তাকে উদ্দীপ্ত করতো। এ রকম একজন ছিলেন কেনেথ বার্ক। হার্ভার্ডে অবশ্য সাহিত্যের পাশাপাশি সঙ্গীত-অধ্যায়ন-অনুশীলনও অব্যাহত থাকে। একটা কথা আমাদের বুঝতে হবে যে, সাহিত্য ও সঙ্গীত দু ক্ষেত্রেই সাঈদ এত গভীরভাবে নিমগ্ন ও বিশিষ্ট ছিলেন যে কোন্টা ছেড়ে কোন্টা ধরবেন তা নিয়ে তার মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কখনোই একেবারে কেটে যায়নি। তবে হার্ভার্ডে তিনি এ মীমাংসায় পৌঁছুতে সক্ষম হন যে, যে ধরনের ভাবুকতায় তার মনের সহজাত স্ফুরণের

www.pathagar.com

সম্ভাবনা তার জন্য 'সঙ্গীত' উপযুক্ত ক্ষেত্র হতে পারে না। হার্ভার্ডে অধ্যায়নকালে বন্ধু আফিফ বুলোসের সঙ্গে তিনি কনসার্ট করেছেন এবং উৎসাহিত করেন বিখ্যাত পোলিশ পিয়ানোবাদক ওস্তাদ ইগনেস টাইগারম্যান। এই ইহুদি পোলিশ সঙ্গীতের ওস্তাদ তাকে এতো প্রভাবিত ও উৎসাহিত করেন যে, 'সঙ্গীত' তার স্বক্ষেত্র হবে না একথা ভাবতে তার খুব কষ্ট হতো। আফিফ বুলোস শুধুমাত্র তার সঙ্গীতের সতীর্থই ছিলেন না, তারা ক্যামব্রিজে একই বাড়িতে বাস করতেন। আফিফ ছিলেন ভাষাতত্ত্বের ছাত্র,সাঈদের চেয়ে পনের বছরের বড়; বৈরুতে গৃহযুদ্ধের সময় নিহত হওয়ার আগে পর্যন্ত (১৯৮২) সাঈদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা ছিল। ক্যামব্রিজে ফ্রানসিস এ্যাভিন্যুর একেবারে শেষ মাথার বাড়িতে তারা এক সঙ্গে বাস করতেন। বাড়ির মালিক ছিলেন এক মধ্যবয়সী বিবাহবিচ্ছেদকৃত সংবেদনশীল মহিলা, সাঈদ ও আফিফ দুজনকেই তিনি খুব ভালবাসতেন। আফিফ ছিলেন সমকামী এবং তা নিয়ে ভদ্রমহিলা অস্বস্তিতে ভোগেননি। কিন্তু এই সংবাদে সাঈদের মা আঁতকে ওঠেন, যদিও তিনি 'সমকামী' হওয়ার মানে কি তা জানতেন না। সাঈদ বুঝিয়ে বলার পর তার মা বিমূঢ় হয়ে পড়েন। সুযোগ পেলেই সাঈদ যেহেতু তুলনা করেন, এক্ষেত্রেও বাড়ির মালিক ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার তুলনা না করে তিনি ছাড়েননি।

১৯৭১ সালে সাঈদের বাবা এবং ১৯৯০ সালে তার মা মারা যান; মার মৃত্যুর দেড় বছর পর তার ক্যান্সার ধরা পড়ে। ১৯৯২ সাল থেকে তিনি ভারতীয় ডাক্তার কান্তি রায়ের চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার মাও মারা যান ক্যান্সারে, যুক্তরাষ্ট্রে। সাঈদের মতে, মরণব্যাধি ক্যান্সার ও নিদ্রাহীন রাত পার করার উত্তরাধিকার মার সূত্রেই তার পাওয়া। প্রহরের পর প্রহর কেটে যায় রাতে, তার ঘুম আসে না। আত্মজীবনী তিনি লেখা ধরেন ১৯৯৪ সালে, কিমোথেরাপি নেবার সময় থেকে; লেখা শেষ করার পর জেরুজালেম ও কায়রো ঘুরে আসেন। 'বাসভূমহীন' বা 'বাসভূমের বাইরে' শিরোনামের এই আত্মচরিতে এডওয়ার্ড সাঈদ তার সূর্যাস্ত বেলার উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করেছেন। নিদ্রাহীন,ক্যান্সার আক্রান্ত, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মহৎ ভাবুক এডওয়ার্ড সাঈদ জীবনের উপান্তে পৌঁছে স্বাভাবিক স্বদেশ ও খাঁটি একখানা বাড়ির স্বপ্ন দেখেন না; প্যালেস্টাইন, কায়রো ও বৈরুত থেকে একের পর এক উচ্ছেদ হওয়া এক নিত্য ভ্রাম্যমাণ পরিবারের সন্তান নিজ বাসভূমের বাইরে বহু বহু দূরে নিউইয়র্কের পরবাসী জীবনে বিদায় সন্ধিক্ষণের প্রহরগুলো অতিক্রম করে চলেছেন। বই, বুদ্ধির উত্তাপ ও সজাগ চৈতন্য নিয়ে নিউইয়র্কের কোন একবাড়ির মধ্যে থেকেও ঠিক বাড়ির মধ্যে না থাকার এ জীবনের প্রতি এডওয়ার্ড সাঈদ এখন অনেক বেশিকৃতজ্ঞ, দরদী, লুব্ধ।

'বাসভূমের বাইরে' এ সময়ের একটা অসাধারণ বই।[১] মরণব্যাধিতে আক্রান্ত না হলে এ বই সাঈদ হয়ত লিখতেনই না। সাঈদের 'আত্মচরিতে'র প্রতিপাদ্য আলোচনার পর এখন বইটির সমালোচনামনস্ক পাঠে প্রবেশ করা অসঙ্গত হবে না। 'আত্মচরিত' পড়ায় আগ্রহ নেই সাহিত্যে এমন লোক বিরল। আমিও এর ব্যতিক্রম নই। সাহিত্যে 'আত্মচরিতে'র স্থান স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। 'আত্মচরিততে'র এজেন্ডা এক নয়, অনেক এবং পৃথিবীর সাহিত্যে যেসব বিখ্যাত 'আত্মচরিত' লেখা হয়েছে– সেই সন্ত অগাস্টিনের পর থেকে– তা বিষয় নির্বাচনের ধরন, শৈলীগত পরিচর্যা, লেখন ও অবয়বসৌষ্ঠবের দিক

www.pathagar.com

অবশ্যই এক নয়। তবে মুখ্যত আত্ম আবিষ্কারের গল্প বলাই আত্মচরিতের কাজ। সাধারণভাবে 'শৈশব' এক প্রধান অংশ জুড়ে থাকে আত্মজীবনীর, 'বাসভূমের বাইরে' বইটিও তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য নেয় না। 'বর্তমান' বেশিরভাগ আত্মচরিতেই অনুপস্থিত, এর কারণ সম্ভবত এই যে 'বর্তমান' এত নিকটে যে তাকে অনুধাবন ও বর্ণনা করা দুরূহ। 'আত্মচরিত' 'আত্ম' বিষয়ক, অর্থাৎ এর কেন্দ্রে 'আমি'ই প্রধান; কিন্তু 'স্মৃতিকথা'য় 'আত্ম' নয় 'পর'ই মুখ্য। আত্মচরিতে 'পর'-এর উপস্থিতি ও ভূমিকা আলঙ্কারিক আবহের বেশি নয়। আত্মচরিত ও স্মৃতিকথা একই বইতে জড়াজড়ি করে থাকতে পারে, কিন্তু তবুও তত্ত্বগত দিক থেকে এ দুটো ভিন্ন ও বিশিষ্ট। 'ব্যক্তি' নিজের বিকাশ ও বেড়ে ওঠাকে নিজে কিভাবে অনুধাবন ও বর্ণনা করেন, আত্মচরিত পাঠে সেটাই থাকে আমাদের প্রধান কৌতূহল। এমন 'আত্মচরিত' লেখা হতেই পারে, হয়েছেও, যা একই সঙ্গে স্মৃতিকথাও– যেমন উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বিখ্যাত আত্মজীবনীকার কারডিনার নিউম্যানের 'আপলোজিয়া' (Apologia Pro Vita Sua, 1864)।

আত্মচরিতের বিষয় 'আত্মসত্তা' এবং এর আবিষ্কারই হল এর লক্ষ্য। আত্মসত্তা আবিষ্কারের প্রধান প্রক্রিয়া হল quest and conversion : অন্বেষণ ও পথান্তর। জেরুজালেম থেকে কায়রো এবং কায়রো থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত এডওয়ার্ড সাঈদের দেশ, নিবাসের, বাড়ি ও ঠিকানা বদলের বিবরণের মধ্য দিয়ে আমরা এক র‍্যাডিকাল নির্বাসিত ভাবুকের আত্মসত্তার ক্রমবিকাশ ও আত্মপরিচয়ের সংঘাতমুখর ক্রমরূপান্তরের কাহিনি লক্ষ্য করি। অক্লান্ত এডওয়ার্ড সাঈদের দৃষ্টিতে 'বুদ্ধিজীবী'র কর্তব্য হল 'ক্ষমতার কাছে সত্য উচ্চারণ করা', কিন্তু অনেক দীর্ঘ অন্বেষণ ও পথান্তরের ভেতর দিয়েই তিনি আত্মপরিচয়ের সেই মীমাংসিত মুহূর্তে পৌঁছান যখন তাঁর সম্ভবপর হয়ে ওঠে অমন গভীর ও প্রগাঢ় উক্তি। কিন্তু অন্বেষণ ও পথান্তর একেকজনের জীবনে একেকভাবে ঘটে এবং প্রত্যেক মানুষের জীবনেই একটা কোন গল্প আছে। এমনকি সবচেয়ে সাধারণ যে মানুষটি, তারও। সে গল্প হয়ত আমরা জানি না, জানব না, কেননা তা লিপিবদ্ধ হয় না। আমরা জানি এবং পড়ি স্মরণীয় মানুষের গল্প। চরিত ও আত্মচরিত আমাদের অবলম্বন। কিন্তু আত্মচরিতের বিষয় যেহেতু চরিতকার নিজে, তাই উপাত্ত নির্বাচন ও আখ্যান নির্মাণে তার ক্ষমতা সার্বভৌমিক। সেজন্য 'সত্যের' যে বিবরণ আমরা পাই আত্মচরিতে তা কখনো কখনো একেবারে মিথ হয়ে উঠতে পারে; আত্মজীবনীর সূচনায় সে কথা সাঈদ নিজেও স্বীকার করেছেন। বইটি সাঈদের আত্মজীবনীর সঙ্গে তার মেয়ের লেখা বাবার চরিত তুলনা করে দেখতে কৌতূহলী পাঠককে অনুরোধ করি। পিতা-মাতা পরিবার ও অন্যান্য সম্পর্কসূত্রের যে জটিলতা ও পর্যালোচনা সাঈদের আত্মবিকাশের পটভূমি হিসেবে আমরা পাই এই বইটিতে, তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু তা শেষাবধি তারই, সাঈদের, সার্বভৌম নির্বাচিত বৃত্তান্ত। উপাত্তের ওপর তার কর্তৃত্ব অবিসংবাদিত– যা বলেছেন এবং যা বলেননি, দুয়ের উপরই তার নিয়ন্ত্রণ ষোলআনা, যেমনিভাবে আর সব আত্মচরিতকারদের আত্মচরিত কেবলি কিছু ঘটনা বা গল্পের সমাবেশ নয়, তার নির্বাচন ও সাজানোও। লেখক সার্বভৌম, যেমন লেখকের কর্তৃত্ব, তেমনি এর বিবরণেও; অর্থাৎ আত্মচরিতে আমরা সম্পাদিত গল্প পাই, কখনো কখনো সংশোধিতও; অন্যদিকে বিবৃতির দিক থেকে তা নিরপেক্ষভাবে অনুপুঙ্খ নয়। সাঈদের 'আত্মচরিতে' তার মা-

www.pathagar.com

বাবাকে মনে হয় প্রচণ্ডভাবে কর্তৃত্ববাদী, খুব ভিন্ন, ব্যতিক্রম; কিন্তু অভিবাসী পরিবারের মন ও জীবন নিয়ে নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণাকর্ম পাঠ করলে বোঝা যায় এটা মোটেও ব্যতিক্রম বা উদ্ভট নয়, একটা সাধারণ সত্য। লেখকের বিশেষ মন ও দৃষ্টিকোণের প্রবল হস্তক্ষেপ ও কর্তৃত্বের কারণে কোন আত্মজীবনীই শেষ পর্যন্ত জীবনের সম্পূর্ণ সত্য তুলে ধরার ক্ষমতা রাখে না। এটি 'আত্মচরিত' নামক সাহিত্যপ্রকরণের একটি মৌলিক সীমাবদ্ধতা কিন্তু এই সীমাবদ্ধতার ফলেই আমরা সত্যের কিছু বিশেষ অংশের প্রকট উদ্ভাসন দেখি। তাতে 'সত্য' বিষয়ে আমাদের সংশয় জাগে না, কিন্তু সত্যের স্বভাব সম্পর্কে আমাদের ধারণা প্রসারিত হয়; আমরা ভাবতে শিখি, সত্যের একক অখণ্ড রূপের কল্পনার সত্যিই কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। এডওয়ার্ড সাঈদের আত্মজীবনীতে কি আছে এবং কি নেই তা নিয়ে আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, কিন্তু 'আত্মচরিত' নিয়ে ও ধরনের প্রশ্ন নতুন নয়। জন স্টুয়ার্ট মিলের আত্মচরিতে (১৮৭৩) তার বাবা অবিস্মরণীয় মহাপুরুষ হিসেবে চিত্রিত হলেও নিজের মা সম্পর্কে এই উদারতন্ত্রী ভাবুকের বিস্ময়কর নীরবতা আমাদের এখনো অবাক না করে পারে না।

তথ্যসূত্র

১. Edward W. Said, Out of Place, New York, 1999.

২. Roy Pascal, Design and Truth in Autobiography, Routledge & Kegan Paul.1960, P.5.

৩. A. O. J. Cockshout, tha Art of Autobiography in 19th and 20th Century England, Yale Univesity Press, 1984, P.3.

৪. Iz. Edard W. said, Representations of the Intellectual Vintage Books, New York, 1994.

৫. Katharine Tait, My father bertrand Russell, Harcourt, Brace Jovanovich, 1975.

সংবাদ, ১৩ জুলাই ২০০০

'ঘরেরও নয় পারেরও নয়'
এডওয়ার্ড সাঈদের *আউট অফ প্লেস*

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

যারা এডওয়ার্ড সাঈদের *ওরিয়েন্টালিজম* (১৯৭৮) গ্রন্থটি পড়েছেন এবং যারা তাঁর উত্তর-উপনিবেশী নানা চিন্তা-ভাবনাকে অনুসরণ করেন, প্যালেস্টাইন সম্বন্ধে তাঁর লেখালেখি ও তাঁর মানবতাবাদী বিশ্বাসের সঙ্গে যাদের পরিচয় রয়েছে এবং যারা তাঁর গৃহহীনতার বেদনাকে বুঝতে চান, তাদের জন্য *আউট অফ প্লেস* অবশ্যপাঠ্য। এ বইটি সাঈদ লিখতে শুরু করেন ১৯৯৪ সাল থেকে – এর মাত্র তিন বছর আগে তাঁর শরীরে লিউকোমিয়া ক্যান্সার ধরা পড়ে। মৃত্যু নিয়ে তাঁর কোনো ভয় অথবা অতৃপ্তি ছিল না, তবুও ক্যান্সারের চিকিৎসা যখন চলছে এবং মাঝে মাঝে উন্নতির কিছু লক্ষণও দেখা যাচ্ছে, সাঈদ জেনে নিয়েছেন মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে তাঁর জন্য। একটা তাড়া তিনি অনুভব করেছেন এবং লিখতে বসেছেন আত্মজীবনী। তবে এ বইতে পুরো জীবনটাকে তিনি তুলে ধরেননি, এর ব্যাপ্তি মাত্র তাঁর জন্ম (১৯৩৫) থেকে শুরু করে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্যে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে বেরুনো পর্যন্ত – অর্থাৎ জীবনের প্রথম সাতাশটি বছর। এরপর ১৯৯৪ সালে এই উপন্যাস লিখতে শুরু করা অথবা ২০০২ সালের অক্টোবরের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর জীবন ছিল সক্রিয়তার, সাফল্যের এবং ব্যাপক পরিচিতির। *ওরিয়েন্টালিজম* তাঁকে যে খ্যাতি এনে দিয়েছিল পরবর্তীতে আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ তা অনেক পরিব্যাপ্ত করেছে। প্যালেস্টাইন-প্রশ্নে সাঈদ এক দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলে, যা তাঁকে ওই ভূখণ্ডের নির্যাতিত মানুষের এক মুখপাত্রে পরিণত করেছিল এবং একই সঙ্গে ইহুদীবাদীদের চোখে এক বৈরী অবস্থানে বসিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই দীর্ঘ সক্রিয়তা, খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা/বৈরিতা এবং একজন মৌলিক চিন্তাবিদ হিসেবে তাঁর দৃঢ় একটি অবস্থানের কাহিনী রয়ে গেল ওই আত্মজীবনীর বাইরে। সাঈদের হাতে অবশ্য সময় ছিল না, আক্ষরিক অর্থেই, এবং তাঁকে অন্যান্য অনেক কাজও করতে হয়েছে ওই পাঁচ বছর, সংবাদপত্রে প্যালেস্টাইন প্রশ্নে অন্তহীন লেখালেখি যেমন (তাঁর লেখা কলামের সংখ্যা কয়েক হাজার ছিল বলে একটি ওয়েবসাইট জানাচ্ছে)। তবে, জীবনের সাতাশ বছরের বৃত্তান্তের ভেতরেই তিনি তাঁর নিজেকে নিয়ে পিতা-মাতাকে নিয়ে; দেশ ও দেশহীনতা, স্থান ও স্থানচ্যুতি নিয়ে; রাজনীতি ও সময় এবং জীবন, অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব নিয়ে তাঁর যে অনেক প্রশ্ন ছিল, ক্ষোভ ছিল, উপলব্ধি ছিল সেগুলোর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলেনি,

www.pathagar.com

অনেক নিবিড় উপলব্ধি এবং উস্কে দিয়েছে বেদনা অথবা কষ্টের অনুভূতিকে– কিন্তু সাঈদ জীবনস্মৃতির কোনো পাতাকে আড়াল রাখতে চাননি। নিজের গড়ে ওঠার একটা বিস্তৃত সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাহস ও সততার সঙ্গে তিনি বর্ণনা করেন তাঁর বালকবেলা এবং যৌবনের ঘটনাগুলো, খোলামেলা মন্তব্য করেন তাঁর পিতা ও মাতা সম্পর্কে, ব্যাখ্যা করেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর জটিল সম্পর্ককে। জন্মস্থান জেরুজালেম থেকে নিয়ে কায়রো অথবা লেবাননের পাহাড়ি গ্রাম ধুর-আল-শোয়োর – যেখানে অনেকগুলো গ্রীষ্ম কাটিয়েছে ওয়াদি সাঈদের পরিবার – অথবা গেজিরা প্রিপেরাটরি স্কুল, ভিক্টোরিয়া কলেজ, মাউন্ট হার্মন স্কুল, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি : যেখানেই শৈশব ও যৌবনের কিছুটা হলেও সময় কেটেছে সাঈদের, সেইসব শহর অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছবি অত্যন্ত দক্ষ হাতে ফুটিয়ে তোলেন তিনি, যেন তাঁর নিজস্ব ইতিহাসের পুরোটা অঞ্চল জুড়ে তারা যে ছায়া ফেলেছে, তার অতি সামান্যও যেন মুছে না যায়।

আউট অফ প্লেস (লন্ডন : গ্রান্টা বুকস, ১৯৯৯) আত্মজীবনীর একটি খণ্ড অবশ্যই, কিন্তু একই সঙ্গে একটা সময়ের এবং ইতিহাসের পুনর্নির্মাণও বটে। রাজনৈতিক কিছু ঘটনাপ্রবাহের বিচিত্রমুখী অভিঘাতের একটি সংবেদনশীল চিত্রও এ বইটি। তত্ত্বের অঞ্চলে যারা ন্যাশন – দেশ বা জাতি – এবং নির্বাসন, ক্ষমতা ও জ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক এবং নিম্নবর্গীয়ের নিষ্পেষণ নিয়ে অনুসন্ধান করেন অথবা উৎপ্রেক্ষার জগতে যারা গৃহ ও গৃহহীনতা, অস্তিত্বের শেকড়-বাকড় অথবা মানুষে মানুষে সম্পর্কের গূঢ়ার্থগুলো অন্বেষণ করেন, তাদের জন্য *আউট অফ প্লেস* অনেক চিন্তার জোগান দেয়। কিন্তু বর্ণনা বা আখ্যানের একটা অন্তরঙ্গ পর্যায়েও এই বইটি পাঠকের মনোযোগ ক্রমাগত অধিকার করে রাখে। ১৯৯৯ সালে প্রকাশের পর এটি নন-ফিকশনের জন্য নিউইয়র্কার বুক অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। সাঈদের ভাষাটি অজটিল এবং আকর্ষণীয়, দৃশ্যকল্পের সরল বিস্তার পাঠককে ঘটনা থেকে ঘটনায় নিয়ে যায় অবলীলায়, তবে দৃশ্যের অভ্যন্তরে অনেক চিন্তার উপাদান জড়ো হয়, ইতিহাস ও সময়ের অনেক অনুষঙ্গ মূর্ত হয়, তাদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক সময় সাঈদ কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক; অনেক সময় কৌতুক অথবা আয়রনির ব্যবহারে বর্ণনাটিকে তীর্যক করে তোলেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর অনুভূতির তীব্রতাটা আন্দাজ করা যায়। এটি আয়েশ করে পড়ার মতো বই নয় – এর সঙ্গে একটা কথপোকথন চলে পাঠকের, এমনকি যিনি তাঁর বিশ্বাস থেকে দূরে, তারও।

২

আউট অফ প্লেস নামটি একটা ব্যাখ্যা দাবি করে শুরুতেই। সাঈদ লিখেছেন এ বইতে তিনি চেষ্টা করেছেন 'বলতে গেলে হারিয়ে যাওয়া অথবা ভুলে যাওয়া' জগতের ব্যক্তিনিষ্ঠ একটি খতিয়ান তুলে ধরতে (ভূমিকা)। এই জগৎটি আড়াআড়িভাবে বিস্তৃত রাজনীতি এবং ইতিহাসের একটি জগতের ভেতরে, যার এপিসেন্টার হচ্ছে প্যালেস্টাইন। অতএব, সাঈদ ওই ভূমিকাতে জানান, 'মধ্যপ্রাচ্যের ওই তুমুল বছরগুলোর একটা আনঅফিসিয়াল ব্যক্তিগত বিবরণও এই বইটি'। এ বইতে রাজনীতির অবস্থান কেন্দ্রীয় নয়, তবে প্রান্তিকও নয় – বিষয়টি নির্ভর করে রাজনীতির কি সংজ্ঞা আমরা নির্মাণ করি, তার ওপর।

www.pathagar.com

স্কুলে যখন ইংরেজ শিক্ষক অকারণে শাস্তি দেন তাঁকে; অথবা তাঁর বাবা একটা বনেদি ক্লাবের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও যখন আরেক ইংরেজ তাঁকে ক্লাবের জমিতে অনুপ্রবেশের জন্য ধমক দেয়, তখন উপনিবেশ, উপনিবেশী শাসন এবং উপনিবেশী প্রজা নির্মাণ বিষয়ে তাঁর যে উপলব্ধি হয়, তাকে বুঝতে হলে রাজনীতির শরণ নিতে হয় আমাদের। *আউট অফ প্লেস* যখন লেখেন সাঈদ, তখন রাজনীতি বিষয়টি নিয়ে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত তাঁর নেয়া হয়ে গেছে; ন্যাশন ও নির্বাসন, উপনিবেশ ও উপনিবেশী শাসন, প্যালেস্টাইনিদের রাষ্ট্রচ্যুতি ও এন্তফাদা নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা ও তত্ত্বে তিনি পৌঁছে গেছেন। কাজেই *আউট অফ প্লেস*-এর পরোক্ষে সেগুলো যে ক্রিয়াশীল থাকবে না, এর রাজনৈতিক বিষয়- কেন্দ্রটিকে প্রভাবিত করবে না, এ রকম ভাবার কোনো কারণ নেই। 'আউ অফ প্লেস' কথাটিকে সোজা বাংলায় স্থানচ্যুতি বললে একটা ছবি পাওয়া যায় সাঈদের মনোবেদনার। তবে এ শুধু স্থানচ্যুতির বিবরণ নয়, বরং একটা জায়গাকে নিজের করে নেবার জন্য যে মানসিক ও আবেগগত বিনিয়োগ প্রয়োজন তার একটা বর্ণনাও বটে। এবং অনেক বিনিয়োগের পর যখন হঠাৎ জায়গাটি বেদখল হয়ে যায় অথবা হারিয়ে যায়, তখন মনে যে ক্ষোভ জন্মে তার বর্ণনা আছে এ বইটিতে। *আউট অফ প্লেস*-এর অনেকখানি জুড়ে আছে সাঈদের দলছুট অভিজ্ঞতাগুলো অথবা একটি পরিচিত, 'স্বাভাবিক' বলয়ে সন্নিবদ্ধ হতে না পারার কষ্টকর বিবরণ। বৃত্তের বাইরে তিনি রয়ে গেছেন নামের কারণে, জাতীয়তার কারণে, ধর্মের কারণে, ভূগোল-ইতিহাস এবং রাজনীতির প্রতিকূল নানা অবস্থানের কারণে। 'সাঈদ' নামটির ইতিহাস তাঁর পক্ষে যায়নি, যেমন যায়নি তাঁর আরব জাতীয়তা অথবা তাঁর ধর্ম – সাঈদ ছিলেন অ্যাংলিকান – এবং আত্মজীবনীর এক স্থানে যেমন তিনি বলেছেন, তাঁর শারীরিক গঠন অথবা রং ছিল অনেকের থেকে আলাদা। স্কুলে সমবয়সীদের থেকে মাথায় উঁচু ছিলেন, কিন্তু চালচলনে সাবলীল ছিলেন না। ক্লাসে মনোযোগী ছিলেন না, গোলমেলে ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এসব কারণে নিজেকে আবিষ্কার করেছেন বৃত্তের বাইরে অথবা বড়জোর প্রান্তে। তাঁর চরিত্র গঠনে বিশাল প্রভাব ফেলেছে এই বৃত্তের ভেতরে সংহত হতে না পারার ক্ষোভ অথবা শুধুই উদাসীনতা।

সাঈদের বাবার নাম ছিল ওয়াদি ইব্রাহীম এবং তাঁর জন্ম হয়েছিল জেরুজালেমে। মায়ের নাম ছিল হিল্ডা মুসা, তাঁর দেশ ছিল লেবানন এবং জন্ম হয়েছিল নাজারেথ-এ। সেই হিসেবে সাঈদের নাম হওয়ার কথা ছিল এডওয়ার্ড ইব্রাহীম। কারণ তাঁর কোনো পিতামহের নাম সাঈদ ছিল না। এ নামটি ওয়াদি গ্রহণ করেন। সাঈদের অবশ্য এই আরব নামে আপত্তি ছিল না – ছিল 'এডওয়ার্ড' নামটিতে। ১৯৩৫ সালে সাঈদের জন্মের বছরে প্রিন্স অব ওয়েলস এডওয়ার্ড জেরুজালেম সফরে যান। তখন এই নামটি গ্রহণ করা হয় সাঈদের জন্যে। আত্মজীবনীতে সাঈদ জানাচ্ছেন, 'এডওয়ার্ড নামে ধাতস্থ হতে তাঁর পঞ্চাশ বছর সময় লেগে যায়। এই নামকরণটি কিছুটা কৌতুকের বলেও মনে হয়েছে তাঁর কাছে। কারণ সাঈদের বাবা ছিলেন আমেরিকার একজন একনিষ্ঠ সমর্থক, ব্রিটিশদের কখনো প্রীতির চোখে দেখেননি তিনি। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ওয়াদি বছর দশেক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে। নাগরিকত্ব নিয়েছেন সে-দেশের এবং প্রথম মহাযুদ্ধে সামরিক বাহিনীতে যোগও দিয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল যুক্তরাষ্ট্রে থেকে গিয়ে আইন পেশায়

www.pathagar.com

যোগ দেবেন, কিন্তু তাঁর মায়ের অনুরোধে প্যালেস্টাইন ফিরে আসেন। এডওয়ার্ড নামটি তাঁরও পছন্দ হওয়ার কথা নয়, অথচ সাঈদের জন্য এটিই নির্বাচিত হলো। পারিবারিক নামটি মাত্র এক প্রজন্মের, ক্রিশ্চান নামটি ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের নামবৃক্ষ থেকে ধার করা– এরকম এক নাম– পরিচিতির জটিলতা নিয়ে এডওয়ার্ড সাঈদের যাত্রা শুরু হলো জীবনে।

এবং এই বিভ্রম অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখা দিল, তাঁকে 'জায়গা' থেকে সরিয়ে দিল। যেমন ভাষা। সাঈদ তিনটি ভাষা জানতেন – আরবি; ইংরেজি এবং ফরাসি। আরবিতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন এবং মায়ের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন যে, আরবিতে অন্তত অর্ধেকটা সময় কথাবার্তা বলতেন তিনি। হিল্ডা ভালো ফরাসি জানতেন, কায়রোতে 'জাতে ওঠার জন্য' অন্য মহিলারা যখন ফরাসি বলার জন্য অস্থির থাকতেন, তখনো হিল্ডা আরবিতে অথবা ইংরেজিতে কথা বলতেন। সাঈদ যেসব স্কুলে গিয়েছেন, আরবি বলার অনুমতি ছিল না সেসব স্কুলে। ফলে আরবি না ইংরেজি, কোনটা ছিল তাঁর প্রথম ভাষা– এ নিয়ে বহুদিন বিভ্রম ছিল। এক সময় তাঁর এরকমও মনে হয়েছিল, দুটির কোনোটিই যেন তাঁর প্রথম ভাষা নয়। কায়রোতে যখন ছিলেন সাঈদ, হিল্ডার আরবিকে তাঁর মনে হতো 'সাবলীল ইজিপশিয়ান'। অথচ এই কায়রোতে তাঁরা মূলধারায় কখনো স্থিত হতে পারেননি। মিশরে যেসব আরব অন্য জায়গা থেকে এসে থাকতেন, বিশেষ করে সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন ও প্যালেস্টাইন থেকে, তাদের বলা হতো শামি। তাদের ভাষাকেও বলা হতো শামি। ওয়াদির পরিবার ছিল শামি অর্থাৎ বহিরাগত। অনেক পরে, যখন গামাল নাসের ক্ষমতায় আরোহণ করেন মিশরে এবং তাঁর নিজস্ব মার্কার আরব সমাজতন্ত্রের প্রচলন করেন, কায়রো হঠাৎ খুব রক্ষণশীল হয়ে পড়ে বিদেশীদের ব্যাপারে। ইউরোপ-আমেরিকা তো ভিন্ন কথা, এই শামিদের ক্ষেত্রেও মনোভাব দ্রুত পালটায়। ওয়াদি ইব্রাহীম/সাঈদ-এর রমরমা ব্যবসা ছিল অফিস সাপ্লাই, বই ইত্যাদির। সেই ব্যবসায় ধস নামে, সাঈদদের ছাড়তে হয় কায়রো। এই একটা পরিচিত 'জায়গা' থেকে চলে যাওয়া, এই নির্বাসন – এখানেও সেই বৃত্তের বাইরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার গল্প। আত্মজীবনীর শুরুতেই তাই সাঈদ জানাচ্ছেন, 'আমি অনেক পরিচিতির একটি অস্থিতিশীল অনুভূতি ধরে রেখেছি মনে, যেগুলোর বেশিরভাগ একে অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত, সারা জীবন, এবং একই সঙ্গে আমার এক হতাশার অনুভূতির কষ্টকর স্মৃতিও মনে আছে, যখন আমি ভাবতাম, আমি যদি পুরোপুরি আরব হতাম অথবা পুরোপুরি ইউরোপীয় অথবা আমেরিকান অথবা পুরোপুরি অর্থোডক্স ক্রিশ্চান অথবা পুরোপুরি মুসলমান অথবা পুরোপুরি মিশরীয় অথবা এরকম' (৫ পৃ:)। এই যে হাইফেন–সংযুক্ত পরিচিতি, সিকি অথবা আধা পরিচিতি, তাতে তাঁর অস্তিত্বের একটা সংকটই সৃষ্টি হয়েছিল। তুমি কে? তুমি কি? এরকম যখন প্রশ্ন উঠত, সাঈদ হয়তো বলতেন, আমি আমেরিকান অথবা আরব কিন্তু উত্তরে বলা হতো, 'কিন্তু সাঈদ তো আরব নাম', 'তুমি একজন আমেরিকান কিন্তু কোনো আমেরিকান নাম ছাড়া, আর তুমি কোনোদিন আমেরিকাতেও যাওনি।' 'তোমাকে দেখতেও আমেরিকান মনে হয় না।' 'তুমি একজন আরব বটে, কিন্তু কি ধরনের? প্রোটেস্টান্ট?' (৫-৬ পৃ:)।

আউট অফ প্লেস– অর্থাৎ ঘরে থেকেও গৃহচ্যুত ছিলেন তিনি। বস্তুত আত্মজীবনীর এক

বড় অংশ জুড়ে আছে তাঁর বেড়ে ওঠার কঠিন সংগ্রামের বিবরণ। এই সংগ্রাম ছিল তাঁর বাবার কঠিন ব্যক্তিত্ব, তাঁর অনুশাসন, তাঁর নিয়ন্ত্রণ, তাঁর উদাসীনতা এবং তাঁর দূরবর্তিতার ফলে সৃষ্ট প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। 'আমার বাবা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের, যুক্তিবাদী শৃঙ্খলা এবং অবদমিত আবেগের এক বিধ্বংসী মিশ্রণ', সাঈদ লিখেন (১২ পৃ:)। ছোটবেলা থেকে কুড়ি ছাড়িয়ে যাবার পরও অনেক বছর সাঈদকে নিয়ন্ত্রণ করতেন ওয়াদি। বাবার সঙ্গে দূরত্ব ছিল এবং সেটি অতিক্রম্য মনে হতো যখন তিনি তাঁর চাওয়া-পাওয়াকে চাপিয়ে দিতেন সাঈদের ওপর, এবং তাঁর 'কখনো হার না মানার' মন্ত্রে সাঈদের জীবনকে চালিত করতে চাইতেন। সাঈদ অনেকটা ক্ষোভের সঙ্গে জানান, তাঁর অবসর অথবা আরামের কোনো ধারণাই ছিল না ছেলেবেলায়। বাবার ক্ষমাহীন দৃষ্টির নিচে নিজেকে একটা উঁচু জায়গায় তুলে ধরার অবিরাম চেষ্টা তাঁকে প্রতিবাদী করেছিল, যে প্রতিবাদ স্কুলের 'দুষ্টু' ছেলে হওয়ার মধ্য দিয়ে এবং এক সময় নিজের পছন্দমতো বিষয় পড়া ও নিজের মতো এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছার মধ্যে প্রতিফলিত হতো। তবে মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটা অনেকটাই সহজ ছিল তাঁর – শুধু তাঁর কাছেই মুখ্যত তার আবেগগত সঙ্গের জন্য ফিরতেন সাঈদ। তবে আত্মজীবনীতে তিনি এ-ও বর্ণনা করেছেন, কিভাবে মায়ের কতগুলো অভ্যাস, বিশ্বাস অথবা চর্চা প্রগাঢ় প্রভাব ফেলেছিল তার জীবনে। হিল্ডা সাঈদের ছিল ঘুমহীনতার ইতিহাস, যার বেশিরভাগ স্বসৃষ্ট; ছিল একটা কাজ ঠিকমতো না হলে এর বিকল্প কি হতে পারে সে নিয়ে 'অবশ করার মতো উদ্বেগ', এক গভীর অস্থিরতা অথচ তা সত্ত্বেও মানসিক এবং শারীরিক প্রাণশক্তির এক অফুরন্ত সরবরাহ; নিঃসঙ্গতাকে একই সঙ্গে মুক্তি এবং অসুখের প্রকাশ হিসেবে নানাভাবে প্রতিপালন করা – এ-সবই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। মায়ের মতো সংগীতের প্রতি এক প্রবল টান ছিল সাঈদের। অথচ সাঈদের ভাষায়, 'পৃথিবী এবং আমার প্রতি মায়ের ছিল এক প্রগাঢ় এবং অনিষ্পন্ন দ্বিমুখীতা।' মা তাঁর থেকে চাইতেন 'ভালোবাসা এবং ভক্তি এবং সেগুলো দ্বিগুণ-চারগুণ করে ফেরত দিতেন; অথচ হঠাৎ করে তা ফিরিয়েও নিতে পারতেন, যার ফলে আমার মধ্যে তৈরি হতো এক আধিবিদ্যক ভীতি'। বস্তুত হিল্ডা সাঈদের 'শক্তিদায়ী হাসি এবং তার শীতল মুখভঙ্গি অথবা তার নাকচকারি ভ্রূকুঞ্চনের মাঝখানে' বালক সাঈদের অস্তিত্ব ছিল একই সঙ্গে 'একজন সৌভাগ্যবান এবং আশাহীনভাবে দুর্দশাগ্রস্তের, কখনো পুরোপুরি একটি অথবা পুরোপুরি অন্যটি নয়' (১৩ পৃ:)।

এই মাঝখানের জীবনকে তিনি অনেকটা স্বতঃসিদ্ধই ধরে নিয়েছিলেন। একে পরিবর্তন করার ইচ্ছা অথবা প্রত্যয় যে তাঁর মধ্যে ছিল না, তা নয়। কিন্তু পরিস্থিতি অথবা ইতিহাস কখনো তাঁর অনুকূলে ছিল না। জেরুজালেমে জন্ম হয়েছে তাঁর, কিন্তু জেরুজালেমে থাকেনি তাঁর ফিরে যাবার মতো একটি স্থায়ী ঠিকানা। ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝিতেই ওই শহরের পুরনো অধিবাসীদের সরিয়ে ইহুদি অভিবাসীদের দিয়ে শহরটা ভরে ফেলা হয়। সাঈদ লিখেছেন, তিনি জেরুজালেমের যেখানটায় জন্মেছিলেন, সময় কাটিয়েছেন এবং যাকে তিনি ঘর বলে ভাবতেন, সেই জায়গাটা পুরোপুরি দখল করে নিয়েছিল পোলিশ, জার্মান এবং আমেরিকান অভিবাসীরা, যারা শহরটা 'জয় করে ফেলে এবং তাকে পরিণত করে তাদের দৃষ্টান্তহীন সার্বভৌমত্বে, যাতে প্যালেস্টাইনি জীবনের কোনো জায়গা ছিল

www.pathagar.com

না' (১১১ পৃ:)। ঘর হারানোর এই বেদনা সাঈদ সারাজীবন বয়ে বেড়িয়েছেন বলে তিনি জানেন প্যালেস্টাইনের আদিবাসীদের তা কতটা ক্ষুব্ধ এবং মরিয়া করে তুলেছিল। যারা প্যালেস্টাইনের আরবদের নিজের জীবনের খণ্ডিত টুকরোগুলোকে জোড়া লাগাবার সংগ্রামকে – যা অনেক সময় রক্তাক্ত হতে বাধ্য – একটি নেতিবাচক চাদর-বর্ণনায় 'উগ্রপন্থী' বলে শ্রেণিবদ্ধ করতে চান, তারা সাঈদের এই বর্ণনাটুকু পড়লে বুঝতে পারবেন *আউট অফ প্লেস* আসলে শুধু বুদ্ধিগতভাবে এই বঞ্চনার সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসার বিষয়টিকে শুধু নয়, বরং ঘরের জন্য মানুষের আদিম ও ঐতিহাসিক আবেগকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপিত করে। ঘরের সঙ্গে মানুষের আবেগ বড় গভীরভাবে জড়িত। সাঈদের মতো একজন তাত্ত্বিক, অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবীও তাঁর সাতাশ বছরের বর্ণনায় প্যালেস্টাইনের হারানোর অংশে এসে আবেগতাড়িত হন।

জেরুজালেমে জন্ম নিলেও সাঈদ শৈশবের একটা বড় অংশ কাটিয়েছেন মিশরে – কায়রোতে। সেখানে তাঁরা থাকতেন জামালেক নামে নীল নদের একটি দ্বীপে। সাঈদ তাকে বর্ণনা করেছেন একটি 'উপনিবেশী চৌকি' হিসেবে। জামালেকের ইউরোপীয় অধিবাসীরাই এর সামাজিক জীবনের ছন্দটি নির্দিষ্ট করে দিত, অথচ ওদের সঙ্গে আরবদের আদান-প্রদান, মেলামেশা ছিল সামান্যই। সাঈদরা ওর ভেতরেই নিজেদের জগৎটি তৈরি করে নেন। কিন্তু কায়রোর জীবনে অনেক ঘটনা, অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক পরিচয়ের সমাহার ঘটলেও শেষ পর্যন্ত তাকে ঘর বলে সাজিয়ে নিতে পারেননি সাঈদরা। পঞ্চাশের দশকেও, যখন সাঈদ পড়াশোনার জন্য আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে কায়রোতে আসতেন, এক ধরনের 'ঘরে ফেরার' মতো। কিন্তু ১৯৬০ সালে জেনারেল মোহাম্মদ নাগিবের কাছ থেকে নাসের ক্ষমতা নিয়ে নিলে ধীরে ধীরে সেই 'ঘরের' চরিত্র পরিবর্তিত হতে থাকে। বিদেশীদের প্রতি সরকার ও মানুষের আচরণ কঠিন হতে থাকে। সাঈদ ততদিনে অনেকটা আমেরিকান বনে গেছেন, তাঁর কথাবার্তায় আমেরিকান ইংরেজির সুর, তাঁর আচরণেও আমেরিকান প্রভাব, কাজেই তিনিও ওই বিদেশীদের কাতারেই পড়লেন। ওয়াদি সাঈদের ব্যবসায়ে বাধা এলো, বৈদেশিক মুদ্রার ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের ফলে তাঁর প্রচুর সমস্যা হতে লাগল। সেগুলো থেকে পরিত্রাণ পেতে তিনি চাতুরির আশ্রয় নিলেন। সাঈদ বাবার ব্যবসার সঙ্গে নামেমাত্র জড়িত ছিলেন। অফিস যেতেন যখন কায়রোতে থাকতেন, কিন্তু কাজ কিছুই ছিল না। কিন্তু বাবার অনুপস্থিতিতে তাঁকে একদিন একটা চুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়। চুক্তিটা ছিল অবৈধ, কাজেই সাঈদকে মাথায় ১৫ বছরের সাজার ভয় নিয়ে কায়রো ছাড়তে হয়। আরো পনেরো বছরের গৃহহীনতাকে তিনি দেখেছিলেন এক স্থায়ী নির্বাসন হিসেবে। জেরুজালেমের পর কায়রোকেও হারাতে হলো তাকে। আউট অফ প্লেস নয়তো কি!

অথচ আমেরিকাতেও যে তিনি ঘর খুঁজে পেয়েছিলেন, এমন নয়। সাঈদের বৃত্তের বাইরের জীবন ছিল আশ্চর্যজনকভাবে বন্ধুহীন। স্কুলে কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁর ছিল না। বাবা ও মা – উভয় দিকেই ছিল বিশাল কাজিন বাহিনী। তাদের সঙ্গে গ্রীষ্মে, অবকাশে, পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে অনেক সময় কাটিয়েছেন, অন্তরঙ্গতাও ছিল অনেকের সঙ্গে, কিন্তু সত্যিকার বন্ধুত্ব ছিল না বলতে গেলে কারো সঙ্গে। বাড়িতে মা ছিলেন একমাত্র বন্ধু। সাঈদের চারটি বোন ছিল, কিন্তু তাঁর আত্মজীবনীটি পড়লে মনে হবে, তারা কেউই

www.pathagar.com

তাঁর বড় বন্ধু ছিল না। সে জন্যে একাকিত্ব এবং নিঃসঙ্গতাকে সাঈদ মেনে নিতে পারতেন। নিজেকে নিয়ে থাকার একটা সামর্থ্যও তাঁর ছিল। কিন্তু ওই যে ছোটবেলা থেকেই হয় এটা নয় ওটা, কখনো পরিপূর্ণভাবে কোনোটা নয় – এরকম দুয়ের মাঝখানের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন সাঈদ, তাতে কোনো অস্তিত্বই তাঁকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণতা দেয়নি। [illegible] জন্যে ছোটবেলা থেকে বই হয়েছে তাঁর সঙ্গী, যৌবনে সাহিত্য এবং সংগীত এবং [illegible]ত বয়সে চিন্তা ও সক্রিয়তার জগতে ঘনিষ্ঠ অংশগ্রহণ তাঁকে দিয়েছে সান্ত্বনা। [illegible] তিনি ছিলেন মুসলমানদের মাঝখানে একজন ক্রিশ্চান, ইংরেজদের মাঝখানে [illegible]জন আরব এবং মিশরীয়দের মাঝখানে একজন শামি। আমেরিকাতে এসে [illegible]টটি আরেকটু বাড়ল। সেখানে তিনি নাগরিকত্বে আমেরিকান অথচ প্যা[illegible]ইন থেকে উঠে আসা একজন আরব। তাঁর ভাষা, উচ্চারণ, চেহারা, আচার-ব্যবহ[illegible] দেয় তিনি একজন বিদেশী। 'জাতীয়তা, পেছনের ইতিহাস, সত্যিকার শিকড় এবং অতীতের কর্মকাণ্ড এসবই ছিল আমার সমস্যার উৎস।' সাঈদ লিখেন, 'যেসব প্রেতাত্মা আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায় স্কুল থেকে স্কুলে, গ্রুপ থেকে গ্রুপে, অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে, তাদের আমি তাড়াতেই পারছিলাম না' (১৩৭ পৃ:)।

১৯৪৮ সালে ওয়াদি সাঈদের গুরুতর স্বাস্থ্যগত জটিলতা দেখা দিলে তাঁকে আমেরিকা নিয়ে যাওয়া হয়। সাঈদও সঙ্গে যান, তবে তাঁকে পাঠানো হয় মেইনের ক্যাম্প মারানাকুক-এ। সেখানে তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতা হয় পরিবারকে ছেড়ে এত দীর্ঘ সময়ের জন্যে কোথাও থাকার। এই ক্যাম্প তাঁকে নিঃসঙ্গতার মুখোমুখি দাঁড় করায় এবং তাঁকে প্রস্তুত করে পরিচিতির অনিশ্চিত পথে পদচারণায়। এরপর ১৯৪৯ সালে কায়রোর ভিক্টোরিয়া কলেজে যখন ভর্তি হন সাঈদ, তাঁর পরিচিতির সংকটটি নতুন একটি মোড় নেয়। এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এসেছিল বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্ম থেকে। কিন্তু আরবি বলায় নিষেধ ছিল, সাঈদ কলেজের পরিবেশকে বর্ণনা করেছেন 'অসহ্য' এবং 'নিষ্পেষণমূলক' হিসেবে। এর জগৎকে তিনি বলেছেন বর্ণশঙ্কর। ভিক্টোরিয়া কলেজ তাঁকে কোনো 'নৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামো' দেয়নি যা দিয়ে নিজেকে পরিমাপ করা যায়, যেন কলেজে ঢোকার আগেই তাঁকে বিচার করে ফেলা হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষকদের আচরণও ছিল নিন্দনীয়। কলেজে শারীরিক শাস্তির ব্যবস্থাও ছিল। তবে এতসব নেতির মধ্যে, সাঈদের বর্ণনায়, একটা ইতিবাচক অবদান ছিল কলেজটির। এখানে এসে তাঁর প্রত্যয় হলো, শিক্ষকদের ধারণা যেহেতু এতই নিচু, পরিশ্রম করে আর কি হবে, কাজেই নিজেকে খুব হাল্কা মনে হতো তাঁর, যেন প্রত্যাশার চাপ নেই, নিজেকে প্রমাণ করার দায় নেই। তাছাড়া ভিক্টোরিয়া কলেজে এসে বাবা-মার তৈরি পরিচিতির খোলসটা যেন আলগা হয়ে গেল। যে নৈতিক মানদণ্ড ছোটবেলা থেকে তাঁকে শিকলে বেঁধে রেখেছিল, তা গেল শিথিল হয়ে। কলেজের উপনিবেশী কাঠামো ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে শুরু হলো সাঈদের উত্তর-উপনিবেশী একটা প্রতিরোধ। কলেজ কর্তৃপক্ষ অবশ্য সাঈদের প্রতিবাদী আচরণকে দেখেছেন 'নষ্ট হয়ে যাওয়ার' আলামত হিসেবে। কলেজ থেকে তাঁকে বের করে দেওয়া হয়।

১৯৫১ সালে সাঈদকে পাঠানো হয় আমেরিকাতে, মাউন্ট হার্মন স্কুলে। সাঈদের জীবনে এই স্কুলটির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, এই স্কুল তাঁকে প্রকৃত অর্থে নিজের পায়ে

www.pathagar.com

দাঁড়াতে শিখিয়েছে। সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে তাঁর চিন্তাগুলোকে সংহত করেছে, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিষয়ে তাঁকে প্রতিবাদী একটি অবস্থান গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছে। এই স্কুলে পাঠানোর পেছনে তাঁর পিতা-মাতার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মধ্যে কাজের প্রতি একটি প্রোটেস্টান্ট নীতি-আদর্শিক নিষ্ঠা তৈরি করা। সাঈদ সেখানে ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত হবেন এরকম কোনো চিন্তা তাঁদের ছিল না। কিন্তু স্কুলটির ধর্মীয় পরিবেশ ছিল সাঈদের জন্যে শ্বাসরুদ্ধকর। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ডি. এল মুডিকে প্রায় সন্তজ্ঞানে ভক্তি নিবেদন করা হতো, তাঁর প্রদর্শিত ধর্মীয় পথে অগ্রসর হতে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত – বাধ্য না হলেও – করা হতো। সাঈদের প্রবল আপত্তি ছিল এই ধর্মীয় অনুশাসনের আতিশয্য নিয়ে। তাঁর মাতামহ একজন ব্যাপ্টিস্ট ধর্মযাজক ছিলেন, তাঁর মায়ের ধর্মানুরাগ ছিল, কিন্তু সাঈদ কখনো ধর্মকে গুরুত্ব দিয়ে জীবনে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর মায়ের এক খালা ছিলেন যাঁকে সাঈদও আন্ট মিলিয়া বলে ডাকতেন, যাঁর ভালোবাসা সেই শিশুকালে মায়ের ভালোবাসার বিকল্প হিসেবে দেখা দিত সাঈদের কাছে, বিশেষ করে মা তিরস্কার করলে। ১৯৫৬ সালে তাঁর মৃত্যুর আগে তাকে সাঈদ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ঈশ্বর বলতে কেউ কি আছেন?' এবং আন্ট মিলিয়া উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে' (১৫ পৃ:)। এই সন্দেহ সাঈদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। তাছাড়া, ধর্মটাকে যখন তিনি সহিংসতা, নিবর্তন এবং নিষ্পেষণের একটা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখলেন, প্যালেস্টাইন এবং অন্যত্র, তখন এর পুরোহিতদের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা দেখাতে পারলেন না। মুডিকে সাঈদ বর্ণনা করেছেন একজন 'শার্লাটান' অথবা ভণ্ড হিসেবে এবং অবাক হয়ে দেখেছেন, পুরো মাউন্ট হার্মনের কেউই – সাঈদ এবং আরো দুই ব্যতিক্রম ছাড়া – মুডি যে সব প্রশংসার দাবিদার হতে পারেন না, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করছে না (২৩৪ পৃ:)।

হিল্ডা সাঈদের ধর্মযাজক পিতার পরিবারের লোকজন ধর্ম নিয়ে যতটা অনুরাগী ছিলেন, ততটা যুদ্ধংদেহী ছিলেন মুসলমান সংখ্যালঘু এলাকায় ক্রিশ্চান হিসেবে বসবাসের ব্যাপারে। ধর্মকে তারা পরিচিতি এবং অস্তিত্ব রক্ষার একটা উপায় হিসেবে গণ্য করতেন। আর সাঈদ বিষয়টাকে দেখতেন সমালোচকের দৃষ্টিতে। সাঈদের মামা-নানারা ইসলামকে দেখতেন মার্কিনিদের দৃষ্টি দিয়ে, যা ছিল প্রকৃতই অবমাননাকর। আমেরিকার প্রশাসন, মিডিয়া এবং এ দুয়ের কল্যাণে সাধারণ মানুষজনও সেই ১৯৪৮ সাল থেকেই ইসরায়েল রাষ্ট্রকে সমর্থন দিয়ে আসছে। যে-উৎসাহে ইসরায়েলকে সমর্থন দেওয়া হয়েছে, ঠিক সেই অনুপাত উৎসাহ নিয়েই যেন ইসলামকে খাটো করে দেখার একটা প্রয়াস চলেছে আমেরিকাতে। সাঈদ তাঁর নানা-মামাদের এই অযৌক্তিক পক্ষাবলম্বন এবং ইসলাম-বিদ্বেষকে গ্রহণ করতে পারেননি। এর একটি কারণ অবশ্যই ধর্ম সম্পর্কে তাঁর নির্মোহ দৃষ্টি এবং ধর্ম থেকেও ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে বরং বিবেচনা করার প্রবণতা; দ্বিতীয় একটি কারণ, সাঈদের ভাষায়, হচ্ছে, তাঁর বাবা-মা ও বোনদের মধ্যে 'ইসলাম সম্পর্কে বৈরিতার মৌলিক কোনো ধারণার অনুপস্থিতি' (১৬৯ পৃ:)। প্রকৃতই উদারপন্থি ছিল পরিবারটি।

মাউন্ট হার্মন স্কুল তাঁকে দ্বিতীয় একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করেছিল, যদিও বিষয়টি শেষ পর্যন্ত স্কুলটির বিপক্ষেই যায়। শিক্ষকরা যদিও বাইরে ছিলেন

www.pathagar.com

যত্নবান, 'অভিন্ন এবং ভাগ করে নেওয়ার মতো মূল্যবোধে' প্রবলভাবে বিশ্বাসী, নেতৃত্ব অথবা সুনাগরিকত্বের মতো বিমূর্ত বিষয়কে শিক্ষার্থীদের জীবনে প্রতিফলিত করতে সংকল্পবদ্ধ. ভেতরে ভেতরে তারা – তাদের কেউ কেউ অন্তত – ভিন্ন একটি চরিত্র লালন করতেন। সাঈদ লিখেছেন, 'মাউন্ট হার্মনে থাকার সময় আমাকে কখনো ফ্লোর অফিসার. টেবিলের প্রধান, ছাত্র সংসদের সদস্য অথবা ভ্যালেডিকটোরিয়ান (দাপ্তরিকভাবে ক্লাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) এবং স্যালুটোরিয়ান (দ্বিতীয়) করা হয়নি, যদিও আমার সকল যোগ্যতা ছিল (২৩০ পৃ:)। কেন করা হয়নি, সাঈদ তা কখনো জানতে পারেননি, যদিও এটি খুব দুর্জ্ঞেয় হওয়ার কথা নয়। সাঈদ শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান হলে নিশ্চয় এ কথাগুলো তাঁকে লিখতে হতো না। তবে এই অবিচার তাঁকে একটা শিক্ষা দিয়েছিল। 'আমি দ্রুত আবিষ্কার করলাম যে আমাকে কর্তৃত্ব থেকে নিজেকে সুরক্ষা দিতে হবে' (২৩০ পৃ:)। একই সঙ্গে তিনি নিজে যা, তা হতে, সেই হিসেবে বেড়ে উঠতে এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে যে রূপে দেখতে চায়, তা না হতে– সেই সম্ভাবনাকে ঠেকাতে, কিছু কলাকৌশল যে তাকে রপ্ত করতে হবে এই অনুধাবনটি স্পষ্টরূপ গ্রহণ করছিল। এই প্রক্রিয়ায় এক জীবনব্যাপী সংগ্রমের সূত্রপাতও প্রত্যক্ষ করেন সাঈদ, যে সংগ্রাম ক্ষমতার মর্জি এবং ভণ্ডামির বিরুদ্ধে। ভণ্ডামি – কারণ মাউন্ট হার্মন স্কুলে তিনি দেখেছেন কিভাবে অনেক ভালো ভালো উদ্দেশ্যের আবরণে আসলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে একটা পূর্ব-আরোপিত বিচার সূত্রে রীতিবদ্ধ করে ফেলেছে।

মাউন্ট হার্মন স্কুল কখনো সাঈদকে তাঁর অস্বস্তি আর অনীহাকে ভুলতে দেয়নি। কিন্তু কিভাবে এসবের প্রভাবকে গুরুত্বহীন করে ফেলা যায়, তা-ও সাঈদ শিখেছেন এই স্কুলে। নিজেকে এবং পরিপার্শ্বকে ভুলে থাকার একটা প্রক্রিয়ায় তিনি এমন সব বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, যেগুলো থেকে তিনি তৃপ্তি পাবেন। 'এর বেশিরভাগ – সব না হলেও – বুদ্ধিবৃত্তিক' (২৪০ পৃ:)। বুদ্ধিবৃত্তিকে জীবনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার পেছনে স্কুলটির সত্যি একটি বড় অবদান ছিল।

মাউন্ট হার্মন থেকে ১৯৫৩ সালে সাঈদ গেলেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঈদের মানসগঠনের একটি পর্যায় পরিপূর্ণতা পেল। প্রক্রিয়াটি অবশ্য সহজ ছিল না – এখানেও তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। এখন প্রিন্সটন বলতে যে আধুনিক, কসমোপলিটান এবং মিশ্র সংস্কৃতির একটি প্রতিষ্ঠান বোঝায়, সে সময় তা ছিল না। শুধু ছাত্ররাই পড়তো প্রিন্সটনে, ছাত্রীদের জন্য দরোজা ছিল বন্ধ। কালোরাও অনুপস্থিত ছিল, বিদেশীদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। গাড়ি ছিল নিষিদ্ধ এবং শনিবার (তা-ও সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত) ছাড়া মেয়েরাও। এরকম পরিবেশে নিজের 'বিদেশিত্ব' অনেক বেশি প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। সাঈদ প্রিন্সটনের পরিবেশকে বর্ণনা করেছেন 'গ্রাম্য' এবং 'বিষাক্ত' হিসেবে ফেব্রুয়ারি মাসের দু সপ্তাহে 'বিকার' নামে একটি জঘন্য পদ্ধতির মাধ্যমে সকল ছাত্রকে কোনো না কোনো ক্লাবের সদস্য হতে হতো। বিকার ছিল একটি অমানবিক প্রথা, র‍্যাগিং থেকেও অনেক বেশি অবমাননাকর। সাঈদ এই বিষাক্ত পরিবেশ থেকে গা-বাঁচানোর জন্যে একটি প্রতিষেধকের আশ্রয় নিলেন – যা ছিল লেখা এবং পড়া। তিনি মেজর বিষয় হিসেবে নিলেন হিউম্যানিটিস – তবে সাহিত্য নয়। এর ফলে তাঁর পড়াশোনার ব্যাপ্তি বেড়ে গেল। তিনি ক্রমাগত এবং প্রচুর পড়তেন, তাঁর স্মৃতিশক্তিও

ছিল প্রখর – যে স্মৃতিশক্তিকে এই বইয়ে এক জায়গায় তাঁর পাওয়া সবচেয়ে বড় উপহার হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি। প্রিন্সটনে তাঁর পড়ার জগতে দিক নির্দেশক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন দু'জন বিদগ্ধ অধ্যাপক – আর.পি. ব্ল্যাকমুর এবং আর্থার জাথমারি। ব্ল্যাকমুর ছিলেন সাহিত্যের শিক্ষক, জাথমারি দর্শনের। শেষোক্ত জন ছিলেন তাঁর মতোই সংশয়বাদী তবে তা ছিল প্রচলিত চিন্তা মতবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচুর প্রশ্ন এবং অনেক ক্ষেত্রে অশ্রদ্ধা। ব্ল্যাকমুর আধুনিক কবিতার ব্যাখ্যা দিতেন, অর্থ খুঁজতেন– এবং তাঁর বিশ্লেষী ক্ষমতা সাঈদকে আকর্ষণ করতো। 'ব্যাখ্যার আনন্দ' সাঈদ গ্রহণ করেছেন ব্ল্যাকমুর থেকে।

হার্ভার্ডে যে পাঁচ বছর (১৯৫৮-৬৩) কাটিয়েছেন সাঈদ, সাহিত্যে একজন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট হিসেবে, তাকে সংক্ষিপ্ত কলেবরে বর্ণনা করেছেন তিনি, *আউট অফ প্লেস*-এর শেষ ক'টি পৃষ্ঠায়। বলেছেন, হার্ভার্ডের বছরগুলো বস্তুত ছিল প্রিন্সটনেরই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্প্রসারণ। শিক্ষকদের পড়ানো ছিল গৎবাঁধা, ছাত্ররা ছিল নিষ্ক্রিয় গ্রাহক, যদিও সাঈদ নিজে পড়াশোনা করতেন একজন ক্ষুধার্থ মানুষের খাদ্যভক্ষণের মতো। হার্ভার্ডে নিজেদের আউট অফ প্লেস মনে হতো, যেন বা ভুল জায়গায় এসে পড়েছেন। যেটুকু মৌলিক অর্জন বলে মনে হয়েছে তাঁর, তা ছিল অ্যাকাডেমিক চর্চার বাইরে কয়েকজন বিদগ্ধ ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে, যেমন আর্থার গোল্ড, মাইকেল ফ্রাইড এবং টম কার্নিচেলি। তাছাড়া ভিকো, সার্ত্র, হাইডেগার, মার্লু-পন্টির মতো লেখক-দার্শনিকের মতবাদ অথবা চিন্তা-ভাবনা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

হার্ভার্ডে সাঈদের সঙ্গীতের প্রতি নিষ্ঠা আরেকটু দৃঢ় হয়েছিল। তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় সাংগীতিক প্রভাব বলে যাকে তিনি বর্ণনা করেন, সেই ইগনাস টিয়েগারম্যান নামে ক্ষুদ্রাকৃতির এক পোলিশ পিয়ানোবাদক, হার্ভার্ডেও তাঁকে অনুপ্রাণিত করে যেতে থাকেন। টিয়েগারম্যান তাঁকে হাতে ধরিয়ে শিখিয়েছেন অনেক কিছু। এক সময় সাঈদ পেশাদার পিয়ানোবাদক হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে সে ইচ্ছায় ভাটা পড়ে যায়। সাঈদের জীবনে সংগীত নিয়ে অবশ্য স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ–হয়তো একটি বইও লেখা যায়, তবে এ নিবন্ধে পরিসর স্বল্পতার জন্য বিষয়টি শুধুই উল্লেখ করা হলো।

৩

আউট অফ প্লেস জুড়ে রয়েছে স্থানচ্যুতির শংকা ও উদ্বেগ, এক আদিম অস্থিরতা– যা শুধু ঘরের সন্ধানে নয়, বরং অস্তিত্বের সন্ধানে মানুষকে চালিত করে। নিজের চামড়ার ভেতরে যেন অন্য কেউ বাসা বেঁধেছিল – এরকম ভাবতেন সাঈদ। ঘর হারানো মানুষ নির্বাসনে গিয়ে ঘর খোঁজে। কিন্তু আমেরিকাতে গিয়েও তিনি ঘর-পাননি। যেসব আরব থাকত আমেরিকাতে – ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, চাকরিজীবী – তাদেরকে খুব অদ্ভুত মনে হতো সাঈদের। তারা জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট, অতীতকে ভুলে যাবার চেষ্টায় যেন রত। তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হতো না সাঈদের। পড়াশোনার রুটিন এবং পুনরাবৃত্ত জীবনে সাঈদ প্যালেস্টাইনকে কিছুটা ভুলেও গিয়েছিলেন। নিজেই স্বীকার করেছেন, কিভাবে কিছুটা 'অরাজনৈতিক' জীবন কেটেছে তাঁর। তবে তা এ জন্যে নয় যে বাবা রাজনীতি

পছন্দ করতেন না। সাঈদকে কড়া করে বলে দিয়েছিলেন, 'সাহিত্যের অধ্যাপনা করছ, ও নিয়েই থাকো।' এ অবশ্য হার্ভার্ড থেকে বেরুনোর পর। সাতাশ বছরের জীবনে কখনো অরাজনৈতিক ছিলেন না সাঈদ – একটা অবস্থান তাঁর আপনা-আপনিই নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থানটা ছিল নির্যাতিত প্যালেস্টাইনিদের পক্ষে, ক্ষমতা ও শক্তির বিরুদ্ধে, মানুষকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করতে বাধ্য করে যেসব নিয়ম-শৃঙ্খলা- উপনেবেশী থেকে নিয়ে পারিবারিক পর্যায় পর্যন্ত যেগুলোর প্রয়োগ- সেসবের বিরুদ্ধে। তাঁর একটা সুচিহ্নিত অবস্থান ছিল চিন্তা ও জ্ঞানের জগতে, পশ্চিমের আধিপত্যের কারণে সৃষ্ট অসংখ্য সামান্যিকরণের প্রবণতার বিরুদ্ধে এই অবস্থান তিনি চিন্তা ও সক্রিয়তা – এ দুই অঞ্চলেই গ্রহণ করেছিলেন।

আউট অফ প্লেস যেহেতু আত্মজীবনী, শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলোর, সে জন্য তাতে অবধারিতভাবে ভিড় জমিয়েছেন অসংখ্য মানুষ। কিছু আত্মীয়, কিছু পরিচিত জন। কেউ শিক্ষক, চিন্তাবিদ, কেউ রাজনীতিবিদ। এই অসংখ্য মানুষ উপস্থিত হয়েছেন নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে, কিন্তু প্রত্যেক চরিত্রই, যাকে বলে, অনন্য। চরিত্রকে সজীব করে তোলার, তাদের জীবনে আমাদের প্রবিষ্ট করাবার যে কুশলতা সাঈদের রয়েছে, তা একজন বড় ঔপন্যাসিকের মতোই স্বতঃস্ফূর্ত মনে হবে এই আত্মজীবনীতে।

অনেক চরিত্রের মধ্যে কিছু এমন চরিত্র রয়েছে, যাদের আসা-যাওয়াটা যেন হয় অন্যের হাত ধরে, অথবা তারা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন সাঈদের বৃহত্তর আখ্যানে। প্যালেস্টাইন যখন ইসরাইলের অধিকারে চলে যায় এবং ইহুদিদের সঙ্গে আরবদের দূরত্ব বাড়ে, তখন সাঈদের কাছে এটি একটি ব্যক্তিগত ট্রাজেডি বলেও মনে হয়। ডেভিড এজরা নামে এক ইহুদি বন্ধু ছিল তাঁর, কিন্তু যখন প্যালেস্টাইনের পরিস্থিতি উত্তেজনাকর হয়ে দাঁড়ায়, ধর্মীয় উগ্রবাদ পরিব্যাপ্ত হয়, আরব ও ইহুদিদের মাঝখানে একটা বিরাট দেয়াল দাঁড়িয়ে যায়, তখন ডেভিডের সঙ্গে সাঈদের সম্পর্কটাও শেষ হয়ে যায়। এই ঘটনাটি একটি প্রতীকী তাৎপর্যে প্রতিষ্ঠা করেন সাঈদ।

আত্মজীবনী – এবং জীবনের প্রায় সাতাশ বছরের– হলেও *আউট অফ প্লেস*-এ সাঈদ তাঁর যৌন জীবন নিয়ে প্রায় কিছুই লেখেননি। তাঁর নিজের অবদমিত যৌনতার উল্লেখ আছে, কৈশোরের শারীরিক উচ্ছ্বাসের কথা আছে, এক বন্ধুর হস্তমৈথুনের গল্প আছে – কিন্তু ঘুরেফিরে পরিবারের কঠিন নৈতিকতার কাছে এসব আবেগ-উচ্ছ্বাসের স্ফূর্তিহীন মিলিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতটাও রয়েছে। তবে সপ্তম পরিচ্ছেদে ধুর-এ তাঁর জীবনে এক তরুণীর প্রবেশের ছোট্ট গল্পও আছে। টেনিস খেলা তাঁকে পিতা-মাতা থেকে স্বাধীন একটা জীবন-যাপনের সুযোগ দিয়েছিল উল্লেখ করে সাঈদ জানাচ্ছেন, তাবারা ক্লাবে তাঁর পরিচয় হয় নাইফ পাশা ইমাদের দুই মেয়ের সঙ্গে। তাঁর একজন ইভা, সাঈদ থেকে সাত বছরের বড়। 'অবিবাহিতা, বিত্তশালী এবং তার পরিপার্শ্ব থেকে সামাজিকভাবে বিচ্যুত। ইভা ছিলেন প্রথম নারী সত্যিকারভাবে আমি যার কাছে আসতে পেরেছিলাম' (১৭৮ পৃ:)। আত্মজীবনীতে প্রেম ও যৌনতার অনুপস্থিতি অনেকের কাছে অবাক হওয়ার মতো হলেও যারা সাঈদের লেখা পড়েছেন, তারা জানেন তিনি আসলেই খুব প্রাইভেট মানুষ ছিলেন একটা লাইন তিনি টেনে দিতেন তাঁর চারপাশে, যার ভেতরে একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলো থেকে যেত পাঠকের দৃষ্টির বাইরে।

www.pathagar.com

৪

আউট অফ প্লেস কেন গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস ও সাহিত্যের পাঠকদের – বিশেষ করে সাহিত্যকে যারা জীবন ও তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে পড়বেন তাদের জন্য এবং যারা সাঈদের প্রাচ্যবাদ ও তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ ও সক্রিয়তার বিষয়টি অনুসরণ করেন, তাঁদের জন্য – তা পরিষ্কার হয় একেবারে গোড়া থেকেই। উত্তর-উপনিবেশী সাহিত্য সত্ত্বেও যে ভিন্নকরণ – বা othering-প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়, যা এক মানুষকে তার স্থির কেন্দ্র থেকে চ্যুত করে প্রান্তে পাঠিয়ে দেয়, সেই মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তার পরিপার্শ্ব থেকে এবং নিজের অজান্তে সে উপনিবেশী একটি সত্তা – প্রজা অথবা সাবজেক্টে পরিণত হয়, তার প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। ঘরে বাবা-মার শাসন, স্কুলে শিক্ষকদের এবং বড় পৃথিবীটাতে স্বার্থপর, অন্ধ রাজনীতির বিধ্বংসী খেলা – এই ত্রয়ী প্রভাবে সাঈদের জীবনে কেন্দ্রচ্যুতি ঘটছিল। তাঁকে অবশ্য পায়ের নিচে মাটি যুগিয়েছে সাহিত্য, সংগীত, জ্ঞানের জগৎ। এই জ্ঞানতাত্ত্বিক ভূমি থেকে তিনি তাঁর অবস্থান, সমকালীন ইতিহাস, রাজনীতি – এসবকে বিশ্লেষণ করেছেন, তাদের পরস্পর বিরোধী অনেক প্রকাশকে সূত্রবদ্ধ করেছেন। সাহিত্য নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস প্রবল। ধুর-এর গ্রীষ্ম-অবকাশে সাঈদ প্রচুর পড়াশোনা করতেন। স্কুলে তো পড়াশোনাটাই ছিল নিজের কাছে পালিয়ে আসার একটা সুযোগ। *আউট অফ প্লেস*-এর শুরুর দিকের বর্ণনায় আছে, এই পলানোর তাঁর উপায় ছিল দুটি – প্রথমত, রূপকথা আর বাইবেলের গল্প, গ্রিক পুরাণ। দ্বিতীয়ত, সিনেমা, বিশেষ করে আরব্যরজনীর গল্প, ওয়েস্টার্ন ফিল্ম এসব। সেই কৈশোর থেকে সাঈদ যে সব বই পড়েছেন, সিনেমা দেখেছেন, সে-সব ছিল তাঁর খুব প্রিয়, সেগুলোকে, তাঁর ভাষাতেই, প্রাচ্যবাদী চিন্তায় পূর্ণ বলে আমরা দেখতে পাই। এই আত্মজীবনীতে ওরিয়েন্টালিজমের অনেক খোরাক রয়েছে।

স্কুল-কলেজে পড়ার সময় যে-সব পাঠ্যক্রম ছিল সাঈদের, সেগুলো সম্পর্কে তাঁর হতাশা ও সমালোচনা ছিল। 'আমরা ইংল্যান্ডের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে পড়তাম, রাজা ও পার্লামেন্ট, ভারত ও আফ্রিকা নিয়ে, অভ্যাস ও বাকধারা নিয়ে পড়তাম, যার কোনো ব্যবহার আমরা ইজিপ্টে অথবা অন্য কোথাও করতে পারতাম না।' লিখেছেন সাঈদ, 'আমরা নিজেদের নিকৃষ্ট ভাবতাম...' (১৮৬ পৃ:)। এই প্রবণতার বিরুদ্ধে সাঈদ, অন্তত নিজের জীবনে, একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন সেই শুরু থেকেই।

আউট অফ প্লেস-এ সাঈদ তাঁর অনেকখানি জীবনীশক্তি বিনিয়োগ করেছিলেন – এ বইটি তিনি লিখেছেন মৃত্যুর ছায়ার নিচে বসে। তিনি চেষ্টা করেছেন, তাঁর কথাগুলো যেন সব বলা হয়ে যায়, যেন পাঠক এবং তাঁর মাঝখানে কোনো ফাঁক না থাকে। শুরুতে একটি মুখবন্ধ লিখেছেন – সেখানে এই আত্মজীবনীর উদ্দেশ-উপায় এসব নিয়ে বলেছেন। আবার নবম পরিচ্ছেদে এসে কাহিনী থেকে বের হয়ে চলে এসেছেন ১৯৯১ সালে, গালফ যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে নানান উদ্বেগের সঙ্গে নিজের ক্যান্সার ধরা পড়ার কথা আবার লিখেছেন। তাঁর অসুস্থতার সঙ্গে আত্মজীবনীর একটি নিবিড় সংযোগের কথা নিজেই বলেছেন, যদিও এর ঘটনাপ্রবাহ অসুস্থতার সময়, পর্যায় এবং ওঠানামার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত,' লিখেছেন সাঈদ, তারপর জানান, লেখাটা হচ্ছে যেরকম একটি

www.pathagar.com

শব্দ থেকে আরেকটি শব্দে এগিয়ে যাওয়া, অসুস্থতাও এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় যাওয়ার মতো – দুটোতেই আছে কষ্ট (২১৬ পৃ:)।

সাঈদ জানাচ্ছেন, এ বইটির একটা প্রধান বিষয় হচ্ছে তাঁর সচেতনভাবে নির্মিত সত্তাটির ভেতরে লুকিয়ে থাকা আরেকটি সত্তার আবিষ্কার, যে সত্তাটিকে তিনি বলেছেন – 'সেকেন্ড সেল্ফ' (২১৭ পৃ:)। এই সেকেন্ড সেল্ফটি আসলে আমাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে দেয়, আবার অনেক জিজ্ঞাসার দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে দেয়; আমাদের ভাবায়, অনুপ্রাণিত করে, আমাদের তার সহযাত্রীতে পরিণত করে। কিন্তু দু'টি সত্তার সম্মিলনে যে সাঈদ, তিনি বার বার থেকে যান আউট অফ প্লেস – যেন ঘরেরও নয়, পারেরও নয়, মাঝখানে এক অনিশ্চিত এলাকায় যার বাস এবং একটা নিশ্চিতির জন্য যার আজীবন সংগ্রাম।

কালি ও কলম, মার্চ, '০৪

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড সাঈদ'র ওরিয়েন্টালিজম ভিন্ন পাঠ

ফাহ্‌মিদ-উর-রহ্‌মান

এডওয়ার্ড সাঈদ তার ওরিয়েন্টালিজম বইতে সাম্রাজ্যবাদের এক হাত নিয়েছেন। সাঈদের কথা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ যদি শাসিতদের সম্পর্কে কিছু জানতে চায় তবে সেটা তাদের উপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণের জন্যই। তাদের কাছে জ্ঞানের কোন স্বাধীন বয়ব বা বৈশিষ্ট্য নেই, বরং জানার প্রক্রিয়া থেকে যে ক্ষমতা কাঠামো তৈরী হয় তা অন্য একটি জনগোষ্ঠীর উপর বলপ্রয়োগ, শাসন-শোষণ করবার জন্য তারা ব্যবহার করে। সাম্রাজ্যবাদীরা ইসলামকে ভয়ানক ও বিপজ্জনক হিসেবে দেখে। ইসলামকে এইভাবে দেখা ও বর্ণনার মধ্যে সাঈদ মনে করেন,মুসলিম দেশগুলোর উপর খবরদারী, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনে নিষ্ঠুর হামলা ও যুদ্ধ পরিচালনায় ওদের ভয়ানক রকমের অভিসন্ধি কাজ করে। মোটকথা ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবিদ্যা হচ্ছে প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্যের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণের বিদ্যা। সাঈদের এ ব্যাখ্যার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। ওরিয়েন্টালিজম যে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার সমান্তরাল একটা জিনিস– এ কথা সাঈদই জোরেশোরে বলেছেন এবং তার লেখালেখির কারণেই ওরিয়েন্টালিজমের বর্ণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র উদাম হয়ে গেছে। আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ক্ষেত্রে সাঈদের এ অবদান মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

এডওয়ার্ড সাঈদ এক জায়গায় লিখেছেন : For the many reasons I have enumerated earlier in this book and in Orientalism, Knowledge of Islam and of Islamic People's has generally proceeded not only from dominance and confrontation but also form cultural antipathy. Today Islam in defined negatively as that with which the West is radically at odds, andhis lension establishes a framework radically limiting knowledge of Islam....... most of what the west knew abou the world it knew in the frame work of colonialism the European shcolar There fore approached his subject from a general position of dominance, and what he said about this subject was said with little reference to what any one but other European scholars and said (covering Islam).

সাঈদের এসব লেখার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। প্রাচ্যবিদরা এক সময় শুধুমাত্র ইসলাম ও তার নবীকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য কলম তুলে নিয়েছিলেন, এ কথা অনেকাংশে সত্য। শুধু তাই নয়, এক দীর্ঘ সাংস্কৃতিক বিরোধ ও অসূয়া তাড়িত হয়ে তারা ইসলামের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে লিখতে উজ্জীবিত হয়েছিলেন। তাও ভুলে যাওয়ার নয়। এ্যাব টাডারিনী (abbe Toderini), ব্যুলেন ভিলার (Boulainviller), সিলভেস্ত্রে ডি সেচি (Sylesre de sacy), এডওয়ার্ড লেন (Edward Lane), গোবিনিউ (Gobineau), রেনান (Renan), স্যার উইলিয়াম মুর (Sir William Muir), স্প্রেঙ্গার (Sprenger) প্রমুখ প্রাচ্যবিদের বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা এখন প্রায় সুবিদিত। অনেক ক্ষেত্রে এরা সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্রয় পেয়েছেন, বিশেষ করে ইসলামের বিরুদ্ধে লিখতে এদের পৃষ্ঠপোষণা করা হয়েছে। ওরিয়েন্টালিজম বইয়ে সাঈদ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শোষণ-শাসন-নিয়ন্ত্রণের যে অভিযোগ করেছেন তাদের লেখালেখি তা প্রমাণ করবার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু সাঈদের ওরিয়েন্টালিজমের সাথে সাম্রাজ্যবাদকে সমান্তরাল ও সমার্থক হিসেবে দেখানোর মধ্যে কতটা গুরুতর ফাঁকও রয়েছে। ওরিয়েন্টালিজম খারাপ জিনিস, কিন্তু এর পুরোটাই কি বর্জনীয়? আমরা অনেক প্রাচ্যবিদের কথা বলতে পারি যাদের জীবনব্যাপী সাধনা, প্রাচ্যভাষার উপর অধিকার, বিশেষ করে মধ্যযুগের মুসলিম পণ্ডিতদের অনেক হারিয়ে যাওয়া ও দুষ্প্রাপ্য রচনাবলীর পুনঃসন্ধান ও পুনঃসম্পাদনার ক্ষেত্রে তাদের অবদান কি ওরিয়েন্টালিজমের সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্যের পুরো সমর্থন করে? এটা সত্য এদের কারো কারো ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়, এমনকি ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের কথাও তাদের অবচেতন মনে কাজ করতে পারে, তারপরেও এদের কাছ থেকেই তো আমরা আলবেরুনী, ইবনে খালদুনের মূল্যবান লেখালেখির সন্ধান পেয়েছি, এরাই ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনীর তরজমা করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েছেন, এরাই আমাদের ঘরের কাছের বাদশা বাবরের আত্মজীবনীকে আমাদের কাছে উপস্থিত করছেন। প্রাচ্যবিদদের অবদান ছাড়া বিশ্বসভ্যতার এই সব মূল্যবান সম্পদ হয়তো একদিন হারিয়ে যেতো। এর মূল্য কি আমরা দেব না? প্রাচ্যবিদ কিংবা প্রাচ্যবিদ্যা মানেই সবসময় যে একটা ভয়ঙ্কর ও কুশ্রী জিনিস এমন ভাবার কিছুই নেই। আমি অন্ততঃ তিনজন প্রাচ্যবিদের কথা বলব যাদের জীবনব্যাপী সাধনা নিমগ্ন হয়েছিল ইসলামকে কেন্দ্র করে। তারা হয়তো ইসলামগ্রহণ করেননি, কিন্তু ইসলামের মূল্যবোধকে কোন না কোনভাবে তারা গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। এদের দু'জন যুক্তরাজ্যের আর্থার জন আরবোরী (Arthur John Arberry) ও স্যার থমাস আর্নল্ড (Sir Thomas Arnold), অন্যজন হলেন জার্মানীর আনমারী শিমেল (Annemarie Schimmel)। আর্থার জন আরবেরীর একটা বিখ্যাত কাজ হচ্ছে The Koran Interpreted কোরান শরীফের এটি একটি বিখ্যাত ইংরেজী তরজমা। এর মুখবন্ধের এক জায়গায় আরবেরী লিখেছেন : This task was undertaken, not lightly and carried to its conclusion at a time of great personal distress, through whichit cdomforted and sustained the writer in a manner for which he will always be grateful, He there fore acknowledges his gratitude to whatever power or Power inspired the man and the Prophet who first recited there scriptures. I pray that this interpretation, poor echo though it is of the golorious original, may instruct, please, and in some degree inspire those who read it.

এই অনুভূতিকে কি ইসলামের শত্রুর বা প্রতিপক্ষের বলা চলে? স্যার থমাস আর্নল্ড বহু দিন আমাদের এই উপমহাদেশে ছিলেন। তিনি আলীগড় মোহামেডান এ্যাংলো

www.pathagar.com

ওরিয়েন্টাল কলেজে শিক্ষকতা করতেন। ঘটনাচক্রে তিনি কবি ইকবালের অন্যতম শিক্ষক ও পরবর্তীতে গভীর বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন। আর্নল্ড দেশে ফিরবার সময় ইকবাল এত মর্মাহত হন যে, তিনি তার উদ্দেশ্যে তার অন্যতম একটি বিখ্যাত শোকগাঁথা রচনা করেন। এই আর্নল্ডের একটি বিখ্যাত বই হচ্ছে The preaching of Islam। এ বইতে তিনি বহু ঘটনা ও তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন এবং ইসলাম সম্পর্কে এক সময় প্রাচ্যবিদরা যে মিথ্যা প্রচার চালিয়েছেন 'এক হাতে কোরআন, অন্য হাতে তরবারী নিয়ে ইসলামের প্রসার' তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তার নিজের কথা শোনা যাক : Islam was not spread. not by the exploits of that mythical personage- the Muslim warrior with the sword in one hand and the the Quran in the other, but by the force of the teachings of the Quran and the character of the Prophet. আর্নল্ডের এই বলবার ভঙ্গী, নিজে প্রাচ্যবিদ হওয়া সত্ত্বেও একশ্রেণীর প্রাচ্যবিদদের ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে বর্ণবাদী প্রচার প্রপাগাণ্ডার বিরুদ্ধে লড়াই করার মত তার শক্তিকে আমরা কখনোই খাটো করে দেখতে পারি না। সেই আঠার-উনিশ শতকের মত আজও ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রপাগাণ্ডা চলছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই ও সহিংসতাকে বলা হচ্ছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এসবের বিরুদ্ধে আজ কিন্তু Preaching of Islam জাতীয় কোন বই পুস্তক লেখা হচ্ছে না। এটাই প্রমাণ করে আর্নল্ডের মত মানুষের প্রয়োজন। তাই একেবারে ফুরিয়ে যায়নি। সবশেষে যার কথা বলব তিনি হচ্ছেন আনমারী শিমেল। জার্মানীর এই পণ্ডিত মহিলা তো আমৃত্যু মুসলিম সূফী দরবেশ আর ইসলামী তাসাউফের জগতে পরিভ্রমণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি মুসলিম সূফীদের মত চলাফেরা করতেন। এ জন্য অনেকে তাকে বলতেন পাশ্চাত্যের রাবেয়া বসরী। মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভাষা ও ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও সাহিত্যের উপর তার অসাধারণ অধিকার, কোরআন শরীফের উপর তার বিপুল পাণ্ডিত্য বিশেষ করে রুমী ও ইকবালের কবিতার উপর তার বিশেষ ভক্তি ও ভালবাসা তাকে প্রাচ্যবিদদের জগতে এক বিশেষ অনন্যতা দিয়েছিল। বহুদিন পর তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে দেয়া এক সংবর্ধনায় তিনি তার ইসলাম অনুরাগের কথা বলেছেন এভাবে : When I was a little girl, I come to love your world- the world of Islam, the world of literature beginning with the poetry of Maulana Rumi... and I was infatualed. শিমেলের এই নির্ভেজাল অনুরাগের মধ্যে কোন বর্ণবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র নেই। আজকের এই যুধ্যমান পৃথিবীতে যখন প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতাগুলো পরস্পরের রক্তক্ষয়ের জন্য মুখিয়ে রয়েছে তখন শিমেলের মত মানুষরা আন্ত ঃসভ্যতার মধ্যে এক নীরব যোগাযোগ, ভাব বিনিময় ও সেতু নির্মাণের চেষ্টা করে গেছেন। আরবেরী, আর্নল্ড কিংবা শিমেল ছাড়াও পাশ্চাত্যে ইসলামের অনুগ্রাহী যথেষ্ট রয়েছেন। গ্যাটে কিংবা বার্নাড শ'র ইসলামপ্রীতির কথা আমরা জানি। হাল আমলের মার্টিন লিঙ্গ, ক্যারেন আমস্ট্রংদের চিন্তা-ভাবনা আমাদের মনোজগতে টোকা দিতে সক্ষম। বিশেষ করে বার্নাড শ'র কথা বলতে হয় এই জন্য, ইসলামের নবীর সম্পর্কে তার বৈপ্লবিক মন্ত ব্য বহু উচ্চারণে যা জীর্ণ হয়ে যায়নি, রসূল সম্পর্কে এটি তার গভীর মমতারই প্রতিধ্বনি। আজকের মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী প্রচার-প্রপাগান্ডার

বদৌলতে অনেক মুসলমানেরই বিশ্বাসের ভিত নড়ে গিয়েছে। জন্মসূত্রে এরা মুসলমান হলেও সাংস্কৃতিকভাবে এরা ইসলামকে অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছেন এবং অনেক সময় সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে এরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজ করে থাকেন। এসব নামকাওয়াস্তা মুসলমানের চেয়ে শ' গ্যাটে প্রমুখের স্থান কি অনেক উপরে নয়? দুঃখের বিষয় হচ্ছে সাঈদের ওরিয়েন্টালিজম পড়ে এদের কারো সম্পর্কেই কোন ধারণা পাওয়া যায় না। ওরিয়েন্টালিজমকে সাম্রাজ্যবাদ বা পাশ্চাত্যের সাথে সব সময় এক করে দেখার বিপদটা এখানেই। সাঈদ তার বইটি লিখেছেন একটি যুক্তিকে সামনে রেখে। সেই যুক্তির মূল্য যতই শক্ত হোক না কেন, সেটি ঘটনার পূর্ণ সত্য হয়ে ওঠেনি, অর্ধ সত্য হয়ে গিয়েছে। ওরিয়েন্টালিজম পড়লে মনে হয় পুরো পাশ্চাত্যের মানুষ বোধ হয় এক জোট হয়ে সাম্রাজ্যবাদী কোন অভিসন্ধিতে মিলিত হয়েছে। এটা সত্য সেখানকার পুঁজিবাদী ও কর্পোরেট ব্যবস্থা, সেখানকার কর্পোরেট নেতৃত্বের সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি ও অন্য জাতিগোষ্ঠীকে দাবিয়ে রাখার ভয়ানক কৌশল, ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম এগুলো অবশ্যই বিশ্বশান্তি ও মানব কল্যাণের পক্ষে একটা বড় বাধা। কিন্তু এটাও আমাদের মনে রাখা দরকার পশ্চিমের এই কুশ্রী চেহারার পাশে সেখানকার একটি মানবিক চেহারাও আছে। অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সেখানে আছেন যারা এই কর্পোরেট নেতৃত্বের বিশ্বব্যাপী হানাহানি ও ধ্বংসের রাজনীতি পছন্দ করেন না। ইরাক যুদ্ধের সময় আমরা দেখেছি পশ্চিমের বহু শান্তিকামী মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন এই অন্যায় যুদ্ধের প্রতিবাদ করতে। ওরিয়েন্টালিজম পড়ে পাশ্চাত্যের যে ছবি আমাদের সামনে আভাসিত হয়ে ওঠে, সেখানে এসব শান্তিকামী মানুষের স্থান কোথায়? এরাতো দুনিয়ার তাবৎ শান্তিকামী মানুষের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত যারা বিবাদ-বিসম্বাদের বাইরে ভিন্ন একটি জগৎ তৈরী করতে চান।

আমাদের মনে রাখা দরকার শ' গ্যাটের মতো ইসলাম বান্ধবের পাশাপাশি আমরা একালে পাশ্চাত্যে মারমাডিউক পিকথল, মোহাম্মদ আসাদের মতো মনীষার সন্ধান পেয়েছি, ইসলামী বুদ্ধিবাদের জগতে যাদের সৃষ্টিশীল অবদান মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। ফরাসী চিন্তাবিদ রোজার গারোদী, বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলি, জার্মান কূটনীতিক ও বুদ্ধিজীবী মুরাদ হফম্যান, ইংল্যান্ডের সংগীত শিল্পী ইউসুফ ইসলাম প্রমুখের লেখালেখি, পণ্ডিতী আলোচনা ও কায়কারবার একালে বিশ্বের দরবারে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক উপস্থাপনাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। এটা সত্য পশ্চিমেই সালমান রুশদী, তারিক আলী, তসলিমা নাসরিনের মতো ইসলাম ত্যাগকারী মুরতাদরা আশ্রয় পেয়েছে এবং ইসলামের শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়েছে। কিন্তু এটাও লক্ষণীয় এই পশ্চিমে বসে ইসমাইল রাজি আল ফারুকী, আকবর এস আহমদ, জামাল বাদাবী, জিয়াউদ্দীন সর্দার, অধ্যাপক হামিদুল্লাহর মতো ধীমান বুদ্ধিজীবীরা একালে মুসলিম চিন্তার জগতকে ফলবান করে তুলেছেন। আরো বিশেষ ব্যাপার হলো পাশ্চাত্যে এখন প্রায় এক থেকে দু' কোটি মুসলমান বাস করেন ও অন্যান্য অশ্বেতাঙ্গ মানুষও সেখানে আছেন। ওরিয়েন্টালিজমে আমরা শুধু প্রতিপক্ষের ছবিই দেখি, এদের কথা শুনতে পাইনি। পাশ্চাত্যের কর্পোরেট ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কারণে আমাদের মনে হতে পারে পাশ্চাত্য মানেই বুশ, ব্লেয়ার কিংবা সেকালের গ্লাডস্টোন, কুইন ভিকটোরিয়া, হিটলার বা মুসোলিনী। আসলে এটি

www.pathagar.com

প্রকৃত সত্য নয়।

ওরিয়েন্টালিজমে সাঈদ যে শক্তিশালী যুক্তি দিয়ে আগুন ও উত্তাপ ছড়িয়েছেন তার মোদ্দাকথা হচ্ছে এই : West can know islam in a demeaning and exploitative manner. তার মানে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসছে সাথে সাথে : Can the west ever hope to understand, objectively and sympa-thetically the other, that is, foreign Cultures, alien peoples?

না, সাঈদের যুক্তি সর্বাংশে মেনে নেয়া যায় না। কারণ পাশ্চাত্যে আজকের ইসলামের অবস্থানই বলে দেয় ওরিয়েন্টালিজমে চিত্রিত পৃথিবীর বাইরেও অন্য পৃথিবী আছে।

ওরিয়েন্টালিজমে সাঈদ পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে যে যুক্তি দিয়েছেন একই যুক্তি দিয়েইতো আবার সাঈদকে অভিযুক্ত করা যায়? এখানে সাঈদ পশ্চিমকে দেখেছেন একজন ফিলিস্তিনী হিসেবে। আর প্রাচ্যবিদরা প্রাচ্যকে এঁকেছেন পশ্চিমের চোখে। হয়তো এই বিপরীত ও প্রান্তিক অবস্থানের কারণেই পৃথিবী আজো 'ওরা' ও 'আমরা'য় ভাগ হয়ে আছে। রাডইয়ার্ড কিপলিংরা এ জন্য হয়তো লিখতে পেরেছেন Twain shall never meet. কিন্তু এই বিপরীত মেরুর মাঝখানে বসে আরবেরী, আর্নল্ড ও শিমেলরা যে নীরবে-নিভৃতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতু বন্ধনের চেষ্টা করে গেছেন তা আমরা প্রায়শঃই ভুলে যাই।

ওরিয়েন্টালিজম বইটির কথা বলতে যেয়ে মনে পড়ছে স্যামুয়েল হান্টিংটনের clash of civilization-এর কথা। হান্টিংটনের এ বইও একটি প্রান্তিক অবস্থান থেকে লেখা এবং অবশ্যই পাশ্চাত্যের চোখ দিয়ে ইসলামকে হেয় করার সেখানকার বর্ণবাদী গোষ্ঠীর শেষতম সংযোজন। হান্টিংটনের চোখে এখন আগামী দিনের দ্বন্দ্বমান সভ্যতার ছবি, সেখানে পশ্চিম বনাম ইসলামের সংঘাতের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তিনি। এখানে হান্টিংটনের একচোখা বর্ণবাদী দৃষ্টি পরিষ্কার। বিভিন্ন সভ্যতার তুলনামূলক বিচার করতে যেয়ে তিনি নিজেই একটি পক্ষের হয়ে লড়াই করেছেন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অন্যান্য বিশেষ করে ইসলামের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর প্রমাণের জন্য ওকালতি করেছেন। সেটা করতে যেয়ে তিনি বেছে নিয়েছেন এক চালাকির পথ। সভ্যতার সংঘাতের তত্ত্ব আসলে একটা চালাকির তত্ত্ব। সভ্যতার দ্বন্দ্ব আছে ঠিক, কিন্তু সভ্যতায় সভ্যতায় যে নীরব দেওয়া-নেওয়া, কথোপকথন চলছে সেটিওতো মিথ্যে নয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পারস্পরিক আদান-প্রদানের এ দিকটি হান্টিংটন সাহেবরা এড়িয়ে গেছেন, সেখানে তারা শুধু আমাদের সভ্যতার সঙ্গে ওদের সভ্যতার দ্বন্দ্ব ঘোষণা করেই আত্মপ্রসাদে লিপ্ত হয়েছেন। সংস্কৃতির লেনদেন বহুত্বের কথা ঝেড়ে মুছে এর বদলে তারা একটি একমাত্রিক সংস্কৃতির অবয়ব খাড়া করতে চান, যার সঙ্গে অন্য সংস্কৃতির সম্পর্ক বিরোধের, প্রতিদ্বন্দ্বিতার। হান্টিংটনের সাথে সাঈদের তুলনা চলে না কোনভাবেই। না বুদ্ধিজীবিতায় না মানবিকতার বোধে। তারপরেও কেন যেন মনে হয় ওরিয়েন্টালিজমে সাঈদ কি পুরোপুরি আবেগহীন থাকতে পেরেছেন? কোথাও কি তার এক চোখের ছায়া পড়েনি?

সাঈদের ভয়ানক যুক্তি পশ্চিম কেবল ইসলামকে শোষণমুক্ত অবস্থান থেকে দেখে। এই মূল্যায়নকে সামনে রেখেই বলছি তারপরেও কিন্তু ইসলাম ও পাশ্চাত্যের সীমান্ত পেরিয়ে বহু মানুষের যোগাযোগ, বন্ধুত্ব ও মানবীয় সম্পর্কের ভিত প্রস্তুত হয়েছে এবং এ সম্পর্ক

www.pathagar.com

পুরোপুরি সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। থমাস আর্নল্ডের সাথে ইকবালের, ওলাফ কেরুর সাথে ইসকেন্দার মির্জার, ই এম ফরস্টারের সাথে রস মাসুদের এবং আমাদের সময়ের সলীম আলীর সাথে ডিলন রিপে- কিংবা র‍্যালফ রাসেলের সাথে খুরশীদ-উল-ইসলামের বন্ধুত্বের কথা আমরা জানি। সীমান্তের বাধা কিংবা জন্মের প্রেক্ষাপট অথবা ধর্মের পার্থক্য এদের বন্ধুত্বে চিড় ধরাতে পারেনি। এই মানবীয় সম্পর্কটুকু এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি বলেই মানুষ আজো স্বপ্ন দেখে। ধ্বংস, রক্তপাত ও নরমেধযজ্ঞের মধ্যেও সে মুক্তির দিন গোনে।

ইনকিলাব, ৫ মার্চ, '০৪

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড সাঈদ'র বিশ্বখ্যাত বই

দ্য কোয়েশ্চেন অব প্যালেস্টাইন

সেলিম ওমরাও খান

ফিলিস্তিন ও আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষ চিন্তাবিদ, গবেষক এবং যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক এডওয়ার্ড ডবি-উ, সাঈদের মৃত্যু সমগ্র আরববিশ্বকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে গেছে। ফিলিস্তিনী আমেরিকান হিসাবে অধ্যাপক সাঈদ ফিলিস্তিন ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন দীর্ঘদিন। ব্যাপকভিত্তিক গবেষণা কাজের সুবিধার জন্য তিনি নিজেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে গুটিয়ে নেন। পশ্চিমী দর্শন ও সংস্কৃতির বিপরীতে অধ্যাপক সাঈদ প্রাচ্যের জীবন, দর্শন ও সংস্কৃতির বিভিন্ন সূত্রকে একই ধারায় উপস্থাপন করে তুলনামূলক দুই ধারার জীবন ও দর্শনকে তিনি তাঁর বিভিন্ন গবেষণায় নিয়ে আসেন। অধ্যাপক সাঈদের এই সূক্ষ্ম বিশে-ষণের কারণে পশ্চিমী দুনিয়ায় তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন। সাঈদের তিনটি প্রামাণ্য গবেষণা গ্রন্থ সমকালীন পশ্চিমা গবেষকদের কাছে এখনও তাই বিশেষভাবে সমাদৃত। এগুলো হলো ১. *জোশেফ কনরাড এন্ড দ্য ফিকশন অব্ অটোবায়োগ্রাফি* ২. *বিগিনিংস : ইনটেনশন এন্ড মেথোড* এবং ৩. *ওরিয়েন্টটালিজম*।

তবে এডওয়ার্ড সাঈদের সবচেয়ে আলোচিত বইটি হলো দ্য কোয়েশ্চেন অব প্যালেস্টাইন (The Question of Palestine)। ১৯৭৯ সালে টাইমস বুকস থেকে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্য নিউইয়র্ক টাইমস বুকস্-এর একটি প্রকাশনা বিভাগ এই টাইমস্ বুকস প্রকাশনী। এশিয়া, আফ্রিকা কিংবা দূরপ্রাচ্যের খুব কম লেখকের বই-ই টাইমস বুকস প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এডওয়ার্ড সাঈদের এই দীর্ঘ গবেষণালব্ধ বইটি প্রকাশের পরপরই তা পশ্চিমী বিশ্বে ব্যাপক সাড়া জাগায়। মাত্র এক বছরের মধ্যে বইটির প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। ১৯৮০ সালের এপ্রিলে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়। ইংরেজী সাহিত্যের শিক্ষক হয়েও এডওয়ার্ড সাঈদ মূলতঃ সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস নিয়েই কাজ করেছেন বেশি। মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস, সামাজিক বিন্যাস ও প্রাচ্যের দর্শন ও সংস্কৃতির আলোকে অধ্যাপক সাঈদ পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে ফিলিস্তিন তথা আরব জাতীয়তাবাদী ও জায়নিজমের (Zionism) দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন তিনি তাঁর সাড়া জাগানো '*দ্য কোয়েশ্চেন অব প্যালেস্টাইন*' বইতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যের যে আর্থ-সামাজিক ও

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় ইসরাইল-মিসর শান্তিচুক্তি পরবর্তী সময়ে ক্যাম্পডেভিড চুক্তি এবং এরপরই এসেছে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পশ্চিমী বিশ্বের ধারণা। ঐতিহাসিক এই সুবিশাল প্রেক্ষাপট নিয়েই অধ্যাপক এডওয়ার্ড সাঈদ দালিলিক বিষয় উপস্থাপন করেছেন তাঁর '*দ্যা কোয়েশ্চেন অব প্যালেস্টাইন*'-এ। ইহুদী রাষ্ট্রটি এখানে শুধু একটি রাষ্ট্রেরই ধারণা নয়। পশ্চিমী পুঁজিতন্ত্রের প্রতিভূ হলো ইহুদীবাদ। আর জায়ানিজমের সঙ্গে দ্বন্দ্বই হলো আরব রাষ্ট্রগুলোর প্রচলিত রাজতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের প্রবল সংঘাতের অন্যতম বিষয়। সাঈদের মতে, ১৯৪৮ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের ফলেই হাজার হাজার ফিলিস্তিনী নিজ ভূমি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়েছে। নির্বাসনে চলে গেছে। এর ফলে ফিলিস্তিনীদের আত্মপরিচয় সংকটের প্রেক্ষাপটে ফিলিস্তিনী জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গটি অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ বইতে তিনি লিখেছেন, '১৯৪৮ সালের আগে এই ভূখণ্ডে বসবাসকারীরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ আরব প্যালেস্টাইন। ১৯৬৭ সালে ইসরাইল মার্কিনীদের সহযোগিতায় অধিকাংশ আরবভূখণ্ড দখল করে নেয়ায় বসতি স্থাপনকারী ইহুদীদের সঙ্গে উদ্বাস্তু প্যালেস্টাইনীদের সংঘাত এখন সেখানে প্রতিদিনের চিত্র।' অধ্যাপক সাঈদ আরও লিখেছেন, '১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ (Universal Decleration of Human Rights)-এর ১৩ নং আর্টিকেলে প্যালেস্টাইনীদের ক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হয়েছে। এসব সত্ত্বেও মার্কিন প্রশাসনসহ পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলো ইসরাইলের এই বর্বরোচিত হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কিন্তু ইহুদী রাষ্ট্র ও জায়ানবাদের প্রতি পশ্চিমী দেশগুলোর কেন এই অকুণ্ঠ সমর্থন, কেন জায়ানবাদের সঙ্গে আরব বিশ্বসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর দ্বন্দ্ব? এসব প্রশ্নের পর্যালোচনা করেছেন তিনি *দ্য কোয়েশ্চেন অব প্যালেস্টাইন*-এ। বইটিতে এডওয়ার্ড সাঈদ সংকটের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এডওয়ার্ড সাঈদ ফিলিস্তিনী সংকটের অভিজ্ঞতা থেকে মনে করেন উপনিবেশবাদের ধারণা থেকে জায়ানবাদকে মোটেও বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নয়া উপনিবেশবাদ জায়ানিজমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে ফলে যে কোনভাবে ফিলিস্তিনীদের ওপর জায়ানবাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় ইসরাইলের অব্যাহত সন্ত্রাস, নিরপরাধ ফিলিস্তিনীদের নির্বিচারে হত্যা, ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেয়ার মতো মানবতাবিরোধী ঘটনা, মার্কিন প্রশাসনসহ অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলোর মধ্যে কোন সংবেদনশীল অনুভূতির সৃষ্টি করে না। অন্যদিকে জায়ানবাদী সন্ত্রাসকে পশ্চিমী প্রচার মাধ্যম গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী প্রচার করে না। এ কারণেই ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসরাইলী সামরিক বাহিনী বর্বরোচিত হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে পশ্চিমী প্রচারমাধ্যম একেবারেই নির্বিকার, নীরব। ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন বিবিসিসহ পশ্চিমী দুনিয়ার অন্যান্য প্রচার মাধ্যম 'ইসরাইলী সামরিক বাহিনী' শব্দ উলে-খ না করে এর স্থলে 'ইসরাইলী নিরাপত্তা কর্মী' শব্দ ব্যবহার করে, প্রকারান্তরে জায়ানবাদী সামরিক বাহিনীর বর্বরতাকেই আড়াল করার চেষ্টা করে থাকে।' এডওয়ার্ড সাঈদ পশ্চিমী বিশ্বের তথ্যের এই সন্ত্রাসকে জায়ানবাদী তথ্য সন্ত্রাস বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভাষায়...hypocrisy of western Journalism and intellectual discourse....

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সাঈদ একটি মার্কিন পত্রিকায় প্রকাশিত তৎকালীন ইসরাইলী সামরিক প্রধান জেনারেল গারি-এর নির্জলা মিথ্যায় ভরা একটি সাক্ষাতকার হুবহু তুলে ধরেছেন তাঁর বইয়ে। জায়ানবাদী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের বিপরীতে এসব প্রচার মাধ্যম সারাবিশ্বে ফিলিস্তিনীদেরই 'বর্বর সন্ত্রাসী' 'ইসলামী মৌলবাদী সন্ত্রাসী' বলে অপপ্রচার করছে। কিন্তু ফিলিস্তিনী জনগণের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমী উপনিবেশবাদ ও জায়ানবাদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনীদের অন্যান্য 'আরব ভাই'রা কী করছেন? এডওয়ার্ড সাঈদ এখানেও হতাশা প্রকাশ করে বলেছেন, আনোয়ার সাদাত ও তাঁর বিভিন্ন সমর্থক 'আরব বন্ধুরা' মার্কিনীদের হাতে ১০০ ভাগ তুরুপের তাস দিয়ে রেখেছেন। অবশ্য এর কারণও তিনি তাঁর এই বইতে ব্যাখ্যা করেছেন। সমকালীন উপাত্তের পাশাপাশি এডওয়ার্ড সাঈদ ১৫১৬ সালে ফিলিস্তিন কীভাবে অটোমানসাম্রাজ্যের প্রদেশ হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে ১৯৪৮-এর পরে কীভাবে পর্যায়ক্রমে ফিলিস্তিনীদের তুলনায় ইহুদী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করল এর বিস্তারিত ঐতিহাসিক বর্ণনা তাঁর এই গ্রন্থে প্রামাণ্য দলিলসহ উপস্থাপন করেছেন। বিশেষ করে প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যে স্থানিক সামাজিক ইতিহাসের উপাদান লুকায়িত থাকে মার্কস এবং এঙ্গেলস তা প্রথম দেখিয়েছিলেন কালজয়ী গ্রন্থ 'পরিবার ব্যক্তিমালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'তে। এঙ্গেলস প্রাচীন সাহিত্য হোমারের 'ইলিয়ড' এবং 'অডিসি'র ভিতর থেকে সামাজিক উপাদান বের করে মানবসভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। একইভাবে গবেষক এডওয়ার্ড সাঈদ প্রাচীন ফিলিস্তিনী সাহিত্যের ভিতর থেকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে আরব ও জায়ানিজমের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব তুলে এনেছেন।

'দ্য কোয়েশ্চেন অব প্রালেস্টাইন' বইতে এডওয়ার্ড সাঈদ ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অন্ত রায় সংবলিত ঐতিহাসিক দিকগুলোকেই তুলে ধরেছেন। কারণ জায়ানবাদ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। জায়ানবাদ নয়া ঔপনিবেশিক ধারণারই রক্ষক। তাই তিনি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অনিবার্য ও যৌক্তিক ইস্যুর প্রধান বাধা হিসাবে সাম্রাজ্যবাদকেই দায়ী করেছেন। সাঈদ-এর ভাষায় : Imperialism was and still is a political philosophy whose aim and purpose for being is territorial expansion and its legitimization. (পৃষ্ঠা-৭৩)

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সাঈদের ধারণা হলো, যেহেতু জায়ানবাদ নয়া উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদেরই সৃষ্ট একটি দর্শন, তাই বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় নয়া মার্কিন আধিপত্যবাদী কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইস্যু অমীমাংসিতই থেকে যাবে। এ ক্ষেত্রে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বর্তমানে যেমন কঠিন, ভবিষ্যতেও তা হবে আরও দুরূহ বিষয়।

জনকণ্ঠ, ৩ অক্টোবর, '০৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের লেখা

www.pathagar.com

ওরিয়েন্টালিজম-এর ভূমিকা

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ

অনুবাদক : জাকারিয়া শিরাজী

জনৈক ফরাসি সাংবাদিক ১৯৭৫-৭৬-এর সর্বধ্বংসী গৃহযুদ্ধের সময় বৈরুত সফর করেছিলেন। আগুনে ছারখার শহর-কেন্দ্র সম্বন্ধে তিনি আক্ষেপের সঙ্গে লিখলেন, এটা এক সময় শাতুব্রিয়াঁ ও নের্ভালের প্রাচ্যের জগৎ ছিল। জায়গাটা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য অবশ্যই সঠিক ছিল, বিশেষ করে য়োরোপিয়ানদের দিক থেকে বিচার করলে। প্রাচ্য জিনিসটা যেন য়োরোপিয়ানদের একটা আবিষ্কার। সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই প্রাচ্য একটা জগৎ যেটাকে ঘিরে রয়েছে রোমান্স, কিম্ভুত প্রকৃতির প্রাণীদের সম্পর্কে ধারণা, কিছু ঝোড়ো স্মৃতি ও ভূ-চিত্র, বেগানা অভিজ্ঞতার ডালা। এখন সেই আবিষ্কার ক্ষয়ে যাচ্ছে, এর যুগ শেষ হয়েছে। এটা মোটেই প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়নি যে প্রাচ্যবাসীদের নিজেদের সুখ-দুঃখ বলে কিছু ছিল, মনে হয়নি শাতুব্রিয়াঁ ও নের্ভালের যুগে প্রাচ্যের লোকেরা এখানে বাস করত, এবং এখন তাদেরই দুর্গতি চলছে। এই য়োরোপীয় সফরকারীর পক্ষে প্রধান বিবেচ্য প্রাচ্যের য়োরোপীয় প্রতিচ্ছবি এবং তার বর্তমান অবস্থা। এই দুটো জিনিসেরই কেবল এই সাংবাদিক ও তাঁর ফরাসি পাঠকদের কাছে একটা সুবিধাভোগী সাম্প্রদায়িক তাৎপর্য আছে।

প্রাচ্য সম্বন্ধে আমেরিকানদের অনুভূতি অভিন্ন নয়। দূর প্রাচ্যকে (বিশেষ করে চীন ও জাপানকে) এর সঙ্গে যুক্ত করাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। আমেরিকানদের অননুরূপ, ফরাসি ও ব্রিটিশরা— স্বল্প মাত্রায় জার্মান, রাশ্যান, স্প্যানিশ, পর্টুগিজ, ইটালিয়ান ও সুইসরা— একটা সুদীর্ঘ *ঐতিহ্য* গড়ে তুলেছে আমি যেটাকে বলব **প্রাচ্যবাদ**। এটা প্রাচ্যের সঙ্গে আপোস করার একটা প্রক্রিয়া যেটা য়োরোপের আভিজ্ঞতার নিরিখে প্রাচ্যের যে বিশেষ আবস্থান, তার ওপর ন্যস্ত। প্রাচ্য কেবল য়োরোপের নিকটবর্তীই নয়; এটা য়োরোপের শ্রেষ্ঠ, প্রাচীনতম ও সমৃদ্ধতম উপনিবেশগুলোর ঠিকানা, তার সভ্যতা ও ভাষাগুলোর উৎসস্থল, তার সাংস্কৃতিক প্রতিপক্ষ, সর্বোপরি 'দি আদার' বা প্রতিস্ব-এর গভীর ও পৌনঃপুনিক ভাবচিত্র। তদুপরি, প্রাচ্য সাহায্য করেছে প্রতিপক্ষ-সুলভ ভাবচিত্রে য়োরোপকে (তথা পাশ্চাত্যকে) সংজ্ঞায়িত করতে— ধীকল্পে, ব্যক্তিত্বে, অভিজ্ঞতায়। তাই বলে এই প্রাচ্যের কোনো অংশই নেহাত কল্পনাশ্রিত নয়। প্রাচ্য য়োরোপের বৈষয়িক সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাচ্যবাদ এই অংশকে সাংস্কৃতিকভাবে এমনকি মতাদর্শের দিক থেকেও অভিব্যক্ত করে এবং এর প্রতিনিধিত্ব করে, প্রতর্কের (discourse)

www.pathagar.com

ধারায় (সহায়ক সংগঠনগুলোর আনুকূল্য সাপেক্ষে), শব্দসম্ভারে, বিদ্যাবত্তায় চিত্রকল্পে, তত্ত্বকথায়, এমনকি ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রে ও ঔপনিবেশিক কায়দাকানুনে। পক্ষান্তরে প্রাচ্য সম্বন্ধে আমেরিকান বোধ ততটা ঘন মনে হবে না, যদিও জাপান, কোরিয়া ও ইন্দোচিনে আমাদের সাম্প্রতিক অভিযান আমাদের মধ্যে একটা সুস্থির ও বাস্তবসম্মত "প্রাচ্যবাদী" চেতনা সঞ্চার করে থাকতে পারে। তাছাড়া নিকট প্রাচ্যে (মধ্য প্রাচ্যে) বিপুলভাবে সম্প্রসারিত আমেরিকান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা এই প্রাচ্য সম্বন্ধে জ্ঞান রাখা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি করে তুলেছে। পাঠকের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে (এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে স্পষ্টতর হবে) যে প্রাচ্যবাদ দ্বারা আমি কয়েকটা বিষয় বোঝাচ্ছি যেগুলির প্রত্যেকটা, আমার মতে, পরস্পর যুক্ত। প্রাচ্যবাদের যে মর্ম সর্বাগ্রে গৃহীত সেটা আকাদেমিক, এবং এখনো বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই পরিচিতিই চলে আসছে। যেই প্রাচ্য সম্বন্ধে পড়ায়, লেখে বা গবেষণা করে, কোনো বিশেষ দিক নিয়ে অথবা সার্বিকভাবে, সেই প্রাচ্যবাদী। হোক সে নৃতত্ত্ববিদ বা সমাজতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবেত্তা বা ভাষাবিজ্ঞানী। এবং সে যে কাজটা করে সেটা প্রাচ্যবাদ। প্রাচ্য অধ্যয়ন বা অঞ্চলভিত্তিক অধ্যয়নের তুলনায় 'প্রাচ্যবাদ' কথাটা বিশেষজ্ঞরা আজকাল কমই ব্যবহার করেন, একথা ঠিক। কারণ শব্দটা অতিমাত্রায় অস্পষ্ট ও অনির্দেশ্য; আরেকটি কারণ, এটা উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর শুরুর সময়কার ঔপনিবেশিক শাসকের মনোভঙ্গির অর্থবাহী। তা সত্ত্বেও গ্রন্থরচনা ও সম্মেলনের আয়োজন চলছেই যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "প্রাচ্য"। এবং প্রাচ্যবাদী তার নতুন অথবা পুরাতন ছদ্মাবরণে এই জ্ঞানের প্রামাণ্য উৎস হিসেবে পরিচিত হচ্ছে। লক্ষণীয় যে প্রাচ্যবাদ তার আগের শক্তি নিয়ে টিকে না থাকলেও আকাদেমিক জগতে প্রাচ্যবাদ প্রাচ্য সম্বন্ধে তার তত্ত্ব ও অভিসন্দর্ভের জোরে কায়েম রয়েছে।

এই আকাদেমিক পরম্পরা যার উত্থান-পতন, পুনরুজ্জীবন, দেশান্তর, বিশেজ্ঞ-সুলভ জ্ঞান ও সংক্রাম যা অংশত এই গবেষণার বিষয়বস্তু— এরই সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাচ্যবাদের বৃহত্তর অর্থ। প্রাচ্যবাদ চিন্তার একটা রীতি যার ভিত্তি "প্রাচ্য" এবং (অধিকাংশ সময়) "প্রতীচ্যের" মধ্যেকার তত্ত্ববিদ্যাবিষয়ক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological) বিভেদ। অতএব লেখকদের এক বিরাট অংশ যাঁদের মধ্যে রয়েছেন কবি, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক তত্ত্ববিদ, অর্থনীতিবিদ ও সাম্রাজ্য-শক্তির পরিপোষক শাসকবর্গ— তাঁরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই মৌলিক বিভেদকে মেনে নিয়েছেন এবং এখান থেকেই যাত্রা শুরু প্রাচ্য ও তার মানুষ, প্রথা, "মানসতা", লক্ষ্যপথ, ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত মতবাদ, সামাজিক বর্ণনা ও রাজনৈতিক আলেখ্যের। এই প্রাচ্যবাদ এসকাইলাস, ভিক্তর উগো, দান্তে ও কার্ল মার্ক্সকেও ধারণ করতে পারে। বর্তমান ভূমিকায় একটু পরে আমি আলোচনা করব এই বিপুল আয়তনের "ক্ষেত্র" নিয়ে কাজ করার সময় কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

প্রাচ্যবাদের আকাদেমিক অর্থ আর যেটাকে বলা যেতে পারে মন-গড়া অর্থ— এই দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় সবসময়েই হচ্ছে, এবং আঠার শতকের শেষ দিক থেকে এই লেনদেন হয়েছে আরো বিশেষভাবে লক্ষণীয়, নিয়মাবদ্ধ, এমনকি সুনিয়ন্ত্রিত। এখন আসি প্রাচ্যবাদের তৃতীয় অর্থ প্রসঙ্গে। অপর দুই অর্থের চাইতে এই অর্থ ঐতিহাসিক ও

www.pathagar.com

বস্তুগত দিক থেকে অধিকতর সূক্ষ্মতার সঙ্গে সংজ্ঞায়িত। অষ্টবিংশ শতাব্দীর শেষভাগকে মোটামুটিভাবে সূচনা পর্ব ধরে প্রাচ্য সম্বন্ধে জ্ঞানচর্চার জন্যে একটা বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানরূপে প্রাচ্যবাদের আলোচনা ও বিশে-ষণ করা যায়। জ্ঞানচর্চার এখানে মানে হচ্ছে এ-সম্বন্ধে মন্তব্য করতে থাকা, বিভিন্ন মতামতের সাফাই গাওয়া, বিবরণ দেওয়া, বিষয়টা শিক্ষা দেওয়া, সমাধান দেওয়া এবং এর ওপর আধিপত্য বিস্তার করা। সংক্ষেপে, পাশ্চাত্যের ধাঁচে প্রাচ্যের ওপর প্রভুত্ব খাটানো, এটা পুনর্গঠন করা এবং কর্তৃত্বের অধীনে নিয়ে আসা। প্রাচ্যবাদকে চিহ্নিত করার জন্যে মিশেল ফুকো তাঁর *The Archaeology of Knowledge* এবং *Discipline and Punish*-এ যে প্রর্তকের অবতারণা করেছেন সেটা এখানে প্রয়োগ করা আমি যথোপযুক্ত মনে করছি। আমার বক্তব্য এই যে প্রাচ্যবাদকে একটা প্রতর্করূপে ব্যবচ্ছেদ না করে কারো পক্ষে হয়ত বোঝা সম্ভব হবে না সেই বহুবিধ নিয়ম-চালিত জ্ঞান-শাখাকে যার বলে য়োরোপীয় সংস্কৃতি উত্তর-আলোকপর্ব (post-Enlightenment) যুগে প্রাচ্যকে রাজনৈতিকভাবে, সমাজতাত্ত্বিকভাবে, সামরিকভাবে, বিশ্ববীক্ষার দিক থেকে, বিজ্ঞানের নিরিখে এবং মানুষের কল্পনায় লালিত করেছে, এমনকি সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া প্রাচ্যবাদের অবস্থান এমনই কর্তৃত্বময় ছিল যে প্রাচ্য নিয়ে যেই ভাববে, লিখবে বা কাজ করবে, তাকেই চিন্তা ও কর্মে প্রাচ্যবাদ-আরোপিত সীমাবদ্ধতার সঙ্গে জুঝতে হবে। মোট কথা, প্রাচ্যবাদের কল্যাণে প্রাচ্য স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ করার বিষয় আগেও থাকেনি, এখনও নেই। তার মানে এই নয় যে প্রাচ্যবাদ একতরফাভাবে ঠিক করে দেয় প্রাচ্য সম্বন্ধে কী বলা হবে, না হবে। আসলে এটা হলো সবগুলো স্বার্থের যোগসাযশ যেগুলো যখনই "প্রাচ্য" নামক এক অদ্ভুত সত্তাটির প্রসঙ্গ এসেছে তখনই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কীভাবে সেটা ঘটে তাই এই বইতে দেখাবার চেষ্টা করা হবে। আরো দেখাবার চেষ্টা করা হবে যে য়োরোপীয় সংস্কৃতি তার শক্তি ও আত্মপরিচয় পরিপুষ্ট করতে পেরেছে এই প্রাচ্যের প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজকে দাঁড় করিয়ে, এমন কি তার প্রতিনিধিত্ব করেও।

ঐতিহাসিকভাবে এবং সাংস্কৃতিকভাবে প্রাচ্য নিয়ে যে ইঙ্গ-ফরাসি লিপ্ততা এবং (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তারের আগে পর্যন্ত) অন্যান্য য়োরোপীয় ও আটলান্টিক শক্তিগুলির যে লিপ্ততা, এ-দুয়ের মধ্যে একটি পরিমাণগত ও গুণগত তফাত আছে। প্রাচ্যবাদের কাহিনী মানে প্রধানত— যদিও সম্পূর্ণত নয়— ব্রিটিশ ও ফরাসি সাংস্কৃতিক অভিযাত্রার কাহিনী। এর বিশাল পরিসরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় অনেকগুলি ভিন্ন জগৎ— সম্পূর্ণ ভারত ভূভাগ ও লেভান্ত, বাইবেলের আদিপাঠ ও বাইবেল-ধৃত জমিন, মশলা বাণিজ্য, ঔপনিবেশিক সেনাবাহিনী, সাম্রাজ্য শক্তির পরিপোষক শাসকদল, অসামান্য বিদ্যাবৈভবে ঋদ্ধ গ্রন্থরাজি, সংখ্যাতীত প্রাচ্যবাদী "বিশেষজ্ঞ" এবং "দক্ষ" ব্যক্তিবর্গ, প্রাচ্যবাদী অধ্যাপকদের গোষ্ঠী, প্রাচ্যবাদী ধ্যান-ধারণার বিচিত্রমুখী সমাহার, (প্রাচ্যের স্বৈরশাসক, প্রাচ্যের আড়ম্বর, নিষ্ঠুরতা, কামুকতা), বিভিন্ন পূর্বদেশীয় সম্প্রদায়, দর্শন, জ্ঞান-গরিমা যেগুলিকে স্থানীয় প্রয়োজনে য়োরোপের উপযোগী করে নেওয়া হয়েছে। এসবের তালিকা যত খুশি দীর্ঘ করা যায়। আমার প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, প্রাচ্যবাদের উৎস নিহিত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে প্রাচ্যের এক বিশেষ ধরনের নৈকট্যের অনুভূতির মধ্যে। এই প্রাচ্য বলতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু

www.pathagar.com

পর্যন্ত কেবল ভারত ও বাইবেলের জমিনকে বোঝাত। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স ও ব্রিটেন প্রাচ্য ও প্রাচ্যবাদের ওপর মোড়লিপনা করেছে; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই মোড়লিপনা চালাচ্ছে আমেরিকা, ফ্রান্সেরই অনুরূপ মনোভঙ্গি নিয়ে। এই নৈকট্যের অন্তঃপ্রেরণা অত্যন্ত সৃষ্টিশীল যদিও এটা প্রতীচ্যকেই (ব্রিটিশ, ফরাসি ও আমেরিকান) অধিকতর শক্তিমান রূপে প্রতিপন্ন করে। এই অন্তঃপ্রেরণা থেকেই উৎসারিত বিপুল পরিমাণ বয়ান (text) আমি যাকে প্রাচ্যবাদ বলি।

বলে রাখা ভালো যে যদিও বিপুল সংখ্যক বইপত্র ও লেখকদের পর্যালোচনা করেছি তারপরও বিপুলতর সংখ্যক বাদ পড়েছে। অবশ্য আমার যুক্তি প্রাচ্যের ওপর রচিত দলিলপত্রের তালিকার পূর্ণাঙ্গতার ওপর নির্ভরশীল নয়; তেমনি কতকগুলি সুনির্বাচিত টেক্সট, লেখক ও ধারণা যার দ্বারা প্রাচ্যবাদী বিধিবিধান রচিত, তার ওপরও নয়। বরং আমি অন্য এক ক্রিয়াপদ্ধতিগত বিকল্পের ওপর নির্ভর করেছি। এর প্রধান অবলম্বন, এক অর্থে, কিছু ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যেগুলি আমি এই ভূমিকায় উপস্থাপন করে চলেছি এবং এখন এগুলিই আরো বিশদভাবে বিশে-ষণ করতে চাই।

দুই

সূচনাতেই আমি ধরে নিয়েছি যে প্রাচ্য প্রকৃতির কোনো অনড়রূপ নয়। এটা কেবল 'সে স্থানে' বহাল নয়, খোদ প্রতীচ্য যেমন 'সে স্থানে' বহাল নয়। ভিকো-র পর্যবেক্ষণকে আমাদের গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। ভিকো বলেন মানুষ নিজেই নিজের ইতিহাস তৈরি করে এবং সে সেটুকুই জানে যেটুকু তৈরি করেছে, এবং এটা ভূগোলের ওপর প্রসারিতও করে। ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক সত্তাগুলি— ঐতিহাসিক সত্তাগুলির তো কথাই নেই— যেমন বিশেষ ঘটনাস্থল, অঞ্চল, "প্রাচ্য" এবং "প্রতীচ্যের" ভৌগলিক খাত নির্ণয়— এসব মনুষ্য-সৃষ্ট। অতএব পাশ্চাত্যের মতোই প্রাচ্য একটা ধী-কল্প যার রয়েছে একটা ইতিহাস আর রয়েছে চিন্তার পরম্পরা, রূপকল্প আর শব্দসম্ভার যেগুলি তাকে দিয়েছে বাস্তবতা এবং পাশ্চাত্যের ভিতরে ও পাশ্চাত্যের নিমিত্তে একটা উপস্থিতি। এভাবেই এই দুই ভৌগলিক সত্তা পরস্পরকে পরিপোষণ ও প্রতিবিম্বিত করে থাকে।

একথা বলার পরও কয়েকটি লাঘবকারী অবস্থার উলে-খ করা যুক্তিসঙ্গত। প্রথমত এই উপসংহার টানা ভুল হবে যে প্রাচ্য সর্বাংশে একটা ধী-কল্প বা সৃষ্টিকল্পনা যার প্রতিতুল্য কোনো বাস্তবতা নেই। ডিজরেইলি যখন তাঁর উপন্যাস *Tancred*-এ বললেন প্রাচ্য একটা জীবিকা তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে প্রাচ্য সম্বন্ধে আগ্রহ পাশ্চাত্যবাসী প্রতিভাদীপ্ত তরুণদের বিমোহিত করে দেবে। তাঁর কথার এমন অর্থ করা উচিত নয় যে প্রাচ্য পাশ্চাত্যবাসীদের জন্য কেবলই জীবিকা। এমন সংস্কৃতি ও জাতি ছিল এবং আছে যার ঠিকানা প্রাচ্য এবং যাদের জীবন, ইতিহাস, লোকাচার, একটা জান্তব সত্য, পাশ্চাত্যে তাদের সম্বন্ধে যা-কিছু বলা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বড়। এই সত্য সম্বন্ধে বর্তমান অভিসন্দর্ভ সামান্যই আলোকপাত করতে পারে, এটাকে মৌন স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া। কিন্তু এখানে প্রাচ্যবাদ বিষয়টাকে যেভাবে পর্যালোচনা করছি তার প্রধান

www.pathagar.com

প্রতিপাদ্য প্রাচ্যবাদ ও প্রাচ্যের মধ্যে প্রতিতুল্যতা নয়; বরং প্রাচ্যবাদের অভ্যন্তরীণ সঙ্গতি এবং প্রাচ্য সম্বন্ধে এর ধী-কল্পগুলো ('প্রাচ্য একটা জীবিকা') যা কোনো প্রকার প্রতিতুল্যতা বা তার অনুপস্থিতি-জনিত ধারণার বাইরে এবং এটাকে ছাড়িয়ে, যেটা "প্রকৃত" প্রাচ্য। আমি বলতে চাই প্রাচ্য সম্বন্ধে ডিজরেইলির মন্তব্য এই গড়ে-তোলা সঙ্গতিকে নির্দেশ করে, সেই ধ্যান-ধারণার মিলিত আকর্ষণ-বিকর্ষণ যা প্রাচ্যের প্রধান দিক।

দ্বিতীয় লাঘবকারী অবস্থা এই যে বিভিন্ন ধীকল্প, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের গভীর অনুধ্যান ও অনুশীলন সম্ভব নয় সেগুলির শক্তি, বা আরো সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ক্ষমতার বিন্যাস অনুধাবন না করে। যদি মনে করি যে প্রাচ্যকে সৃষ্টি করা হয়েছিল— আমি যেটাকে বলি "প্রাচ্যীকৃত" করা হয়েছিল— এবং যদি বলা হয় এ-ধরনের ঘটনা শুধু কল্পনার বশ্যতার কারণে ঘটেছিল তাহলে কপটতার আশ্রয় নেয়া হবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যেকার সম্পর্ক ক্ষমতার সম্পর্ক। এ সম্পর্ক প্রভুত্বের, বিভিন্ন মাত্রার জটিল আধিপত্যের। এটা নির্ভুলভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে কে এম পানিক্করের যুগান্তকারী *Asia and Western Dominance* বইটার শিরোনামে। প্রাচ্যকে প্রাচ্যীকৃত করা হয়েছে শুধু এই কারণে নয় যে উনবিংশ শতাব্দীর একজন গড়পড়তা য়োরোপিয়ান সাধারণ বিবেচনায় এটাকে "প্রাচ্য-সুলভ" বলে আবিষ্কার করেছে; একারণেও যে এটাকে প্রাচ্য-সুলভ বানানো সম্ভব এবং তা হতে বাধ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটা একতরফা ঘটনার উলে-খ করা যায়। ফ্লোবেয়ার একবার এক ইজিপশিয়ান বারবনিতার মুখোমুখী হলেন। এই ঘটনা প্রাচ্য-সুলভ নারীর একটা নমুনা হয়ে দাঁড়াল যেটা ব্যাপক প্রচারও পেল। এই মহিলা নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলেনি। সে নিজের আবেগ, উপস্থিতি ও ইতিহাস প্রকাশ করেনি। মহিলার পক্ষ থেকে যা-কিছু বলার তিনিই বললেন এবং তার প্রতিনিধিত্ব করলেন। তিনি ছিলেন বিদেশি, তুলনামূলকভাবে ধনী এবং পুরুষ। এগুলি ঐতিহাসিকভাবে প্রভুত্বের আলামত। এর ফলে তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো শুধু শারীরিকভাবেই কুচুক হানেমের অধিকার পাওয়া নয়, তার পক্ষ থেকে কথা বলা এবং পাঠকদের জানানো কোন দিক থেকে সে "স্বাতন্ত্র্যময় প্রাচ্যের" মহিলা। আমার যুক্তি এই যে কুচুক হানেমের তুলনায় ফ্লোবেয়ারের যে শক্তিশালী অবস্থান সেটা কোনো বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত নয়। পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে আপেক্ষিক শক্তির যে বিন্যাস এবং প্রাচ্য সম্বন্ধে যে প্রতর্কের এখান থেকে সূত্রপাত হতে পারে, এটা তার যথার্থ নমুনা।

এটা তৃতীয় লাঘবকারী অবস্থার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরায়। কারো এমনটা ধরে নেয়া উচিত হবে না যে প্রাচ্যবাদের নির্মিতি কতকগুলো মিথ্যা ও রূপকথার নির্মিতি ছাড়া আর কিছু নয় এবং প্রকৃত সত্য যখনই লোকে জানবে এই ধূম্রজাল মিলিয়ে যাবে। আমি বিশ্বাস করি প্রাচ্যবাদ প্রাচ্য সম্বন্ধে তথ্য দেবার নাম করে যে প্রতর্কের সৃষ্টি করে (যা একাদেমিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলে দাবি করা হয়) তার চেয়ে প্রাচ্যের ওপর য়োরোপিয়ান-আটলান্টিক ক্ষমতার নিদর্শন রূপে এটা বেশি মূল্যবান। তথাপি যেটা আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত ও বোঝার চেষ্টা করা উচিত সেটা প্রাচ্যবাদী প্রতর্কের মিলিত বুননের শক্তি, সহায়তাকারী আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে এর নিকট সম্বন্ধ এবং

www.pathagar.com

এর সংশয়াতীত টিকে থাকার শক্তি। এটাও মনে রাখতে হবে যে ধারণাগুলোর যে-কাঠামো ১৮৪০-এর শেষ পর্ব অর্থাৎ আর্নেস্ট রেনাঁর কাল থেকে এ-পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে টিকে থাকতে পারে একটা শিক্ষাদানের উপযোগী জ্ঞান হিসেবে (আকাদেমিগুলোতে, বইয়ের পাতায়, সভা-সম্মেলনে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, কূটনৈতিক চাকরির ইনস্টিটিউটগুলোতে) সেটা কেবল একগুচ্ছ মিথ্যা হতে পারে না, বরং এর চেয়ে শক্তিশালী একটা কিছু। প্রাচ্যবাদ, অতএব, প্রাচ্য সম্বন্ধে একটা বায়বীয় য়োরোপীয় চিত্তবিভ্রম নয়; বরং একটা সযত্ন-সৃষ্ট তত্ত্ব ও প্রথা যেটাতে বহু প্রজন্ম ধরে বিপুল পরিমাণে সম্পদের বিনিয়োগ হয়েছে। ক্রমান্বয়ে বিনিয়োগ প্রাচ্যবাদকে, প্রাচ্য সম্বন্ধে একটা জ্ঞান-পদ্ধতিরূপে, একটা গ্রহণীয় ছাকনি রূপে গড়ে তুলল যার মধ্য দিয়ে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের চেতনায় সঞ্চারিত হতে লাগল। এবং বিনিয়োগ যেমন বাড়তে লাগল আর ফলবাহী হতে লাগল তেমনি প্রাচ্যবাদ সংক্রান্ত মন্তব্যগুলো সর্বজনীন সংস্কৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হলো।

গ্রামসি পৌর সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের মধ্যে একটা মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় বিশে-ষণী ভেদরেখা টেনেছেন। প্রথমটা স্বেচ্ছা-নির্ভর (অন্তত যুক্তিভিত্তিক ও নিগ্রহ-মুক্ত) আনুগত্যের ওপর ধৃত, যেমন স্কুল, পরিবার, ইউনিয়ন; দ্বিতীয়টির ভিত্তি রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ (সশস্ত্র বাহিনী, পুলিস, কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র) রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় যাদের ভূমিকা সরাসরিভাবে কর্তৃত্বময়। সংস্কৃতি অবশ্য পৌর সমাজের মধ্যেই ক্রিয়াশীল থাকে যেখানে ধ্যান-ধারণা, প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ব্যক্তিদের ক্রিয়াকলাপ প্রভাব বিস্তার করে কর্তৃত্ব নয়, বরং যেটাকে গ্রামসি বলেছেন সম্মতির মধ্যে দিয়ে। অতএব, একনায়কত্ব দ্বারা চালিত নয় এমন যে-কোনো সমাজে কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংরূপ অন্যগুলির চেয়ে বেশি প্রধান হয়ে উঠবে, যেমন করে কতকগুলি ধ্যান-ধারণা অন্যগুলির চেয়ে বেশি প্রভাবশালী হয়। সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের এই সংরূপকে গ্রামসি চিহ্নিত করেছেন আধিপত্য (hegemony) বলে। শিল্পসমৃদ্ধ পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক জীবন বুঝতে হলে এটা সম্বন্ধে ধারণা থাকা জরুরি। এই আধিপত্য বা সাংস্কৃতিক আধিপত্যের ক্রিয়াশীলতার ফলাফল প্রাচ্যবাদকে সেই শক্তি ও টিকে থাকার রসদ যুগিয়েছে যেটা সম্বন্ধে আমি এতক্ষণ আলোচনা করলাম। ডেনিস হে যেটাকে বলেছেন য়োরোপের প্রতীতি, সেটা থেকে প্রাচ্যবাদ খুব দূরে নয়। এটা হলো একটা সমষ্টিমূলক ধারণা যেটা দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে "আমরা" য়োরোপিয়ানরা এবং প্রতিপক্ষরূপে "তারা" যারা য়োরোপিয়ান নয়। এবং এটাও বলা যায় যে য়োরোপীয় সংস্কৃতির এক মুখ্য উপাদান হচ্ছে এটাই যা সংস্কৃতিকে আধিপত্যময় করেছে, য়োরোপের ভিতরে ও বাইরে। য়োরোপের পরিচিতি বিষয়ে একটা ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে যে এটা অ-য়োরোপীয় জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির তুলনায় উন্নততর। তার ওপর রয়েছে প্রাচ্য সম্বন্ধে য়োরোপীয় প্রতীতির আধিপত্য। প্রাচ্য নিজেই য়োরোপীয় শ্রেষ্ঠত্ব পুনর্ব্যক্ত করে চলেছে; কোনো স্বাধীন ও সপ্রশ্ন চিন্তক যে একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করবে সে-সম্ভাবনাও অবদমিত।

প্রাচ্যবাদের এই শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থানগত কিছু হেরফের হলেও এবং পাশ্চাত্যবাসী প্রাচ্যের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্কে যুক্ত হলেও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার কোনো পরিবর্তন হয় না। এবং

www.pathagar.com

হবার উপায়ও নেই। বিশেষ করে রেনেসাঁ থেকে এপর্যন্ত য়োরোপের অসামান্য উত্থানের পর। বিজ্ঞানী, পণ্ডিত, মিশনারি, সওদাগর, অথবা সৈনিক— এঁরা প্রাচ্যে ছিলেন বা প্রাচ্য সম্বন্ধে ভাবতে পেরেছিলেন প্রাচ্যের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বাধা ছাড়াই। প্রাচ্য বিষয়ক জ্ঞানের শিরোনামের অধীন এবং প্রাচ্যের ওপর পাশ্চাত্যের আধিপত্যের ছত্রছায়ায় অষ্টবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্ব থেকে এক জটিল প্রাচ্যের উদ্ভব হলো যা খুবই উপযোগী আকাদেমিতে অধ্যয়নের জন্যে, প্রত্নশালায় প্রদর্শনের জন্যে, ঔপনিবেশিক দফতর পুনর্বিন্যাসের কাজে, মানবজাতি ও বিশ্বের ওপর নৃতাত্ত্বিক, জীববিদ্যা-সংক্রান্ত বা ভাষা, বর্ণ বা ইতিহাস সম্বন্ধীয় অভিসন্দর্ভে তত্ত্বগত চিত্র স্থাপনে, অর্থনৈতিক বা সামাজিক উন্নয়ন, বিপ-ব, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বা জাতীয় বা ধর্মীয় চরিত্র সম্পর্কে মতবাদের দৃষ্টান্ত স্থাপনে। এগুলি ছাড়াও প্রাচ্য বলতে কোন কোন জিনিস বোঝায় তার কল্পনার ভিত্তি প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিহিত ছিল সেই সার্বভৌম পশ্চিমা চেতনার মধ্যে। এই চেতনার কেন্দ্রিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়নি এবং এটা জন্ম দিয়েছে এক প্রাচ্যের যা রচিত হয়েছে প্রথমত প্রাচ্য কী এবং কোন কোন জিনিস সে-সম্পকে সাধারণের ধারণা দ্বারা, এবং পরবর্তী পর্যায়ে দাঁড় করানো হয়েছে এক বিষদ যুক্তিমালা যার পেছনে কোনো বাস্ত ব অভিজ্ঞতা নেই, আছে বাসনার ডালা, সত্যের অবদমন, বিনিয়োগ ও ভবিষ্যতের প্রাক্কলন। আমরা সিলভেসটর দ্য সাসি-র *Chrestomathy arabe* অথবা এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেনের *Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians*-এর মতো জ্ঞান-সমৃদ্ধ প্রাচ্যবাদী গ্রন্থের উদাহরণ অবশ্য দিতে পারি কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে রেনাঁ ও গোবিনো-র বর্ণবাদী ধারণার উৎস সেই একই প্রেরণা যা ভিক্টোরিয়ান যুগে অসংখ্য কামোদ্দীপক উপন্যাসের জন্ম দিয়েছে (দেখুন স্টিভেন মার্কাসের '*কামুক তুর্কি*'-র বিশে-ষণ)।

তবুও আমাদের বারবার প্রশ্ন করতে হবে প্রাচ্যবাদের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এ-সম্বন্ধে সাধারণ ধ্যান-ধারণা যা বই-পুস্তককে ছাপিয়ে উঠেছে— অনস্বীকার্য যে এসব বইপত্র য়োরোপের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিভিন্ন ধরনের বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের চিন্তা দ্বারা আক্রান্ত— নাকি অন্যান্য অসংখ্য লেখকের নিজস্ব স্বতন্ত্র রচনা যেগুলিতে লেখক ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচ্যকে তুলে ধরেছেন। এক দিক দিয়ে দেখলে বিশেষ ও সার্বজনীন এই দুই বিকল্প একই তথ্যভাণ্ডারের দুটো দিক মাত্র। উভয় ক্ষেত্রে আমরা সম্মুখীন হবো এ-জগতের পথিকৃৎ উইলিয়াম জোন্‌সের সঙ্গে এবং নার্ভাল ও ফ্লোবেয়ারের মতো জগৎ বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে। আর দুটো দিকই একসঙ্গে কেন প্রয়োগ করা যাবে না, অথবা পর্যায়ক্রমে? যদি অত্যন্ত ব্যাপক বা অত্যন্ত স্থির-নির্দিষ্ট কোনো চিত্রে বিচার করা হয় তাহলে কি স্পষ্টত বিকৃতির আশঙ্কা থাকে না (যে ধরনের বিকৃতি ঘটাবার আকাদেমিক প্রাচ্যবাদের বিশেষ প্রবণতা রয়েছে)?

আমার দুটি আশঙ্কা হচ্ছে তথ্য-বিকৃতি এবং অ-যাথার্থ্য, বা বলতে পারি যে ধরনের অ-যাথার্থ্য বিচারোর্ধ্ব সরলীকৃত চিন্তা আর সংশয়হীন ও ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে স্থান-নিবদ্ধ বিচারণার ফল। আমি চেষ্টা করেছি আমার সমকালীন বাস্তবতার তিনটি প্রধান দিক নিয়ে আলোচনা করতে। আমার মনে হয় এগুলিই আমি যে পদ্ধতিগত বা দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা-

www.pathagar.com

সংক্রান্ত অসুবিধাগুলির কথা আলোচনা করছি, তার সমাধান নির্দেশ করতে পারে। এই অসুবিধাগুলো একজনকে বাধ্য করতে পারে প্রথমত এমন একটা স্থূল, ঢালাও ও আক্রমণাত্মক রচনা প্রস্তুত করতে যার কোনো মূল্যই থাকে না, দ্বিতীয়ত সেটা হতে পারে এতই বিশদ ও খুঁটিনাটি বিশে-ষণে ভরা যে তার সামগ্রিক চরিত্র ও ঘনীভূত আবেদন হারিয়ে যায়। তাহলে ব্যক্তিগত অবদানকে চিহ্নিত করে তার সঙ্গে কীকরে সমন্বিত করা যায় সার্বজনীন ও আধিপত্যমূলক তথ্যসম্ভারকে যা বৌদ্ধিক অবশ্যই এবং নিষ্কর্ম নয়, সর্বাংশে জবরদস্তিমূলকও নয়।

তিন

আমি আমার সমকালীন বাস্তবতার তিনটি দিকের কথা উলে-খ করেছি। সেগুলি এখন আমার ব্যাখ্যা করতে হবে আর সংক্ষেপে কিছু বলতে হবে যাতে বোঝা যায় আমি কী করে একটা বিশেষ ধারার গবেষণা ও লেখার দিকে ধাবিত হলাম।

১. শুদ্ধ জ্ঞান ও রাজনৈতিক জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য। সহজেই যুক্তি দেয়া যেতে পারে যে শেক্সপিয়র ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ রাজনৈতিক নয় কিন্তু সমকালীন চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান রাজনৈতিক। আমার নিজের প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত অবস্থান হলো "হিউম্যানিস্ট" বা মানবিকতাবাদী যার অর্থ আমার কর্মক্ষেত্র হচ্ছে মানবিক বিদ্যার শাখাসমূহ আর সেজন্যেই আমার কাজে কোনো রাজনীতি থাকবে এই সম্ভাবনা ক্ষীণ। অবশ্য আমি এ-সব তকমা ও অভিধা কোনো অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা ছাড়াই ব্যবহার করেছি কিন্তু মোটামুটিভাবে এই সত্য সাধারণভাবে গৃহীত। কোনো মানবিক বিদ্যানিষ্ঠ লেখক যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ওপর লিখছে অথবা যে সম্পাদক কীট্সের ওপর বিশেষজ্ঞ সে রাজনীতিতে জড়াবে না এটা ভাবার কারণ তার কাজের কোনো রাজনৈতিক প্রভাব দৈনন্দিন অর্থে যে বাস্তবতা, তার ওপর পড়বে না। যে পণ্ডিতের ক্ষেত্র সোভিয়েট অর্থনীতি সে অত্যন্ত সংবেদনশীল এলাকায় কাজ করছে যেখানে প্রবলভাবে সরকারি স্বার্থ নিহিত এবং কোনো সমীক্ষা বা প্রস্তাবের আকারে সে যা প্রকাশ করবে সেটা নীতিনির্ধারকরা, সরকারী আমলা, প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিবিদ ও গোয়েন্দা দলের বিশেষজ্ঞরা গুরুত্বের সাথে নেবে। "মানবিক" বিদ্যাতন্ত্রী আর অপর পক্ষে যাদের কাজের রাজনৈতিক তাৎপর্য বা রাজনৈতিক ফলাবর্তন আছে, এই দুই দলের লেখকদের কাজের ফারাক আরো বাড়িয়ে দেখাতে হলে বলা সম্ভব যে প্রথমোক্তদের মতাদর্শের ছাপ রাজনীতিতে পড়লেও সেটা হবে গৌণ ব্যাপার (যদিও সহকর্মীদের কাছে তাদের স্টালিনিজ্‌ম, ফ্যাসিবাদ বা অতি সরলীকৃত উদারপন্থা আপত্তিকর মনে হতে পারে)। কিন্তু শেষোক্তদের মতাদর্শ তাদের কাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আধুনিক আকাদেমিগুলোতে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্বকে মতাদর্শভিত্তিক বিজ্ঞানরূপে দেখা হয় আর সেজন্যে ধরেই নেয়া হয় যে এগুলি "রাজনৈতিক"। তা সত্ত্বেও সমকালীন পাশ্চাত্যে (প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রে) যে-ধরনের বিদ্যাচর্চার স্বীকৃতি আছে, প্রত্যাশিত যে সেটা হবে অ-রাজনৈতিক, পাণ্ডিত্যপূর্ণ, আকাদেমিক, এবং দলীয় স্বার্থ ও ক্ষুদ্র মানসিকতা দ্বারা লালিত মতামতের ঊর্ধ্বে। তাত্ত্বিকভাবে এই লক্ষ্য সম্বন্ধে কারো আপত্তি থাকতে পারে

www.pathagar.com

না কিন্তু কার্যক্ষেত্রের বাস্তবতা সমস্যাকীর্ণ। এপর্যন্ত কেউ কোনো পন্থা আবিষ্কার করতে পারেনি যার দ্বারা একজন বিদ্যানুরাগীকে তার ব্যক্তিগত পরিস্থিতি থেকে আলাদা করা যায়, তাকে তুলে আনা যায় কোনো শ্রেণী বা বিশ্বাসমালার সঙ্গে তার সংলগ্নতা থেকে, বা তার সামাজিক অবস্থান ও সমাজের একজন সভ্যরূপে তার কার্যধারা থেকে। পেশাগত জীবনে সে যা করে, এ-সবের তার ওপর প্রভাব পড়ে, যদিও স্বভাবতই তার চেষ্টা থাকে যেন তার গবেষণা ও এর ফল দৈনন্দিন জীবনের স্থূল বাস্তবতা-সৃষ্ট বেড়াজাল ও ছুঁৎমার্গ থেকে যথাসম্ভব মুক্ত থাকতে পারে। কারণ জ্ঞান বলে একটা জিনিস আছে যা যে-ব্যক্তি এটা চর্চা করে তার চেয়ে কম তো নয়ই বরং বেশি পক্ষপাতদুষ্ট (যদিও ব্যক্তির জীবনে থাকে নানা সংশি-ষ্টতা ও মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার মতো ঘটনা)। অতএব এই জ্ঞান স্বতই অ-রাজনৈতিক নয়।

সাহিত্য বা ক্লাসিক্যাল ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা রাজনৈতিক তাৎপর্য দ্বারা আক্রান্ত কি না বা সরাসরি রাজনীতি-যুক্ত কিনা এটা একটা বৃহৎ প্রশ্ন যা আমি আমার অন্য একটা রচনায় বিশদ আলোচনার চেষ্টা করেছি। এখানে আমি দেখাব "সত্যনিষ্ঠ" জ্ঞান মূলত অ-রাজনৈতিক (এবং পক্ষান্তরে রাজনৈতিক জ্ঞান "সত্যনিষ্ঠ" নয়), এই সম্মিলিত উদার জনমত কীভাবে জ্ঞান আহরিত হবার সময়কার বিদ্যমান সুসংগঠিত (এবং সম্ভবত সংগুপ্ত) রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে আড়াল করে দেয়। আজকে সেটা বোঝা সহজ হবে না যদি কোনো কাজকে "রাজনৈতিক" আখ্যা দিয়ে সেটাকে খাটো করা হয় শুধু এইজন্যে যে রাজনীতি-নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠতার ভড়ং লঙ্ঘিত হয়েছে। প্রথমত আমরা বলতে পারি যে পৌর সমাজ জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক গুরুত্বের বহুস্তরীয় বিন্যাসকে স্বীকার করে। একটা ক্ষেত্রকে কতটা রাজনৈতিক গুরুত্ব দেয়া হবে সেটা অংশত নির্ভর করে তার সরাসরি অর্থনৈতিক যৌক্তিকতায় রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনার ওপর। কিন্তু রাজনৈতিক গুরুত্ব নিরূপণে তারও আগে বিবেচ্য সেই ক্ষেত্রটি রাজনৈতিক সমাজে ক্ষমতার উৎসগুলির কত কাছে। এভাবে, সোভিয়েট জ্বালানির সম্ভাবনা কতটা এবং সেটা তার সামরিক সামর্থ্যের ওপর কী প্রভাব ফেলবে এ-বিষয়ে একটা অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রতিরক্ষা বিভাগ ফরমায়েশ দিয়ে করাতে পারে। এটা একটা রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করবে; পক্ষান্তরে কোনো সদনের আংশিক অর্থায়নে পরিচালিত টলস্টয়ের প্রথম পর্বের গল্পোপন্যাসের ওপর কোনো গবেষণা-গ্রন্থ কোনোদিন সেই গুরুত্ব পাবে না। অথচ উভয় কাজকেই পৌর সমাজ স্বীকৃতি দেবে সমপর্যায়ের বলে— রাশিয়া নিয়ে গবেষণা। যদিও একটা গবেষণা হয়ত করেছে অত্যন্ত রক্ষণশীল কোনো অর্থনীতিবিদ, আরেকটা করেছে কোনো উগ্র প্রগতিবাদী ইতিহাসবিদ। আমি এটাই বলতে চাচ্ছি যে "রাশিয়া" একটা সার্বিক বিষয় হিসেবে রাজনৈতিক অগ্রগণ্যতার দাবি রাখে যা ক্ষুদ্রতর বিভাগগুলি যেমন "অর্থনীতি" ও "সাহিত্যের ইতিহাস" থেকে ওজনে বেশি। কারণ রাজনৈতিক সমাজ, গ্রামসি-র অর্থে, পৌর সমাজের বিভিন্ন অঙ্গন যেমন আকাদেমি ইত্যাদিতে প্রবিষ্ট হয়ে যায় এবং তার স্বার্থের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, এমন কিছু তাৎপর্যে সেগুলোকে অম্বিত করে।

আমি সার্বিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তিতে আর বেশি দূর এগোবো না। আমার মনে হয় আমার কথার যাথার্থ্য ও বিশ্বাসযোগ্যতা সুনির্দিষ্টভাবে মূর্ত করা যায়। যেমন নোয়াম চমস্কি রাষ্ট্র-

www.pathagar.com

প্রণোদিত সামরিক গবেষণার কাজে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানচর্চার ধারণার প্রয়োগের সঙ্গে ভিয়েতনাম যুদ্ধের যোগসূত্র নিয়ে গবেষণা করেছেন। যেহেতু ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং এখন যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। তাদের রাজনৈতিক সমাজ তাদের পৌর সমাজে এক অস্থিরতা সৃষ্টি করে, সরাসরি রাজনীতি ঢুকিয়ে দেয় যখনই এবং যেখানেই তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে এটার প্রয়োজন পড়ে। এটা বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে যদি বলি, উদাহরণস্বরূপ, যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারত বা মিসরে কিছু ইংরেজ সে-দেশ সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁদের মাথার মধ্যে সে-সব দেশের যে মর্যাদা ছিল তা উপনিবেশের অধিক কিছু নয়। ভারত ও মিসর সম্বন্ধে সকল আকাদেমিক জ্ঞান কোনো-না-কোনোভাবে স্থূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজন দ্বারা রঞ্জিত, সেই ছাপে মুদ্রিত এবং সম্পূর্ণ শাসিত। এটাই আমি বলতে চাচ্ছি প্রাচ্যবাদের ওপর আমার এই অভিসন্দর্ভে। এটা সত্য যে কোনো জ্ঞানের অনুশীলনে একজন মানুষ হিসেবে অনুশীলকের নিজের পরিমণ্ডলের সঙ্গে তার লিপ্ততাকে অস্বীকার করে হয় না। এটাও তাহলে সত্য যে একজন য়োরোপিয়ান বা আমেরিকান যে প্রাচ্য নিয়ে গবেষণা করছে তাকেও তার পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। প্রথমেই একজন য়োরোপিয়ান বা আমেরিকান হিসেবে সে প্রাচ্যকে দেখে; আরো পরে একজন ব্যক্তিরূপে। এবং এই পরিস্থিতিতে একজন য়োরোপিয়ান বা আমেরিকান কোনো নিষ্কর্মক সত্তা নয়। অর্থাৎ যতই নিশ্চেষ্টভাবে হোক সে সজাগ যে সে এমন একটা শক্তির কোলে লালিত প্রাচ্যে যার সুনির্দিষ্ট স্বার্থ রয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা, সে বিশ্বের সেই প্রান্তের বাসিন্দা যার প্রাচ্যের সঙ্গে লিপ্ততার অবিসংবাদিত ইতিহাস আছে, প্রায় হোমারের কাল থেকে।

এদিক দিয়ে বিচার করলে এ-সব রাজনৈতিক বাস্তবতা এখনো এতই অবয়বহীন ও অনির্দেশ্য যে প্রকৃত মনোযোগ সৃষ্টি করতে পারে না। অনেকেই এ-বিষয়ে একমত হবে কিন্তু এটা মানবে না যে এর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য রয়েছে; যেমন তাৎপর্য আছে ফ্লোবেয়ারের কাছে যখন তিনি *Salambô* লিখলেন অথবা এইচ আর গিব-এর কাছে যখন তিনি লেখেন *Modern Trends in Islam*। সমস্যা হচ্ছে যে যে-বৃহৎ প্রভাবসঞ্চারী অবস্থার আমি বর্ণনা দিয়েছি এবং চলমান জীবনের খুঁটিনাটি যেগুলিকে একটা উপন্যাস বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার বয়ান আশ্রয় করে, এ-দুয়ের মধ্যে ফারাক দুস্তর। তথাপি, যদি আমরা শুরু থেকে এই ধারণা বর্জন করি যে সংস্কৃতি ও ধী-কল্পের মতো জটিল ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের মতো "বৃহৎ" সত্যকে যান্ত্রিকভাবে ও একটা ছকের মতো করে প্রয়োগ করা যায় তখন আমরা একটা মনোজ্ঞ গবেষণার দিশা পাবো। আমার ধারণা, প্রাচ্য সম্বন্ধে যে আগ্রহ য়োরোপিয়ানরা ও পরে আমেরিকানরা দেখিয়েছে তার মূলে আছে রাজনীতি। এখানে প্রদত্ত কতকগুলো খোলাখুলি ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট। কিন্তু আগ্রহটা সৃষ্টি করেছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি স্থূল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক যৌক্তিতার সঙ্গে একযোগে চলিষ্ণুভাবে ক্রিয়া করেছে যার ফলে প্রাচ্য হয়ে উঠেছে এক বিচিত্রমুখী জটিল জায়গা যা স্পষ্টতই বিদ্যমান ছিল সেই ক্ষেত্রে আমি যাকে বলছি প্রাচ্যবাদ।

অতএব প্রাচ্যবাদ কেবল একটা রাজনৈতিক বিষয় নয় বা ক্ষেত্র নয় যা পরোক্ষভাবে সংস্কৃতি, বিদ্যাচর্চা ও সংগঠন ক্রিয়ার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে; এটা প্রাচ্য সম্বন্ধে

www.pathagar.com

গর্হিত পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অভিব্যক্তি নয়। এটা বরং নন্দনতাত্ত্বিক, জ্ঞানচর্চামূলক, অর্থনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং ভাষাবিজ্ঞানমূলক বয়ানের মধ্যে ভূ-রাজনৈতিক চেতনার "বণ্টন"। এটা শুধু ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্যের প্রসারণ নয় (পৃথিবী দুই অসম অর্ধাংশের সমন্বয়ে রচিত— প্রাচ্য ও প্রতীচ্য); এটা বিভিন্ন স্বার্থের এক বিশাল ক্রম-ধারা: এই স্বার্থ সৃষ্টি করা হয় এবং টিকিয়ে রাখা হয় বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যেমন জ্ঞান-অনুশীলন দ্বারা নব্যতর উদ্ভাবন, ভাষাবিজ্ঞানমূলক পুনর্গঠন, মনোবিজ্ঞানী বিশ্লেষণ, ভূ-দৃশ্য ও সমাজতাত্ত্বিক বর্ণন। যেটা প্রকাশ্যত ভিন্ন জগৎ (বা বিকল্প বা নূতন জগৎ) সেটাকে জানার, ক্ষেত্রবিশেষে নিয়ন্ত্রণ করা বা ব্যবহারোপযোগী করার "ইচ্ছা" বা অভিপ্রায়ের প্রকাশ নয়, বরং বিদ্যমানতা। সর্বোপরি এটা একটা প্রতর্ক যা রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে অপরিপক্ক ও সরাসরিভাবে কোনো সম্পর্কে লিপ্ত নয়, বরং বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতার সঙ্গে অসম বিনিময়-ক্রিয়ায় এর সৃষ্টি, কিছুটা রূপলাভ করে রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে (একইভাবে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে) বিনিময়-ক্রিয়ায়, বৌদ্ধিক ক্ষমতার সঙ্গে, (বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানের শাখাগুলি যেমন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, শারীরস্থান, অথবা যে-কোনো আধুনিক নীতিমালা-সংক্রান্ত বিজ্ঞান), সাংস্কৃতিক ক্ষমতার সঙ্গে, (যেমন রক্ষণশীলতা এবং রুচি, বয়ান ও মূল্যবোধের সূত্রাবলী), নৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে (যেমন এমন ধারণার সঙ্গে যে "আমরা" কী করতে পারি আর "ওরা" করতে পারে না বা বুঝতে পারে না আমরা যা করি)। আমার মূল যুক্তি এই যে প্রাচ্যবাদ আধুনিক রাজনৈতিক-বৌদ্ধিক সংস্কৃতির এক বিশাল আয়তনের শুধু প্রতিনিধিত্ব করে না, এই আয়তন জুড়ে অস্তিত্বমান থাকে। তার ফলে এর কারবার প্রাচ্যের সঙ্গে ততটা নয় যতটা "আমাদের" জগতের সঙ্গে।

প্রাচ্যবাদ যেহেতু একটা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা, এর বিদ্যমানতা পুরানো পুঁথির শূন্যতার মধ্যে নয়; বরং তার উল্টোটা। আমার মনে হয় এটা দেখানো সম্ভব যে প্রাচ্য নিয়ে যা-কিছু চিন্তা, কথা বা কাজ তা অনুসৃত হয় (বা অন্তর্নিহিত থাকে) কয়েকটি সুস্পষ্ট ধারায় যা বৌদ্ধিকভাবে জানা সম্ভব। এখানেও দেখা যায় বৃহৎ বহির্কাঠামোগত চাপ ও ভিতরের খুঁটিনাটির মধ্যে ব্যঞ্জনার বিভিন্নতা ও বক্তব্যের প্রসারণ কাজ করে, যাকে বলা চলে বয়াননির্ভরতার বাস্তবতা। বেশিরভাগ মানবিক-বিষয়ক পণ্ডিত, আমার মনে হয়, এই ধারণা নিয়ে তুষ্ট যে বয়ান প্রেক্ষিতের মধ্যে নিহিত (texts exist in context), অন্তর্বয়ান (Intertextuality) বলে কিছু আছে, এবং ওয়াল্টার বেনজামিন একবার যেটাকে বলেছিলেন "সৃজনশীলতার নামে সৃজনক্ষম ব্যক্তিকে অতিরিক্ত চাপ দেয়া", যেখানে মনে করা হয় কবি নিজ ক্ষমতায় এবং স্বচ্ছ মনের তাগিদে সৃষ্টি করেন— সেটা সীমিত হয়ে যায় লোকাচার, পূর্বসূরিদের কাজ ও আলঙ্কারিক শৈলী দ্বারা। তবুও, রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও মতাদর্শগত সীমাবদ্ধতাগুলো যে ব্যক্তিগত পর্যায়েও লেখকের ওপর কাজ করে, এটা মানতে অনেকেই নারাজ। মানবিক বিদ্যার একজন অনুসারীর কাছে এটা খুব চিত্তগ্রাহী তথ্য মনে হবে যে বালজাক *Comédie humaine* লেখার সময় জিয়ফ্রু সঁ-হিলাইর ও কুভিয়ে-র মধ্যেকার বিরোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু অতি রক্ষণশীল রাজতন্ত্র বালজাকের মনের ওপর যখন একই রকম চাপ সৃষ্টি করল সেটাকে প্রচ্ছন্নভাবে তাঁর "প্রতিভা" খর্বকারী মনে করা হয় এবং সে-

www.pathagar.com

কারণে গভীরভাবে অনুশীলনের অযোগ্য ভাবা হয়। তেমনি, হ্যারি ব্র্যাকেন যেমন নিরলসভাবে বলে চলেছেন, দার্শনিকরা লক, হিউম ও প্রয়োগবাদ নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাবেন কিন্তু এটা কখনো তাঁদের হিসাবের মধ্যে আনবেন না যে এ-সব ধ্রুপদী লেখকদের ক্ষেত্রে তাঁদের "দার্শনিক" তত্ত্ব আর তাঁদের বর্ণবাদী মতবাদ, দাস ব্যবস্থার সমর্থন ও ঔপনিবেশিক শোষণের পক্ষে যুক্তি স্থাপনের মধ্যে প্রকাশ্যত সম্পর্ক আছে। এগুলি হলো কয়েকটি সাধারণ পন্থা যার দ্বারা সমকালীন জ্ঞানচর্চা নিজকে "খাঁটি" রাখে। হয়ত এটা সত্যি যে রাজনীতির পক্ষে সংস্কৃতির নাক রগড়ে দেবার চেষ্টা প্রায়শ উগ্র প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার রূপ নিয়েছে। হয়ত এটাও সত্যি যে আমার নিজের যে অনুশীলন-ক্ষেত্র সেখানে সাহিত্যের সামাজিক ব্যাখ্যা বয়ানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। কিন্তু এটা উপেক্ষা করার উপায় নেই যে সাহিত্য অধ্যয়ন সার্বিকভাবে এবং আমেরিকান মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকরা বিশেষভাবে, বয়াননির্ভর, ইতিহাস-বিষয়ক বিদ্যাবত্তায় উপর-কাঠামো ও ভূমি-সংলগ্ন স্তরগুলির মধ্যেকার ব্যবধান নিষ্ঠার সঙ্গে মোচন করার শ্রমকে এড়িয়ে গেছেন। অন্য একটা উপলক্ষে আমি এটাও বলেছি যে সামগ্রিকভাবে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সাম্রাজ্যবাদ ও সংস্কৃতির গভীর অধ্যয়নকে নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষণা করেছে। প্রাচ্যবাদ এই প্রশ্নের মুখোমুখী করে দেয় যে রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ দখল করে সমগ্র বিদ্যাবত্তার জগৎকে, কল্পনা-শক্তিকে, বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠানগুলিকে, এবং এমনভাবে করে যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে সেটা এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। তথাপি নিস্কৃতি পাবার একটা চিরাচরিত পথ খোলা আছে। বলাই যেতে পারে যে সাহিত্য-বিষয়ক যিনি পণ্ডিত ও যিনি দার্শনিক তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেছেন যথাক্রমে সাহিত্য ও দর্শনে, রাজনীতি বা মতাদর্শগত বিচার-পদ্ধতিতে নয়। অর্থাৎ কার কোনটা বিশেষ ক্ষেত্র এই যুক্তি দিয়ে এক বৃহত্তর বুদ্ধিবৃত্তিক দিগন্তকে ছোঁয়ার যে চেষ্টা যা আমার মতে বেশি শ্রমসাধ্য, সেটাকে আড়াল করে দেয়া যায়।

এখানে আমার মনে হয় একটা সহজ, দুই পর্বের উত্তর আছে, অন্তত সাম্রাজ্যবাদ ও সংস্কৃতির (অথবা প্রাচ্যবাদের) অধ্যয়নের বেলায় যেটা দিতে পারি। প্রথমত প্রায় প্রত্যেক উনবিংশ শতাব্দীর লেখক (পূর্ববর্তী যুগের লেখকদের সম্বন্ধেও কথাটা খাটে) সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে খুব ভালোভাবে সচেতন ছিলেন। বিষয়টা— নিয়ে বেশি গবেষণা হয়নি। আধুনিক মেজাজের একজন ভিক্টোরিয়ান বিশেষজ্ঞের এটা স্বীকার করতে বেশি বেগ পেতে হবে না যে যাঁরা ছিলেন উদারপন্থী সাংস্কৃতিক অগ্রদূত যেমন জন স্টুয়ার্ট মিল, আরনল্ড, কার্লাইল, নিউম্যান, মেকলে, রাস্কিন, জর্জ এলিয়ট, এমন কি ডিকেন্স— তাঁদের সকলের বর্ণ ও সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মতামত ছিল। তাঁদের লেখনী থেকে এটা স্পষ্ট। অতএব একজন বিশেষজ্ঞকে এই জ্ঞানার্জনের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে যে মিল তাঁর *'বিমুক্তি'* ও *'প্রতিনিধিত্বশীল সরকার'* বইতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে সেখানে প্রদত্ত তাঁর মতামত ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না (জীবনের এক বিরাট অংশ জুড়ে তিনি ইন্ডিয়া অফিসের একজন কর্মকর্তা ছিলেন) কারণ ভারত বর্ণের দিক থেকে না হলেও সভ্যতার দিক থেকে নিকৃষ্ট। একই ধরনের দোটানা মনোভাব মার্ক্সের মধ্যেও পাওয়া যায় যা এই বইতে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাজনীতি

www.pathagar.com

পাওয়া যায় যা এই বইতে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাজনীতি সাম্রাজ্যবাদের খোলসে সাহিত্য, বিদ্যাবত্তা, সামাজিক তত্ত্ব ও ইতিহাস রচনার ওপর প্রভাব ফেলে একথা বলার অর্থ এই নয় যে সংস্কৃতি অতএব একটা তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বিষয়। বরং তার উল্টো। আমার পুরো বক্তব্য এটাই যে সংস্কৃতির মতো আভিসিঞ্চনকারী ও আধিপত্যশীল ব্যবস্থার যে টিকে থাকার শক্তি সেটা আমরা আরো ভালো বুঝতে পারবো যখন উপলব্ধি করবো যে লেখক ও চিন্তকদের ওপর অভ্যন্তরীণ যে চাপ সেটা সুফলপ্রদায়ী, একতরফা ভাবে অবদমনকারী নয়। এই ধারণা গ্রামসি অবশ্যই এবং ফুকো ও রেমন্ড উইলিয়াম্‌স তাঁদের নিজ নিজ পন্থায় দেখিয়েছেন। উইলিয়াম্‌স-এর *The Long Revolution*-এ *The Uses of Empire* থেকে উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক বৈভব সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

অতএব আমি প্রাচ্যবাদের অনুশীলন করি একটা চলমান বিনিময়-ক্রিয়া রূপে, ব্যক্তি পর্যায়ে লেখক এবং তার রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টার মধ্যে যেটা রূপ লাভ করেছে তিনটি বৃহৎ সাম্রাজ্য দ্বারা— ব্রিটিশ, ফরাসি এবং আমেরিকান— যেখানকার বৌদ্ধিক ও কল্পনা-সিদ্ধ ভূমিতে এ-সকল রচনার সৃষ্টি। একজন জ্ঞানানুশীলক রূপে আমার যেটা সবচেয়ে বেশি আগ্রহের সৃষ্টি করে তা এ-সকল রচনার সামগ্রিক রাজনৈতিক সত্যনিষ্ঠা নয়; বরং তাদের খুঁটিনাটির উপস্থাপনা, বর্ণনার বিশদতা। বাস্তবিকই, লেন বা ফ্লোবেয়ার বা রেনাঁর মতো লেখকের মধ্যে যা আমাদের আকর্ষণ করবে তা এই অবিসংবাদিত সত্য (লেখকের দৃষ্টিতে) নয় যে প্রতীচ্য প্রাচ্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর; বরং এই "সত্য" যে মনোভূমি উন্মোচন করেছে যেখানে সূক্ষ্ম ডিটেইলের কাজের বিভিন্ন সাক্ষ্য পাওয়া যায়। আমার কথার যথার্থতা বোঝা যাবে শুধু এটুকু মনে রাখলে যে লেন-এর *Manners and Customs of the Modern Egyptians* ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের একটা কালোত্তীর্ণ দৃষ্টান্তরূপে স্বীকৃত তার রচনাশৈলী, তার সূক্ষ্ম বিষয়গুলির দ্যুতিময় বর্ণনার গুণে, বর্ণবাদী শ্রেষ্ঠত্বের সরল উপস্থাপনের জন্যে নয়।

প্রাচ্যবাদ, তাহলে, যে-সব রাজনৈকিত প্রশ্নের জন্ম দিতে পারে সেগুলি হলো: প্রাচ্যবাদী পরম্পরার মতো একটা সাম্রাজ্যবাদী পরম্পরা নির্মাণে আর কী কী ধরনের বৌদ্ধিক, নান্দনিক, পাণ্ডিত্য-সংক্রান্ত ও সাংস্কৃতিক কর্মশক্তি নিয়োজিত হয়েছে? প্রাচ্যবাদের বিশ্বের প্রতি সার্বিকভাবে যে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে ভাষাতত্ত্ব, অভিধান প্রণয়ন, ইতিহাস, জীববিজ্ঞান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্বকথা, উপন্যাস রচনা ও গীতিকবিতা তার স্বার্থানুবর্তী হয়েছে? প্রাচ্যবাদের ভিতরে কী কী পরিবর্তন, পরিশীলন, এমনকি বিপ্লব সাধিত হয়েছে? এই প্রেক্ষিতে মৌলিকতা, ধারাবাহিকতা ও প্রাতিস্বিকতার অর্থ কী? প্রাচ্যবাদ কীভাবে এক কালপর্ব থেকে আরেক কালপর্বে সঞ্চারিত হয় বা নিজকে পুনরুৎপাদিত করে? সংক্ষেপে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধি, রাষ্ট্র, এবং আধিপত্যের সুনির্দিষ্ট বাস্তবতা— এগুলির মধ্যে যে জোট-বন্ধন সেটাকে উপেক্ষা না করে প্রাচ্যবাদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরকে কীভাবে যৌক্তিকতার অনিবার্য ফলাহরণ (ratiocination) নয় বরং একটি সংকল্পবদ্ধ মানবক্রিয়া বলে বিবেচনা করতে পারি, তার ঐতিহাসিক জটিলতা, খুঁটিনাটি এবং মূল্যমান সহ? এ-ধরনের চিন্তা দ্বারা চালিত মানবতন্ত্রী বিদ্যাচর্চা রাজনীতি 'এবং' সংস্কৃতির দিকে মনেযোগ দিতে পারে।

www.pathagar.com

একথা বলার অর্থ এই নয় যে জ্ঞান ও রাজনীতির মধ্যে আবশ্যিকভাবে একটা সম্পর্ক রয়েছে। আমার যুক্তি এই যে প্রত্যেকটি মানবতন্ত্রী তথ্যানুশীনের বেলায় এই সম্পর্ককে সূত্রবদ্ধ করা উচিত গবেষণার বিষয় ও তার ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে।

২. পদ্ধতির প্রশ্ন। পূর্বের একটি গ্রন্থে আমি মানবতন্ত্রী বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করার জন্যে পদ্ধতির গুরুত্ব, এ-ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ, স্বতন্ত্র পথের যাত্রা বিন্দু ও প্রারম্ভিক নীতি সূত্রবদ্ধ করার বিষয়ে অনেক ভাবনা ও বিশ্লেষণের অবতারণা করেছিলাম। প্রথম যে পাঠ আমি নিয়েছিলাম এবং উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছিলাম তা এই যে পূর্ব-নির্দিষ্ট বা সহজলভ্য কোনো সূচনা বিন্দু নেই। প্রতিটি প্রকল্পের জন্যে আলাদাভাবে সূচনা করতে হয়, এভাবে করতে হয় যে যা-কিছু এখান থেকে অনুসৃত হবে তাকে যেন ক্রিয়াসম্পন্ন করা যেতে পারে। আমার অভিজ্ঞতায় কোনো পর্যায়ে এই পাঠের দুরূহতা এত সচেতনভাবে আত্মস্থ করিনি (কতটা সাফল্য বা ব্যর্থতার সঙ্গে, বলতে পারব না) যেমনটা প্রাচ্যবাদের গবেষণার সময় করতে হয়েছে। সূচনার ধারণা এবং সূচনার কাজের মধ্যে নিহিত রয়েছে সীমারোপের কাজটা যার দ্বারা বিপুল তথ্যের স্তূপ থেকে কিছু অংশ ছেঁটে নিতে হয়। তথ্যভাণ্ডার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে-যাওয়া এ-সব তথ্যকে সূচনা বিন্দুর কাজ করতে হয়, সূচনা বিন্দু হতে হয়, একটা আরম্ভ দাঁড়িয়ে যায়। বয়ানের ছাত্রদের জন্যে প্রারম্ভিক সীমারোপের একটা ধারণা দিয়েছেন লুই আলথুসের যেটাকে তিনি বলেছেন problematic । এটা হলো একটা বয়ান বা একগুচ্ছ বয়ানের সুনির্ধারিত ঐক্য, যেটা বিশ্লেষণ থেকে উদ্ভূত। কিন্তু প্রাচ্যবাদের ক্ষেত্রে (যেটা মার্ক্সীয় বয়ান থেকে ভিন্ন— আলথুসের মার্ক্সের বয়ানই অনুশীলন করছিলেন) শুধু সূচনা বিন্দু বা problematic একমাত্র সমস্যা নয়; তারপরও ঠিক করতে হয় কোন বয়ান, লেখক ও কালপর্ব অনুশীলনের জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত।

প্রাচ্যবাদের একটা বিশ্বকোষ-তুল্য বৃত্তান্ত প্রণয়ন আমার কাছে নিরর্থক মনে হয়েছে। কারণ, প্রথমত, যে-নীতির আলোকে কাজ করব সেটা যদি হয় 'প্রাচ্যবাদ সম্বন্ধে য়োরোপিয়ান ধারণা' তাহলে যে-পরিমাণ তথ্য-উপাত্ত নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে তার কোনো সীমা-পরিসীমা থাকবে না। দ্বিতীয়ত, বৃত্তান্তমূলক ধাঁচটা আমার বর্ণনামূলক চরিত্র ও রাজনৈতিক ঝোঁকের সঙ্গে খাপ খায় না। তৃতীয়ত, য়োরোপ-প্রাচ্য মোকাবেলা বিষয়ের কয়েকটা দিক নিয়ে বিশ্বকোষ-তুল্য বই আগেই লেখা হয়েছে। যেমন রেমন্ড শোয়াব-এর *La Renaissance orientale*, জোহান ফুক-এর *Die Arabischen Studien in Europa bis in den Aufang des 20. Jahrhunderts*, এবং আরো সাম্প্রতিক ডরোথি মেটলিট্‌জকি-র *The Matter of Araby in Medieval England* অতএব যে সার্বিক ও রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষিতের নির্দেশনা ওপরে দিয়েছি, সে-বিচারে সমালোচকের কাজ ভিন্ন খাতে চলে যাবে।

তারপরেও কাজ থেকে যায় সুবিশাল এক নথিশালাকে ছেঁটে ব্যবহারোপযোগী আয়তনের মধ্যে নিয়ে আসা। তার চেয়েও বড় ব্যাপার, এই বয়ানগুলির মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামো-প্রকৃতির একটা রূপরেখা দাঁড় করানো। একই সঙ্গে এও দেখতে হবে এটা যেন অর্থহীন কালপঞ্জী অনুসৃতিতে পর্যবসিত না হয়। তাই আমার সূচনা বিন্দু হলো প্রাচ্য সম্বন্ধে

www.pathagar.com

বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমিতে অভিজ্ঞতা কীভাবে অর্জিত হলো, এই অভিজ্ঞতার মান ও চরিত্র কী থেকেছে : আরব ও ইসলাম সম্বন্ধে ইঙ্গ-ফরাসি-আমেরিকান অভিজ্ঞতা প্রায় হাজার বছর ধরে মিলিতভাবে প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে; এ-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী সীমিত করার পরও অত্যন্ত বিপুল আয়তনের ছিল। সেগুলিকে আরো সীমিত করেছি কতকগুলো কারণে যা একটু পরে আলোচনা করছি। এটা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যের এক বিরাট অংশ যেন বাদ পড়ে গেল— ভারত, জাপান, চীন এবং দূর প্রাচ্যের অপরাপর অংশ। কারণ এটা নয় যে এই অঞ্চলগুলোর গুরুত্ব ছিল না (বলা বাহুল্য যে গুরুত্ব ছিল); কারণ হলো নিকট প্রাচ্য বা ইসলাম সম্বন্ধে য়োরোপের অভিজ্ঞতা দূর প্রাচ্য সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা করে আলোচনা করা সম্ভব। তথাপি, প্রাচ্যে য়োরোপের সার্বিক আগ্রহের যে ইতিহাস তার কতকগুলি বিশেষ মুহূর্তে প্রাচ্যের কিছু অংশ যেমন, মিসর, সিরিয়া ও আরব নিয়ে আলোচনা করা যায় না দূরতর কয়েকটি অঞ্চলে য়োরোপের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে অধ্যয়ন না করে; পারস্য ও ভারত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ-বিষয়ে অষ্টবিংশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটেনের সূত্রে একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ মিসর ও ভারতের মধ্যেকার সম্পর্ক। তেমনি, জেন্দা ভেস্তার অর্থোদ্ধারে ফরাসি প্রয়াস, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে পারি শহরের সংস্কৃত ভাষা চর্চার এক প্রধান কেন্দ্ররূপে খ্যাতিলাভ, ন্যাপোলিয়ঁ-র প্রাচ্য সম্বন্ধে আগ্রহ যে নির্ভর করতো ভারতে ব্রিটিশ মতিগতিকে তিনি যেভাবে দেখছেন, তার ওপর— দূর প্রাচ্য সম্পর্কে এ-সকল স্বার্থ সরাসরি প্রভাবিত করেছে নিকট প্রাচ্য, ইসলাম ও আরব নিয়ে ফরাসি স্বার্থকে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স পূর্ব ভূমধ্যসাগরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে। তবু এই আধিপত্য সম্বন্ধে আমার আলোচনা ও তন্নিষ্ঠ আগ্রহ কতকগুলো বিষয়ের প্রতি সুবিচার করছে না যেমন— (ক) প্রাচ্যবাদে জার্মানি, ইটালি রাশ্যা, স্পেন ও পর্তুগালের মূল্যবান অবদান এবং (খ) অষ্টবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্যকে জানার অন্যতম প্রেরণা ছিল বাইবেল অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত হওয়া। এই বৈপ্লবিক আগ্রহ জাগ্রত করেছিলেন কয়েকজন পথিকৃৎ যেমন বিশপ লাওথ, আইখহর্ন হের্ডের এবং মিকাইলিস। প্রথমত আমাকে কঠোরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয়েছে ব্রিটিশ-ফরাসি এবং পরে আমেরিকান বিষয়-বস্তুর ওপর কারণ এটা অনিবার্যভাবে সত্য প্রতিপন্ন হচ্ছিল যে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স কেবল প্রাচ্য ও প্রাচ্য-বিষয়ক জ্ঞানানুশীলনে পথিকৃৎ জাতিই নয়, তারা এই শীর্ষ অবস্থান টিকিয়ে রাখতে পেরেছে বিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী ইতিহাসের সবচেয়ে সুপ্রসারিত ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার জোরে; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রাচ্যে আমেরিকার অবস্থান এই দুই য়োরোপীয় শক্তি কর্তৃক খনন-কৃত খাতের মাপের সঙ্গে মেলানো— আমার মনে হয় সচেতনভাবে : তাছাড়া আমি মনে করি প্রাচ্যের ওপর ব্রিটিশ, ফরাসি ও আমেরিকান লেখনীর যে গুণ, একনিষ্ঠতা ও পরিমাণ সে-কারণে এগুলি প্রাধান্য পেয়ে গেছে জার্মানি, ইটালি, রাশ্যা ও অন্যত্র সম্পাদিত কাজগুলির ওপর, যদিও শেষোক্ত কাজগুলি সন্দেহাতীতভাবে দিক-উন্মোচনকারী ছিল। কিন্তু আমি মনে করি এটাও সত্য যে প্রাচ্য সংক্রান্ত বিদ্যাবত্তার ক্ষেত্রে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল ব্রিটেন অথবা ফ্রান্সে, পরে আরো বিস্তারিতভাবে সেটা জার্মানিতে সমাধা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সিলভেস্টর দ্য

www.pathagar.com

সাসি যে কেবল য়োরোপের প্রথম আধুনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে প্রাচ্যবাদী যিনি ইসলাম ও আরবি সাহিত্য, দ্রুজ ধর্ম ও সাসানাইদ পারস্যের ওপর কাজ করেছেন তাই নয়, তিনি ছিলেন শাঁপোলিয়োঁ-র শিক্ষক, শিক্ষক ছিলেন ফ্রান্‌জ বপ-এরও যিনি জার্মান তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। তেমনি অগ্রবর্তিতা ও পরবর্তী কালে অধিকতর প্রসিদ্ধির দাবি উইলিয়াম জোনস ও এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেন-এর পক্ষেও করা যায়।

দ্বিতীয়ত— এখানে আমার প্রাচ্যবাদ গবেষণার অনেক ঘাটতি পূরণ হয়ে গেছে— আমি যেটাকে বলব আধুনিক প্রাচ্যবাদ তার বিকাশের পটভূমি নিয়ে সম্প্রতি বাইবেল বিষয়ক পণ্ডিতরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। যেটা শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে প্রোজ্জ্বলভাবে প্রাসঙ্গিক সেটা হলো ই এস শেফারের হৃদয়গ্রাহী কাজ *"Kubla Khan" and The Fall of Jerusalem*। রোমান্টিসিজমের উৎপত্তি এবং যে বৌদ্ধিক সাধনার ওপর কোলরিজ, ব্রাউনিং ও জর্জ এলিয়টের রচনা ন্যস্ত, সেটার ওপর এক অপরিহার্য গবেষণা। শেফারের কাজের কিয়দংশ শোয়াব যে রূপরেখা দিয়েছেন তারই পরিবর্ধন ও পরিশীলন। জার্মান বাইবেল-বিষয়ক পণ্ডিতদের কাজে যে প্রাসঙ্গিক মালমশলা পাওয়া যায় সেগুলোর ওপর আলোকপাত করা এবং সেটা ব্যবহার করে বুদ্ধিদীপ্ত ও চিত্তগ্রাহী ভঙ্গিতে তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ব্রিটিশ লেখককে পাঠ করা। তা সত্ত্বেও বইটার ঘাটতি এই যে ব্রিটিশ ও ফরাসি লেখকরা প্রাচ্যবাদী মালমশলার ওপর যে প্রান্তিকতা আরোপ করেছেন যেটা আমার প্রধান বিবেচ্য, সে-ব্যাপারে চেতনার অভাব। তাছাড়া আরেকটা কাজ শেফার করেননি যা আমি চেষ্টা করেছি— আকাদেমিক ও সাহিত্যিক প্রাচ্যবাদের পরবর্তী উত্তরণ যার ছাপ পড়েছে একদিকে ব্রিটিশ ও ফরাসি প্রাচ্যবাদ ও আরেকদিকে প্রকাশ্যভাবে উপনিবেশ-মনস্ক সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে। আমি আরো দেখাতে চাই পূর্বের মালমশলা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কীভাবে আমেরিকান প্রাচ্যবাদে পুনরাবর্তিত হলো।

তথাপি আমার গবেষণার একটা সম্ভবত বিভ্রান্তিকর দিক আছে। সাসি যে উন্মোচন-পর্বকে শাসন করেছেন তারপর থেকে জার্মান উত্তরণ সম্বন্ধে আমি সম্যক আলোচনা করিনি, দৈবাৎ দুয়েকটি তথ্য নির্দেশনা ছাড়া। আকাদেমিক প্রাচ্যবাদের একটা ধারণা দিতে চায় এমন কোনো গ্রন্থ যদি স্টাইনথাল, মুলার, বেকের, গোল্ডযিহের, ব্রকেলমান নোলডেকের প্রতি পর্যাপ্ত মনেযোগ না দেয়— মাত্র কয়েক জনের নামোল্লেখ করা হলো— তাহলে সেটা নিন্দার্হ এবং আমি অকুণ্ঠচিত্তে নিজকে নিন্দা জানাই। আমার সবচেয়ে বেশি দুঃখ হয় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জার্মান বিদ্যাবত্তা বিজ্ঞান সাধকরূপে যে সম্মান অর্জন করেছিল সেটার পর্যাপ্ত আলোচনা না করা। যে সঙ্কীর্ণচিত্ত ব্রিটিশ পণ্ডিতকুল এদেরকে অবজ্ঞা করেছেন তাঁদের অভিযুক্ত করেছেন জর্জ এলিয়ট। আমার মনে গেঁথে আছে জর্জ এলিয়ট তাঁর *Middlemarch*- এ মিস্টার ক্যাসাউবানের যে অবিস্মরণীয় চরিত্র এঁকেছেন। ক্যাসাউবান তাঁর বিশ্বপুরাণের চাবি-গ্রন্থ শেষ করতে পারছেন না কারণ তাঁর জ্ঞাতি উইল ল্যাডিস্লাউ-এর মতে তিনি জার্মান বিদ্যাবত্তার সঙ্গে অপরিচিত। কারণ ক্যাসাউবান শুধু যে "রসায়নের মতো নিত্য পরিবর্তনশীল" একটা বিষয় বেছে নিয়েছেন তাই নয়; নতুন আবিষ্কার সবসময় নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করছে। তিনি যে-কাজে হাত দিয়েছেন সেটা প্যারাসেলসাসকে খণ্ডণ করার সামিল কারণ "তিনি

www.pathagar.com

তিনি যে-কাজে হাত দিয়েছেন সেটা প্যারাসেলসাসকে খণ্ডণ করার সামিল কারণ "তিনি প্রাচ্যবাদী নন তো"।

এলিয়ট ভুল করছেন না যখন বোঝাতে চাচ্ছেন যে ১৮৩০ সালের দিকে যখন *Middlemarch* লেখা হয়েছিল জার্মান বিদ্যাবত্তা পুরোপুরি য়োরোপীয় শিখর ছুঁয়েছিল। তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই-তৃতীয়াংশ সময়ের মধ্যে কখনোই জার্মান বিদ্যাবত্তায় প্রাচ্যবাদী ও প্রাচ্যে দীর্ঘকালীন "জাতীয়" স্বার্থ রক্ষার যে তাগিদ, এদুয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ প্রত্যুপকারের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। ভারতে, লেভান্তে বা উত্তর আফ্রিকায় ইঙ্গ-ফরাসি উপস্থিতির সঙ্গে তুলনীয় কোনো-কিছু জার্মানিতে ছিল না। তাছাড়া জার্মান প্রাচ্য প্রায় পুরোপুরি একটা বিদ্যা-বিষয়ক, অন্তত ক্লাসিক্যাল প্রাচ্য। এটা গীতি কবিতা, উদ্ভট কাহিনী, এমনকি উপন্যাসের বিষয় হয়েছে কিন্তু এটা কখনোই মূর্ত হয়নি, যে অর্থে মিসর ও সিরিয়া মূর্ত ছিল শাতুব্রিয়াঁ, লেন, লামার্তিন, বার্টন, ডিজরেইলি ও নের্ভালের কাছে। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে প্রাচ্যের ওপর সবচেয়ে বিখ্যাত যে দুটি জার্মান কাজ, গ্যয়টের *Westöstlicher Diwan* এবং ফ্রিডরিশ শ্লেগেলের *Uber die Sprache und Weishit der Indier* সে দুটোর ভিত্তি ছিল যথাক্রমে রাইনের ওপর দিয়ে ভ্রমণ ও পারির লাইব্রেরিতে অতিবাহিত অনেকগুলো ঘন্টা। জার্মান বিদ্যাবত্তা যে কাজটা করল সেটা হলো ক্রিয়াপদ্ধতিগুলির পরিমার্জন ও পরিবর্ধন যেটা প্রয়োগ করা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক প্রাচ্য থেকে সংগৃহীত বয়ান, পুরাণ, ধী-কল্প, ভাষায়।

তথাপি ইঙ্গ-ফরাসি ও পরে আমেরিকান প্রাচ্যবাদের সঙ্গে জার্মান প্রাচ্যবাদ যেখানে অভিন্ন সেটা হলো পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে প্রাচ্যের ওপর এক ধরনের কর্তৃত্ব। প্রাচ্যবাদের যে-কোনো বিবরণে এই কর্তৃত্বের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। কর্তৃত্ব সম্বন্ধে রহস্যময় কিছু নেই। এটা গঠন করা হয়, বিকিরণ করা হয়, প্রচার হয়। এটার চালিকা শক্তি আছে, মানুষের মনকে বশ করতে পারে। এটার মর্যাদা আছে, এটা রুচি ও মূল্যমান নির্ধারণের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। যে ভাবধারাকে এটা সত্য বলে মহিমামণ্ডিত করে, যে পরম্পরা, বিচারবোধ এটা গঠন করে, সঞ্চালিত ও পুনরুৎপাদিত করে সেগুলি থেকে এটাকে পৃথক প্রায় করাই যায় না। সর্বোপরি কর্তৃত্বকে বিশ্লেষণ করা যায় এবং করা উচিত। কর্তৃত্বের এসব গুণাগুণ প্রাচ্যবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর এই অভিসন্দর্ভে আমার কাজের এক বড় অংশ জুড়ে থাকবে প্রাচ্যবাদে ঐতিহাসিক কর্তৃত্ব এবং এর ব্যক্তিগত কর্তৃত্বগুলি।

কর্তৃত্ব অনুধাবনের জন্যে এখানে আমার প্রধান পদ্ধতি হলো যাকে বলা যেতে পারে নীতিকৌশলগত অবস্থান (strategic location)। এটা হলো প্রাচ্যবাদী বিষয় নিয়ে লেখক যা লিখছেন সে-সম্পর্কে বয়ানের মধ্যে লেখকের অবস্থানের বর্ণনা। অপরটি নীতিকৌশলগত গঠনক্রিয়া (strategic formation)। এটা হলো বিভিন্ন বয়ানের মধ্যেকার সম্পর্ক ও এবং বয়ানের গুচ্ছ, প্রকৃতি এমনকি বয়ানের বর্গগুলি (textual genres) নিজদের মধ্যে যে ভর, ঘনত্ব ও তথ্য নির্দেশনার ক্ষমতা অর্জন করে ও পরে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সঞ্চারিত করে, তার বিশ্লেষণ। আমি নীতিকৌশলের ধারণা প্রয়োগ করছি সেই সমস্যাকে চিহ্নিত করতে যেটার প্রত্যেক লেখককে সম্মুখীন হতে হয়:

www.pathagar.com

কীভাবে এটার সঙ্গে জুঝতে হবে, কোনদিক দিয়ে বিচার করতে হবে, কীভাবে বিষয়টার মহিমা, পরিসর ও ভীতি-জাগানিয়া মাত্রা দ্বারা পরাস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে হবে। প্রাচ্য নিয়ে যেই লিখবে তাকেই প্রাচ্যের সূত্রে নিজ অবস্থান ঠিক করতে হবে। এই অবস্থান বয়ানে সঞ্চালিত হয়ে যাবে, কী ধরনের কথকের জবানি সে গ্রহণ করবে, কেমন কাঠামো গড়বে, কী ধরনের চিত্রকল্প, বিষয়, মোটিফ তার বয়ানে ঘুরপাক খাবে— সব মিলিয়ে প্রাচ্য সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করা হচ্ছে এবং পরিশেষে প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে অথবা এর পক্ষে বলা হচ্ছে। এগুলির কোনো-কিছুই বিমূর্তভাবে ঘটছে না। সকল প্রাচ্য বিষয়ক লেখক (হোমার সহ) প্রাচ্য সম্বন্ধে কিছু পূর্বের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ওপর ভর করে। তাছাড়া প্রাচ্যের ওপর প্রত্যেকটা রচনা নিজকে "অধিভুক্ত" (affilliates) করে ফেলে অন্যান্য রচনার সঙ্গে, শ্রোতৃমণ্ডল ও প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে, এমন কি খোদ প্রাচ্যের সঙ্গে।

আশা করি এটা স্পষ্ট যে কর্তৃত্ব নিয়ে আমার যে সংশ্লিষ্টতা সেটার জন্যে প্রাচ্যবাদী বয়ানে কী সংগুপ্ত আছে তার বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই, বিশ্লেষণ প্রয়োজন তার উপরিভাগের, এটা যা বর্ণনা করে তার বাহ্যিকতার। আমার মনে হয় একথার গুরুত্ব খুবই স্পষ্ট। প্রাচ্যবাদ ভর করে আছে বাহ্যিকতার ওপর। প্রাচ্যবাদী কবি ও লেখক প্রাচ্যকে দিয়ে কথা বলাচ্ছে, প্রাচ্যের বর্ণনা দিচ্ছে, পাশ্চাত্যের কাছে ও পাশ্চাত্যের জন্যে এর রহস্যগুলি খোলাসা করে দিচ্ছে। তার সঙ্গে প্রাচ্যের আর কোনো সম্পর্ক নেই। একমাত্র সম্পর্ক যা-কিছু সে বলছে তার একটা কারণ হিসেবে। তার লেখা থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে প্রাচ্যবাদী প্রাচ্যের বাইরের। এই বাহ্যিকতার সৃষ্টি প্রতিনিধিত্ব। অনেক আগে থেকেই। এসকাইলাসের নাটক *'পারস্যবাসীগণ'*-তে সুদূরবর্তী ও ভীতিপ্রদ প্রতি-স্ব রূপান্তরিত হয়ে গেছে তুলনামূলকভাবে পরিচিত বস্তুতে (এসকাইলাসের ক্ষেত্রে শোক-বিহ্বল এশীয় মহিলারা)। *'পারস্যবাসীগণে'র* প্রতিনিধিত্বের নাটক-সৃষ্ট নৈকট্য এই সত্যকে আড়াল করেছে যে দর্শকরা একটা অতিমাত্রায় কৃত্রিম অভিনয় দেখছে একটা বস্তুর যেটাকে একজন অ-প্রাচ্যবাসী সমগ্র প্রাচ্যের প্রতীকরূপে উপস্থাপিত করেছে। প্রতিনিধিত্বের মূলে আছে এই বিশ্বাস যে প্রাচ্য যদি নিজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারত তাহলে করত; কিন্তু সে তো পারছে না।

বাহ্যিকতার ওপর এতটা জোর দেবার আরেকটা কারণ আমি মনে করি, একটা সংস্কৃতির মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতর্ক ও বিনিময়ের ব্যাপারে এটা স্পষ্ট করে দেয়া উচিত যে বয়ানে যা-কিছু ঘুরপাক খায় তা "সত্য" নয়, প্রতিনিধিত্ব মাত্র। এটা আর নতুন করে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে ভাষা নিজেই একটা অত্যন্ত সুসংগঠিত ও সংকেত-সম্বলিত আয়োজন। প্রকাশ করতে, ইঙ্গিত দিতে, বার্তা ও তথ্য বিনিময় করতে, প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি করতে এটা কিছু কলাকৌশল প্রয়োগ করে। অন্তত লিখিত ভাষার উদাহরণ নিলে, এখানে কোনো-কিছুর উপস্থিতি নেই, আছে পুনরুপস্থিতি বা প্রতিনিধিত্ব। অতএব প্রাচ্য সম্বন্ধে লিখিত কোনো মন্তব্যের মূল্যমান, কার্যকারিতা, শক্তি, আপাত দৃষ্টিতে সেটা সত্য কি না— এ-সব প্রাচ্যের ওপর নির্ভর করে না এবং প্রাচ্যের মুখাপেক্ষী নয়। বরং, লিখিত বক্তব্যটি পাঠকের কাছে একটা "উপস্থিতি" এজন্যে যে "প্রাচ্য" বলতে যে প্রকৃত

www.pathagar.com

প্রাচ্যবাদ প্রাচ্য থেকে অনেক দূরে। প্রাচ্যবাদ আদৌ যে একটা অর্থ বহন করে সেটা পাশ্চাত্যের ওপর নির্ভরশীল। এই অর্থটি প্রতিনিধিত্ব করার যে-সব কৌশল পাশ্চাত্য প্রয়োগ করে থাকে সেগুলোর কাছে সরাসরি ঋণী। প্রতর্কে এই কৌশলগুলির প্রয়োগে প্রাচ্য হয়ে ওঠে দৃশ্যমান, স্পষ্ট, "ওখানে"। আর এই প্রতিনিধিত্ব নির্ভর করে প্রতিষ্ঠান, পরম্পরা, প্রথা, সেগুলি যে প্রভাব সৃষ্টি করছে তা বোঝার জন্যে সর্বসম্মত সংকেত, দূরবর্তী ও নিরবয়ব প্রাচ্যের ওপর নয়। অষ্টবিংশ শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশের পূর্বের প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্ব এবং তার পরের (আমি যেটাকে বলব আধুনিক প্রাচ্যবাদ, সেই সময়টায়), এই দুই কালপর্বের প্রতিনিধিত্বের মধ্যে তফাত এই যে পরবর্তীকালে এর ব্যাপ্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এটা সত্যি যে উইলিয়াম জোনস ও আঁকেতিল দুপেরোঁ-র পরে এবং ন্যপোলিয়ঁ-র মিসর অভিযানের পরে য়োরোপ অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রাচ্যকে জানল, বৃহত্তর কর্তৃত্ব ও নিয়ম-নিষ্ঠার সঙ্গে এটাকে ধারণ করল। কিন্তু য়োরোপের জন্যে বেশি প্রাসঙ্গিক ছিল সম্প্রসারিত সুযোগ ও আরো উন্নত কলাকৌশল। অষ্টবিংশ শতাব্দীর প্রান্তে এসে প্রাচ্যের ভাষাগুলির প্রাচীনতা জানা গেল, জানা গেল যে এগুলোর প্রাচীনতা ঐশ্বরিক মর্যাদাপ্রাপ্ত হেব্রুর চেয়ে অধিক, একদল য়োরোপিয়ানই এটা আবিষ্কার করেন। তাঁরা অন্যান্য পণ্ডিতদের কাছে এটা হস্তান্তর করেন এবং নবাবিস্কৃত ভাষাবিজ্ঞানে এটাকে স্থান দেন। ভাষাগত প্রাচ্যকে দেখবার জন্যে একটা শক্তিশালী বিজ্ঞানের জন্ম হলো। আর, ফুকো যেভাবে তাঁর *The Order if Things* -এ দেখিয়েছেন, এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আগ্রহের সূত্রপাত হলো। অনুরূপভাবে, উইলিয়াম বেকফোর্ড, বায়রন, গ্যয়টে এবং উগো তাঁদের শিল্পকর্ম দ্বারা প্রাচ্যকে পুনর্গঠিত করেছিন, এবং তাঁদের চিত্রকল্প, ছন্দ ও মোটিফ দিয়ে প্রাচ্যের রং, আলো ও মানুষকে দৃশ্যমান করেছেন। ফলত আমার বিশ্লেষণে দেখাবার চেষ্টা হবে এই ক্ষেত্রের অবয়ব ও অভ্যন্তরীণ সংগঠন, এর পথিকৃৎদের, কর্তৃত্বময় ব্যক্তিদের, এর বিধিবিধান। আরো দেখাবার চেষ্টা করব কীভাবে প্রাচ্যবাদ যে-সব "শক্তিমান" ধ্যান-ধারণা মতবাদ ও প্রবণতা সংস্কৃতিকে শাসন করে সেগুলি থেকে ধার করেছে এবং বারংবার এগুলি দ্বারা প্রাণিত হয়েছে। এভাবেই গড়ে উঠেছিল (এবং এখনো আছে) একটা ভাষাবিজ্ঞান-সংক্রান্ত প্রাচ্য, ফ্রয়েডিয়ান প্রাচ্য, স্পেংলারিয়ান প্রাচ্য, ডারউইনিয়ান প্রাচ্য, বর্ণবাদী প্রাচ্য, ইত্যাদি। কিন্তু কখনোই বিশুদ্ধ, শর্তহীন প্রাচ্যের দেখা পাইনি। তেমনিভাবে, প্রাচ্যবাদের কোনো বস্তু-সংস্রবহীন কোনো নমুনা দেখিনি, আর প্রাচ্য সম্বন্ধে "ধী-কল্প"-এর মতো নির্লিপ্ত জিনিস তো অনেক দূরে। আমি একমত নই সেই সকল পণ্ডিতদের সঙ্গে যাঁরা শুধু ধী-কল্পের ইতিহাস অনুশীলন করেন।

মিশেল ফুকোর কাজের কাছে আমি ঋণী কিন্তু প্রভেদ এইখানে যে আমি খুবই বিশ্বাস করি যে প্রাচ্যবাদের ব্যাপ্ত, বেনামি ও সমষ্টিগত বয়ানের ওপর ব্যক্তি-লেখকদের স্বতন্ত্র ছাপ চিহ্নিত করা উচিত। বিশাল পাঁচমিশেলি বয়ানগুলি বিশ্লেষণ করলে যে ঐক্যের ভাব দেখা যায় তা এই কারণে যে সেগুলি প্রায়ই একে অন্যের বরাবর তথ্য নির্দেশনা দেয়। প্রাচ্যবাদ শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল অন্য লেখক ও গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেবার একটা ব্যবস্থা। এডওয়ার্ড উইলিয়ামস-এর *Manners and Customs of Modern Egyptians* পঠিত

www.pathagar.com

হয়েছে এবং উদ্ধৃত হয়েছে এমন লেখকদের দ্বারা যাদের মধ্যে পরস্পর কোনো মিল নেই— নের্ভাল, ফ্লোবেয়ার, রিচার্ড বার্টন। তিনি ছিলেন একজন প্রামাণ্য লেখক এবং যেই প্রাচ্য নিয়ে লিখছে বা ভাবছে তারই যেন উচিত তাঁর লেখা কাজে লাগানো, এবং শুধু মিসরের সূত্রেই নয়। নের্ভাল *Modern Egyptians* থেকে অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ ধার করে ব্যবহার করছেন একটি অক্ষরও না পাল্টে কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য মিসর নয়, সিরিয়ার গ্রামীণ দৃশ্য বর্ণনায় লেনের সাহায্য নেয়া।

উত্তরাধুনিক ইলেকট্রনিক বিশ্বের একটা দিক এই যে যে-গতানুগতিক দৃষ্টিতে প্রাচ্যকে দেখা হতো সেটা আরো জোর পেয়ে গেছে। টেলিভিশন, চলচ্চিত্র এবং সংবাদ মাধ্যমগুলি তথ্যকে এক প্রমিত ধাঁচের মধ্যে পুরেছে। প্রাচ্যের ব্যাপারে এই প্রমিতকরণ ও গৎ-বাঁধা অনুসৃতি "রহস্যময় প্রাচ্য" সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর আকাদেমিক পণ্ডিতদের এই অসুরিক বিলাপের সুরকেই আরো চড়া করেছে। এটা সবচেয়ে প্রকট নিকট প্রাচ্যকে বোঝার ব্যাপারে। তিনটা জিনিস এখানে কাজ করেছে যেজন্যে ইসলাম ও আরবদের সম্বন্ধে অতি সাধারণ বোধও ভীষণ রাজনীতি আক্রান্ত চেঁচামেচিতে পরিণত হয়। প্রথমটা হলো, পাশ্চাত্যে ইসলাম ও আরবদের প্রতি বিদ্বেষের ইতিহাস, যেটা সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যবাদের ইতিহাসে প্রতিফলিত হয়। দ্বিতীয়টা, আরব ও ইজরেইলি যায়নবাদের মধ্যে সংগ্রাম যেটা প্রভাবিত করেছে আমেরিকান ইহুদিদেরকে, তথা উদারপন্থী সংস্কৃতি ও বৃহত্তর জনগণকে। তৃতীয়, আরব ও ইসলাম নিয়ে মোহমুক্তভাবে আলোচনা করা যেতে পারে এমন অবস্থান প্রায় অনুপস্থিত। বলার অপেক্ষা রাখে না যে মধ্যপ্রাচ্য এখন বৃহৎ শক্তিগুলোর রাজনীতি, তেলের অর্থনীতি ইত্যাদির লীলাক্ষেত্র। তার ওপর একটা মোটা দাগের ভেদ-রেখা টেনে দেয়া হয়েছে যে ইজরেইল হচ্ছে স্বাধীনতা-প্রিয় ও গণতান্ত্রিক আর আরবরা অশুভ, স্বৈরাচারী, আর সন্ত্রাসী। এই অবস্থায় নিকট প্রাচ্যকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পারার এবং কিছু বলতে পারার সুযোগ খুব কম।

এ-সব ব্যাপারে আমার নিজের অভিজ্ঞতা এ-বই রচনায় আমাকে প্রণোদিত করেছে। পাশ্চাত্যে, বিশেষ করে আমেরিকায় আরব ফিলিস্তিনির জীবন অসহায়। এখানে প্রায় মতৈক্য রয়েছে যে রাজনৈতিকভাবে তার কোনো অস্তিত্ব নেই, আর যদিবা মানা হয় যে তার অস্তিত্ব আছে, সেটা একজন উপদ্রবকারী বা প্রাচ্যবাসীরূপে। বর্ণবাদ, সংস্কৃতি বিষয়ে বদ্ধ ধারণা, রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ আরব ও মুসলিমদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এই নাগপাশকে প্রতিটি ফিলিস্তিনিকে তার নিয়তি-প্রদত্ত শাস্তি বলে মানতে হচ্ছে। এটা আরো পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে যখন তাকে মন্তব্য করতে হয় যে আমেরিকায় নিকট-প্রাচ্য বিষয়ে আকাদেমিক পর্যায়ে সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি, অর্থাৎ কোনো প্রাচ্যবাদী সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিকভাবে আরবদের সাথে পুরোপুরি একাত্মতা অনুভব করেননি।

ক্ষমতা ও জ্ঞানের মধ্যে সংযোগ যেটা "প্রাচ্যবাসী"-কে সৃষ্টি করেছে এবং একজন মানুষ হিসেবে এক অর্থে তাকে নিশ্চিহ্ন করছে সেটা, অতএব, আমার কাছে সর্বাংশে একটা আকাদেমিক ব্যাপার নয়। তবু এটা একটা "বুদ্ধিবৃত্তিক" ব্যাপার যার স্পষ্টত কিছু গুরুত্ব আছে। আমি আমার মানবতন্ত্রী ও রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগাতে পেরেছি

আছে। আমি আমার মানবতন্ত্রী ও রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগাতে পেরেছি একটি বৈষয়িক ব্যাপারের বিশ্লেষণ ও বিবরণে— প্রাচ্যবাদের উত্থান, বিকাশ ও সংহতকরণ। প্রায়ই সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে মনে করা হয় রাজনৈতিকভাবে, এমনকি ঐতিহাসিকভাবে নির্দোষ। আমার কাছে সবসময়েই তার উল্টোটা মনে হয়েছে। প্রাচ্যবাদ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমি অবশ্যই দৃঢ়মত হয়েছি (এবং আমার সাহিত্য ক্ষেত্রের সহকর্মীদেরও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা এই মতের পক্ষে আনব) যে, সমাজ ও সাহিত্য-সংক্রান্ত সংস্কৃতি কেবল একযোগে অনুধাবন ও অধ্যয়ন করা যায়। তাছাড়া, ঘটনার প্রায় অমোঘ নিয়মে, আমি নিজেকে দেখলাম ইতিহাস লিখছি পাশ্চাত্যের সিমাইট-বিদ্বেষের এক অদ্ভুত গোপন অংশীদারদের। সিমাইট-বিদ্বেষ ও প্রাচ্যবাদের মধ্যে যে বিশেষ সাযুজ্য রয়েছে এটা একটা ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সত্য। একজন ফিলিস্তিনি আরবের কাছে এটা উল্লেখ করলেই বিষয়টার ক্রূর বৈপরীত্য সঠিক প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এখানে আমি আরো দেখাতে চেয়েছিলাম সাংস্কৃতিক আধিপত্য কীভাবে কাজ করেছে। যদি এটা প্রাচ্যের সঙ্গে একটা নতুন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, বরং যদি এটা “প্রাচ্য” ও “প্রতীচ্য” জাতীয় ধারণা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে পারে তাহলেই মনে করব আমরা সেই প্রক্রিয়ার লক্ষ্যে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হতে পেরেছি যেটাকে রেমন্ড উইলিয়ামস বলেছেন “মজ্জাগত প্রভুত্বশীল মেজাজ” গঠিত হয়, এমন শিক্ষাকে ঝেড়ে ফেলা।

www.pathagar.com

জ্ঞান এবং তাফসীর

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ
অনুবাদক : রেহনুমা আহমেদ

প্রাকৃতিক জগৎ সম্বন্ধে নয়, মানব সমাজ সম্বন্ধে সকল জ্ঞানই ঐতিহাসিক। এবং, এই কারণে এটি ভর করে বিচার এবং তাফসীরের (interpretation*) উপর। তার অর্থ এই নয় যে, প্রকৃত ঘটনাবলী কিংবা উপাত্তসমূহ বলে কিছু নেই। বরং প্রকৃত ঘটনাবলীকে তাফসীরে কিভাবে দাঁড় করানো হচ্ছে সেটি নির্ধারণ করে দেয় সে ঘটনাবলীর তাৎপর্য। নেপোলিয়ান যে বাস্তবে বেঁচে ছিলেন, তিনি যে একজন ফরাসী সম্রাট ছিলেন, এটি কেউ অস্বীকার করেন না; তবে, তিনি ফ্রান্সের একজন মহান, নাকি কিছু অর্থে, সর্বনাশা শাসক ছিলেন সে ব্যাপারে পর্যাপ্ত পরিমাণ তাফসীরী মতানৈক্য বর্তমান। এ ধরনের মতানৈক্য ঐতিহাসিক রচনার জন্ম দেয়, এটি হতেই ঐতিহাসিক জ্ঞানের উৎপত্তি। তার কারণ, তাফসীর নির্ভর করে তাফসীরকারী কে, পুরুষ কিংবা নারী তাফসীরকারী তাফসীরটি কাকে লক্ষ্য করে করছেন, তাফসীর করার ক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী, কোন্ বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে তাফসীরকরণ ঘটছে, এ সবের উপর। এই অর্থে বলা যেতে পারে যে, সকল তাফসীরকরণ *পরিস্থিতিজনিত* (situational): এগুলো সকল সময়ে একটি পরিস্থিতিতে ঘটে যেটির তাৎপর্য তাফসীরের সঙ্গে *সংশ্লিষ্ট* (affiliative)[১] ?। অপর তাফসীরকারীগণ কী বলেছেন সেটির সঙ্গে এটি সম্পর্কযুক্ত, কারণ এটি হয় তাদেরকে সমর্থন করে, কিংবা তাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে, কিংবা তাদের কথাবার্তা চালিয়ে

অনুবাদকের টীকা

* পূর্বে interpretation শব্দটির তর্জমা যদিও আমরা/আমি করেছি "ব্যাখ্যা" (দেখুন, রেহনুমা আহমেদ ও মানস চৌধুরী, *নৃবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ*, ঢাকা: একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০০৩, পৃ: ৩৮১, ৩৯৮ যেখানে interpretive anthropology, hermeneutic practiceকে "ব্যাখ্যাদানকারী" কিংবা "ব্যাখ্যামূলক" নৃবিজ্ঞান বলা হয়েছে; কিংবা দেখুন, এডওয়ার্ড ডাব্লিউ সাঈদ, "উপনিবেশিত'র পরিবেশন: নৃবিজ্ঞানের আলাপচারীগণ", *সমাজ নিরীক্ষণ* ৮৪, আগস্ট ২০০২, পৃ: ৪০), আমার মনে হয় "তাফসীর" শব্দটি সঠিকতর, যেহেতু এটি 'ধারণায়ন অনুসারে ব্যাখ্যা', এই অর্থটি ধারণ করে। এডওয়ার্ড সাঈদের এই প্রবন্ধ অনুবাদকালীন সময়ে interpretation, তাফসীর বিষয়ে আমার ধারণা আরো সুস্পষ্ট হয়েছে।

□ অনূদিত এই লেখাটি এডওয়ার্ড সাঈদের *Covering Islam* বইটির তৃতীয় অধ্যায়ের শেষাংশ। মূল বইতে অনূদিত এই অংশের পাদটীকা হচ্ছে চারটি (২৯-৩২ নম্বর)। এই নম্বরীকরণ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে ভেবে আমি এই চারটি পাদটীকাকে পুন:নম্বর করেছি (১-৪ নম্বর)। বইটির ঠিকুজি পাবেন পাদটীকার আগে।

www.pathagar.com

যায়। পূর্বসূত্রীতা বাদে কিংবা অন্য তাফসীরের সঙ্গে বিনা সম্পর্কিত হয়ে কোনো তাফসীরকরণ ঘটতে পারে না। যেমন ধরুন, ইসলাম, কিংবা চীন, কিংবা শেকস্পিয়ার কিংবা মার্ক্স সম্বন্ধে কেউ যদি গুরুত্বসহকারে কিছু লিখতে চান তাহলে কোনো না কোনোভাবে এ সকল বিষয়ে কী বলা হয়েছে তা হিসেবে আনতে হবে, অন্তত যাতে তিনি যা বলছেন তা অপ্রাসঙ্গিক বা ফালতু বলে বিবেচিত না হয়। কোনো লেখা এতোটা নতুন নয় যে এটি সম্পূর্ণরূপে মৌলিক। কারণ, মানব সমাজ সম্বন্ধে যিনি লিখতে বসেন তিনি অংক কষতে বসেন না, সে কারণে এই ধরনের কাজে একই ধরনের আমূল মৌলিকত্ব কামনা করা যায় না।

তাহলে, অন্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান বিশেষভাবে "অবৈজ্ঞানিক" বেঠিকতা এবং তাফসীরের পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীন। তাসত্ত্বেও, আমরা সাময়িকভাবে হলেও বলতে পারি যে অন্য সংস্কৃতির জ্ঞান সম্ভব। এবং এটি যোগ করা গুরুত্বপূর্ণ, এই জ্ঞান কাম্য, যদি দুটো শর্ত পূরণ করা যায় – ঘটনাক্রমে, এই শর্ত দুটো বর্তমানের মধ্যপ্রাচ্য কিংবা ইসলামিক অধ্যয়ন খুব-একটা পূরণ করে না। প্রথমত, শিক্ষার্থীর মনে হতে হবে যে তিনি যে সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠী অধ্যয়ন করছেন সেটির প্রতি রয়েছে তাঁর জবাবদিহিতা, এবং সেটির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বলপ্রোয়গভিত্তিক নয়। আমি আগেই বলেছি, অ-পশ্চিম জগৎ সম্বন্ধে পশ্চিম যা জানে তার সিংহভাগ জেনেছে ঔপনিবেশিকতার পরিকাঠামোর ভিতর হতে; ইউরোপীয় পণ্ডিত তাঁর বিষয়ের প্রতি অগ্রসর হয়েছেন আধিপত্যের অবস্থান হতে, এবং তিনি এ বিষয় সম্বন্ধে যা বলেছেন, এতে অপর ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ বাদে আর অন্য কারো খুব অল্প সামান্যই উল্লেখ রয়েছে। আমি ইতোমধ্যে এই বইতে এবং *'ওরিয়েন্টালিজম'*এ যে সকল কারণসমূহের ফিরিস্তি দিয়েছি [তার প্রধান একটি হচ্ছে]* ইসলাম এবং মুসলমান জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত জ্ঞান সাধারণত কেবলমাত্র আধিপত্য এবং সংঘাত হতে অগ্রসর হয়নি, বরং সাংস্কৃতিক বিদ্বেষ হতেও। বর্তমানে ইসলামকে সংজ্ঞায়িত করা হয় নেতিবাচকভাবে এমনটি হিসেবে যেটির সঙ্গে পশ্চিমর রয়েছে মৌলিক বিরোধ, এবং এ টানাপোড়েন প্রতিষ্ঠিত করে এমন একটি পরিকাঠামো যা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানকে আমূলভাবে সংকোচিত করে। যদ্দিন এই পরিকাঠামো বলবৎ থাকবে, তদ্দিন ইসলামকে মুসলমানদের একটি প্রাণসঞ্চারী যাপিত অভিজ্ঞতা হিসেবে জানা সম্ভব হবে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিশেষভাবে সত্য, ইউরোপের ক্ষেত্রে এর সত্যতা কম কিন্তু সামান্য।

দ্বিতীয় শর্তটি প্রথমটির পরিপূরক, এটি প্রথমটিকে পরিপূর্ণতা দান করে। সামাজিক জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান, অর্থাৎ প্রাকৃতিক জগতের বিপরীত জ্ঞান হচ্ছে মূলত আমি যেটিকে বলছি তাফসীর সেটি: এটি বিভিন্ন উপায়ে জ্ঞানের মর্যাদা লাভ করে, এটি কিছু অংশে বুদ্ধিবৃত্তিক, বহুলাংশেই সামাজিক, এমনকি রাজনৈতিকও। সর্বপ্রথম, তাফসীর হচ্ছে বানানোর একটি ধরন (a form of making): অর্থাৎ, এটি নির্ভর করে মানব মনের

অনুবাদকের টীকা

* কিছু কিছু জায়গায় বক্তব্য সুস্পষ্ট করার সুবিধার্থে আমি দু'একটি বাড়তি শব্দ যোগ করেছি যা মূল লেখায় অনুপস্থিত। সংযোজিত শব্দগুলো এমন ধরনের চারকোণ-বিশিষ্ট ব্র্যাকেটে পাবেন।

www.pathagar.com

ইচ্ছাকৃত সঙ্কল্পকৃত কার্যের উপর, এটি যত্ন ও অধ্যয়বশতাসহকারে মনোযোগের বিষয়বস্তুকে আকৃতিদান করে, সেটিকে *গঠন* করে। এ ধরনের কাজ একটি বিশিষ্ট সময় ও স্থানে ঘটে, এটি বিশিষ্টভাবে স্থাননির্ণিত একজন ব্যক্তি দ্বারা কৃত, যার রয়েছে বিশিষ্ট পটভূমি, বিশিষ্ট পরিস্থিতি, এবং নির্দিষ্ট এক সারি লক্ষ্য। সে কারণে, গ্রন্থের তাফসীর, যেটি হচ্ছে অন্য সংস্কৃতির জ্ঞানের প্রধান ভিত্তি, একটি রোগ-জীবাণুমুক্ত পরীক্ষাগারে ঘটে না। কিংবা, এটি বস্তুনিরপেক্ষ ফলাফল দাবী করতে পারে না। এটি একটি সামাজিক কার্য, এবং এটি অবিচ্ছেদ্যভাবে সেই পরিস্থিতির সঙ্গে বাঁধা যা হতে এটি প্রথমে আবির্ভূত হয়, যা এটিকে হয় জ্ঞানের মর্যাদা দান করে কিংবা এটিকে সে মর্যাদার উপযুক্ত বলে বিবেচনা করে না। কোনো তাফসীরই এই পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করতে পারে না, এবং এই পরিস্থিতির তাফসীর ব্যাতিরেকে কোনো তাফসীর পরিপূর্ণ নয়।

এটি স্পষ্ট যে অনুভূতি, অভ্যাস, রীতি, সংসর্গ, এবং মূল্যবোধের মত অবৈজ্ঞানিক ঝামেলা যে কোনো তাফসীরের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রত্যেক তাফসীরকারী একজন পাঠক এবং নিরপেক্ষ, মূল্যবোধ-বিহীন পাঠক বলে কিছু নেই। অন্যভাবে বললে, প্রত্যেক পাঠক একজন ব্যক্তিক ইগো, এবং সমাজের একজন সদস্য, উভয়ই। নারী কিংবা পুরুষ হিসেবে সকল ধরনের বন্ধন তাকে সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে। তাফসীরকারীর দেশপ্রেম কিংবা স্বদেশান্ধত্বের মতো জাতীয়[তাবাদী] অনুভূতি থেকে ভয় কিংবা হতাশার মতো ব্যক্তিগত অনুভূতির মুখোমুখি হতে হয়, সেটি সামলে নিতে হয়, এবং শৃংখলিত উপায়ে যুক্তিশীলতা এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত তথ্য (যেটি খোদ একটি দীর্ঘ তাফসীরী প্রক্রিয়া) প্রয়োগ করতে হয় যাতে বোঝাপড়া অর্জিত হতে পারে। বড় ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয় যাতে দুটো পরিস্থিতির মধ্যকার প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করা যায়, তাফসীরকারীর পরিস্থিতি এবং যে পরিস্থিতিতে যবে এবং যখন গ্রন্থটি উৎপাদিত হয়। দুরত্ব এবং সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমের এই সচেতন, সঙ্কল্পিত প্রচেষ্টা অন্য সমাজ এবং সংস্কৃতির জ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে সম্ভব তরে তোলে– এবং একইসঙ্গে সে জ্ঞান পরিসীমিত করে। সেই মুহূর্তে, নারী কিংবা পুরুষ তাফসীরকারী, নিজ মানব পরিস্থিতিতে নিজ নারী কিংবা পুরুষ সত্তা উপলব্ধি করেন, তিনি গ্রন্থটিকে *সেটির* পরিস্থিতির সাপেক্ষে উপলব্ধি করেন, সেই মানব পরিস্থিতি যেটিতে সেটি উৎপাদিত হয়। এটি কেবল স্ব-অবগতির ফলশ্রুতি হিসেবেই ঘটতে পারে যেটি দুরের এবং অচেনা হওয়া সত্ত্বেও মানবীয়, এমন অবগতিকে উজ্জিবীত করে। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়াটি প্রথাগত ওরিয়েন্টালিস্টের ইঙ্গিত করা, "নতুন এবং সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন জ্ঞান" কিংবা অধ্যাপক বাইভারের স্ব-সংশোধনকারী "শাস্ত্রসমূহের" সঙ্গে খুব সামান্যভাবেই সম্পর্কিত।

তাফসীরসূচক প্রক্রিয়ার খানিকটা বিমূর্ত এই বিবরণ প্রসঙ্গে, যেটির পরিশেষে পৌঁছানো যায় জ্ঞানে– যা অটল কিছু নয়– আরেকটু কিছু বলা জরুরী। যদি *স্বার্থ* না থাকে তাহলে তাফসীর, উপলব্ধি এবং জ্ঞান, এগুলো কখনোই ঘটে না। মনে হতে পারে এটি একেবারে মামুলি একটি সত্য, কিন্তু এই বেশ মামুলি কিসিমের সত্য সাধারণত উপেক্ষিত হয় কিংবা অস্বীকৃত হয়। একজন মার্কিনী পণ্ডিত একটি আরবী কিংবা জাপানী উপন্যাস পাঠ করে সেটির সাঙ্কেতিকার্থোদ্ধার (decode) কার্যে যে ধরনের আজব বস্তুর

সম্মুখীন হন সেটি একজন রসায়নবিদের রাসায়নিক ফর্মুলার সাঙ্কেতিকার্থোদ্ধারের কাজ হতে একেবারে ভিন্ন। রাসায়নিক উপাদান মাত্রই আবেগ-অনুভূতি সম্বন্ধীয় নয় এবং এগুলোতে মানব অনুভূতি জড়িত নয়, যদিও এগুলো সম্পূর্ণ বহিরাগত কারণে, বিজ্ঞানীর অনুভূতিমূলক সংযোগসমূহ আলোড়িত করতে পারে। বহু তাত্ত্বিকদের মতে এর বিপরীতটি সত্য সেই তাফসীরে যেটিকে মানবতাবাদী তাফসীর ডাকা যেতে পারে। বাস্তবিক অর্থে এটি শুরু হয় তাফসীরকারীর পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে অবগতির মাধ্যমে, যে গ্রন্থটির তাফসীর করা হবে সেটি হতে তাফসীরকারীর বিযুক্ততা, এবং ইত্যাদি। হ্যান্স-জর্জ গাদামার যেমনটি লিখেছেন:

> যে ব্যক্তি একটি গ্রন্থ বুঝতে চাচ্ছেন, তিনি গ্রন্থ থেকে কিছু একটা জানবেন বলে প্রস্তুত। এ কারণে তাফসীরে প্রশিক্ষীত একটি মনের প্রথম থেকেই গ্রন্থটির নতুনত্বের গুণপনার প্রতি স্পর্শকাতর হতে হবে। কিন্তু এ ধরনের স্পর্শকাতরতার অর্থ এই নয় যে বস্তুর প্রতি হতে হবে "নিরপেক্ষ", কিংবা নিজ সত্তাকে বিলীন করতে হবে। বরং, এর অর্থ হচ্ছে নিজের প্রাক-অর্থসমূহ (অর্থাৎ, সে সকল অর্থ কিংবা তাফসীরসমূহ যা পূর্বের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইতোমধ্যেই বর্তমান) এবং পক্ষপাতদুষ্টতার একটি সচেতন অঙ্গীভূতকরণ। গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে নিজের পক্ষপাতদুষ্টতার প্রতি সচেতন হওয়া, যাতে গ্রন্থটি আপন নতুনত্ব নিয়ে প্রকাশিত হয় এবং এতদানুসারে নিজ প্রাক-অর্থের উপস্থিতি সত্ত্বেও আপন সত্যর উপর জোরারোপ করতে পারে।[২]

অতএব, অচিন সংস্কৃতিতে উৎপাদিত গ্রন্থ পড়তে গেলে প্রথমে যে জিনিসটির প্রতি নজর রাখা লাগে তা হলো এটির দুরত্ব। আক্ষরিক অর্থে, দুরত্বের প্রধান অবস্থা (সময়কাল এবং পরিসর উভয় অর্থেই) তবে কেবলমাত্র এই অর্থে নয়, হচ্ছে তাফসীরকারীর নিজ স্থান ও সময়কালে উপস্থিতি। আমরা দেখেছি, গোঁড়া ওরিয়েন্টালিস্ট কিংবা "এলাকা অধ্যয়ন" পন্থা হচ্ছে দুরত্বের সঙ্গে কর্তৃত্বের সমীকরণ, দুরের সংস্কৃতির আজগুবীপনাকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ডিসকোর্সের কর্তৃত্বশীল বাগাড়ম্বরতায় একীভূত করা, যেটির রয়েছে জ্ঞানের সামাজিক মর্যাদা, কিন্তু এই আজগুবীপনা তাফসীরকারী হতে কি নিংড়ে নিয়েছে তার স্বীকৃতি-বিহীনতা, এবং কোন ক্ষমতা কাঠামো তাফসীরকারীর এই কাজটি সম্ভবপর করে তোলে সেটিরও স্বীকৃতি-বিহীনতা। আমি খুব সোজাসুজিভাবে যা বলতে চাই তা হলো প্রায় কোনো ব্যতিক্রম বাদেই, পশ্চিমে ইসলাম নিয়ে লিখছেন এমন কোনো লেখকই সুস্পষ্টভাবে এটি বলেন না যে "ইসলাম"কে দেখা হয় একটি শত্রুতাসম্পন্ন সংস্কৃতি হিসেবে, কিংবা একজন পেশাজীবী পণ্ডিত যখন ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলেন সেটি ঘটে কর্পোরেশন, প্রচারমাধ্যম, সরকারের প্রভাবের বলয়ের মধ্যে, এবং এসবই তাফসীরে একটি বড়সড় ধরনের ভূমিকা পালন করে যা পরবর্তীকালে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানকে কাম্য এবং "জাতীয় স্বার্থ"এর করে তোলে। উপরে আমি যে যুক্তিতর্ক বিশ্লেষণ করেছি, তার মধ্যে লিওনার্ড বাইন্ডার একটি আদর্শ নমুনা: তিনি এসব বিষয় উল্লেখ করেন, তারপর তিনি এগুলোকে হাওয়া করে দেন "শাস্ত্রসমূহের" পেশাজীবীকরণের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, যার সমষ্টিগত কার্যকলাপ হচ্ছে যুক্তিশীল বস্তুনিরপেক্ষতার মুখোশকে যা কিছু বিনষ্ট করে সেটিকে ধুলিস্মাৎ করে দেয়া। এটি হচ্ছে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য জ্ঞান যে

www.pathagar.com

ধাপের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়েছে সেটি মুছে ফেলার একটি নমুনা।

তাফসীরের একটি দিক হিসেবে "স্বার্থ"কে করে আরো বর্ণিত করা যায়, আরো বাস্তবিকভাবে। এমনটি নয় যে ইসলাম, ইসলামি সংস্কৃতি, কিংবা ইসলামি সমাজ হঠাৎ করে কারো নজরে পড়ছে। বর্তমানের পশ্চিমা শিল্পভিত্তিক রাষ্ট্রের নাগরিকের ইসলামের সঙ্গে দ্বৈরথ ঘটে তেলের রাজনৈতিক সংকট, কিংবা মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ, কিংবা প্রচারমাধ্যমের প্রগাঢ় মনোযোগ, কিংবা বিশেষজ্ঞের - অর্থাৎ, ওরিয়েন্টালিস্টের - দ্বারা পশ্চিমে ইসলামের উপর ধারাবর্ণনার যে দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহ্য রয়েছে সেটির কল্যাণে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক, ধরুন কোনো তরুণ ইতিহাসবিদ আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যীয় ইতিহাস বিষয়ে বিশিষ্টতা লাভে আগ্রহী। পুরুষ কিংবা নারী ইতিহাসবিদ এই বিষয় অধ্যয়ন করতে আসেন তিনটি উপাদানের ক্রিয়াকর্মের অধীনে, সবগুলোই এই পরিস্থিতিকে আকৃতিদান করে এবং গঠন করে যার মধ্যে "প্রকৃত ঘটনা"– তথাকথিত কাঁচা মাল– অনুমিত হয়। উপরন্তু, এই হিসাবনিকাশে ধরতে হবে ব্যক্তির নিজস্ব ইতিহাস, তার সংবেদনশীলতা, এবং বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলী। এই সব মিলিয়ে গঠিত হয় এই বিষয়ে সে পুরুষ কিংবা নারীর আগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ অংশ: কেবলমাত্র কৌতুহল এ ধরনের জিনিস দ্বারা প্রশমিত হয় যেমন স্টেট ডিপার্টমেন্ট, সেনাবাহিনী, কিংবা তেল কোম্পানির জন্য কন্সাল্টেন্সি, সম্মেলন, টেলিভিশন, বক্তৃতার মঞ্চে যাওয়ার খায়েশ, খ্যাতিমান পণ্ডিত হওয়ার বাসনা, ইসলাম একটি চমৎকার (কিংবা, হতে পারে ভয়ংকর) সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা সেটি "প্রমাণ" করার আকাংক্ষা, এই সংস্কৃতি এবং সেই সংস্কৃতির মধ্যে একটি সেতু হওয়ার বাসনা, জানার আগ্রহ। গ্রন্থসমূহ, অধ্যাপকগণ, পণ্ডিতি ঐতিহ্য, সেই বিশেষ মুহূর্তটি ছাপ ফেলে তরুণ/তরুণী ইতিহাসবিদ কী অধ্যয়ন করবেন তার উপর। পরিশেষে, বিবেচনায় আনার আরো কিছু বিষয় রয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ সিরিয়ার উনবিংশ শতকের ভূমিস্বত্ব নিয়ে কাজ করে থাকেন, কাজটি যত শুষ্কতম, এবং "বস্তুনিরপেক্ষতম" হোক না কেন, খুব সম্ভব নীতিমালার দিক দিয়ে এটির থাকবে সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা, বিশেষ করে কোনো সরকারী কর্মকর্তার জন্য যিনি সনাতনী কর্তৃত্বের গতিশীলতা বুঝতে চান (যেটি ভূমি মালিকানার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত), যাতে সমসাময়িক সিরিয়ায় বাথ পার্টির বিপরীত শক্তি সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারেন। কিন্তু, যদি শুরুতেই দূরবর্তী সংস্কৃতির সঙ্গে বলপ্রয়োগহীন যোগাযোগ স্থাপনের কিছু প্রচেষ্টা চালানো হয়, এবং দ্বিতীয়ত, তাফসীরকারী যদি তাঁর তাফসীরী পরিস্থিতির ব্যাপারে সচেতনভাবে অবগত হন (অর্থাৎ, যদি তাফসীরকারী বোঝেন যে অন্য সংস্কৃতির জ্ঞান চূড়ান্ত নয় বরং যে তাফসীরী পরিস্থিতিতে জ্ঞান উৎপাদিত হয় সেটির সাপেক্ষে), তাহলে তাফসীরকারীর এটি মনে হওয়ার সম্ভাবনা অধিকতর যে, ইসলাম এবং অন্যান্য "অচিন" সংস্কৃতি সম্পর্কে সনাতনী ধারণা বাস্তবে খুবই পরিসীমিত। তুলনামূলকভাবে, ইসলাম-বিপরীত জ্ঞান (antithetical knowledge of Islam) সনাতনী ধারণার সীমাবদ্ধতা, বেশ খানিকটা হলেও অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। যেহেতু বিপরীত পণ্ডিতগণ এই ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেন যে ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানের হতে হবে সরকারের জরুরী নীতিমালা সংক্রান্ত স্বার্থের তাবেদার, কিংবা এটির ঢুকতে হবে ইসলামের প্রচারমাধ্যমীয় ইমেজে যেটি মোতাবেক এটি বিশ্বকে দান করে ভয়াবহ

www.pathagar.com

জঙ্গীপনা এবং সহিংসতা, তাঁরা জ্ঞান ও ক্ষমতার যোগসাজশের বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে তোলেন। এর সাহায্যে তাঁরা চান ইসলামের সঙ্গে ক্ষমতার আদেশকৃত সম্পর্কাদি বহির্ভূত সম্পর্ক স্থাপন করতে। বিকল্প সম্পর্ক অনুসন্ধানের অর্থ হচ্ছে অন্য তাফসীরী পরিস্থিতি খোঁজা; অতঃপর, পদ্ধতিমালাগতভাবে অনেক বেশি সতর্ক একটি বোধ তৈরী হয়।

তবে, পরিশেষে, কিছু সমালোচকেরা যেটির নামকরণ করেছেন তাফসীরী চক্র, তা হতে কোনো সহজ পরিত্রাণ পাওয়া মুশকিল। সংক্ষেপে বললে, সামাজিক জগত সম্বন্ধে জ্ঞান সবসময়ই, যেই তাফসীরের উপর দাঁড়িয়ে, তার থেকে আরো ভালো কিছু নয়। ইসলামের মত জটিল এবং সহজে-বোধগম্যতা-এড়ানো এমন একটি প্রপঞ্চ সম্বন্ধে আমরা যে সকল জ্ঞান ধারণ করি, তা আসে গ্রন্থ, ইমেজ, অভিজ্ঞতা থেকে। এই জ্ঞান ইসলামের প্রত্যক্ষ কোনো নজির নয় (যেটি কেবলমাত্র উপলব্ধ হতে পারে নিদর্শনের মাধ্যমে), বরং পরিবেশন, কিংবা সেটির তাফসীর। অন্যভাবে বললে, অন্য সকল সংস্কৃতি, সমাজ কিংবা ধর্মের সকল জ্ঞানসমূহ, পণ্ডিত মানুষটির ব্যক্তিগত পরিস্থিতি, যার অন্তর্ভুক্ত সময়কাল, স্থান, ব্যক্তিগত গুণাবলী, ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং এ বাদে সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিসমূহ, অপ্রত্যক্ষ প্রমাণাদির সংশ্রবের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌছায়। এই জ্ঞানকে যথার্থ কিংবা অ-যর্থার্থ, খারাপ, ভালো, কিংবা মন্দ করে তোলাটা প্রধানত নির্ধারিত হয় সেই সমাজের চাহিদা দ্বারা যেই সমাজ জ্ঞান উৎপাদিত করছে। অবশ্যই, এখানে একটি পর্যায়ে রয়েছে সহজ-সরল প্রকৃত ঘটনা যা ব্যতিরেকে কোনো জ্ঞান ঘটতে পারে না; তা না হলে আমরা কেমনে আরবী, বারবার [Berber] এবং সে দেশটি সম্বন্ধে কিছু না জেনে মরক্কোর ইসলাম সম্বন্ধে জানতে পারি? কিন্তু, তা বাদে, মরক্কোর ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান সেখানে এবং এখানের মধ্যকার অনুরূপতার ব্যাপার নয়, একটি অনঢ় বস্তু এবং সেটির প্রত্যক্ষদর্শনকারী[র ব্যাপার নয়], বরং *এখানের* একটি লক্ষ্য[কে উদ্দেশ্য করে] এ দুটির আন্তপ্রতিক্রিয়ার (সাধারণত) ব্যাপার: উদাহরণস্বরূপ, একটি জ্ঞানী-গুণী প্রবন্ধ, একটি বক্তৃতা, টেলিভিশনের পর্দায় হাজির হওয়া, নীতিনির্ধারকদের পরামর্শ প্রদান। যতদূর পর্যন্ত এই লক্ষ্য পূরণ হচ্ছে, ধরে নেয়া হয় যে জ্ঞান উৎপাদিত হয়েছে। জ্ঞানের অন্য ব্যবহারও রয়েছে (এতে অপ্রয়োজনীয়তার প্রয়োজনও অন্তর্ভূক্ত), কিন্তু প্রধানগুলো খুবই কার্যবাদী বা সহায়ক ধরনের হয়।

অতএব, জ্ঞান হিসেবে যেটিকে চালিয়ে দেয়া হয় সেটি প্রকৃতপক্ষে খুবই মিশ্রিত একটি জিনিস, এটি অন্তঃস্থ চাহিদার চাইতে (এগুলো খুব কচিৎ অন্তঃস্থ হয়) বহিঃস্থ চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হয়। পাহলেভি শাসনকালে ইরানের এলিট সংক্রান্ত কোনো অধ্যয়ন যেটি মার্কিনী শিক্ষায়তনের ভালো সিল-ছাপ্পাপাওয়া কোনো মানুষের দ্বারা করা, সেসকল নীতিনির্ধারধকদ্বয়ের জন্য কাজের হতে পারে যাঁরা রাজপরিবারের শাসনের খেয়াল রাখছেন; কিন্তু, এই একই অধ্যয়ন একজন অ-সনাতনী ইরান বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে হবে ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনায় ভরপুর[৩]। মান বিচারের মৌলিক তফাৎ এই নয় যে আরো ভালো নিয়ামক এবং আরো সুদৃঢ় কষ্টিপাথরের প্রয়োজন; এগুলো বরং আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে তাফসীরের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তাফসীর-উদ্ভূত সমস্যার নিকট আমাদের ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া, প্রশ্ন উত্থাপন করা যে কার জন্য, কি কারণে, এবং কেন

www.pathagar.com

এই তাফসীরটি এই বিশেষ প্রেক্ষিতে আরো বেশি বিশ্বাসযোগ্য। তাফসীর, জ্ঞান, এবং যেমনটি ম্যাথিউ আর্নল্ড বলেন, খোদ সংস্কৃতি হচ্ছে যুদ্ধের ফসল, এগুলো স্বর্গ থেকে পাওয়া দেওয়া নয়।

এই বইতে [*Covering Islam*] আমার অভিসর্ন্দব ছিল যে ইসলামের অনুশাসনীয়, সনাতনী কভারেজ যা আমরা শিক্ষায়তন, সরকার এবং প্রচারমাধ্যমে পাই সেটি আন্ত সম্পর্কিত। এটি পশ্চিমে অন্য কোনো "কভারেজ" কিংবা তাফসীরের তুলনায় *অধিকতর* ব্যাপৃত, *অধিকতর* প্ররোচনাকারী এবং প্রভাবশালী। এই কভারেজের স্বার্থকতার হেতু সত্যতা কিংবা যথার্থতার পরিবর্তে সে মানুষজন এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজনৈতিক প্রভাব, যারা এটি [কভারেজ] উৎপাদন করে। আমি এই যুক্তিতর্কও দাঁড় করিয়েছি যে এই কভারেজ খোদ ইসলাম সম্পর্কিত বাস্তব জ্ঞানের লক্ষ্য খুব অপ্রত্যক্ষভাবেই পূরণ করেছে। এর ফলাফল হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে কেবল একটি বিষেশ ধরনের *জ্ঞান* নয়, বরং একটি বিশেষ ধরনের *তাফসীর*, যেটি অবশ্য এ সত্ত্বেও চ্যালেঞ্জবিহীন থাকেনি কিংবা অ-সনাতনী, প্রশ্নসূচক মনের সম্মুখে অভেদ্য থাকেনি।

এ কারণে এটি বেশ ভালোই যে "ইসলাম" উপসাগরীয় যুদ্ধ ব্যাখ্যার্থে তেমন কাজে দেয়নি, ঠিক যেমন "নিগ্রো মানসিকতা" বিংশ শতকের কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিনীদের অভিজ্ঞতা বোঝাতে তেমন সুবিধাজনক বলে প্রমাণিত হয়নি। তার কারণ এই প্রত্যয়গুলো যেই বিশেষজ্ঞ ব্যবহার করেন, যাঁর জীবীকা এগুলোর উপর নির্ভরশীল, তাঁকে আত্মপ্রেমজ তৃপ্তিদান ছাড়া, এই সর্বাত্মকবাদী প্রত্যয়সমূহ ঘটনার সুস্পষ্ট প্রাবল্য, কিংবা যেই জটিল শক্তিসমূহ এই ঘটনাবলী উৎপাদন করে তার সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি। যার ফলাফল হচ্ছে সমরূপকারী প্রত্যয়ের [homogenizing concepts] দৃঢ়তাসূক ঘোষণা, এবং প্রকৃত ইতিহাসের অধিকতর শক্তিশালী দৃঢ়তাসূক ঘোষণা ও অ-ধারাবাহিকতাগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদের গহ্বরে, মাঝেমধ্যে এমন একজন মানুষ পা ফেলেছেন যিনি সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন, ও যুক্তিসঙ্গত উত্তর আশা করেছেন।

আমরা যেই বিশ্বে বসবাস করি সেটি সম্বন্ধে কেউই সবকিছু জানতে পারি না, সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমবিভাজন অদূর ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে। এই বিভাজন শিক্ষায়তনের জন্য জরুরী, খোদ জ্ঞান এটি দাবি করে, এবং পশ্চিমে সমাজ এটিকে ঘিরে সংগঠিত। কিন্তু, মানব সমাজ সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞান হচ্ছে, আমার মতে, সাধারণ বুদ্ধির [common sense] নিকট প্রাপ্তিযোগ্য - অর্থাৎ, যে বুদ্ধি সাধারণ মানব অভিজ্ঞতা হতে বাড়ে - এবং এটির, বাস্তবে কোনো না কোনো ধরনের সমালোচকীয় মাপজোকের অধীনস্ত হতে হয়। এই দুটো জিনিস, সাধারণ বুদ্ধি এবং সমালোচকীয় মাপজোক, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সকলের প্রাপ্তিযোগ্য এবং কর্ষণযোগ্য সামাজিক এবং সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলী, এগুলো কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা নয় কিংবা এক মুঠো সিল-ছাপ্পাওয়ালা "বিশেষজ্ঞের" সম্পত্তিও নয়। তথাপি, বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন যদি কারো আরবী কিংবা চীনা [ভাষা] শিখতে হয়, কিংবা কারো যদি অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, এবং জনসংখ্যা-বিষয়ক প্রবণতার অর্থোদ্ধার করতে হয়। এবং, এই প্রশিক্ষণ প্রাপ্তিযোগ্য করে তোলার স্থান হচ্ছে শিক্ষায়তন: এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র কোনো সন্দেহ নেই। সমস্যা তৈরী হয় যখন প্রশিক্ষণ সংঘ এবং সাংবাদিক "বিশেষজ্ঞ" উৎপাদন করে যারা সম্প্রদায়, ভালোমন্দের

www.pathagar.com

বিচারবোধ, এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দায়িত্ববোধের সঙ্গে সকল বাস্তব সংযোগ হারিয়ে যে কোনো মূল্যে বিশেষ স্বার্থান্বেষী দলের উদ্যোক্তা হয়ে দাঁড়ান, কিংবা অতি সানন্দে বা অসমালোচকীয়ভাবে সেটিকে ক্ষমতার কাজে নিয়োগের জন্য পেশ করেন। উভয় ক্ষেত্রেই, ইসলামের মত অচিন সমাজ এবং সংস্কৃতি বিশদভাবে ব্যাখ্যাকৃত এবং উপলব্ধ হওয়ার পরিবর্তে হয় আবৃত। এমন কি নতুন গপ্পো আবিস্কৃত হওয়ার ভয়ও থাকে, থাকে নাম-না-জানা অ-তথ্য, কু-তথ্য প্রচারনার।

বিগত কয়েক বছরগুলোতে যথেষ্ট প্রমাণাদি, যা কিনা সকলের নিকট প্রাপ্তিযোগ্য, জড়ো হয়েছে যে সাধারণভাবে অ-পশ্চিমা বিশ্ব, এবং বিশেষভাবে ইসলাম, যুদ্ধপরবর্তী বছরগুলোতে মার্কিনী এবং ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞানী, ওরিয়েন্টালিস্ট, এবং এলাকা বিশেষজ্ঞদের ছাঁচে-আঁকা ধারার সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করছে না। এটি আমার মনে হয় সবচাইতে ভালোভাবে প্রকাশ করেছেন স্বনামধন্য আলজিরীয় পণ্ডিত এবং ক্রিটিক মোহাম্মদ আরকুন, যিনি সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক চিন্তার অধ্যাপক:

> "ইসলামিক অধ্যয়ন" সংক্রান্ত বিদ্যাজাগতিক ডিসকোর্সের এখনো ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি কিভাবে এতো বিবিধ এলাকা, তত্ত্ব. সাংস্কৃতিক পরিসর, শাস্ত্র, এবং প্রত্যয় "ইসলাম" নামক একটিমাত্র শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত হলো, এবং কেন ইসলামের ক্ষেত্রে আলোচনাটি এতটা একপেশে। পক্ষান্তরে, পশ্চিমা সমাজের অধ্যয়নের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর সযত্ন নিরীক্ষণ, খুঁটি-নাটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ, সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম পার্থক্য, এবং তত্ত্ব-নির্মাণ। প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিমা সংস্কৃতির অধ্যয়ন এ ধারাতেই বিকশিত হচ্ছে, এবং "ইসলাম" নামক বিষয় এবং তথাকথিত "আরব বিশ্বের" প্রতি যে দুর্ভাগা পন্থা অনুসরণ করা হয়, তার থেকে পুরোপুরি ভিন্ন গতিপথে অগ্রসর হচ্ছে।
> (ম্যালিজ রুথভেন দ্বারা উদ্ধৃত, *লন্ডন রিভিউ অফ বুকস্*, আগস্ট ১, ১৯৯৬, পৃ: ২৭)

এটি অবশ্যই সত্য যে পুরো ইসলামি বিশ্ব সম্পূর্ণরূপে মার্কিন-বিরোধী এবং পশ্চিম-বিরোধী নয়, কিংবা এর কার্যক্রমও একত্রীভুত বা ভবিষ্যদ্বাণীযোগ্য নয়। এই পরিবর্তনগুলোর একটি বিস্তারিত ফিরিস্তি না দিয়ে, আমি যেটি বলছি তা হলো ইসলামী বিশ্বে নতুন এবং অনিয়মিত বাস্তবতা দেখা দিয়েছে; এটিও কম সত্য নয় যে একই ধরনের অনিয়মিতা, যা পূর্বতন বছরগুলোর প্রশান্ত তাত্ত্বিক বর্ণনাগুলোকে নড়বড়ে করে তোলে তা উত্তর-ঔপনিবেশিক জগতের অন্যান্য অঞ্চলেও দেখা দিয়েছে। "অনুন্নয়ন" এবং "আফ্রো-এশীয় মানসিকতা"র মত পুরোনো ফর্মুলার পুনর্উচ্চারণ নোহায়েৎ বোকামি; কিন্তু, এগুলোকে পশ্চিমের দুঃখজনক পতন, ঔপনিবেশিকতার দুর্ভাগ্যজনক পরিসমাপ্তি, এবং মাকিনী ক্ষমতার অনুশোচনীয় হ্রাসের ফলাফর হিসেবে দেখাটা হচ্ছে, আমি সজোরে বলতে চাই, নিরেট নির্বুদ্ধিতা। যে সমাজগুলো পরিসর এবং পরিচিতি. উভয় দিক দিয়েই আটলান্টিক জগৎ থেকে হাজারো মাইল দূরে, সেগুলোকে আমরা যা চাই সেটি কোনো সহজ-সরল উপায়ে হওয়ানো যাবে না। এটিকে একটি নিরপেক্ষ বাস্ত ব ঘটনা হিসেবে ধরে নেয়া যায়, এটিকে ভালো মনে করতেই হবে তেমনটি নয় (যেমনটি

আমি মনে করি)। যাই হোক না কেন, একই বাক্যে ইরান-হারানো এবং সে কারণে, এটির হুমকিপনা এবং পশ্চিমের পতন নিয়ে কথা বলার বিপদ হচ্ছে যে আমরা অধিকাংশ কার্যপদক্ষেপ গ্রহণের সম্ভাবনার রাস্তা ইতোমধ্যেই বন্ধ করে দেই– পশ্চিমের উত্থান, ইরান এবং উপসাগরের মত জায়গা পুনরায় লাভ করা বাদে যা গত দুই দশকের ধারা। ইসলামি জগতে মার্কিন কিংবা বৃটিশ কিংবা ফরাসী আধিপত্যের পরিসমাপ্তি (কিংবা সেটির সম্প্রসারণের পক্ষে যুক্তিতর্ক) নিয়ে "বিশেষজ্ঞদের" হাহাকারের সাম্প্রতিক সার্থকতা, আমার মতে নীতিনির্ধারকদের মনের গভীরে কী ঘুরপাক খাচ্ছে তার ভয়াবহ সাক্ষ্যপ্রমাণ রাখে। এই বিশেষজ্ঞগণ আসলে সচেতন কিংবা অচেতনভাবে আগ্রাসন এবং পূর্বেকার গোপন চাহিদা পূরণ করে*। চ্যালা নেটিভটিও যে একই পালায় গান গাইছে সেটি দাসত্বগিরির জন্মজীর ইতিহাসের অংশ, এটি তৃতীয় বিশ্বের একটি নয়া পূর্ণতাপ্রাপ্তির স্মারক (কিছু ব্যক্তিদের মতে) নয়।

দখলের উদ্দেশ্য বাদে, পশ্চিমে "ইসলাম" বলতে যা বোঝানো হয়ে থাকে সেটি তা নয়। এ কারণে, আমাদের একটি বিকল্প দিতে হবে: যদি "ইসলাম"এর যা বলার কথা, এটি সে তুলনায় আরো অনেক কম বলে থাকে, যদি এটি ধারণ করার চাইতে আরো অনেক বেশি আবৃত করে থাকে তাহলে আমরা কোথায়– কিংবা কিভাবে– এমন তথ্য খুঁজব যা ক্ষমতার নতুন স্বপ্ন কিংবা পুরানো ভয় এবং পক্ষপাতদুষ্টতায় উৎসাহ প্রদান করে না? কোন ধরনের অনুসন্ধান এই পর্যায়ে সবচাইতে কার্যকরী হবে সেটির উল্লেখ আমি এই বইতে করেছি, কিছু জায়গায় সেটির বর্ণনা দিয়েছি। আমি এও বলেছি যে সবকিছুর সূত্রপাত এই ধারণার সাহায্যে ঘটেছে যে, সকল জ্ঞান হচ্ছে তাফসীর। এবং পদ্ধতিগতভাবে, তাফসীরের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে হতে হবে আত্ম-সচেতন যদি এর হতে হয় সদাসতর্ক। এর হতে হবে মানবীয়, যদি এর পৌঁছুতে হয় জ্ঞানের বিন্দুতে। কিন্তু, অন্য সংস্কৃতিসমূহের সকল তাফসীরের– বিশেষ করে ইসলামের– অন্তরালে যেই চয়নের মুখোমুখি প্রত্যেক পণ্ডিত ব্যক্তির কিংবা বুদ্ধিজীবীর হতে হচ্ছে, তা হলো: বুদ্ধি কী তিনি ক্ষমতার কাজে লাগাবেন না কি সমালোচনামনস্কতা, জনগোষ্ঠী, কথোপকথন, এবং নৈতিক বোধের কাজে। আজ এই চয়নই হতে হবে তাফসীরের প্রথম কাজ, এবং এটির ফলাফল হতে হবে একটি সিদ্ধান্ত, স্থগিতকরণ নয়। যদি পশ্চিমে ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞানের ইতিহাস দখল এবং আধিপত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকে, সময় এসেছে এই বন্ধন বিচ্ছেদের। এ ব্যাপারে কোনো জোরারোপই অত্যাধিক হবে না। কারণ, তা নাহলে আমাদের দীর্ঘস্থায়ী টানাপোড়েনের, হয়তবা যুদ্ধেরও মুখোমুখি হতে হবে। আমরা মুসলমান জগৎকে, এর বিবিধ সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রসমূহকে দান করব বহুবিধ যুদ্ধ, অবর্ণনীয় ভোগান্তি, এবং ভয়াবহ উত্থানের সম্ভাবনা। [এই পরিস্থিতিতে] এমন "ইসলাম"এর বিজয়ের সম্ভাবনা যেটি সম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়া, সনাতন এবং বেপরোয়াগিরির ভূমিকা পালনে প্রস্তুত, মোটেও ক্ষীণ নয়। সর্বোচ্চ আশাবাদীতার আলোকেও এটি একটি সুখময় সম্ভাবনা হওয়ার কথা নয়।

II. Knowledge and Interpretation, from Chapter Three: Knowledge and Power. From Edward W. Said's *Covering Islam. How the Media and the Experts*

www.pathagar.com

Determine How We See The Rest Of The World, fully revised edition with a new Introduction by the author. London: Vintage 1997 (1981), pp. 162-173.

টীকা

১. আমি "Reflections on Recent American 'Left' Literary Criticism," *Boundary* 2 8, no. 1 (Fall 1979): 26-29'এ *সম্বন্ধযুক্ততার* (affiliation) ধারণা আলোচনা করেছি।

২ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method* (New York: Seabury Press, 1975), p. 238

৩. ইরানের এলিট সম্প্রদায়ের উপর Marvis Zonis-এর সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে Ali Jandaghi'র মন্তব্য দেখুন, "The Present Situation in Iran," *Monthly Review*, November 1973, pp. 34-47.

৪. উদাহরণস্বরূপ রয়েছে, J. B Kelly, *Arabia, the Gulf and the West* যিনি সুয়েজের পূর্ব হতে বৃটিশদের প্রত্যাবর্তনে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন; আরো আছেন Elie Kedourie যিনি দ্য গলকে আক্রমণ করেন আলজিরিয়া "ছেড়ে দেয়ার" জন্য,. দেখুন তাঁর লেখা Alastair Horne, *A Savage War of Peace, Algeria, 1954-1962* এর পর্যালোচনা যেটি *Times Literary Supplement*, April 21, 1978, pp. 447-50 প্রকাশিত হয়েছে; আরো আছেন Robert W. Tucker এবং তাঁর এক সারি অনুসারী যারা অন্তত গত পাঁচ বছর ধরে উপসাগরে মার্কিনী আগ্রাসন উৎসাহিত করছেন (দেখুন notes 34 38, Chapter One)। এসবের অন্তরালে রয়েছে Edward N Luttwak; তাঁর এই বইটিতে উপস্থাপিত মডেলটি দেখুন *The Grand Strategy of the Roman Empire: From the First Century AD to the Third* (Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1976).

'সমাজ নিরীক্ষণ' ৯০-৯১ সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর '০৩।

www.pathagar.com

উপনিবেশিত'র পরিবেশন নৃবিজ্ঞানের আলাপচারীগণ

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ*
অনুবাদক : রেহনুমা আহমেদ

এ জগতের এমন কোন কোণ নেই যেখানে আমার হস্তাঙ্গুলির ছাপ নেই, এমন কোন গগনচুম্বী অট্টালিকা নেই যেটি আম।র পাড়ালির ছাপ ধারণ করে না, এমন কোন রত্ন নেই যেটির ঔজ্জ্বল্য আমার ধুলোকণা ...ন করে না।
– এইম সেজেয়া, Cahier d'un re... ur au pay... tal

১

এই শিরোনামের চারটি প্রধান শব্দের প্রতিটি একটি উত্তেজিত এবং উত্তালরত পরিসরে অবস্থিত। উদাহরণস্বরূপ, এমন একটি সময়ের কথা এখন স্মরণ করা প্রায় অসম্ভব যখন মানুষজন পরিবেশনের [representation] সংকটের কথা বলছিলেন না। এবং সংকটটি যত বেশি বিশ্লেষিত এবং আলোচিত হচ্ছে, এটির উৎপত্তি তত বেশি পুরাতন মনে হচ্ছে। মিশেল ফুকো তাঁর যুক্তিতর্কে আরো বেশি জোরাল এবং আকর্ষণীয়ভাবে একটি ধারণা পেশ করেছেন যেটি সাহিত্যের ইতিহাসবিদ আর্ল ওয়াসারম্যান, এরিক অয়েরবাখ এবং এম এইচ এইব্র্যামসের কাজে পাওয়া যায় যথা, ধ্রুপদী ঐক্যের বিলুপ্তির সাথে শব্দসমূহ পূর্বের মত স্বচ্ছ একটি মাধ্যম থাকেনি, যেটি অস্তিত্বকে আলোকোজ্জ্বল করতে পারে। এটির পরিবর্তে, অস্বচ্ছ হলেও অদ্ভুতভাবে বিমূর্ত, নাগালের বাইরের একটি সারবত্তা [essence] হিসেবে ভাষা উদ্ভুত হয় ভাষাবৈজ্ঞানিক আগ্রহের বস্তু হিসেবে, এবং

---

* ইংরেজি এবং তুলনামূলক সাহিত্য, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিউইয়র্ক

এই প্রবন্ধটি শিকাগোয় ২১শে নভেম্বর ১৯৮৭তে আমেরিকান এ্যান্থ্রোপলজিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের ৮৬তম বার্ষিক সভার একটি আমন্ত্রিত অধিবেশনে পাঠ করা হয়। আমন্ত্রণ জানান জন্স হপকিন্সের অধ্যাপক ক্যাথরিন ভারডেরি, যাঁর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। অধিবেশনের শিরোনাম ছিল: "এ্যান্থ্রোপলজিস্ ইন্টারলকিউটার্স: এডওয়ার্ড সাঈদ এ্যান্ড রেপ্রেজেন্টেশান্স অফ দ্য কলোনাইজড্," এবং এটি আয়োজন এবং সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক উইলিয়াম রোজবেরি (নিউ স্কুল) এবং তালাল আসাদ (হাল), যিনি আলোচনায়ও অংশগ্রহণ করেন। আলোচকবৃন্দ ছিলেন অধ্যাপকবৃন্দ এ্যান স্টোলার, রিচার্ড ফক্স, রেনাটো রোজাল্ডো, এবং পল র‍্যাবিনও। আমি তাঁদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ মন্তব্য এবং পরামর্শের জন্য. এই সংশোধিত প্রবন্ধে তার বেশ কিছু নিঃশব্দভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অতিরিক্ত মন্তব্য প্রদান করেছেন অধ্যাপক লীলা আবু লুঘদ। আমি অধ্যাপক ডেবোরা পুল (মিশিগান)'এর নিকট কৃতজ্ঞ তাঁর সহায়তাপ্রদানকারী মন্তব্যের কারণে।

www.pathagar.com

তার পরবর্তী হতে সেটি বাস্তবতাকে অনুকরণের যে কোন প্রচেষ্টাকে নিরপেক্ষ এবং স্তিমিত করে ফেলে। সেহেতু নিটশে, মার্ক্স এবং ফ্রয়েডের যুগে, পরিবেশনের মুখোমুখি হতে হয়েছে কেবলমাত্র ভাষাবিদ্যাগত ফর্মের চৈতন্য এবং রীতির সাথে নয়, উপরন্তু ব্যক্তি-উত্তীর্ণ, মানব-উত্তীর্ণ এবং সংস্কৃতি-উত্তীর্ণ শক্তিসমূহ যেমন শ্রেণী, অচেতন, লিঙ্গ, বর্ণ, এবং কাঠামোর সাথে। এগুলো লেখক, গ্রন্থ এবং বস্তুর মত জিনিসে, যেগুলো আমাদের পূর্বতন ধারণা মোতাবেক ছিল স্থিতিশীল, কী রূপান্তর সাধন করেছে তা আক্ষরিক অর্থে ছাপার, এবং নিশ্চিতভাবে উচ্চারণের, অযোগ্য। বর্তমানে কাউকে, এমন কি কোন কিছুকে, পরিবেশন করা এমন একটি প্রচেষ্টা হয়ে উঠেছে যেটি সেই রেখাটির মত যা বরাবর বক্ররেখার দিকে এগোয় কিন্তু কখনই ছুঁতে পারে না, এর ফলশ্রুতিতে নিশ্চয়তা এবং মীমাংসাযোগ্যতা কল্পনানুরূপভাবেই কঠিন হয়ে পড়েছে।

উপনিবেশিত'র ধারণা, আমার চারটি প্রত্যয়ের দ্বিতীয়টির* কথা বললে, নিজস্ব ধরনের বিস্ফোরকত্ব হাজির করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে অ-পশ্চিমা এবং অ-ইউরোপীয় বিশ্বের বাসিন্দাগণ ছিলেন উপনিবেশিত, তারা ছিলেন ইউরোপীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ক্ষেত্র বিশেষে তাদেরকে দিয়ে জোর করে বসতি স্থাপন করা হয়েছিল। সেহেতু, সেই অনুসারে, এ্যাল্বার্ট মেম্মির বই উপনিবেশকারী এবং উপনিবেশিত, উভয়কেই একটি বিশেষ জগতে স্থাপন করে, সেটির নিজস্ব নিয়মনীতি এবং পরিস্থিতি সমেত, ঠিক যেমনটি *দ্য রেচেড অফ দি আর্থ*এ ফ্র্যান্টজ্ ফ্যানন দুই ভিন্ন ভাগে বিভক্ত ঔপনিবেশিক শহরের কথা বলেছেন, পরস্পরের সাথে নৃশংসতা এবং প্রতি-নৃশংসতায় যোগাযোগরত।[২] তিন বিশ্ব সম্বন্ধে এ্যাল্ফ্রেড সভি'র ধারণাসমূহ যতদিনে তত্ত্বে এবং প্রাক্সিসে প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত হয়ে উঠেছিল, ততদিনে তৃতীয় বিশ্ব উপনিবেশিতের সমার্থক হয়ে গিয়েছিল।

তা সত্ত্বেও আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে, যেগুলোর বিভিন্ন এলাকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে স্বাধীনতা অর্জন করে, পশ্চিমা শক্তিসমূহের একটি ধারাবাহিক ঔপনিবেশিক উপস্থিতি ছিল। সেহেতু, এমনটি নয় যে "উপনিবেশিত" হচ্ছে একটি ঐতিহাসিক সমষ্টি যে জাতীয় সার্বভৌমত্ব অর্জনের পর ভেঙ্গে যায়, বরং এটি হচ্ছে একটি বর্গ যেটি নব্য-স্বাধীন দেশের বাসিন্দা এবং ইউরোপীয়দের দ্বারা বসতি-স্থাপিত পরাধীন জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে। কুৎসিত ঔপনিবেশিক যুদ্ধ, যেটির ফলশ্রুতি ছিল হত্যা, এবং অনড় নিষ্ফলা রাজনৈতিক একক বর্ণবাদকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে টিকিয়ে রাখে। উপনিবেশিত হওয়ার অভিজ্ঞতা সে কারণে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর নিকট অনেক গুরুত্ব বহন করে যাদের নির্ভরশীল, নিম্নবর্গীয়, এবং পশ্চিমের সাব্জেক্ট হিসেবে অভিজ্ঞতার পরিসমাপ্তি ঘটে নি–ফ্যাননের ভাষা ধার করে বলা যায়–এমনকি শেষ শ্বেতাঙ্গ পুলিশটি চলে যাওয়ার পরও, শেষ ইউরোপীয় পতাকাটি নামিয়ে ফেলার পরও। উপনিবেশিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে এমন ভাগ্য যেটির রয়েছে

---

*[অনুবাদকের টীকা: সাঈদের এই লেখার ইংরেজী শিরোনাম হলো "Representing the Colonized: Anthropology's Interlocutors"। ইংরেজীতে লেখা এই প্রবন্ধটির শিরোনামে যে চারটি প্রত্যয় রয়েছে সেগুলো ক্রমানুসারে হচ্ছে: "পরিবেশন," "উপনিবেশিত," "নৃবিজ্ঞান" ও "আলাপচারিতা," বাংলা অনুবাদে এই ক্রমপর্যায় পরিবর্তিত হয়েছে এভাবে: "উপনিবেশিত," "পরিবেশন," "নৃবিজ্ঞান" ও "আলাপচারিতা"]।

www.pathagar.com

দীর্ঘমেয়াদী, প্রকৃত পক্ষে ভয়ঙ্করভাবে অন্যায্য ফলাফল, বিশেষ করে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর। দারিদ্র্য, নির্ভরশীলতা, অবোন্নয়ন, ক্ষমতা এবং অবক্ষয়ের নানাবিধ বিকার অধ্যয়ন, এবং অবশ্যই যুদ্ধ, অক্ষরজ্ঞান, ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে লক্ষণীয় অর্জনসমূহঃ এই বৈশিষ্টাবলীর সংমিশ্রণ আখ্যায়িত করে উপনিবেশিত মানুষজনকে, যারা একটি পর্যায়ে নিজেদের উন্মুক্ত করেছিল কিন্তু অন্য পর্যায়ে অতীতের শিকার থেকে যায়।

কাকুতি-মিনতি ও স্ব-করুণা'র চিহ্ন বহন করা তো দূরে থাক, "উপনিবেশিত" বর্গটি এযাবৎ বেশ খানিকটা সম্প্রসারিত হয়ে নারী, অবদমিত এবং নিপীড়িত, জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, এমনকি প্রান্তিকীকৃত কিংবা সঙ্ঘবদ্ধ বিদ্যাজাগতিক উপবিশেষজ্ঞের ক্ষেত্রাদিও অন্তর্ভুক্ত করেছে। উপনিবেশিতকে ঘিরে বাক্যাবলীর একটি সমগ্র শব্দমালা গড়ে উঠেছে, এবং প্রতিটি নিজ-নিজভাবে সেই মানুষদের, যাদের ভি এস নাইপল উপহাসমূলকভাবে চিত্রিত করেছিলেন কেবলমাত্র টেলিফোন ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু আবিষ্কার করতে পারে না হিসেবে, গৌণত্বে ভয়ঙ্করভাবে পুনর্শক্তি যোগাচ্ছে। সে অনুসারে উপনিবেশিত মানুষজনের মর্যাদাকে নির্ভরশীলতা ও প্রান্তিকতার পরিসরে স্থির করা হয়েছে, অনুন্নত, কম-উন্নত, উন্নতকামী রাষ্ট্রের আখ্যাদানের মাধ্যমে কলঙ্কিত করা হয়েছে, শাসন করা হয়েছে একটি উৎকৃষ্ট, উন্নত কিংবা মহানগরীয় উপনিবেশকারী দ্বারা, যাকে তাত্ত্বিকভাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে একজন বিরুদ্ধ অধিরাজ হিসেবে। অন্য কথায়, এতসবের পরও পৃথিবী বিভক্ত ছিল আরো ভাল এবং আরো খারাপ'এ, এবং নিকৃষ্ট বান্দাদের বর্গটি যদি সম্প্রসারিত হয়ে নতুন যুগে আরো অনেক নতুন মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করেও থাকে, এটিকে তাদের দুর্ভোগ হিসেবে দেখা ছাড়া আর কিই বা করার আছে। এ অনুসারে একজন উপনিবেশিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে অনেক ধরনের ভিন্ন, কিন্তু নিকৃষ্ট কিছু হওয়ার সম্ভাবনা, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়কালে।

একটি বর্গ হিসেবে নৃবিজ্ঞান প্রসঙ্গে যদি আসি, এই জ্ঞানকাণ্ডের কিছু মহলে যে তোলপাড় ঘটছে সেটি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই অনেক কিছু বলা এবং লেখা হয়েছে এবং এতে আমার মত একজন বহিরাগতের খুব সামান্য কিছুই যোগ করার আছে। তা সত্ত্বেও, ব্যাপক অর্থে বললে, কিছু প্রবাহের উপর এখানে গুরুত্ব আরোপ করা যায়। বিগত গোটা বিশেক বছর ধরে বিদ্যাজাগতিক তর্কবিতর্কে একটি প্রধান প্রবণতা সৃষ্ট হয়েছে এই চেতনা হতে যে পশ্চিমা পুঁজিবাদ "বর্বর," কিংবা কম-উন্নত অ-পশ্চিমা সমাজসমূহকে অধ্যয়ন এবং পরিবেশন করেছে, নির্ভরশীলত্বকে শোষণ করেছে, কৃষকদের নিপীড়ন করেছে, এবং সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে নেটিভ সমাজকে স্বীয় স্বার্থে ব্যবহার কিংবা ব্যবস্থাপনা করেছে। এই সচেতনতা অনূদিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের মার্ক্সবাদী কিংবা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নৃবিজ্ঞানে, উদাহরণস্বরূপ, এরিক উল্ফের প্রথম দিকের কাজ, উইলিয়াম রোজবেরির *কফি এ্যান্ড ক্যাপিটালিজম ইন দ্য ভেনেজুয়েলান এ্যান্ডিজ*, জুন ন্যাশ'এর *উই ইট দ্য মাইনস এ্যান্ড দ্য মাইনস ইট আস*, মাইকেল টসিগ'এর *দ্য ডেভিল এ্যান্ড কমডিটি ফেটিশিজম ইন সাউথ আমেরিকা*, এবং আরো অন্যান্য। এই ধরনের বিরুদ্ধ কাজে চমৎকারভাবে অংশীদারিত্ব করেছেন নারীবাদী নৃবিজ্ঞানীরা (উদাহরণস্বরূপ, এমিলি মার্টিনের *দ্য উম্যান ইন দ্য বডি*, লিলা আবু লুঘদ'এর *ভেইলড সেন্টিমেন্টস*), ঐতিহাসিক নৃবিজ্ঞান (উদাহরণস্বরূপ, রিচার্ড ফক্সের *লায়ন্স অফ দ্য*

www.pathagar.com

পাঞ্জাব), সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে সংযুক্ত কাজ (জিন কমারফ'এর *বডি অফ পাওয়ার, স্পিরিট অফ রেসিসস্টেন্স*), মার্কিনী নৃবিজ্ঞান (উদাহরণস্বরূপ, মৌলবাদ প্রসঙ্গে সুজান হার্ডিং), এবং নিন্দামূলক নৃবিজ্ঞান (শেল্টন ডেভিসের *ভিক্টিমস অফ দ্য মিরেকেল*)।

অন্য প্রধান ধারা হচ্ছে উত্তর-আধুনিকতাবাদী নৃবিজ্ঞান যেটি সেই সব পণ্ডিতদের দ্বারা চর্চিত যারা সাধারণভাবে সাহিত্য তত্ত্ব, আরো নির্দিষ্টভাবে বললে লেখা, ডিসকোর্স, এবং ক্ষমতা পদ্ধতির তাত্ত্বিকগণ যেমন ফুকো, রঁলা বার্থ, ক্লিফর্ড গিয়ার্টজ, জাক ডেরিডা, এবং হেডেন হোয়াইট দ্বারা প্রভাবিত। তা সত্ত্বেও আমি ইতিবাচকভাবে লক্ষ্য করেছি যে, যে পণ্ডিতরা *রাইটিং কালচার* কিংবা *এ্যান্থ্রোপলজি এ্যাজ কালচারাল ক্রিটিক*'এর মত সংকলনে° – দুটি সাম্প্রতিক অতি দৃশ্যমান বই – লেখা দিয়েছেন তাঁদের খুব কমই প্রত্যক্ষভাবে নৃবিজ্ঞানের অবসান চেয়েছেন যেমন কিনা, উদাহরণস্বরূপ, কিছু সাহিত্য পণ্ডিত সাহিত্যের প্রত্যয়ে প্রস্তাব করেছেন। তথাপি আমি ইতিবাচকভাবে এও লক্ষ্য করেছি যে নৃবিজ্ঞানের বাইরে যে নৃবিজ্ঞানীদের কাজ পড়া হয় তাঁদের সামান্য ক'জনাই এটি গোপন করেন যে তাঁদের ইচ্ছা হল নৃবিজ্ঞান, এবং নৃবৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, আরো বেশী সাহিত্যমনস্ক, কিংবা ধরন ও সচেতনতায় সাহিত্য তাত্ত্বিক হতে পারত, কিংবা নৃবিজ্ঞানীদের আরো বেশি ভাবা উচিৎ গ্রন্থময়তা [textuality] নিয়ে এবং আরো কম মাতৃতান্ত্রিক বংশধারা নিয়ে, কিংবা তাঁদের গবেষণায় অন্যান্য বিষয়ের তুলনায়, যেমন ধরুন উপজাতীয় সংগঠন, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, এবং আদিম শ্রেণীকরণ, সাংস্কৃতিক কাব্যশাস্ত্রের [cultural poetics] আরো বেশী কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করা উচিৎ।

কিন্তু এই প্রবণতার নীচে আরো কঠিন সমস্যা নিহিত। যে আলোচনা এবং তর্কবিতর্ক স্বতন্ত্র নৃবৈজ্ঞানিক উপবিভাগে চলমান যেমন এ্যান্ডিয়ান স্টাডিজ বা ভারতীয় ধর্ম, সেগুলোকে সরিয়ে রাখা সত্ত্বেও মার্ক্সবাদী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং নৃবৈজ্ঞানিক মহা-পণ্ডিতদের (গিয়ার্টজ, টসিগ, উল্ফ, মার্শল সাহলিন্স, য়োহাননেস ফেবিয়ান, এবং অন্যান্যরা) কাজ প্রকাশ করে যে সামগ্রিকভাবে নৃবিজ্ঞানের সামাজিক রাজনৈতিক মর্যাদা খাঁটি রোগে রোগাক্রান্ত। সম্ভবত এটি এখন মানব বিজ্ঞানের সকল পরিসরের ক্ষেত্রে সত্য, কিন্তু নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে সত্য। রিচার্ড ফক্সের ভাষায়:

> নৃবিজ্ঞান দৃশ্যতই আজ বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বিপন্ন, ততটুকুই যতটুকু নৃবিজ্ঞানীগণ একটি বিপন্ন বিদ্যাজাগতিক প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছেন। চাকুরি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রাম, গবেষণা সহায়তা এবং নৃবিজ্ঞানীদের পেশাজীবী মর্যাদা হ্রাসের সাথে পেশাগত ভয় যুক্ত। নৃবিজ্ঞানের প্রতি হুমকি আসছে জ্ঞানকাণ্ডের অভ্যন্তর হতে: সংস্কৃতির দুটি বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি [[যেগুলোকে ফক্স ডাকেন সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ এবং সংস্কৃতিবিজ্ঞান]] যেগুলো অনেক বেশি শরিকি, এবং খুব কমই তর্করত।[৮]

এটি আগ্রহ উদ্দীপক এবং লক্ষণীয় যে ফক্সের নিজের চমৎকার বইটি, *লায়ন্স অফ দ্য পাঞ্জাব*, যেখান থেকে এই বাক্যগুলো উদ্ধৃত, অপরাপর প্রভাবশালী রোগবিশারদদের

www.pathagar.com

সঙ্গে নৃবিজ্ঞানের শতাব্দীর রোগের [mal du siecle] – এটা যে রোগ তাতে আমিও একমত – ধারণায় শেরি অর্টনার'এর মত শরিক,' যে নন্দিত বিকল্প হচ্ছে একটি অনুশীলন, যেটির ভিত্তি হচ্ছে অনুশীলন, যেটি শক্তিপ্রাপ্ত হবে হেজেমনি, সামাজিক পুনরুৎপাদন, এবং মতাদর্শের ধারণা দ্বারা যেগুলো এ্যান্টনিও গ্রামশি, রেমন্ড উইলিয়ামস, আলা টুর্যেই, এবং পিয়েঘ বুর্দোর মত অ-নৃবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে ধার করা। তা সত্ত্বেও, আমার ধারণা যে কুহ্‌ন'এর প্যারাডাইম-ক্রান্তির গভীর অনুভূতি কাজ করছে, যেটির ফলশ্রুতি নৃবিজ্ঞানের জন্য নিশ্চয়ই, আমার বিশ্বাস, উৎকণ্ঠা-উৎপাদনকারী।

আমার মনে হয় কিছু (সংগত) ভয় এ ধরনেরও যে, আজকালের নৃবিজ্ঞানীরা পূর্বের মত স্বচ্ছন্দে উত্তর-ঔপনিবেশিক মাঠে যাতায়াত করতে পারেন না। এটি অবশ্য জাতিতাত্ত্বিক রচনার প্রতি একটি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ, ঠিক সেই পরিসরে যেটিতে পূর্বে নৃবিজ্ঞানীরা তুলনামূলকভাবে সার্বভৌম ছিলেন। এই চ্যালেঞ্জের সাড়া বিবিধ। কয়েকজনা হটে গেছেন, এক অর্থে, গ্রন্থময়তার রাজনীতিতে [the politics of textuality]। অন্য ক'জনা মাঠ থেকে উৎসারিত হিংস্রতাকে উত্তর-আধুনিক তত্ত্বের বিষয়ে পরিণত করেছেন। এবং তৃতীয়ত, কয়েক'জনা নৃবৈজ্ঞানিক ডিসকোর্সকে সামাজিক পরিবর্তন কিংবা রূপান্তরের মডেল সৃষ্টির পরিসর হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তা সত্ত্বেও, কোনো সাড়াই এই প্রকল্প সম্পর্কে অতটা ইতিবাচক নয় যতটা ছিলেন ডেল হাইমস'এর *রি-ইনভেন্টিং এ্যান্থ্রোপলজি*'র সংস্কারবাদী অংশগ্রহণকারীরা কিংবা *ইন সার্চ অফ দ্য প্রিমিটিভ*'এর স্ট্যানলি ডায়মন্ড, এক বিদ্যাজাগতিক প্রজন্ম আগে।

পরিশেষে "ইন্টারলকিউটার" শব্দটি। এখানে আবারো আমি ধাক্কা খাচ্ছি, আলাপচারী [ইন্টারলকিউটার] ধারণাটি এতখানি অস্থিতিশীল যে এটি নাটকীয়ভাবে দুটি মৌলিক অমীমাংসাযোগ্য অর্থে বিভাজিত হয়। এক দিকে, এটি প্রতিধ্বনিত হয় ঔপনিবেশিক সংঘাতের একটি সামগ্রিক পটভূমিতে, যেটিতে উপনিবেশকারীরা খোঁজেন একজন *interlocuteur valable**, এবং অপর পক্ষে, উপনিবেশিত মানুষজন ক্রমান্বয়ে বেপরোয়া সমাধান অনুসন্ধানে বাধ্য হন যেহেতু তাঁরা প্রথমে ঔপনিবেশিক কর্তার সূত্রবদ্ধ করা বর্গসমূহে আঁটার চেষ্টা করেন। তারপর, এধরনের সমাধান ব্যর্থ হতে বাধ্য সেটি স্বীকার করে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন যে কেবলমাত্র তাঁদের নিজস্ব সামরিক শক্তি প্যারিস কিংবা লন্ডনকে গ্রহণ করতে বাধ্য করবে যে তাঁরা হচ্ছেন গুরুত্বপূর্ণ আলাপচারী। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে, সেহেতু, সংজ্ঞামাত্রই একজন আলাপচারী হচ্ছেন তিনি যিনি বাধ্য, যিনি সেই শ্রেণীর যেটিকে ফরাসীরা আলজিরিয়ায় *evolue*$^{\Phi}$, *notable*$^{\beta}$, *caid*$^{\Psi}$ (স্বাধীনতা পক্ষীয় গোষ্ঠী *beni -wewe* বা শ্বেতাঙ্গ পুরুষের নিগার, এই পদটি সংরক্ষণ করে রাখেন) ডাকতেন, কিংবা এমন একজনা যিনি ফ্যাননের নেটিভ বুদ্ধিজীবীর মত। তিনি কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান, তাঁর সিদ্ধান্তমতে কেবলমাত্র চরমভাবে বিরুদ্ধ, সম্ভবত হিংস্র

---

* [অনুবাদকের টীকা: ফরাসী এই শব্দ দুটোর অর্থ হতে পারে, "স্বীকৃত মুখপাত্র"]।

Φ [অনুবাদকের টীকা: বিবর্তিত, সম্প্রসারিত, রূপান্তরিত]।

β [অনুবাদকের টীকা: লক্ষণীয়, বিশিষ্ট]।

Ψ [অনুবাদকের টীকা: কর্তা, ওস্তাদ]।

www.pathagar.com

ক্ষিপ্র প্রত্যুত্তরই হচ্ছে ঔপনিবেশিক ক্ষমতার সাথে একমাত্র সম্ভাব্য আলাপরীতি।
আলাপচারিতার অপর অংশ আরো কম রাজনৈতিক। এটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে একটি বিদ্যাজাগতিক কিংবা তাত্ত্বিক প্রতিবেশ হতে উৎসারিত, এবং একটি চিন্তা-নিরীক্ষার [thought experiment] প্রশান্তি'সহ পতন নিবারক, নিয়ন্ত্রিত গুণাবলী ইঙ্গিত করে। এই প্রেক্ষিতে, আলাপচারী হচ্ছেন এমন একজন যাঁকে হয়তবা দরজায় চেঁচামেচি করতে দেখা গেছে। অন্য কোন জ্ঞানকাণ্ড, কিংবা ক্ষেত্র, হতে এসে তিনি এখানে ঢোকার জন্য বিচ্ছিরি ঝামেলা সৃষ্টি করছেন, দারোয়ানের কাছে বন্দুক বা পাথর জমা রেখে, আরো আলাপ চালানোর লক্ষ্যে ভিতরে ঢুকছেন। এই গৃহায়িত ফলশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দেয় কেতাপূর্ণ একাধিক তাত্ত্বিকভাবে পরস্পরসম্পর্কযুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ, উদাহরণস্বরূপ, বাখতিনের ডায়ালজিসম এবং হেটেরোগ্লসিয়া, য়ুর্গেন হাবারমাসের "আদর্শিক নৈতিক ভাষা পরিস্থিতি" [ideal speech situation] কিংবা রিচার্ড ররটির দার্শনিকদের আলোকচিত্র (*ফিলসফি এ্যান্ড দ্য মিরর অফ নেচার*'এর শেষে), সুসজ্জিত একটি বৈঠকখানায় যাঁরা উজ্জীবিতভাবে বাতচিতরত। আলাপচারীগণের এমন বর্ণনা কিছুটা অতিরঞ্জিত মনে হলেও, এ ধরনের আলাপচারিতা ঘটার জন্য প্রয়োজনীয় অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং আত্মসাৎকরণ কিভাবে সেটির প্রকৃতি বদল করে, এটি অন্তত তার পর্যাপ্ত চিহ্নাদি ধারণ করে। আমি যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছি তা হল, এ ধরনের মাজাঘষা করা, সংক্রামক রোগবীজশূন্য আলাপচারী হচ্ছেন পরীক্ষাগারের সৃষ্টি, এটির রয়েছে অবদমিত এবং সেহেতু সংকট এবং সংঘাতের জরুরী পরিস্থিতির সাথে কপট যোগাযোগ, যে পরিস্থিতি প্রথমত তার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়েছে। নারী, প্রাচ্যের মানুষ, কৃষ্ণাঙ্গ, এবং অন্য "নেটিভ"গণ পর্যাপ্ত শোরগোল করার কারণেই তাদের প্রতি মনোযোগী হতে হয়েছে, বলতে গেলে তাদের ঢুকতে দিতে বাধ্য হয়েছে। এর পূর্বে তাদের উপেক্ষা করা হয়েছিল, উনবিংশ শতকের ইংরেজী উপন্যাসের চাকরদের মতন, উপস্থিত, কিন্তু পটভূমির একটি কার্যকরী অংশ বাদে তাদের ভূমিকা ছিল হিসেবের বাইরে। আলোচনার বিষয় কিংবা গবেষণার ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার অর্থ হচ্ছে তাদের মৌলিক এবং গঠনমূলকভাবে ভিন্ন কিছুতে পরিবর্তিত হওয়া। তাহলে, বিষয়সংগতি থেকেই যায়।
আমার সম্বন্ধে প্রায়শই যে সমালোচনাটি উচ্চারিত হয় এই পর্যায়ে সেটি সম্পর্কে আমার কিছু বলা উচিৎ, আমি সব সময় এ সম্পর্কে কিছু বলতে চেয়েছি যে, ইউরোপের নিকৃষ্ট অন্য উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য চিত্রাঙ্কন প্রক্রিয়ায় আমার কাজ নাকি কেবলমাত্র নেতিবাচক বাহাসে পর্যবসিত হয়েছে যেটি কোন নতুন জ্ঞানতাত্ত্বিক পন্থা বা পদ্ধতি উত্থাপন করে না, এবং অন্য সংস্কৃতিসমূহের সাথে গাম্ভীর্য্য'সহ কারবার করতে পারার পরিবর্তে কেবলমাত্র হতাশা ব্যক্ত করে। আমি এ পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা করেছি তার সাথে এই সমালোচনাগুলো সম্পর্কিত, এবং যদিও সমালোচকদের প্রতিটি কথা ধরে সেগুলোর প্রত্যুত্তর করার কোন খায়েশ আমার নেই, আমি এমনভাবে আমার প্রতিক্রিয়া করতে চাই যেটি বর্তমানের আলোচনায় বৌদ্ধিকভাবে প্রাসঙ্গিক।
'*ওরিয়েন্টালিজম*'এ আমি যে কাজে অবতীর্ণ হয়েছিলাম সেটি ছিল একটি প্রতিপক্ষমূলক সমালোচনা কিন্তু কেবলমাত্র পরিসরের দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র নয়, সেটি একইসাথে ছিল সেই সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির যেটি সেই ডিসকোর্সটিকে সম্ভাব্য

www.pathagar.com

করে তোলে, এটিকে এত টেকসই করে তোলে : জ্ঞানতত্ত্ব, ডিসকোর্স, এবং ওরিয়েন্টালিজমের মত পদ্ধতিসমূহের মূল্য হয়ে পড়ে নামমাত্র যদি সেগুলোকে লঘু করে জুতো গোছের বস্তু হিসেবে চিত্রিত করা হয়, যেগুলো ক্ষয় হয়ে গেলে তালি লাগানো যায়, পুরানো এবং ঠিকঠাক করার অযোগ্য হলে ফেলে দিয়ে তার পরিবর্তে নতুন বস্তু আনা যায়। প্রাচ্যবাদের মহাফেজখানার মর্যাদা, প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ব, এবং পিতৃতান্ত্রিক দীর্ঘায়ু গুরুত্বের সাথে গৃহীত হওয়া উচিৎ কারণ মোটের উপর এটির বৈশিষ্টাবলী একটি জগৎ-সংসারের দৃষ্টিকোণ হিসেবে কাজ করে যেটির রয়েছে গুরুতর রাজনৈতিক শক্তি, এটি কেবলমাত্র জ্ঞানতত্ত্ব হিসেবে উড়িয়ে দেয়ার মত নয়। সেহেতু, আমার দৃষ্টিতে প্রাচ্যবাদ হচ্ছে একটি কাঠামো যেটিকে একটি গাঢ় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মধ্যে খাড়া করা হয়েছে যেটির প্রধান শাখাকে এটি পরিবেশন করত, এটিকে সম্প্রসারণ করত কেবলমাত্র জ্ঞানচর্চা হিসেবে নয়, বরং একপক্ষীয় মতাদর্শ হিসেবেও। তা সত্ত্বেও প্রাচ্যবাদ আগ্রাসনকে এটির জ্ঞানচর্চাগত এবং নন্দনতাত্ত্বিক বাগধারার অধীনে লুকোয়। আমি এগুলো দেখাতে চেয়েছিলাম, উপরন্তু, আমি যুক্তিতর্ক দাঁড় করিয়েছিলাম যে এমন কোন জ্ঞানকাণ্ড, বা জ্ঞানকাঠামো, বা প্রতিষ্ঠান বা জ্ঞানতত্ত্ব নেই যেটি বিবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, এবং রাজনৈতিক গঠন হতে মুক্ত, এগুলো যুগসমূহকে দান করে সেগুলোর বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা।

এখন, আমি যে বিবিধ তাত্ত্বিক এবং ডিসকার্সিভ পুনর্মূল্যায়নের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে এটি সত্য যে তারা এই কলহময় বাস্তবতা হতে পালানোর পথ খোঁজে। তাঁরা দক্ষ গ্রন্থীয় কৌশল [textual strategies] উদ্ভাবনে রত যাতে জাতিতাত্ত্বিক রচনার কর্তৃত্বের প্রতি ফ্যাবিয়েন, তালাল আসাদ, এবং জেরার্ড লেক্লার্কের' তীব্র আক্রমণকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করা যায়: এই কৌশলসমূহ হতাশাব্যঞ্জকভাবে ল্যাপ্টালেপ্টি-করা, অসম্ভব রকমের অতি-ব্যাখ্যাকৃত এবং সংঘাতবদ্ধ নৃবৈজ্ঞানিক পরিসরকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার একটি পদ্ধতি তৈরী করেছে। এটিকে ডাকতে পারেন নন্দনতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া। অন্যটি প্রায় পুরোপুরিভাবেই অনুশীলনের উপর মনোনিবেশ করেছে,' ভাবটা এমন যে অনুশীলন হচ্ছে বাস্তবতার এমন একটি পরিসর যেটি এজেন্ট, স্বার্থ, এবং তর্কাতর্কি, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক, দুটিই ব্যতীত। এটিকে ডাকতে পারেন লঘুকারী বাস্তবমুখী প্রতিক্রিয়া।

'*ওরিয়েন্টালিজম*'এ উভয় বোধনাশকের কোনটিই আমার মনে হয়নি পোষণ করা সম্ভব। চরম সংশয়বাদিতা হয়ত আমাকে মহাতত্ত্ব ও একান্ত জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভূমির অযোগ্য করে তুলেছে। কিন্তু আমার মনে হয়নি যে আমি যে প্রেক্ষিত বর্ণনা করছি তার বাইরে কোন আর্কিমেডীয় অবস্থান রয়েছে যেটিতে আমি নিজেকে অর্পণ করতে পারি, কিংবা একটি অন্তর্ভুক্তকারী ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতিমালা উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ করতে পারি যেটি সে নির্দিষ্ট বাস্তবিক ঐতিহাসিক পরিস্থিতিসমূহ হতে মুক্ত যা হতে প্রাচ্যবাদ উৎসারিত, এবং যেটি হতে সেটি পুষ্টি গ্রহণ করে। সে কারণে আমার মনে হয়েছে যে নৃবিজ্ঞানীদের, ইতিহাসবিদদের নয়, এই অবশ্যম্ভাবী সত্য, যেটি জিয়ামবাতিস্তা ভিকো সর্বপ্রথম আকৃতি দান করেন, সেটির কাঠিন্য গ্রহণে সবচাইতে অনিচ্ছুক হওয়া, বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমি অনুমান করি যে – এবং এ বিষয়ে আমার আরও বলার আছে – যেহেতু নৃবিজ্ঞান

www.pathagar.com

সর্বোপরি, উৎসের মুহূর্ত হতেই, ঐতিহাসিকভাবে বিধিবদ্ধ এবং নির্মিত হয়েছে সার্বভৌম ইউরোপীয় পর্যবেক্ষক এবং অ-ইউরোপীয় নেটিভ, যিনি, বলতে গেলে, কম মর্যাদার এবং দূরবর্তী স্থানের, এ দুইয়ের মধ্যকার জাতিতাত্ত্বিক অভিঘাতের মুহূর্ত হতে, এখন এটি হচ্ছে কোন এক, বিংশ শতকের শেষার্দ্ধের নৃবিজ্ঞানী যিনি সেই সক্ষমতার মুহূর্তের মর্যাদা চ্যালেঞ্জকারী কাউকে বলেন, " আমাকে তাহলে আরেকটি [মুহূর্ত] প্রদান কর" ।[১০] এই অপ্রাসঙ্গিক আক্রমণ আরেকটু পরে আবার চলবে, যখন আমি এটিরই ফলশ্রুতিতে ফিরে যাবো, যথা, পর্যবেক্ষকের সমস্যামূলে [the problematic of the observer], যেটি ইতিপূর্বে উল্লেখিত শোধনবাদী নৃবৈজ্ঞানিক ধারায় লক্ষণীয়ভাবে কম-বিশ্লেষিত। এটি বিশেষভাবে সত্য, আমার মনে হয়, সাহলিন্স (তাঁর *আইল্যান্ডস অফ হিস্টরি*), কিংবা উল্ফের (তাঁর *ইউরোপ এ্যান্ড দ্য পিপল উইদআউট হিস্টরি*) মত দুর্দান্ত মৌলিক নৃবিজ্ঞানীদের কাজের ক্ষেত্রে। এই মৌনতা বজ্রধ্বনির মত, অন্তত আমার নিকট তাই। মহাতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের কাজে দেখুন, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা রয়েছে খুবই বুদ্ধিমান সূক্ষ্ম যুক্তিতর্ক, কিংবা সাহলিন্স এবং উল্ফের কাজে, আপনি হয়ত হঠাৎ লক্ষ্য করবেন কিভাবে কেউ একটি কর্তৃত্বশালী, অনিসন্ধিৎসু, পরিচ্ছন্ন, শিক্ষিত কণ্ঠস্বরে কথা বলছেন, বিশ্লেষণ করছেন, প্রমাণাদি জড়ো করছেন, তত্ত্বায়ন করছেন, সবকিছু নিয়ে ভাবনা তৈরী করছেন – কিন্তু নিজ বাদে। বক্তা কে? কেন বলছেন, কাকে লক্ষ্য করে বলছেন? এই প্রশ্নগুলো উচ্চারিত হয় না, যদি বা হয়ও, সেগুলো হয়ে পড়ে, জেমস ক্লিফর্ড যিনি লেখেন জাতিতাত্ত্বিক কর্তৃত্ব নিয়ে, তাঁর ভাষায়, প্রধানত "কৌশলগত পাসান্দের" ব্যাপার।[১১] "অন্য"দের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ, গ্রন্থাদি, এগুলোকে দেখা হয় পশ্চিমা উদ্যোগের প্রতিক্রিয়া হিসেবে – এবং সেহেতু নিষ্ক্রিয়, নির্ভরশীল – কিংবা সংস্কৃতির এমন পরিসর হিসেবে যেটি হচ্ছে "নেটিভ" এলিটদের। তবে, এই বিষয়টি আরো অধিক আলাপ করার চাইতে, আমি প্রস্তাবিত আলোচনার বিষয়টির চারপাশের পরিসরে খননকাজ করতে চাইব।

আপনি হয়ত ইতোমধ্যে অনুমান করেছেন যে পরিবেশন, কিংবা "উপনিবেশিত," বা "নৃবিজ্ঞান" এবং এটির "আলাপচারীগণ," এগুলোতে কোন সারবত্তামূলক কিংবা অনড় অর্থ আরোপ করা সম্ভব নয়। শব্দগুলো বিভিন্ন সম্ভাব্য অর্থের মধ্যে দুলতে থাকে কিংবা, কিছু ক্ষেত্রে, দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শব্দগুলো যেভাবে আমাদের মুখোমুখি হয় সে ব্যাপারে যে বিষয়টি সবচাইতে স্পষ্ট তা হলো এগুলো অপ্রতিকারযোগ্যভাবে একাধিক সীমানা এবং চাপ দ্বারা প্রভাবিত, যেগুলো উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সে অর্থে, "পরিবেশন," "নৃবিজ্ঞান," এবং "উপনিবেশিত" এমন প্রেক্ষাপটে নিহিত যেটি কোন পরিমাণ মতাদর্শিক হিংস্রতা দ্বারা খারিজ হবে না। তার কারণ, আমরা সাথে-সাথে সে শব্দাবলীর অস্থিতিশীল এবং বিস্ফোরণমূলক ভাষাগত ব্যবহার যা স্মৃতি হতে জেগে ওঠে তার সাথে ধস্তাধস্তি করতে থাকি, কিন্তু একই সঙ্গে আমরা দ্রুত প্রত্যাবর্তিত হই বাস্তব জগতে, যাতে খুঁজে পেতে পারি এবং দখল করতে পারি নৃবৈজ্ঞানিক পরিসর না হলেও অন্তত সেই সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি যেটিতে বাস্তবে নৃবৈজ্ঞানিক কাজ সম্পাদিত হয় ।

"দুনিয়াদারিত্ব" [worldliness] ধারণাটি আমার প্রায়শই কাজে লেগেছে, দুটো শব্দ সেটির সহজাত হওয়ার কারণে, একটি, "পর-জাগতিক"-এর বিপরীতে সেক্যুলার

www.pathagar.com

জগতে বসবাস, এ ধারণাটির কারণে এবং দ্বিতীয়ত, ফরাসী শব্দ *mondanite* যা ইঙ্গিত করে, যে দুনিয়াদারীর গুণাবলী হচ্ছে একটি অনুশীলিত, একটু-আধটু অবসন্ন রুচিশীলতা, সেয়ানাপনা এবং পথেঘাটে চলতে-ফিরতে-জানা ঝানুপনা। নৃবিজ্ঞান এবং দুনিয়াদারিত্বের (উভয় অর্থেই) পরস্পরকে প্রয়োজন, আবশ্যিকভাবে। ভৌগলিক স্থানচ্যুতি, সেক্যুলার আবিষ্কার, এবং অন্তর্নিহিত কিংবা অন্তরীকৃত ইতিহাসসমূহের কষ্টসহিষ্ণু উদ্ধারপ্রকল্প: এগুলো জাতিতাত্ত্বিক রচনার অনুসন্ধানকে একটি সেক্যুলার শক্তির ছাপ প্রদান করে যেটি নির্ভুলভাবে মন-খোলা। তা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত জড়োকৃত ডিসকোর্সসমূহ, সঙ্কেতসমূহ, এবং নৃবিজ্ঞানের অনুশীলনমুখী ধারা, এটির কর্তৃত্বসমূহ, শৃংখলিত কাঠিন্য, কুলুজিবিদ্যাগত মানচিত্র, পৃষ্ঠপোষকতা এবং সক্ষম বলে স্বীকৃত হওয়ার ব্যবস্থাসমূহ, পুঞ্জীভূত হয়েছে নৃবৈজ্ঞানিক হওয়া'র বিবিধ পদ্ধতিসমূহে। নিষ্পাপ হওয়ার এখন আর প্রশ্নই ওঠে না। এবং, আমরা যদি এমনটি সন্দেহ করি যে আর সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ শাস্ত্রের মতনই, রীতিমাফিক কাজ-করা সমবায়ের সদস্যদের যুগপৎ হতচেতন এবং বিযুক্ত করে, তাহলে আমরা সকল ধরনের শাস্ত্রীয় দুনিয়াদারিত্ব সম্পর্কে সত্য কিছু একটা বলছি। নৃবিজ্ঞান অনন্য নয়।

তথাপি, নৃবিজ্ঞান, আমার নিজের ক্ষেত্র তুলনামূলক সাহিত্যের পরিসরের মতন, অন্যতা এবং ভিন্নতার উপর বর্ণিত, সেই প্রাণচঞ্চল, তথ্যমূলক ধাক্কার উপর যেটি অজানা এবং ভিনদেশীয় সত্য দ্বারা প্রদত্ত, জেরাল্ড ম্যানলি হপকিনের বাক্যাংশ অনুসারে, যেটি হচ্ছে "ভিতরে একদম তরতাজা"। এই দুটি শব্দ, "ভিন্নতা" এবং "অন্যতা," ইতিমধ্যে মাদুলীর মত গুণাবলী সংগ্রহ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, এগুলো যে কত যাদুকরী, এমনকি অধিবিদ্যামূলক, সেটি দ্বারা হকচকিয়ে না যাওয়া প্রায় অসম্ভব, যেহেতু দার্শনিক, নৃবিজ্ঞানী এবং সাহিত্য তাত্ত্বিকগণ, এবং সমাজবিজ্ঞানীরাও এগুলোর উপর চোখ-ধাঁধানো ক্রিয়াকলাপ করে থাকেন। তা সত্ত্বেও, "অন্যতা," এবং "ভিন্নতা" হচ্ছে, আর সকল সাধারণ পদের মত, সেগুলোর ঐতিহাসিক এবং দুনিয়াদারী প্রেক্ষিত দ্বারা প্রচণ্ডভাবে নির্ধারিত। সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্রে "অন্য" সম্পর্কে কথা বলা, বর্তমানের নৃবিজ্ঞানীর জন্য, ধরুন, একজন ভারতীয় বা ভেনেজুয়েলার নৃবিজ্ঞানীর তুলনায় বেশ কিছুটা ভিন্ন: য়ুর্গেন গোল্টে "দখলের নৃবিজ্ঞান" [the anthropology of conquest] সম্পর্কে একটি চিন্তাশীল প্রবন্ধে যে সিদ্ধান্তে পৌছেছেন সেটি হচ্ছে যে, অ-আমেরিকান এবং সে অর্থে, দেশজ নৃবিজ্ঞানও, সাম্রাজ্যবাদের সাথে নিবিড়ভাবে বাঁধা, যেহেতু মহান মহানগরভিত্তিক কেন্দ্র হতে যে বৈশ্বিক ক্ষমতা বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেটি প্রচণ্ড রূপে অধিপতিশীল।[১১] সে কারণে, যুক্তরাষ্ট্রে নৃবিজ্ঞান চর্চা করার অর্থ কেবলমাত্র একটি বড় দেশে বসে "অন্যতা" এবং "ভিন্নতা" অনুসন্ধান করা নয়; এটি হবে সেগুলোকে একটি প্রচণ্ড রূপে প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র যেটির বৈশ্বিক ভূমিকা হচ্ছে মহাশক্তির, সে প্রেক্ষিতে আলোচনা করা।

সে কারণে "ভিন্নতা" এবং "অন্যতা"র বস্তুকরণ এবং বিরামহীন উদযাপনকে দেখা যেতে পারে একটি অশুভ প্রবণতা হিসেবে। এটি কেবলমাত্র জনাথান ফ্রিডম্যান যেটিকে বলেছেন "নৃবিজ্ঞানের তামাশাকরণ" [the spectacularization of anthropology] যার মাধ্যমে "গ্রন্থীয়করণ" এবং "সংস্কৃতিকরণ" রাজনীতি এবং ইতিহাস ব্যতিরেকে ঘটে,[১২]

www.pathagar.com

সেটিকে ইঙ্গিত করে না, এটি একই সঙ্গে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জগতের বিবেচনাহীন আত্মসাৎকরণ এবং অনুবাদকরণ ইঙ্গিত করে যেটি আপেক্ষিকতার শত প্রতিবাদ সত্ত্বেও, জ্ঞানতাত্ত্বিক যত্ন এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞপনার প্রদর্শন সত্ত্বেও, সাম্রাজ্যের পক্রিয়া হতে সহজে পৃথক করা সম্ভব নয়। আমি এটি অত্যধিক জোর দিয়ে বলছি কারণ আমি লক্ষ্য করেছি, নৃবিজ্ঞান, জ্ঞানতত্ত্ব, গ্রন্থীয়করণ [textualization], এবং অন্যকরণ সংক্রান্ত বহু কাজ, যেগুলোর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং মালমশলা নৃবিজ্ঞান হতে ইতিহাস এবং সাহিত্য তত্ত্ব পর্যন্ত প্রসারিত, সেগুলোতে মার্কিনী সাম্রাজ্যিক হস্তক্ষেপের এমন ধরনের উল্লেখ প্রায় সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত যা তাত্ত্বিক আলোচনাকে প্রভাবিত করতে পারে। বলা হবে যে নৃবিজ্ঞান এবং সাম্রাজ্যের প্রসঙ্গকে আমি খুব মোটা দাগে যুক্ত করেছি, খুব অপৃথকীকৃত ঢংয়ে; এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমি বলব কিভাবে – এবং সত্যিকার অর্থে কিভাবে – এবং কবেই বা এগুলো বিযুক্ত ছিল। ঘটনাটি কবে ঘটেছিল তা আমি জানি না, এটি আদৌ ঘটেছিল কিনা তাও জানি না। সে কারণে, এটি ঘটেছিল সেটি ধরে নেয়ার চাইতে, আমরা বরং দেখি মার্কিনী নৃবিজ্ঞানীদের নিকট সাম্রাজ্য প্রসঙ্গের কোনো গুরুত্ব আছে কি না, বাস্তবে বুদ্ধিজীবী হিসেবে আমাদের সকলের জন্য রয়েছে কি না।
বাস্তবতা ভীতি উদ্রেককারী। যেটি সত্য তা হচ্ছে আমাদের বিশাল বৈশ্বিক স্বার্থ রয়েছে, এবং আমরা সেগুলো প্রয়োগ করি। সেনাবাহিনী রয়েছে, রয়েছে পণ্ডিতকূলের বাহিনী যারা রাজনৈতিক, সামরিক এবং মতাদর্শিকভাবে কাজ করে। ভেবে দেখুন, উদাহরণস্বরূপ নিম্নের বাক্যটি যেটি সুস্পষ্টভাবে বৈদেশিক নীতি এবং "অন্য"কে সম্পর্কযুক্ত করে:

> সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (ডি ও ডি) এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে যেগুলোর জন্য প্রয়োজন আচরণগত এবং সামাজিক বিজ্ঞানের ..... বর্তমানে সামরিক বাহিনী কেবলমাত্র যুদ্ধে লিপ্ত নয়। তাদের ব্রতে শান্তি করণ, সহায়তা প্রদান, "ভাবনার যুদ্ধ," ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এসকল ব্রতের লক্ষ্যে প্রয়োজন হচ্ছে, আমাদের যে সামরিক কর্মীবৃন্দের শহুরে ও গ্রামীণ জনসংখ্যার সাথে যোগাযোগ হয়, তাদেরকে বুঝতে পারা–নতুন "শান্তি বিগ্রহ"এর কার্যক্রমে কিংবা যুদ্ধবিগ্রহে। সমগ্র বিশ্বের বহু দেশে, আমাদের প্রয়োজন বিশ্বাস, মূল্যবোধ, এবং অনুপ্রেরণা সম্পর্কে আরো জ্ঞান; তাদের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, এবং অর্থনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে; এবং তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধারার উপর আমাদের বিভিন্ন পরিবর্তন বা উদ্ভাবনের প্রভাব .... নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াদি হচ্ছে উপাদান যেগুলো সামরিক সংস্থাসমূহের গবেষণা কৌশলের বিষয়াদিতে গুরুত্ব বহন করে। *গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা অঙ্গীকার:* (১) বিদেশের সামাজিক ও আচরণগত বিজ্ঞানের পদ্ধতি, তত্ত্ব এবং প্রশিক্ষণ ... (২) বৈদেশিক সামাজিক বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রকল্প (৩) সামাজিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজ যেটি স্বাধীন দেশজ বিজ্ঞানীগণ সম্পন্ন করবেন ... (৪) বিদেশী এলাকার কেন্দ্রস্থলে প্রধান মার্কিনী গ্রাজুয়েট অধ্যয়নসমূহ সামাজিক বৈজ্ঞানিক কার্যাদি সম্পন্ন করবে ... (৭) এমন ধরনের অধ্যয়নসমূহ যেগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পাদিত হবে ও অ-প্রতিরক্ষা সংস্থার অনুদান-প্রাপ্ত হবে, এবং বিদেশী অনুসন্ধানকারীর সংগৃহীত

www.pathagar.com

> তথ্যাদির সুযোগ নেবে। তথ্যাদি, সম্পদ এবং বিশ্লেষণী পদ্ধতিসমূহের উন্নতির উপর চাপ প্রয়োগ করা উচিৎ যাতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সংগৃহীত তথ্যাদি অত্যধিক লক্ষ্যে ব্যবহৃত হতে পারে ... (৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বহির্বিশ্বের সেসব অপরাপর প্রকল্পের সাথে সহযোগিতা করতে হবে যেগুলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মীবৃন্দকে "মুক্ত বিশ্বে"র বিদ্যাজাগতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদে চলমান প্রবেশাধিকার দেবে।[১৪]

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে সেই সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থা যেটি পৃষ্ঠপোষক এবং মক্কেলের একটি বিশাল জাল, এবং একই সাথে একটি গোয়েন্দা এবং নীতি-নির্ধারণী সংস্থা যেটি পূর্বের অবস্থার তুলনায় অভূতপূর্বভাবে সমৃদ্ধ ও ক্ষমতাশালী, মার্কিনী সমাজের সকল কিছুকে আচ্ছাদিত করে না। প্রচার মাধ্যম নিঃসন্দেহে মতাদর্শিক মালমশলায় সিক্ত, কিন্তু একইসাথে এটিও সত্য যে, মিডিয়ার সকল কিছু সমভাবে সিক্ত নয়। সম্ভাব্য সকল উপায়ে আমাদের চিনতে হবে স্বাতন্ত্র্যাবলী, আমাদের পৃথককীরণ করতে পারতে হবে, তবে একইসঙ্গে এটিও যোগ করা উচিৎ যে, এই মোটা দাগের সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি না দিলে চলে না যে, পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে রাস্তা কাটে সেটি বেশ প্রশস্ত, এবং বলতে গেলে, এটি কেবলমাত্র একটি রেগান কিংবা একাধিক কার্কপ্যাট্রিকের কারণে নয়, বরং এটি গুরুতরভাবে নির্ভরশীল সাংস্কৃতিক ডিসকোর্স, জ্ঞান কারখানা, গ্রন্থ এবং গ্রন্থপনার উৎপাদন ও বিতরণের উপর, সংক্ষেপে বললে, সাধারণ নৃবৈজ্ঞানিক পরিসর হিসেবে যে "সংস্কৃতি", যেটি সাংস্কৃতিক কবিত্ব ও গ্রন্থনাকরণের ক্ষেত্রে বাঁধাধরা ভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়, সেটির উপর নয় বরং বেশ-নির্দিষ্টভাবে আমাদের সংস্কৃতির ওপর।

বস্তুগত স্বার্থের কারণে আমাদের সংস্কৃতির গরজ আরো বেশি, লোকসান বহু গুণের। এসব কেবলমাত্র যুদ্ধ ও শান্তির বিষয়াদিতে বিজড়িত নয়–তার কারণ, সাধারণভাবে যদি আপনি অ-ইউরোপীয় বিশ্বকে একটি সাপেক্ষিক কিংবা নিকৃষ্ট অঞ্চলে পরিণত করে ফেলেন, সেটিকে আক্রমণ করা, সেটিকে শান্ত করা আরো সহজ–এগুলো অর্থনৈতিক বরাদ্দকরণ, রাজনৈতিক প্রাধান্যপ্রদান, এবং কেন্দ্রীয়ভাবে আধিপত্য ও অসমতার প্রশ্নে বিজড়িত। আমরা এখন আর এমন একটি বিশ্বে বসবাস করি না যেটির তিন-ভাগ শান্তি পূর্ণ এবং অনুন্নত। তা সত্ত্বেও, আমরা এখনো একটি কার্যকরী জাতীয় ধারা প্রবর্তন করিনি যেটির ভিত্ হচ্ছে উৎকৃষ্টতার নিয়তির তত্ত্বের পরিবর্তে, যেটি সকল সাংস্কৃতিক মতাদর্শের কম-বেশী গুরুত্বারোপের বিষয়, আরো সমতাভিত্তিক এবং অ-জোরপ্রদানকারী কিছু। এ প্রেক্ষিতে উৎকৃষ্টতার বিশেষ সাংস্কৃতিক ঢং প্রকাশ পায়–আমি একটি গৎবাঁধা উদাহরণ উল্লেখ করছি–আলী মাজরুইয়ের উপর *নিউ ইয়র্ক টাইমস*'এর নির্বোধ আক্রমণে (২৬শে অক্টোবর ১৯৮৬), কারণ তিনি আফ্রিকান হিসেবে আফ্রিকানদের নিয়ে চলচ্চিত্র বানানোর স্পর্ধা দেখিয়েছেন, যতদিন আফ্রিকাকে দেখা হবে ইতিবাচকভাবে এমন একটি অঞ্চল হিসেবে যেটি ঐতিহাসিক ঔপনিবেশিকতা প্রদত্ত সভ্যকারী আধুনিকায়নে লাভবান হয়েছে ততদিন সহনশীলতা প্রদর্শন করা হবে; কিন্তু যদি আফ্রিকানরা এটিকে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের কারণে বিপর্যস্ত, এ হিসেবে

এখনো দেখেন, তাহলে এটিকে সাইজ করতে হবে, এটিকে দেখাতে হবে মূলগতভাবে নিকৃষ্ট হিসেবে, শ্বেতাঙ্গ পুরুষ চলে যাওয়ার পর পতিত হয়ে যাওয়া হিসেবে। এবং সেহেতু বাগাড়ম্বরতার অভাব নেই–উদাহরণস্বরূপ, প্যাস্কাল ব্রুক্নারের *টিয়ার্স অফ দ্য হোয়াইট ম্যান*, ভি এস নাইপলের উপন্যাসসমূহ, কনর ক্রুজ ও'ব্রায়ানের সাম্প্রতিক সাংবাদিকতা–যেটি সেই দৃষ্টিকে পুনর্শক্তি যোগায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরের নাগরিক ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাকি বিশ্বের মধ্যে কী ঘটে সে প্রসঙ্গে আমাদের রয়েছে একটি বিশেষ দায়িত্ব, যে দায়িত্ব লঘু কিংবা পালিত হয় না এটি বলে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আরো খারাপ। বিষয়টি হলো, এই দেশ এবং এটির মিত্রদের ব্যাপারে আমরা দায়ী, এবং সে কারণে এটিকে প্রভাবিত করার জন্য আমরা আরো যোগ্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে বিষয়টি একইভাবে প্রযোজ্য নয়। সে কারণে আমাদের সংশয়াপন্ন হয়ে প্রথমে অনুধাবন করতে হবে–সবচাইতে দৃষ্টিগোচরটির কথা উল্লেখ করছি–কিভাবে মধ্য ও লাতিন আমেরিকায়, এবং মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকায় ও এশিয়ায়ও, পূর্বতন মহান সাম্রাজ্যসমূহের পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান অধিপতিশীল বহির্শক্তি হিসেবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

এটি বলা অত্যুক্তি হবে না যে সৎভাবে দেখলে খেরোখাতার অবস্থা ভালো নয়, অর্থাৎ, যদি না আমরা এ ধারণাটি সমালোচনাহীনভাবে গ্রহণ করি যে আমাদের পাওনা হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গভাবে সঙ্গতিপূর্ণ নীতি যেটির লক্ষ্য হচ্ছে অপর রাষ্ট্রসমূহ, যেগুলোর প্রাসঙ্গিকতা মার্কিনী নিরাপত্তা স্বার্থে অধি-গুরুত্বপূর্ণ, এটি হতে পারে আকারে-ইঙ্গিতে কিংবা ঘোষিত, সেগুলোকে প্রভাবিত করা, প্রভুত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ করায় চেষ্টারত থাকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হতে প্রতিটি মহাদেশে মার্কিনী সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটেছে, এবং নাগরিক হিসেবে আমরা যেটি কেবলমাত্র উপলব্ধি করতে শুরু করেছি তা হলো এসব হস্তক্ষেপসমূহ বহু জটিল এবং ব্যাপক, এগুলো ঘটে বহুবিধভাবে, এবং এগুলোতে জাতীয় বিনিয়োগ বিশাল। এগুলো যে ঘটে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এবং এটিই হচ্ছে, উইলিয়াম এ্যাপেলম্যান উইলিয়ামের ভাষায়, সাম্রাজ্য হচ্ছে একটি জীবন যাপন পদ্ধতি। ইরানগেটের চলমান উন্মোচন এই জটিল হস্তক্ষেপের অংশবিশেষ, তা সত্ত্বেও এটি লক্ষ্য করা জরুরী যে বিশাল প্রচার মাধ্যম এবং মতামত বন্যায় খুব অল্প-সামান্য মনোযোগ দেয়া হয়েছে এই বিষয়ে যে, আমাদের ইরান এবং মধ্য আমেরিকার নীতিমালা–সেগুলো হতে পারে ইরানের "মধ্যপন্থী"দের মধ্যে একটি ভৌগোলিক-রাজনৈতিক ফাঁকের সুযোগ-সন্ধানী হওয়া, কিংবা নিকারাগুয়ার বৈধভাবে গঠিত এবং নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার লক্ষ্যে কন্ট্রা "মুক্তি-যোদ্ধাদের" সাহায্য প্রদান–হচ্ছে নাঙ্গা সাম্রাজ্যবাদী নীতিমালা।

মার্কিনী নীতির এই সুস্পষ্ট দিক নিয়ে আমি বেশী সময় ব্যয় করতে চাই না, এবং এ কারণে আমি উদাহরণ দেব না, ও সংজ্ঞার বোকা-বোকা বিতর্কে জড়াব না। আমরা যদি মেনেও নেই, যেমনটি অনেকেই নিয়েছেন, যে বহির্বিশ্বে মার্কিনী নীতি হচ্ছে মূলত পরার্থবাদী এবং মুক্তি ও গণতন্ত্রের মত অনিন্দনীয় লক্ষ্যে নিয়োজিত, এ বিষয়ে সন্দেহবাদী হওয়ার পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে। কারণ আমরা কি, অন্তত আপাত দৃষ্টিতে, জাতি হিসেবে ফ্রান্স ও বৃটেন, স্পেন ও পর্তুগাল, হল্যান্ড ও জার্মানি যা যা করেছিল,

www.pathagar.com

সেটিরই পুনরাবৃত্তি করছি না? এবং আমরা কি দৃঢ়তা এবং ক্ষমতার সুবাদে মনে করি না যে আমরা পূর্বতন নোংরা সাম্রাজ্যবাদী অভিযান হতে মুক্ত এবং আমরা কি আমাদের বিশাল সাংস্কৃতিক অর্জন, আমাদের সমৃদ্ধি, আমাদের তাত্ত্বিক এবং জ্ঞানতত্ত্বীয় সচেতনতার প্রতি আঙ্গুল উঁচিয়ে দেখাই না? তাছাড়া, এমন একটি অনুমান কি আমাদের মধ্যে নেই যে আমাদের ভাগ্য হচ্ছে বিশ্বকে শাসন করা ও নেতৃত্ব প্রদান করা, এমন এক ভূমিকা যা আমরা বনের মোষ চরাতে যেয়ে নিজেদের প্রদান করেছি?

২

সংক্ষেপে বললে, গভীর, প্রচণ্ডভাবে বিপন্ন এবং বিপন্নতা উদ্রেককারী প্রশ্ন আমাদের সামনে রয়েছে জাতিগতভাবে, এবং পূর্ণাঙ্গ সাম্রাজ্যিক দৃশ্যপটে, অপরের সাথে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে–অপর সংস্কৃতি, অপর রাষ্ট্র, অপর ইতিহাস, অপর অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্য, মানুষজন, এবং নিয়তি । এ প্রশ্নের সমস্যা হচ্ছে যে সংস্কৃতির মধ্যকার সম্পর্কের বাস্তবতার বাইরে কোন দৃকপট নেই, অসম সাম্রাজ্যিক এবং অ-সাম্রাজ্যিক ক্ষমতাসমূহের মধ্যকার সম্পর্কের বাইরে, বিবিধ অন্যের মধ্যে, এমন একটি দৃকপট যেটি নিজকে খোদ চলমান সম্পর্কসমূহের বোঝাপূর্ণ স্বার্থ, অনুভূতি, এবং মুখোমুখি হওয়ার ধারণাবলীর বিচার, মূল্যায়ন এবং ব্যাখ্যার জ্ঞানতত্ত্বীয় সুবিধাদি হতে মুক্তি প্রদান করবে। আমরা যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাদ বাকি বিশ্বের যুক্ততা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করি, আমরা হচ্ছি, বলতে গেলে, যুক্ততার অংশ, সেগুলির বাইরে, সেগুলির উর্ধ্বে নই। এ কারণে বুদ্ধিজীবী, মানবতাবাদী, এবং সেক্যুলার সমালোচক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে জাতি এবং ক্ষমতার এই বিশ্ব-সংসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাটিকে বাস্তবতার ভিতর হতে উপলব্ধি করা, এবং অংশগ্রহণকারী হিসেবে, বিযুক্ত পর্যালোচক হিসেবে নয় যাঁরা, ইয়েটসের চমৎকার সেই বাক্যের অলিভার গোল্ডস্মিথের মতন, স্বেচ্ছাকৃতভাবে আমাদের মনের মধুপাত্রে পান করে।

এখন ঘটনা হলো, সাম্প্রতিক ইউরোপীয় এবং মার্কিনী নৃবিজ্ঞানের ইদানিংকালের যাত্রা এই সমস্যাটির হতবুদ্ধিকর প্রশ্ন ও বিবাদসমূহের লক্ষণাদি প্রকাশ করে। সেই সাংস্কৃতিক অনুশীলনের ইতিহাস ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি প্রধান বিধিবদ্ধকারী উপাদান হিসেবে ধারণ করে বহিরাগত পশ্চিমা জাতিতত্ত্বকারী-পর্যবেক্ষক এবং একটি আদিম, কিংবা অন্তত ভিন্ন কিন্তু নিঃসন্দেহে দুর্বল এবং অল্প উন্নত, অ-পশ্চিমা সমাজ। *কিম'*এ রুডয়ার্ড কিপলিং সেই সম্পর্কের রাজনৈতিক অর্থ নিরূপণ করেন এবং সেটিকে অসাধারণ শিল্পীয় ন্যায্যতাবোধের সাথে দেহবদ্ধ করেন কর্নেল ক্রেইটনের চরিত্রে, সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত জাতিতত্ত্বকারী, এবং একই সাথে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান, সেই তথাকথিত মহা খেলায়, যেটির অংশ হচ্ছে তরুণ কিম। যাঁরা এই অনতিক্রম্য অসামঞ্জস্যতার মধ্যে কারবার করেন যথা, একটি রাজনৈতিক বাস্তবতা যেটির ভিত্তি হচ্ছে বলপ্রয়োগ, এবং অন্য'কে বিশদব্যাখ্যাদানমূলকভাবে [hermeneutically] এবং সহানুভূতিশীলভাবে এমন পদ্ধতিসমূহ দ্বারা উপলব্ধি করার একটি বৈজ্ঞানিক এবং মানবিক কামনা, যেটি সবসময় বলপ্রয়োগ দ্বারা সংকুচিত এবং সংজ্ঞায়িত নয়, আধুনিক নৃবিজ্ঞান সেই তাত্ত্বিকদের সাম্প্রতিক কাজের সাহায্যে আমাদের একইসাথে

www.pathagar.com

স্মরণ করিয়ে দেয়, এবং আচ্ছন্ন করে, সেই সমস্যাজনক ঔপন্যাসিক প্রাক-চিত্রনটি। এসকল প্রচেষ্টা সার্থকতা অর্জন করে, না কি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় সেটি এই প্রচেষ্টাটিকে বিশিষ্টতা দানকারী বিষয়ের তুলনায় কম আগ্রহের, কারণ শেষোক্তটিকে সম্ভব করে তোলে সাম্রাজ্যবাদী পটভূমি সম্বন্ধে সচেতনতা, প্রকটভাবে লজ্জাবনত কিন্তু গোপন-করা, যেটি সকল কিছু সত্ত্বেও, সর্বব্যাপৃত এবং অবশ্যম্ভাবী। কারণ, বাস্তবে, আমার জানা মতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ উপলব্ধি ছাড়া আমাদের নিজ সংস্কৃতি হতে জগৎ-সংসারকে উপলব্ধি করার কোন পথ নেই (কথা প্রসঙ্গে, এমন একটি সংস্কৃতি যেটির রয়েছে নির্মূল ও অন্তর্ভুক্তিকরণের একটি পরিপূর্ণ ইতিহাস)। এবং এটি হচ্ছে, আমার মতে, রাজনৈতিক এবং ব্যাখ্যাদানকারী গুরুত্বের দিক হতে অসাধারণ একটি সাংস্কৃতিক সত্য, কারণ এটিই সত্যভাবে সীমারেখা সংজ্ঞায়ন করে, এবং কিছুটা, "অন্যতা" এবং "ভিন্নতা"র মতন নৈর্ব্যক্তিক এবং ভিত্তিহীন প্রত্যয়কে সক্ষমতা দান করে। যে আসল সমস্যাটি আমাদের ভূতের মতন তাড়া করে, সেটি কিন্তু রয়েই যায়: একটি চলমান কর্মসাধনা হিসেবে নৃবিজ্ঞান এবং অপর পক্ষে, একটি চলমান সংশ্লিষ্টতা হিসেবে সাম্রাজ্য, এ দুইয়ের সম্পর্ক।

কেন্দ্রীয় জাগতিক সমস্যামূল [problematic] যখন সুস্পষ্টভাবে বিবেচনার জন্য পুনর্স্থাপিত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই অন্তত তিনটি নির্ণীত বিষয় পুনর্নিরীক্ষণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত হয়। প্রথম হচ্ছে আমি পূর্বেই যেটির উল্লেখ করেছি, পর্যবেক্ষকের বিধিবদ্ধকারী ভূমিকা, জাতিতাত্ত্বিক "আমি" কিংবা সাবজেক্ট, যার মর্যাদা, ক্রিয়া পরিসর, এবং একইসঙ্গে চলমান কেন্দ্রটি, লজ্জাজনক দৃঢ়তার সাথে খোদ সাম্রাজ্যিক সম্পর্কটিকে ছোঁয়। দ্বিতীয় হচ্ছে ভৌগোলিক মনোভঙ্গি, যেটি অভ্যন্তরীণভাবে অতি প্রয়োজনীয়, অন্তত ঐতিহাসিকভাবে, জাতিতাত্ত্বিক রচনার লক্ষ্যে। যে ভৌগোলিক প্রতীকী-বিষয়বস্তু পশ্চিমের বহু সাংস্কৃতিক কাঠামোতে গভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেটি নিয়মিত সমালোচকদের নিকট সশ্রদ্ধ অগ্রাধিকার পেয়েছে কালগততার [temporality] তুলনায়। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে, আমার বিশ্বাস, খোদ আমাদের সাম্রাজ্য, এবং একইসাথে ইতিহাস রচনা, নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, এবং আধুনিক আইনী কাঠামোসমূহের বিবিধ ধরন হতো না, যদি না গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক এবং কল্পনা-নির্ভর প্রক্রিয়াসমূহ পরিসরকে উৎপাদন, সংগ্রহ, ও অধীনস্ত করায়, সেটিতে বসতিস্থাপন করায়, ক্রিয়াশীল হ'ত। এই বিষয়টি আলোকিত হয়েছে সমসাময়িক কিন্তু পরস্পরের সাথে তুলনা-নিরর্থক বইসমূহে, যেমন নীল স্মিথের *আনইভেন ডিভেলপমেন্ট*, কিংবা রনজিৎ গুহ'র *রুল অফ প্রপার্টি ফর বেঙ্গল*, অথবা এ্যাল্ফ্রেড ক্রসবি'র *ইকলজিকাল ইমপিরিয়ালিজম*, যে সকল কাজ অনুসন্ধান করে কিভাবে নৈকট্য এবং দূরত্ব, দখল এবং রূপান্তরের একটি গতিশীলতা তৈরী করে যেটি আত্ম এবং অপরের সম্পর্কের প্রাচীরবেষ্টিত পুঙ্খানুপুঙ্খাঙ্কনে অনধিকার প্রবেশ ঘটায়। জাতিতাত্ত্বিক রচনায়, ভূগোলের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশুদ্ধ ক্ষমতার অনুশীলনটি তীব্র। তৃতীয় হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকীরণের বিষয়টি, গবেষকের তুলনামূলকভাবে প্রাইভেট পরিসর এবং তাঁর কর্মচক্র হতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কিংবা প্রতিবেদনমূলক শাস্ত্রীয় কাজ স্তরে-স্তরে ছড়িয়ে নীতিমালা সৃষ্টি করে, নীতিমালা প্রয়োগ করে, এবং–এটি কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়–পাবলিক প্রচারমাধ্যমের

www.pathagar.com

দৃশ্যকল্পসমূহে কঠোর নিয়মানুবর্তী জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনের পুনর্সংবহন ঘটায়, যা এই নীতিসমূহকেই পুনর্শক্তি যোগায়। সুদূর কিংবা আদিম কিংবা "অন্য" সংস্কৃতি, সমাজ, মানুষজনকে নিয়ে করা কাজ কিভাবে মধ্য আমেরিকা, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে নির্ভরশীলতা, অধস্তনতা কিংবা হেজেমনির সক্রিয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহে অন্তর্ভুক্ত হয়, যোগসূত্র তৈরী করে, বাধাগ্রস্ত কিংবা প্রবল হয়ে উঠে ?

দুটি উদাহরণ, মধ্যপ্রাচ্য এবং লাতিন আমেরিকা, সাক্ষ্য প্রমাণাদি হাজির করে যে বিশেষায়িত "বিষয়"-সংক্রান্ত পাণ্ডিত্য এবং পাবলিক নীতিমালার মধ্যে একটি সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে, যেটি প্রচার মাধ্যমীয় পরিবেশনে সহানুভূতি এবং সহমর্মিতার পরিবর্তে নেটিভ সমাজের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ এবং নৃশংসতার ব্যবহারে পুনর্শক্তি যোগায়। বর্তমানে পাবলিক ডিসকোর্সে "সন্ত্রাসবাদ" কমবেশী স্থায়ীভাবে ইসলামের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেছে, অধিকাংশ মানুষজনের নিকট এটি একটি রহস্যমূলক ধর্ম কিংবা সংস্কৃতি, কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে (ইরানের বিপ্লবের পর, লেবানন এবং ফিলিস্তিনের বিবিধ বিদ্রোহের পর) "গুণী-জ্ঞানী" আলোচনায় এটি একটি বিশেষ ভীতি-প্রদর্শনকারী আকৃতি লাভ করেছে ।[২৫] ১৯৮৬ সনে, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু (জাতিসংঘে ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত) সম্পাদিত সংকলন *টেরোরিজম: হাউ দ্য ওয়েস্ট ক্যান উইন*'এ ছিল সার্টিফিকেটধারী প্রাচ্যবাদীদের লেখা তিনটি প্রবন্ধ, যার প্রতিটি গম্ভীরভাবে ঘোষণা করে যে ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ সংযুক্ত। এধরনের বক্তব্য বাস্তবে যা উৎপাদন করে তা হলো লিবিয়াকে বোমা মারার প্রতি সম্মতি, এবং একই ধরনের অভিযানের স্বপক্ষে স্থুল ন্যায়পরায়ণতাবোধ, যেহেতু মানুষজন ইতোমধ্যেই বিশেষজ্ঞদের নিকট হতে ছাপাক্ষরে ও টেলিভিশন মারফৎ জেনে ফেলেছেন যে ইসলাম হচ্ছে, বলতে গেলে, একটি সন্ত্রাসবাদী সংস্কৃতি।[২৬] একটি দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে লাতিন আমেরিকা সংক্রান্ত ডিসকোর্সে "ইন্ডিয়ান" শব্দটিকে ঘিরে যে জনপ্রিয় অর্থ সেটি, বিশেষ করে ইন্ডিয়ানগণ এবং সন্ত্রাসবাদ (কিংবা ইন্ডিয়ানগণের সাথে একটি পশ্চাৎপদ, স্থবির আদিম জনগোষ্ঠী ও প্রথাকৃত হিংস্রতা) যেহেতু একত্রিত। পেরুর সাংবাদিকদের একটি এ্যান্ডীয় গণহত্যা প্রসঙ্গে মারিও ভার্গাস লোসা'র বিখ্যাত বিশ্লেষণ ("ইনকোয়েস্ট ইন দি এ্যান্ডিস: এ ল্যাটিন এ্যামেরিকান রাইটার এক্সপ্লোরস দ্য পলিটিকাল লেসন্স অফ এ পেরুভিয়ান ম্যাসেকার," *নিউ ইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন*, ৩১ জুলাই ১৯৮৩)'এর পত্তনী হচ্ছে এ ধারণা যে এ্যান্ডিয়ান ইন্ডিয়ানগণ সহজেই বিশেষ ভয়ংকর ধরনের বাচবিচারহীন হত্যা করেন; ভার্গাস লোসা'র গদ্য ইন্ডিয়ান রিচ্যুয়াল, পশ্চাৎপদতা, অন্ধকারাচ্ছন্ন অপরিবর্তনশীলতা, এসব বাক্যে ভরপুর যেগুলো সবই নৃবৈজ্ঞানিক বর্ণনার চূড়ান্ত কর্তৃত্বের উপর র্নিভরশীল। প্রকৃত পক্ষে, কিছু বিশিষ্ট পেরুভীয় নৃবিজ্ঞানীগণ ছিলেন সে প্যানেলের সদস্য (ভার্গাস লোসার সভাপতিত্বে) যেটি গণহত্যার তদন্ত অনুষ্ঠিত করে।

এই বিষয়গুলো কেবলমাত্র তাত্ত্বিক গুরুত্বের নয়, প্রাত্যহিক গুরুত্বেরও। সাম্রাজ্যবাদ, সাগরের ওপারের ভূখ ও জনসমষ্টির নিয়ন্ত্রণ, বিকশিত হয় লাগাতারভাবে মনশ্চক্ষে বিবিধ ইতিহাস, সাম্প্রতিক অনুশীলন এবং নীতিমালা'সহ, বিভিন্নভাবে অঙ্কিত সাংস্কৃতিক যাত্রাসমূহের সাহায্যে। তা সত্ত্বেও ইতোমধ্যেই তৃতীয় বিশ্বে রয়েছে আয়তনে বেশ বড়-সড় একটি সাহিত্য ভাণ্ডার, যেটি একটি আবেগান্বিত তাত্ত্বিক এবং বাস্তবানুগ

www.pathagar.com

বক্তব্য উদ্দিষ্ট করে এলাকা অধ্যয়নের [area studies] পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের প্রতি, এবং নৃবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদদের প্রতি। সাম্রাজ্যবাদ হতে ঐতিহ্যসমূহ, ইতিহাসসমূহ, এবং সংস্কৃতিসমূহ পুনরুদ্ধারের অংশ হচ্ছে এই সংশোধনবাদী উত্তর-ঔপনিবেশিক উদ্দিষ্টকরণ, আবার এটি একইসাথে বিবিধ বিশ্ব ডিসকোর্সে অনুপ্রবেশের একটি সমতাভিত্তিক পন্থাও। মনে পড়ে আনোয়ার আব্দেল মালেক ও আব্দুল্লাহ লারুইয়ের কথা, সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ গোষ্ঠীর মত মানুষজনের কথা, সি এল আর জেমস এবং আলী মাজরুই, বিবিধ গ্রন্থ যেমন ১৯৭১এর বারবাডস ডিক্লারেশন (যেটি সরাসরি নৃবিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানবাদ, কপটতা এবং সুবিধাবাদিতার অভিযোগ উত্থাপন করে), উপরন্তু নর্থ-সাউথ রিপোর্ট এবং দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন অর্ডার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, এই মালমশলার খুব অল্পই নগরীয় কেন্দ্রের অন্দর মহলে পৌঁছায়, কিংবা সাধারণ শাস্ত্রীয় বা ডিসকোর্সীয় আলোচনায় প্রভাব ফেলে। প্রকৃত পক্ষে, পশ্চিমা আফ্রিকাবিদগণ আফ্রিকীয় লেখকদের ব্যবহার করেন তাঁদের গবেষণার উৎস সূত্র হিসেবে, পশ্চিমা মধ্যপ্রাচ্যবিদগণ আরব কিংবা ইরানের গ্রন্থসমূহকে তাঁদের গবেষণার মৌলিক সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে দেখেন, যেখানে কিনা সাবেক-উপনিবেশিতদের তর্কাতর্কি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিজড়নের প্রত্যক্ষ, এমনকি নাছোড়বান্দা, অনুরোধসমূহ প্রধানত উপেক্ষিত হয়।

এসব ক্ষেত্রে তর্ক করা, ঘন বর্ণনা [thick description] এবং আবছা ধরন [blurred genre], এই ফ্যাশনগুলো বাইরের কণ্ঠস্বরের শোরগোল, যা সাম্রাজ্য এবং আধিপত্য সংক্রান্ত দাবীদাওয়া বিবেচনার জন্য উত্থাপন করছে সেটিকে ঢুকতে দিচ্ছে না বা আটকাচ্ছে, অপ্রতিহতযোগ্য। প্রায়শ যেভাবে অঙ্কিত হয় তা সত্ত্বেও, নেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি কেবলমাত্র একটি জাতিতাত্ত্বিক সত্য নয়, এটি প্রধানত কিংবা নীতিগতভাবে একটি বিশদব্যাখ্যাদানকারী নির্মাণও নয়; এটি হচ্ছে নৃবিজ্ঞান শাস্ত্র এবং অনুশীলনের ("বহিরাগত" ক্ষমতার প্রতিনিধি হিসেবে) প্রতি একটি বড়সড়ভাবে চলমান, দীর্ঘকালীন, এবং টিকে থাকা প্রতিপক্ষীয় প্রতিরোধ, গ্রন্থময়তা হিসেবে নয় বরং রাজনৈতিক আধিপত্যের একটি প্রত্যক্ষ এজেন্ট হিসেবে।

এতদসত্ত্বেও চলমান নৃবৈজ্ঞানিক কাজে রয়েছে চিত্তাকর্ষক, তথাপি সমস্যামূলক প্রচেষ্টাসমূহ যা এই উপলব্ধির সম্ভাব্য ফলশ্রুতিকে স্বীকার করে। রিচার্ড প্রাইসের বই *ফার্স্ট টাইম* সুরিনামের সারামাকা জনগোষ্ঠীকে নিরিখ করে, এমন একটি জনগোষ্ঠী যেটির বেঁচে থাকার উপায় হচ্ছে কার্যত একটি গোপন জ্ঞানকে গোষ্ঠীগুলোতে ছড়িয়ে দেয়া, যে জ্ঞানকে তাঁরা ফার্স্ট টাইম নামে ডাকেন; সে কারণে *ফার্স্ট টাইম*, অষ্টাদশ শতকীয় ঘটনাবলী যা সারামাকাদের দান করে তাদের জাতীয় পরিচিতি, হচ্ছে "সংকুচিত, সীমাবদ্ধ, এবং রক্ষিত"। প্রাইস বেশ অনুভূতিশীলভাবে বহিরাগত চাপের মুখোমুখি প্রতিরোধের এই ধরনটিকে উপলব্ধি করেন, এটিকে সযত্নে নথিবদ্ধ করেন। তা সত্ত্বেও তিনি যখন এ প্রশ্নটি তোলেন, "সে মৌলিক জিজ্ঞাসা যে, যদি তথ্য প্রকাশিত হয়ে যায় যেটি তার গোষ্ঠীকে ক্ষমতা অর্জন করে আংশিকভাবে গোপন হওয়ার কারণে সেটি অকার্যকর করে তোলে কি না সে তথ্যের অর্থ," তিনি তখন এ ধরনের যন্ত্রণাদায়ক নৈতিক বিষয়াদি নিয়ে খুব সংক্ষেপিত সময়ের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে, গোপন তথ্য প্রকাশ

www.pathagar.com

করা শুরু করেন।[১৭] জেম্‌স সি স্কটের অবিস্মরণীয় বই *ওয়েপন্স অফ দ্য উইক: এভ্‌রিডে ফর্ম্‌স অফ প্রেজেন্ট রেজিজটেন্স* এ একই ধরনের সমস্যা দেখা যায়। স্কট চমৎকারভাবে দেখিয়ে দেন কিভাবে জাতিতাত্ত্বিক বর্ণনাসমূহ বহিরাগত পদার্পণের প্রতি কৃষক প্রতিরোধের একটি "পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি" পেশ করে না, করতে পারে না, যেহেতু কৃষক কৌশলমাত্রই (পা ছ্যাচড়ানো, দেরী করা, খেয়ালিপনা, যোগাযোগহীনতা, ইত্যাদি) হচ্ছে ক্ষমতার অবাধ্য হওয়া।[১৮] এবং যদিও স্কট হেজেমনি প্রতিরোধের একটি চমৎকার প্রত্যক্ষণভিত্তিক তাত্ত্বিক বর্ণনা পেশ করেন, তিনি ঠিক সেই প্রতিরোধ যেটির সম্বন্ধে তাঁর উচ্চ ধারণা, যেটিকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, সেটির শক্তিমত্তা ফাঁসের মাধ্যমে, এক অর্থে, সেটিকে লঘু করেন। আমি প্রাইস ও স্কটের উল্লেখ করছি কোনভাবেই তাঁদের অভিযুক্ত করার লক্ষ্যে নয় (সেটি তো দূরের কথা, যেহেতু তাঁদের বইগুলো অত্যধিক মূল্যবান) বরং নৃবিজ্ঞান সম্মুখিত কিছু তাত্ত্বিক স্ববিরোধী সত্য এবং ঘোষিত দ্বন্দ্ব চিহ্নিত করার লক্ষ্যে।

৩

শুরুতেই যেমনটা বলেছিলাম, এবং এটি প্রত্যেক নৃবিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছেন যিনি ভেবেছেন সেই তাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে যেগুলো এখন খুব স্পষ্টতই প্রতীয়মান, অনেক ধার-কর্জ করা হয়েছে সংলগ্ন পরিসরগুলো হতে, সাহিত্য তত্ত্ব, ইতিহাস, এবং ইত্যাদি হতে, কিছুটা কারণ এগুলির অধিকাংশই রাজনৈতিক বিষয়াদির কিনার ঘেঁষে যায় যেহেতু রাজনীতি নিয়ে আলাপ করার চাইতে কাব্যশাস্ত্র নিয়ে আলাপচারিতা আরো সহজ। তা সত্ত্বেও, ধীরে-ধীরে নৃবিজ্ঞানকে দেখা হয় একটি বৃহত্তর, আরো জটিল ঐতিহাসিক সমগ্রের অংশ হিসেবে, যেটি পূর্বের ধারণার তুলনায় পশ্চিমা ক্ষমতার পোক্তকরণের সাথে আরো বেশী ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। জর্জ স্টকিং এবং কার্টিস এম হিন্সলির সাম্প্রতিক কাজ হচ্ছে বিশেষভাবে শক্তিশালী উদাহরণ,[১৯] একই সাথে তালাল আসাদ, পল র‍্যাবিনও, এবং রিচার্ড ফক্স সৃষ্ট বিবিধ ধরনের কাজ। চূড়ান্ত অর্থে এই পুনর্সংযুক্তিকরণের কারণ হচ্ছে, আমার মনে হয়, প্রথমত বয়ান পদ্ধতি [narrative procedures] সম্পর্কে আমাদের অর্জন করা নতুন এবং কম আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ উপলব্ধি, দ্বিতীয়ত বিকল্প এবং প্রতি-আধিপত্যবাদী অনুশীলনী ধারণার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের অধিক সচেতনতা। আমি এখন উভয় বিষয় সম্পর্কে কথা বলতে চাই।

মানবিক এবং সামাজিক বিজ্ঞানে বয়ান এখন অর্জন করেছে একটি প্রধান সাংস্কৃতিক সম্মিলনের মর্যাদা। রেনাটো রোজাল্ডো'র অবিস্মরণীয় কাজের সাথে যাঁরাই পরিচিত তাঁদের কেউই এটি বুঝতে ব্যর্থ হবেন না। হেডেন হোয়াইটের *মেটা হিস্টরি* এই ধারণাটি প্রবর্তন করে যে বয়ান অনুশাসিত হয় trope এবং genre দ্বারা – রূপক, লক্ষণা, সিনেকড্যাকি, পরিহাস, রূপক-বর্ণনা এবং ইত্যাদি–যেটি আবার নিয়ন্ত্রিত করে, এমন কি উনবিংশ শতকের সর্বোত প্রভাবশালী ইতিহাসবিদ উৎপাদন করে, এমন মানুষ যাঁদের ঐতিহাসিক কাজ সম্পর্কে অনুমান ছিল যে, দার্শনিক এবং/অথবা মতাদর্শিক ধারণা প্রত্যক্ষণভিত্তিক সত্য দ্বারা সমর্থিত। হোয়াইট বাস্তব এবং আদর্শের প্রধানত্ব স্থানচ্যুত করেন; সে স্থানে তিনি স্থাপন করেন [illegible]

বয়ানগত এবং ভাষাভিত্তিক পদ্ধতিসমূহ। তিনি যেটি ব্যাখ্যা করতে পারেন নি, কিংবা করতে চান নি তা হলো, ইতিহাসবিদদের নিকট বয়ানের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্বেগ, কেন, উদাহরণস্বরূপ, জেকব বার্কহার্ট এবং মার্ক্স বয়ানগত (নাটক কিংবা ছবির পরিবর্তে) কাঠামোকরণ ব্যবহার করেন, এবং বিবিধ সুরে বাঁধার কারণে এগুলো পাঠকের নিকট বিবিধ প্রতিক্রিয়া এবং লটবহর দ্বারা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অপরাপর তাত্ত্বিকগণ–ফ্রেডরিক জেমসন, Paul Ricoeur, Tzvetan Todorov–বয়ানের আনুষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যাবলী এমন সামাজিক এবং দার্শনিক পরিকাঠামোতে অনুসন্ধান করেন যা কিনা হোয়াইটের ব্যবহৃতগুলোর চাইতে বৃহত্তর এবং, খোদ সামাজিক জীবনে বয়ানের পরিসর এবং গুরুত্ব দেখান। বয়ান একটি আনুষ্ঠানিক নকশা কিংবা ছাঁচ হতে পরিবর্তিত হয়ে যায় একটি ক্রিয়াতে যেটিতে রাজনীতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস, এবং ব্যাখ্যাদানের সম্মিলন ঘটে।

সাম্প্রতিকতম তাত্ত্বিক এবং বিদ্যাজাগতিক আলোচনার একটি বিষয় হিসেবে সাম্রাজ্যিক প্রেক্ষিতের প্রতিধ্বনি বয়ানে অবশ্যই অনুরণিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদ, পুনরুত্থানমূলক কিংবা নতুন, আঁঠার মত বয়ানের সাথে লেগে যায় ইতিহাসের কোন একটি ভাষ্যের কাঠামোকরণ, অঙ্গিভূতকরণ, কিংবা বর্জনকরণের লক্ষ্যে। বেনেডিক্ট এ্যান্ডারসনের *ইমেজিন্ড কম্যুনিটিজ* এই বিষয়টিকে আকর্ষণীয়ভাবে উপলব্ধি করিয়ে দেয়, একই কাজ করেন এরিক হব্‌সবম্‌ ও টেরেন্স রেঞ্জার সম্পাদিত *দি ইনভেনশান অফ ট্র্যাডিশন*এর বিবিধ ভাগীদারগণ। বৈধত্ব এবং স্বাভাবিকত্বদানশীলতা [normativeness]–উদাহরণস্বরূপ, সমসাময়িক আলোচনায় "সন্ত্রাসবাদ" এবং "মৌলবাদ"–সংকটের ধরনসমূহকে হয় বয়ান দান করেছে, কিংবা করে নি। আপনি যদি আফ্রিকা কিংবা এশিয়ার এক ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনকে "সন্ত্রাসবাদী" হিসেবে উপলব্ধি করেন তাহলে আপনি সেটির বয়ানগত ফলশ্রুতি [narrative consequence] অস্বীকার করেন, পক্ষান্তরে আপনি যদি সেটিকে বয়ানের মর্যাদা প্রদান করেন (যেমনটি নিকারাগুয়া কিংবা আফগানিস্তান) তাহলে আপনি সেটিতে প্রদত্ত করেন একটি পূর্ণাঙ্গ বয়ানের বৈধত্ব। অর্থাৎ, যেহেতু আমাদের মানুষজনকে স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে, সে কারণে তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়েছেন, অস্ত্রসজ্জিত হয়েছেন, যুদ্ধ করেছেন, মুক্তি অর্জন করেছেন; অন্য দিকে, অপর পক্ষের মানুষজন হচ্ছে লক্ষ্যবিহীন, দুর্বৃত্ত সন্ত্রাসী। এ কারণে, বয়ানসমূহ রাজনীতিগত এবং মতাদর্শগতভাবে হয় অনুমোদনপ্রাপ্তি লাভ করে, কিংবা করে না।[২০] তথাপি উত্তর-আধুনিকতাবাদ সংক্রান্ত এই অব্দি গড়ে ওঠা প্রকাণ্ড তাত্ত্বিক সাহিত্যভাণ্ডারে বয়ান হচ্ছে একটি বিতর্কের বিষয়, যেটি হাল আমলের রাজনৈতিক বাহাস প্রভাবান্বিত করে। জাঁ ফ্রাসোয়াঁ লিওতার্দের বক্তব্য হচ্ছে যে মুক্তি এবং আলোকময়তার দুটি প্রধান বয়ান তাদের বৈধতাদানকারী ক্ষমতা হারিয়েছে এবং এখন আরো ক্ষুদ্র স্থানিক বয়ান (*petits recits*) যেগুলোর বৈধতা প্রদানকারী ভিত্তি হচ্ছে কার্যকারিতা, তা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, এবং এটি হচ্ছে ব্যবহারকারীর স্বীয় স্বার্থে সংকেত ব্যবহারের যোগ্যতা যার লক্ষ্য [illegible] হাসিল করা।[২১] একটি সুন্দর সামালযোগ্য পরিস্থিতি, যেটি লিওতার্দ মোতা[illegible] সম্পূর্ণভাবে ঘটেছে ইউরোপীয় কিংবা পশ্চিমা কারণে: মহা বয়ান তাদের ক্ষমতা হারিয়েছে, বিষয়টি কেবলমাত্র এটিই। যদি এই রূপান্তরটিকে সাম্রাজ্যিক গতিশীলতে স্থাপন করে আরেকটু ব্যাপক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তাহলে

www.pathagar.com

লিওতার্দের যুক্তিতর্ক একটি ব্যাখ্যা [explanation] হিসেবে ধরা পড়ে না, বরং এটি ধরা পড়ে একটি লক্ষণ [symptom] হিসেবে। তিনি পশ্চিমা উত্তর-আধুনিকতাবাদকে অ-ইউরোপীয় বিশ্ব হতে বিযুক্ত করেন, উপনিবেশিত বিশ্বে ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদ–এবং আধুনিকীকরণের–ফলশ্রুতি হতে বিযুক্ত করেন।[২২] ফলত, উত্তর-আধুনিকতাবাদ, এটির উদ্ধৃতি, অতীত-আকৃতি, এবং অপৃথকীকরণের নন্দনতত্ত্ব সমেত নিজ ইতিহাস হতে মুক্ত হয়ে পড়ে, যার অর্থ হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের বিভাজন, সুস্পষ্ট শাস্ত্রীয় সীমানায় অনুশীলনের সীমাবদ্ধতা, এবং জ্ঞানের বিরাজনীতিকরণ মোটামুটিভাবে ইচ্ছামত ঘটতে পারে।

লিওতার্দের যুক্তিতর্কের লক্ষণীয় বিষয় এবং এটিই সম্ভবত সেটির ব্যাপক জনপ্রিয়তার হেতু হচ্ছে কিভাবে এটি মহাবয়ানের প্রধান চ্যালেঞ্জ, এবং কী কী কারণে সেগুলোর ক্ষমতা বর্তমানে প্রশমিত হয়েছে বলে মনে হয়, একে কেবলমাত্র ভুলভাবে পাঠ করে না, ভুলভাবে পরিবেশনও করে। এগুলো তাদের বৈধত্বকরণ বড় অংশেই হারায় আধুনিকতাবাদের সংকটের কারণে, যেটি নানাবিধ কারণে অবলোকনমূলক পরিহাসে নড়বড়ে কিংবা জড় হয়ে পড়ে, যার একটি হচ্ছে, খোদ ইউরোপে, যেটি সাম্রাজ্যিক পরিসরের উৎসস্থল, বিবিধ অন্যের বিব্রতকর আবির্ভাব। এলিয়ট, কনর‍্যাড, ম্যান, প্রুস্ট, উল্ফ, পাউন্ড, লরেন্স, জয়েস, ফর্স্টার-এর কাজে, অপরত্ব [alterity] এবং ভিন্নতা [difference] ধারাবাহিকভাবে অচেনা-অজানা মানুষের সাথে যুক্ত, যাঁরা হয়ত নারী কিংবা নেটিভ, কিংবা যৌন অনুসরণে খামখেয়ালি, প্রতিষ্ঠিত নগরীয় ইতিহাস, ধরনসমূহ, চিন্তন পদ্ধতি বিন্যাস করার লক্ষ্যে দৃশ্যপটে বিস্ফোরিত হন। এই চ্যালেঞ্জের প্রত্যুত্তরে আধুনিকতাবাদ এমন একটি সংস্কৃতির আনুষ্ঠানিক পরিহাস সমেত প্রতিক্রিয়া করে যেটি না পারে হ্যাঁ, আমাদের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেয়া উচিৎ বলতে, কিংবা না, তা সত্ত্বেও আমরা ধরে রাখব বলতে: একটি নিষ্ক্রিয় আত্ম-সচেতনমূলক অবলোকন নিজকে গঠন করে, যেমনটি জর্জ লুকাশ স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরিয়ে দেন, নান্দিকীকৃত ক্ষমতাহীনতার অসাড় ঈশারায়,[২৩] উদাহরণস্বরূপ, *এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়ার* পরিসমাপ্তিতে যেখানে ফর্স্টার লক্ষ্য করেন, এবং স্বীকার করেন এর পিছনের ইতিহাস, ডঃ আজিজ এবং ফিল্ডিং'য়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব–বৃটেন দ্বারা ভারতের বশীকরণ–কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি না বি-উপনিবেশকরণের পরামর্শ দিতে পারেন, না পারেন উপনিবেশকরণ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিতে। "না, এখনো না, এখানে না," ফর্স্টার প্রতিজ্ঞা হিসেবে কেবলমাত্র এটিই ব্যক্ত করতে পারেন।[২৪]

সংক্ষেপে বললে, ইউরোপ এবং পশ্চিমকে বলা হচ্ছিল অন্য-কে গাম্ভীর্যের সাথে গ্রহণ করতে। এটি, আমার মনে হয়, হচ্ছে আধুনিকতাবাদের মৌলিক ঐতিহাসিক সমস্যা। নিম্নবর্গ, এবং বিধিবদ্ধভাবে ভিন্ন মানুষজন, হঠাৎ একটি বিনাশকারী প্রকাশক্ষমতা অর্জন করেন ঠিক সেই ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে যেখানে পূর্বে, দাবিয়ে রাখার জন্য, নীরবতা এবং সম্মতির উপর নির্ভর করা যেত। ভেবে দেখুন আধুনিকতাবাদের পরবর্তী এবং আরো তিক্ত রূপান্তর যেটি চিত্রিত হয় আল্বার্ট কাম্যু এবং ফ্যানন, উভয়েরই আলজিরিয়া সংক্রান্ত লেখাতে। *La Peste* এবং *L'Etranger*, উভয় বইয়ের আরবগণ হচ্ছেন নাম-বিহীন সত্তা যাদের কাম্যু পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেন ভবিষ্যতের ইউরোপীয়

www.pathagar.com

অধিবিদ্যার পূর্বলক্ষণ আবিষ্কার করার লক্ষ্যে, যিনি, আমাদের স্মরণ করতে পারা উচিৎ, তাঁর *Chronique algerienne*'তে আলজেরীয় জাতিত্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।[২৫] (কাম্যুর সাথে বর্দুকে, যিনি লিখেছেন *আউটলাইন অফ এ থিওরি অফ প্র্যাক্টিস*, যেটি সম্ভবত সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞানের সবচাইতে প্রভাবশালী তত্ত্বীয় গ্রন্থ, যেটি উল্লেখ করে না ঔপনিবেশিকতাবাদ, আলজেরিয়া, এবং ইত্যাদি, যদিও তিনি অন্যত্র লিখছেন আলজেরিয়ার কথা, তুলনা করা কি খুব বেশী অবাস্তব হবে? *আউটলাইন*-এ বর্দুর তত্ত্ব নির্মাণ এবং জাতিতাত্ত্বিক ভাবনাচিন্তায় আলজেরিয়ার বর্জন হচ্ছে লক্ষণীয়)। পক্ষান্তরে, ফ্যানন ইউরোপের উপর, যেটি "ঘুমন্ত সুন্দরীর দায়িত্বজ্ঞানহীন খেলা"র ["le jeu irresponsable de la belle au bois dormant"] ভূমিকায়রত, সেটির উপর জোরপূর্বকভাবে চাপিয়ে দেন একটি উদ্ভূত-হওয়া প্রতি-বয়ান [counternarrative], জাতির স্বাধীনতা অর্জনের প্রক্রিয়া।[২৬] তিক্ততা এবং হিংস্রতা সত্ত্বেও ফ্যাননের কাজের সামগ্রিক লক্ষ্য হচ্ছে ইউরোপীয় নগরকে একত্রে ভাবতে বাধ্য করা নিজ ইতিহাসের সাথে উপনিবেশের ইতিহাসকে, যা সাম্রাজ্যিক আধিপত্যের নিষ্ঠুর অসাড়তা এবং বিকৃত গতিহীনতা হতে জাগ্রত হচ্ছে, এইম সেজেয়া'র বাক্য মোতাবেক, "ভোগান্তির চৌহদ্দি দ্বারা মাপযোগ্য" [["measured by the compass of suffering"]]।[২৭] নিঃসঙ্গ, এবং ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার জন্য প্রাপ্য স্বীকৃতি না দেয়াতে, ফ্যানন বলেন, আলোকময়তা এবং মুক্তির পশ্চিমা বয়ানসমূহ প্রকাশিত হয় বাতাসী কপটতা হিসেবে; এভাবেই, তিনি বলেন, গ্রীক-লাতিনীয় বেদী ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে।

আমরা, আমার বিশ্বাস, ফ্যাননের অন্তর্ভুক্তিকারী দৃকশক্তির চূর্ণবিচূর্ণকারী নতুনত্বকে–যেটি হচ্ছে সেজেয়া'র *Cahier d'un retour au pays natal* এবং লুকাশের *History and Class Consciousness*' দুর্দান্ত সংশ্লেষণ–সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা প্রমাণিত করব যদি আমরা জোরারোপ না করি, যেমনটি তিনি করেছিলেন, বি-উপনিবেশকরণের প্রক্রিয়ায় মিশ্রিত হতে হবে ইউরোপ এবং সেটির উচ্চতর ক্ষমতাকেন্দ্র। সেজেয়া এবং সি এল আর জেমস'এর মতনই ফ্যাননের সাম্রাজ্য-উত্তর পৃথিবীর মডেল নির্ভর করে মানব জাতির একটি সামষ্টিক'সহ বহুবিধ ভাগ্যের উপর, পশ্চিমা ও অ-পশ্চিমা, উভয়েরই। সেজেয়া যেমন বলেন, "এবং মানুষের অতিক্রম করতে হবে সকল নিষেধাজ্ঞা যা তার উত্তাপের খাঁজে লুকানো এবং সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা, শক্তিমত্তার উপর কোন নরবর্ণের একচেটিয়া দখল নেই/এবং বিজয়ের সমাবর্তনে সকলের জন্য রয়েছে স্থান"।[২৮]

তথাপি: সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস যে প্রেক্ষিত প্রদান করে সেটির সাহায্যে বয়ানগুলো নিয়ে ভাবুন, সে ইতিহাস যেটির ভিত্তিরূপদানকারী দ্বন্দ্ব শ্বেতাঙ্গ ও অ-শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে মুক্তির নতুন এবং অধিকতর অন্তর্ভুক্তিকারী প্রতি-বয়ানে বীণার মত ভেসে উঠেছে। এটি, আমি বলব, হচ্ছে উত্তর-আধুনিকতাবাদের পূর্ণাঙ্গ পরিস্থিতি, যেটির জন্য লিওতার্দের বিস্মৃতিমূলক দৃকশক্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যাপৃত নয়। আবারো, পরিবেশন হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ, কেবলমাত্র বিদ্যাজাগতিক কিংবা তাত্ত্বিক উভসঙ্কটের কারণে নয় বরং একটি রাজনৈতিক বাছাই হিসেবে। নৃবিজ্ঞানী কিভাবে তাঁর শাস্ত্রীয় পরিস্থিতি পরিবেশন করেন সেটি এক পর্যায়ে অবশ্যই স্থানিক, ব্যক্তিক ও পেশাজীবিতার সন্ধিক্ষণের বিষয়। কিন্তু বাস্তবে এটি [পরিবেশন] হচ্ছে একটি সমগ্রতার অংশ, নিজ সমাজের, যেটির আকৃতি ও

প্রবণতা নির্ভর করে পুঞ্জীভূত হ্যাঁ-সূচক, কিংবা নিবৃত্তিকারী, এবং বিরুদ্ধ ভারের বাছাইসমূহের পূর্ণাঙ্গ পরম্পরার উপর। আমরা যদি বাগাড়ম্বিতায় আমাদের ক্ষমতাহীনতা কিংবা অকার্যকরতা অথবা উদাসীনতার জন্য আশ্রয় খুঁজি তাহলে আমাদের স্বীকার করতে প্রস্তুত হতে হবে যে এ ধরনের বাগাড়ম্বিতা চূড়ান্তভাবে একটি, কিংবা অপর প্রবণতার, ভাগীদার হয়। বিষয়টি হলো যে নৃবৈজ্ঞানিক পরিবেশন যেমন পরিবেশনকারীর জগতে, আবার তেমনি কী বা কে পরিবেশিত হচ্ছে, তার উপরও প্রভাব ফেলে।

আমার মনে হয় না যে ফ্যাননে এবং সেজেয়ার, এবং তাঁদের মতন অন্যদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়াটা ঘটেছে; এমনটিও নয় যে আমরা তাঁদেরকে গাম্ভীর্যের সাথে, সমসাময়িক বিশ্বের মনুষ্য মডেল, কিংবা পরিবেশন হিসেবে গ্রহণ করেছি। বাস্তবে, ফ্যানন এবং সেজেয়ার– আমি অবশ্য তাঁদের কথা বলছি ধরন হিসেবে–পরিচিতি [identity], এবং পরিচিতি-ঢঙ্গীয় ভাবনার [identitarian thought] প্রশ্নে সরাসরি খোঁচা মারেন, যেটি "অন্যতা" এবং "ভিন্নতা" নিয়ে বর্তমান নৃবৈজ্ঞানিক ভাবনা-চিন্তার গোপন ভাগীদার। তাঁদের অনুগামীদের নিকট ফ্যানন এবং সেজেয়ার চেয়েছিলেন, এমন কি সংঘাতের উত্তাপময় মুহূর্তগুলোতেও, প্রতিষ্ঠিত পরিচিতি বিষয়ে অনড় ধারণার, এবং সাংস্কৃতিকভাবে কর্তৃত্বভুক্ত সংজ্ঞায়নের, পরিত্যাজ্যতা। ভিন্ন হও, তাঁরা বলেন, যাতে উপনিবেশিত মানুষজন হিসেবে তোমাদের ভাগ্য ভিন্ন হতে পারে; এ কারণে জাতীয়তাবাদ, সেটির আপাতদৃষ্ট প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও, হচ্ছে শত্রু। আমি জানি না নৃবিজ্ঞানের পক্ষে নৃবিজ্ঞান হিসেবে থেকেই ভিন্ন কিছু হওয়া সম্ভব কি না, অর্থাৎ, নিজকে বিস্মৃত করে সাম্রাজ্যবাদ এবং সেটির প্রতিপক্ষদের দ্বারা যুদ্ধের আহ্বানে প্রতিক্রিয়া করে অন্য কিছু হওয়া। নৃবিজ্ঞানকে আমরা যেভাবে জেনেছি হয়ত সেটি সাম্রাজ্যিক বিভাজনের কেবলমাত্র একটি দিকেই টিকে থাকতে পারে, আধিপত্য এবং হেজেমনির সঙ্গী হিসেবে।

অপর পক্ষে, সমসাময়িক কিছু নৃবৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা যেগুলো সমালোচনামনস্কভাবে সংস্কৃতির ধারণার আদ্যপ্রান্ত পুনর্নিরিখ করে সেগুলো হয়তবা ভিন্ন কাহিনী বলা শুরু করেছে। আমরা যদি সংস্কৃতি, এবং সেটির সাথে তার অনুগামীদের সম্পর্ককে সম্পূর্ণভাবে সন্নিহিত, পুরোপুরিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সামগ্রিকভাবে মানানসই হিসেবে না দেখে এটিকে ভাবি প্রবেশ্য হিসেবে, এবং সার্বিকভাবে, রাজনৈতিক এককের মধ্যকার প্রতিহতকারী সীমারেখা হিসেবে, তাহলে পরিস্থিতি অধিকতর ইতিবাচক মনে হতে পারে। তথাপি অন্য-কে তত্ত্ববিদ্যাগতভাবে তেমনটাই-থাকবে [ontologically given] হিসেবে না দেখে বরং ঐতিহাসিকভাবে বিধিবদ্ধ হিসেবে দেখলে ক্ষয় হয়ে যাবে আমাদের সেই বর্জনকারী পক্ষপাতিত্ব যা আমরা সংস্কৃতিতে আরোপ করি, সর্বোপরি নিজ সংস্কৃতিতে। সংস্কৃতি তাহলে পরিবেশিত হতে পারে নিয়ন্ত্রণ কিংবা পরিত্যাগ, স্মৃতি কিংবা বিস্মৃতি, বলপ্রয়োগ কিংবা নির্ভরশীলতা, বর্জনকারী কিংবা অংশীদারী পরিসর হিসেবে, এসবই ঘটছে বৈশ্বিক ইতিহাসে যেটি হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশ।[২৯] নির্বাসন, অভিবাসন এবং সীমানা পার হওয়া হচ্ছে অভিজ্ঞতাসমূহ যেগুলো আমাদের নতুন বয়ানমূলক ধরন, কিংবা জন বার্জারের বাক্যানুসারে, বলার অন্য পথ, প্রদান করতে

পারে। এ ধরনের নতুন চলন আরো সহজে অনন্য দৃকশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যেমন কি না জঁা জেনে, কিংবা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ইতিহাসবিদ যেমন ব্যাজিল ডেভিডসন, যাঁরা জাতিগতভাবে নির্মিত প্রতিবন্ধকতাসমূহকে নির্লজ্জভাবে পারাপার এবং লঙ্ঘন করেন, তাঁদের নিকট পেশাজীবী নৃবিজ্ঞানীদের তুলনায় আরো সহজে প্রাপ্তিযোগ্য কিনা, সেটি আমার বলতে পারার বিষয় নয়। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হলো, এমন ধরনের উদাহরণের প্ররোচিত করার ক্ষমতা মানব বিদ্যা এবং সমাজ বিজ্ঞানের জন্য চমকপ্রদভাবে প্রাসঙ্গিক যেহেতু তারা সাম্রাজ্যের প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা নিয়ে সংগ্রামরত।

Edward W. Said, "Representing the Colonized: Anthropology's Interlocutors," *Critical Inquiry* 15 (Winter 1989). এটি সম্প্রতি Edward W. Said, *Reflections on Exile and Other Literary and Cultural Essays*, New Delhi: Penguin Books, 2001এ পুনপ্রকাশিত হয়েছে।

অনুবাদকের টীকা: উপরের তরজমায় চারকোণ-বিশিষ্ট ব্র্যাকেট হচ্ছে অনুবাদকের সংযোজন, রিচার্ড ফক্স এবং ১৪ নং পৃষ্ঠায় এইম সেজেয়া'র উদ্ধৃতাংশ বাদে। লেখক এবং অনুবাদক, উভয়েরই, চারকোণ-বিশিষ্ট ব্র্যাকেটের ব্যবহার পৃথক রাখার লক্ষ্যে আমি দুটো স্থানে, এডওয়ার্ড সাঈদের "একটি" চারকোণ-বিশিষ্ট ব্র্যাকেটকে "দুটো" করেছি।

প্রথমেই ড: জহির আহমেদকে ধন্যবাদ জানাই যাঁর কারণে এই লেখার প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষিত হয়েছে । লেখাটির শীর্ষে এইম সেজেয়া'র ফরাসী কাব্যের উদ্ধৃত অংশের অনুবাদে সাহায্য করেছেন শাহেদ রহমান এবং দিলরুবা করিম। তাঁদেরকে ধন্যবাদ। প্রবন্ধের বাকি অংশের ফরাসী অনুচ্ছেদ, বাক্য, শব্দ অনুবাদ করেছেন এক তুনিশীয় দম্পতি: মব্রিয়া আবিদি এবং লুৎফি জিতুন। তাঁদের অকুণ্ঠ সাহায্যপরায়ণতায় আমি কৃতার্থ, এবং আবারো দিলরুবা করিমকে ধন্যবাদ জানাই যিনি এই যোগাযোগে ঘটক হিসেবে কাজ করেছেন। "ইন্টারলকিউটার" শব্দটির অর্থোদ্ধারে সাহায্য করেছেন নিশিতা রেজা ইসলাম ও খাদেম-উল-ইসলাম। তাঁদেরও ধন্যবাদ। মানস চৌধুরী এবং সায়দিয়া গুলরুখ বরাবরের মত অনুবাদের কাজে উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং ধৈর্য্য সহকারে আমার ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

তথ্যসূত্র

১. দেখুন Frantz Fanon, *The Wretched of the Earth*, অনুবাদ Constance Farrington (New York, 1966), এবং Albert Memmi, *The Colonizer and the Colonized*, অনুবাদ Howard Greenfield (New York, 1965).

২. দেখুন Carl E. Pletsch, "The Three Worlds, or the Division of Social Scientific Labor, circa 1950 – 1975," *Comparative Studies in Society and History* 23 (Oct. 1981): 565 – 90. দেখুন Peter Worsley, *The Third World* (Chicago, 1964).

৩. দেখুন Fanon, *The Wretched of the Earth*, p. 101.

৪. দেখুন Eqbal Ahmad, "From Potato Sack to Potato Mash: The Contemporary Crisis of the Third World," *Arab Studies Quarterly* 2 (Summer 1980): 223 – 34; Ahmad, "Post-Colonial Systems of Power," *Arab Studies Quarterly* 2 (Fall 1980): 350 – 363; Ahmad, "The Neo-Fascist State: Notes on the Pathology of Power in the Third World," *Arab Studies Quarterly* 3 (Spring 1981): 170 – 180.

৫. দেখুন *Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Movement in the*

www.pathagar.com

Human Sciences. সম্পাদিত, George E. Marcus এবং Michael M. J. Fischer (Chicago. 1986), *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*, সম্পাদিত, James Clifford এবং Marcus (Berkeley and Los Angeles. 1986).

৬. Richard Fox, *Lions of the Punjab: Culture in the Making* (Berkeley and Los Angeles, 1985), p. 186.

৭. দেখুন, উদাহরণস্বরূপ, Sherry B. Ortner, "Theory in Anthropology Since the Sixties," *Comparative Studies in Society and History* 26 (Jan. 1984): 126 - 166.

৮. দেখুন *Anthropology and the Colonial Encounter* সম্পাদিত Talal Asad (London, 1973); Gerard Leclerc, *Anthropologie et colonialisme: essai sur l'historie de l'africanisme* (Paris, 1972); এবং *L'Observation de l'homme: une histoire des enquetes sociales* (Paris, 1979); Johannes Fabian, *Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object* (New York. 1983).

৯. দেখুন Ortner, "Theory in Anthropology Since the Sixties," pp. 144 – 60.

১০. Marcus এবং Fischer, *Anthropology as Cultural Critique*, পৃ: ৯ এবং এপরবর্তী, জ্ঞানতত্ত্বের উপর জোরারোপ অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

১১. James Clifford, "On Ethnographic Authority," *Representations* I (Spring 1983): 142.

১২. Jurgen Golte, "Latin America: The Anthropology of Conquest," দেখুন *Anthropology: Ancestors and Heirs*, সম্পাদিত, Stanley Diamond (The Hague, 1980), p. 391.

১৩. Jonathan Friedman, "Beyond Otherness or: The Spectacularization of Anthropology," *Telos* 71 (1987). 161 – 70.

১৪. Defense Science Board, *Report of the Panel on Defense: Social and Behavioral Sciences* (Williamstown, Mass., 1967).

১৫. আমি এটি আমার *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World* (New York. 1981) আলোচনা করেছি। আরো দেখুন, "The MESA Debate: The Scholars, the Media and the Middle East," *Journal of Palestine Studies* 16 (Winter 1987): 85 – 104.

১৬. দেখুন *Blaming the Victims: Spurious Scholarship and the Palestinian Question* সম্পাদিত, Edward W. Said এবং Christopher Hitchens (London, 1988), pp. 97 – 158.

১৭. Richard Price, *First-Time: The Historical Vision of an Afro-American People* (Baltimore, 1983), pp. 6, 23.

১৮. James C. Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (New Haven, Conn., 1985), pp. 278 – 350. আরো দেখুন, Fred R. Myers, "The Politics of Representation: Anthropological Discourse and Australian Aborigines," *American Ethnologist* 13 (Feb. 1986): pp. 138 - 153.

১৯. দেখুন George W. Stocking, Jr., Victorian Anthropology (New York, 1987), এবং Curtis M. Hinsley, Jr. *Savages and Scientists: The Smithsonian Institution and the Development of American Anthropology, 1846 – 1910* (Washington D C 1981).

২০. দেখুন Said, "Permission to Narrate," *London Review of Books* (16 – 29 Feb. 1984): 13 – 17.

২১. দেখুন Jean-Francois Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, অনুবাদ Geoff Bennington এবং Brian Massumi. *Theory and History of Literature*, vol. 10 (Minneapolis, 1984), pp. 23 - 53.

২২. দেখুন Irene L. Gendzier, *Managing Political Change: Social Scientists and the Third World* (Boulder, Colo., 1985).

২৩. Georg Lukacs, *History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics*, অনুবাদ Rodney Livingstone (London. 1971), pp. 126 – 34.

www.pathagar.com

২৪. এই যুক্তিতর্ক আমার প্রকাশিতব্য *Culture and Imperialism* (New York, 1989)'এ আরো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

২৫. Albert Camus, *Actuelles, III: Chronique algerienne, 1939 – 1958* (Paris, 1958), p. 202. "আরব দাবি মেটানোর প্রতি আমরা যতই সম্মত থাকি না কেন, তা সত্ত্বেও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে আলজিরিয়ার জাতীয় স্বাধীনতার ভাবনা একান্তভাবে কাল্পনিক। (এখন পর্যন্ত) কোন আলজিরীয় জাতি গঠিত হয়নি। ইহুদী, তুর্কী, গ্রীক, ইতালীয়, বারবার, সকলেরই এই অপ্রকৃত হলেও ক্ষেত্রবিশেষে প্রকৃত বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য এই জাতিটিকে দাবী করার সমান অধিকার রয়েছে।"

২৬. Fanon, *Les Damnes de la terre* (Paris, 1976), p. 62.

২৭. Aime Cesaire, Cahier d'un retour au pays natal [Notebook of a Return to the Native Land], *The Collected Poetry*, trans. Clayton Eshleman and Annette Smith (Berkeley and Los Angeles, 1983), pp. 76, 77.

২৮. প্রাগুক্ত।

২৯. Raymond Williams, Problems in Materialism and Culture: Selected Essays (London, 1980), pp. 37 - 47.

সমাজ নিরীক্ষণ, নং-৮৪, আগস্ট '০২

www.pathagar.com

সার্ত্রের সঙ্গে আমার বিরোধ

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ

অনুবাদ : সারফুদ্দিন আহমেদ

বিশ্বখ্যাত বুদ্ধিজীবী জ্যঁ-পল সার্ত্রে সমস্ত বিশ্ববাসীর দৃষ্টি থেকে আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনীতির প্রতি তার অন্ধ সমর্থনের কারণে ১৯৮০ সালে তার মৃত্যুর পর থেকেই তিনি সমালোচকদের আক্রমণের শিকার হন। এমনকি তার প্রচারিত "হিউম্যানিস্ট এক্সিসটেনশিয়ালিজম (দিনেমার দার্শনিক কিয়েৰ্কে গার্ড থেকে উদ্ভূত এবং সার্ত্রে কর্তৃক প্রচারিত মতবাদ যার মূলমন্ত্র হলো নির্লিপ্ত ও প্রতিকূল বিশ্বে মানুষ এক নিঃসঙ্গ প্রাণী যে নিজকর্মের জন্য দায়ী এবং নিজ নিয়তি নির্ধারণের ব্যাপারে স্বাধীন) ও আশাবাদ, স্বেচ্ছাসেবা ও পারস্পারিক মুক্তি বিনিময় প্রক্রিয়া সমর্থন করার কারণে উপহাসের খোরাক হচ্ছিল। সার্ত্রের সমস্ত শিল্পকর্ম অশ্লীলতার অভিযোগে প্রত্যাখ্যান করেছে মূলত দুই শ্রেণীর মানুষ। এদের মধ্যে একদল হলো নব্যধনী শ্রেণীর চার্বাক দর্শনবাদী যাদের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্রবিরোধী মতবাদকে উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকৃষ্ট করা এবং আরেক দল হলো আদর্শচ্যুত পোস্ট স্ট্রাক্‌চারালিস্ট ও পোস্টমডার্নিস্ট যারা সার্ত্রের জনগণকেন্দ্রীক রাজনীতিকে সচেতনভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছিল। উপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, নাট্যকার, আত্মজীবনীকার, দার্শনিক, রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি এত বিস্তৃত কাজ করেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ তাকে গ্রহণ করার বদলে যেন প্রত্যাখ্যান করেছে অনেক বেশি। গত ২০ বছরে সার্ত্রের লেখা পঠিত হয়েছে খুবই কম আর তাকে নিয়ে যতটুকু আলোচনা হয়েছে তা তার পাণ্ডিত্যের তুলনায় একেবারেই নগণ্য।

আলজেরিয়া ও ভিয়েতনামে এক সময় তার যে অবস্থান ছিল এখন তা মানুষ একেবারেই ভুলে গেছে।

১৯৬৪ সালে প্যারিসে ছাত্রদের মাওবাদী সংগ্রামের সময় নির্যাতিত মানুষের পক্ষে তার অবদান এবং তার সাহিত্যিক বিক্ষোভ (যে কারণে তিনি সাহিত্যে নোবেল পেয়েও তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন)-এর ইতিহাস সবই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর কিছুদিন আগেই তিনি একমাত্র এ্যাংলো আমেরিকান বিশ্ব ছাড়া সর্বত্রই একজন ক্ষতিকর, 'অপকারী' এক্স-সেলিব্রেটিতে পরিণত হয়েছিলেন। এ্যাংলো আমেরিকান বিশ্বের মানুষের কাছে তিনি কখনোই দার্শনিক হিসেবে পরিচিতি পাননি। একজন উপন্যাসিক,

www.pathagar.com

আত্মজীবনীকার হিসেবেই তারা তাকে কিছুটা গ্রহণ করেছিল। একজন অধপতিত লেখকের মতো তারা তাকে মূল্যায়ন করেছিল এবং আলফ্রেড কামু'র চেয়ে তাকে নিম্নশ্রেণীর লেখক হিসেবেই গণ্য করতো।

পুরোনো ফ্যাশন নতুনভাবে ফিরে আসার মতো কিছুদিন আগে ফ্রান্সে সার্ত্রের পুনরুত্থান হয়েছিল। তার ওপরে বেশ কয়েকটি বই বেরিয়েছিল এবং কিছু সময়ের জন্য তিনি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন কিন্তু সে সময়টার স্থায়ীত্ব হয়েছিল খুবই কম। ওইসময় তাকে নিয়ে সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবী মহলে খানিক আলোচনাই হয়েছে কিন্তু তার লেখা সে সময় খুব একটা পঠিত হয়নি। আমার প্রজন্মের লেখক সাহিত্যিকদের কাছে সার্ত্রে বিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্টেলেকচুয়াল হিরো হিসেবে সমাদৃত হবে আসছেন। আমার সময়ের লেখকদের কাছে তিনি হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব যার দূরদর্শীতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপহারগুলো আমাদের সময়ের যে কোনো প্রগতিশীল কাজের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। তারপরও সার্ত্রের কাজ ও মতবাদ এখন সবার কাছে না অভ্রান্ত না ভাববানীপূর্ণ। অবশ্য সম্প্রতি একজন বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে সহায়তা করার জন্য এবং রাজনৈতিক সংকটের সময় জনগণকে একত্রিত ও সংহতিপূর্ণ অবস্থানে আনবার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা চালানোর জন্য সার্ত্রের বেশ প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন সার্ত্রে যাই লিখতেন তাই পাঠককে আকৃষ্ট করতো কারণ তার লেখায় এক অসাধারণ শক্তি ও বিরুদ্ধস্রোতের ধৃষ্টতা রয়েছে।

হ্যাঁ তার লেখায় অবশ্যই একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সে বিষয়ে একটু বলতে চাই। ১৯৬৭ সালের গোড়ার দিকে সার্ত্রের মিশর সফর (গত মাসে সাপ্তাহিক আল আহরাম পত্রিকায় ওই সফরের বিবরণ ও সেখানে তার আলোচনার ব্যাপারে লেখালেখি হয়েছে) এবং সেখানে তার দেওয়া বক্তৃতার ওপর দু'জনের সমালোচনা আমাকে এ বিষয়ে বলতে আগ্রহী করেছে। এ দুজনের একজন হলেন বার্নার্ড হেনরী লেভি যিনি সম্প্রতি তার প্রকাশিত একটি বইয়ে সার্ত্রের ওই মিশর সফরের সমালোচনা করেছেন। আরেকজন হলেন প্রয়াত মিশরীয় বুদ্ধিজীবী লতফি আল খোলি। তিনিও তার একটি বইয়ে সার্ত্রের মিশর সফরের কথা লিখেছেন। সার্ত্রের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ও একান্ত পরিচয়ের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু এ সাক্ষাৎ ছিল কাব্যিক এবং বিশেষ তাৎপর্যময়।

সময়টা ১৯৭৯'র জানুয়ারি। খুব ভোরে নিউ ইয়র্কের বাড়িতে বসে একটা ক্লাসে লেকচার দেবার পূর্ব প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ডোরবেল বাজতেই দরজা খুলে দেখি আমার নামে একটা টেলিগ্রাম। খাম ছিঁড়ে দেখি সেটি এসেছে প্যারিস থেকে। ভেতরে লেখা, '*লেস টেমপ্স মডার্নস*' নামের একটি জর্নালের উদ্যোগে প্যারিসে মধ্যপ্রাচ্যশান্তি বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে এ বছরের ১৩ ও ১৪ মার্চ। আপনাকে ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সত্ত্বর জবাব দিন। ইতি সাইমন ডি বেভোয়ার এবং জ্যঁ পল সার্ত্রে।"

প্রথমে ভেবেছি তারযন্ত্রের মুদ্রণপ্রমাদ হয়তো আমার সঙ্গে ঠাট্টা মশকরা করেছে। আমি বড়জোর কোসিমা ও রিচার্ড ওয়েগণারের পক্ষ থেকে বৈরুৎ বেড়াতে যাবার– আমন্ত্রণপত্র পাবার আশা করতে পারি অথবা টিএস এলিয়ট ও ভার্জিনিয়া উলফ তাদের ডায়ালের অফিসে এক সন্ধ্যা কাটিয়ে আসার জন্য এ অধমকে ডাকতে পারে। নিউইয়র্কে ও প্যারিসে বসবাসরত আমার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে টেলিগ্রামে পাঠানো

আমন্ত্রণপত্রের সত্যতা আবিষ্কারের জন্য আমার টানা দুদিন সময় লেগেছে। তাদের কাছ থেকে শুনে যখন নিশ্চিত হলাম যে নিমন্ত্রণপত্রটি ঠিক জায়গা থেকেই এসেছে তখন তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণের খবর পাঠাতে আমার আর দেরী হলো না। (পরে জেনেছি আমার প্যারিস যাবার রাহাখরচ দিয়েছিল লেস মোডালিটেস যেটি পল সার্ত্রের প্রতিষ্ঠিত টেমপ্স মডার্নস জর্নালেরই একটি শাখা সংগঠন)। তার এক সপ্তা পরেই আমি প্যারিসের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। *'লেস টেমপ্স মডার্নস'* প্যারিসে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকা পালন করেছিল এবং পরবর্তীতে এ পত্রিকাটি ইউরোপের এবং তৃতীয় বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সার্ত্রে বহু পণ্ডিত ব্যক্তিদের তার চারপাশে জড়ো করতে সক্ষম হয়েছিলেন যাদের অনেকেই মতাদর্শের বিরোধী ছিলেন। তারা তার বিরোধী হলেও সার্ত্রেকে তারা সমীহ করতেন। এদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং সাইমন ডি বেভোয়ার, প্রখ্যাত দার্শনিক রেমন্ড এ্যারোন, সার্ত্রের সহপাঠী মাউরিস মার্লিড পন্টি, জাতীবিজ্ঞানী মাইকেল লিরিস প্রমুখ। কোন বড় ধরনে আন্তর্জাতিক ইস্যুই এই জর্নালের দৃষ্টি এড়াতো না। ১৯৬৭ সালে আরব ও ইসরাইলিদের মধ্যকার যুদ্ধ নিয়ে 'লেস টেমপ্স মডার্নস' ঢাউস সাইজের একটি সংস্করণ বের করেছিল। ওই সংখ্যায় আই এফ স্টোনের লেখা আরব-ইসলাইল যুদ্ধ বিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। আমার প্যারিস যাত্রার পেছনে ওই প্রবন্ধ বড় ধরনের প্রেরণা যুগিয়েছিল। প্যারিসে পৌঁছানো মাত্র বেভোয়ার এবং সার্ত্রের পাঠানো একটি ছোট চিরকুট পেলাম। তারা তখন আমার জন্য লাতিন কোয়ার্টারে ভাড়া করা হোটেল কক্ষে অপেক্ষা করেছিলেন। চিরকুটে লেখা "নিরাপত্তাজনিত কারণে মিশেল ফুকোর বাড়িতে নির্ধারিত মিটিং অনুষ্ঠিত হবে।" আমাকে যথাসময়ে ফুকোর বাড়ির ঠিকানা দেওয়া হলো এবং পরদিন সকাল ১০ টায় তার এ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে দেখি লোকজন তেমন নেই এবং সার্ত্রেও অনুপস্থিত। কোন কারণে আমাদের আলোচনাস্থল বদলানো হলো এবং সেই রহস্যময় নিরাপত্তা জনিত কারণ"টাই বা কি সে বিষয়ে কেউই কিছু বলতে পারল না। বেভোয়ার তার বিখ্যাত টুপি মাথায় দিয়ে অনেক লোকজনের মধ্যে বসে আছেন এবং কেট মিলেটের সঙ্গে ইরানে কাটানো দিনগুলোর স্মৃতিচারণমূলক বক্তৃতা দিচ্ছেন। আমি যতদূর জানি তারা একসময় ইরানের সরকার বিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। ওই আন্দোলনের বিষয়ে কিছু বলেন কিনা তা শোনার জন্য কানা খাড়া করে রইলাম। কিন্তু সে আলোচনার ধার দিয়েও তিনি গেলেন না। তারপর ঘণ্টাখানিক বা তার কিছু বেশি সময় পরে (সার্ত্রে আসার কিছুক্ষণ আগে) বেভোয়ার বেরিয়ে গেলেন এবং ওইদিন আর এলেন না।

ফুকো কিছুক্ষণবাদেই আমাকে জানালেন যে সেমিনারে তার বলার তেমন কিছুই নেই এবং প্রতিদিনকার মতো তিনি তখন তার 'বিবলিওথেক ন্যাশনাল রিসার্চ' হাউসে যাবেন। তার টেবিলের এক কোনায় সংবাদপত্র ও জার্নালের গাদার ওপরে আমার লেখা *'বিগিনিংস'* বইটা দেখে ভালোই লাগল।

যদিও সে সময় বেশ আন্তরিকভাবেই তার সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি কেন ফুকো মধ্যপ্রাচ্যেরে রাজনীতির ব্যাপারে কোন কথা বলতে চাননি। ১৯৮৪ সালে তার মৃত্যুর এক দশক পরে এর কারণ কিছুটা হলেও জেনেছি। ফুকোর দুই বন্ধু

লেখক দিদিয়ার এরিবোন এবং জেমস মিলার তাদের আত্মজীবনীতে লিখেছেন ১৯৬৭ সালে তিউনিসিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন এবং জুন মাসে যুদ্ধ শেষ হবার পরপরই সেখান থেকে চলে আসেন। মিশেল ফুকো বলেছিলেন, ইসরাইলের কাছে বৃহত্তর আরবভূমি পরাজিত হবার কারণে সেখানকার জনগণের মধ্যে এন্টিসেমিটিক ও এন্টি ইসরাইল সেন্টিমেন্ট পয়দা হয় এবং যেহেতু তিনি ইসরাইলের সমর্থক ছিলেন সেহেতু তার ওপর যে কোন সময় হামলা হতে পারে– এ ভয় থেকেই তিনি তিউনিশিয়া থেকে চলে আসেন। কিন্তু ১৯৯০ সালে তিউনিশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের একজন অধ্যাপিকা ও ফুকোর সহকর্মী– আমাকে অন্য একটি তথ্য দিলেন। তিনি বললেন, ফুকোর সঙ্গে তার কয়েকজন ছাত্রের সমকামী সম্পর্ক ছিল এবং এ সম্পর্কের কথা প্রকাশিত হবার পরই তিনি তিউনিশিয়া ছেড়ে আসতে বাধ্য হন। অবশ্য আমি এখনো জানি না কোনটা সত্যি।

প্যারিস সেমিনারের সময় ফুকো জানিয়েছিলেন তিনি মাত্র কয়েকদিন আগে তার ইরানের সাময়িক আবাস থেকে প্যারিস এসেছেন। ইরানে তখন তিনি 'কোরিয়ার ডেলা সেরা'র বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বপালন করছিলেন। ৬৭'র ইসলামী বিপ-বের প্রথম দিকের দিনগুলো সম্পর্কে ফুকোকে বলতে শুনেছি, "ভেরি এক্সাইটিং, ভেরি স্ট্রেঞ্জ, ক্রেজি"। আমার মনে হয় আমি তাকে বলতে শুনেছি (হয়তো ভুল করে বলে ফেলেছেন) যে তিনি তেহরানে পরচুলা লাগিয়ে ছদ্মবেশ ধরে থাকতেন। সে সময় তার লেখা প্রতিবেদনগুলো প্রকাশ পাবার পর ইরানের সকল বিষয়কেই তিনি এড়িয়ে চলতেন। ১৯৮০ সালে গিলেজ দালিউজ আমাকে জানালেন তিনি এবং ফুকো এক সময়ের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ফিলিস্তিন সংকট প্রশ্নে এই দুই বন্ধুর মধ্যে বিরোধ ছিল। ফুকো সমর্থন করতেন ইসরাইলিদের এবং দালিউজ ফিলিস্তিনিদের সমর্থন করতেন।

ফুকোর এ্যাপার্টমেন্টটি ছিল লম্বা, বেশ বড়সড়ো এবং বাড়াবাড়ি ধরনের আরামদায়ক। ঘরের দেয়ালগুলোর চোখ ধাঁধানো রজতশুভ্র রং। সংসার বিচ্ছিন্ন দার্শনিক ও চিন্তাবিদের জন্য উপযুক্ত আবাসস্থল। সেমিনারে কয়েকজন ফিলিস্তিনি এবং ইসরাইলি ইহুদীকে দেখলাম। ওদের মধ্যে শুধু ইব্রাহিম দাক্কাককে চিনতে পারলাম। দুই ঘনিষ্ট বন্ধুর মাধ্যমে দাক্কাকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। একজন হলেন জেরুজালেমের বিরজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাফিজ নাজাল এবং আরেকজন ইসরাইলিদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত বিশেষজ্ঞ ইয়েহোশোফাত হারকাবি। হারকাবি ইসরাইলের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ছিলেন এবং ভুলক্রমে একবার ইসরাইলি আর্মিকে সতর্ক সংকেত দেওয়ার জন্য তাকে বরখাস্ত করা হয়। বছর তিনেক আগে আমি আর দাক্কাক স্ট্যান্ডফোর্ড সেন্টারে বিহেভিওরাল সায়েন্সর ওপরে এক সঙ্গে গবেষণা করেছিলাম। সে সময় যদিও প্রত্যক্ষভাবে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না, তবে আদর্শগত ভাবে দুজনের মধ্যে একটা আত্বিক যোগাযোগ ছিল। উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে বেশীর ভাগই ইসরাইল অথবা ফ্রান্সের ইহুদী সম্প্রদায়ের লোক। এদের কেউ কট্টর ধার্মিক কেউ আবার কট্টর সেক্যুলার। তবে একদিক থেকে তাদের সবাই ছিলেন প্রো-জিওনিস্ট। ওদের মধ্যে এলি বেনগাল নামে একজনের কথাবার্তা শুনে মনে হলো সার্ত্রের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। পরে অবশ্য জেনেছি এই ভদ্রলোক ইসরাইলে সার্ত্রের সফরসঙ্গী হিসেবে

www.pathagar.com

গিয়েছিলেন।

যাহোক, নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে অবশেষে প্রত্যাশিত মহান সার্ত্রে দেখা দিলেন। সার্ত্রেকে সে সময় এত বৃদ্ধ ও বিপর্যস্থ মনে হচ্ছিল দেখে খুবই মর্মাহত হলাম। তার চারপাশে অজস্রসহকর্মী, চাকরবাকর এমনভাবে তাকে সব সময় ঘিরে রাখেছিল যে তা দেখে আমার মনে হলো তিনি পুরোপুরি তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। এদের মধ্যে অনেকেই তাকে উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতেন। তার ছায়াসঙ্গী হিসেবে থাকতেন সার্ত্রের এক কথিত দত্তক কন্যা। পরে জেনেছি আলজেরিয় বংশোদ্ভূত ওই মহিলা সার্ত্রের সাহিত্যবিষয়ক সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। আরেকজন হলেন সাবেক মাওবাদী রাজনীতিক ও সার্ত্রের সহযোগী প্রকাশক পিয়েরে ভিক্টর যিনি পরবর্তীতে কট্টর ইহুদীধর্মাবলম্বীতে পরিণত হন।

এই ভিক্টর আসলে মিশরীয় বংশোদ্ভূত ইহুদি। কিন্তু তার আচরণ বা কথাবার্তায় বোঝারই উপায় নেই যে সে মিশরীয়। সে এখানে এসেছে বামপন্থি বুদ্ধিজীবী হিসেবে অনেকেটা প্রতারকের মতো।

তৃতীয় ব্যক্তিটি হলেন ভন বুলো নামের এক ত্রিভাষী মহিলা। সে একটা জার্নালে কাজ করে এবং সার্ত্রের সব লেখা অনুবাদ করাই মুখ্যত তার কাজ। যদিও সার্ত্রে দীর্ঘদিন জার্মান ছিলেন এবং শুধু হিডেগার নয়, উইলিয়াম ফকনার এবং ডস প্যাসোমের সমালোচনা লিখেছেন কিন্তু তিনি না জানতেন জার্মান না ইংরেজী।

দুদিন ব্যাপী সেমিনারে ভন বুলোকে সাত্রের গা ঘেঁসে বসে থাকতে দেখেছি। বুলা সার্ত্রের পাশের চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ পরপর তার কানে ফিসফিস করে সেমিনারের বক্তব্য ফরাসীতে অনুবাদ করে দিচ্ছিল। বক্তাদের মধ্যে ভিয়েনা থেকে আগত ফিলিস্তিনি একজন আরবী ও জার্মান ভাষা ছাড়া অন্যভাষা জানেন না। তিনি ছাড়া অন্য সবাইকে ইংরেজিতে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমরা অধিকাংশই মত দিয়েছিলাম।

সেমিনারের বক্তব্য সার্ত্রে কতটুকু বুঝেছিলেন তা এখনো আমার পুরোপুরি অজানা। তবে আমি একটা বিষয়ে চমৎকৃত হয়েছি যে সার্ত্রে প্রথম দিন থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকের বক্তব্য গভীর আগ্রহে শুনেছিলেন। তাঁর পুস্তক বিবরণীকার মাইকেল কনট্যাটও সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তিনি ওই আলোচনায় অংশ নিলেন না। মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা হলো অল্পদূরের একটি ছিমছাম রেস্তোরায়। খাবার দাবারের পরিবেশ পুরোপুরি ফরাসি। ফরাসিদের স্বাভাবিকভাবেই খাবার টেবিলে ঘণ্টা খানেক বা তারচে বেশি সময় লেগে যায়। মধ্যাহ্ন ভোজের সময়ই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। কেউ কেউ ট্যাক্সি করে চলে গেছেন। আমরা যারা বাকি ছিলাম তারা সবাই কমপক্ষে চার বৈঠকে খাওয়া দাওয়া করলাম। টানা সাড়ে ৩ ঘণ্টা বৃষ্টি হলো। যারা ট্যাক্সি করে বাড়ি গিয়েছিল তারা ততক্ষণে আবার ফিরে এসেছে। মোটামুটি আমাদের 'মধ্যপ্রাচ্য শান্তি' বিষয়ক সেমিনারের প্রথম দিন এভাবেই কাটল। কাজের কথা যা হলো তা ফালতু আলোচনার তুলনায় একেবারেই কম। আমি যতটুকু দেখলাম, কারো সাথে কোন শলাপরামর্শ না করেই ভিক্টর আলোচ্যবিষয় নির্ধারণ করছিলেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝেছিলাম ভিক্টর নিজেকে ওই সেমিনারের সর্বেসর্বা মনে করছিলেন এবং সার্ত্রের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে কর্তৃত্ব ফলাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং মাঝে মাঝে সার্ত্রের সঙ্গে কিসব

www.pathagar.com

কানাকানি করে নিচ্ছিলেন। এসময় তাকে অতি আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল। ভিক্টর আমাদের আলোচ্য বিষয়ের তিনটি এজেন্ডা নির্ধারণ করেছিলেন: সেগুলো হলো–

১. মিশর ও ইসরাইলের শান্তি উদ্যোগের মূল্যায়ন (এ সময় ক্যাম্প ডেভিডের আলোচনা চলছিল)

২. ইসরাইল ও আবর বিশ্বের শান্তি প্রক্রিয়া এবং

৩. আরব বিশ্ব দ্বারা পরিবেষ্টিত ইসরাইলের সঙ্গে ফিলিস্তিনের ভবিষ্যত সহাবস্থানের জটিলতা।

সেমিনারের আলোচ্যসূচির ধরন শুণে কোনআরব প্রতিনিধিকেই খুব খুশি হয়েছেন মনে হলো না। আমার মনে হলো ফিলিস্তিন স্বার্থ ডিঙিয়ে এ আলোচ্যসূচী নিধারণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের ধারণ-ধরন দেখে দাব্বাক এত বিরক্ত হলেন যে সেই দিনই তিনি লাগেজ পত্র নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন।

ওই দিনই আবিষ্কার করলাম সেমিনারের আয়োজকরা আরব বিশ্বের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সুক্ষ্ম আঁতাত করে ওই আলোচ্যসূচী নির্ধারণ করেছিল এবং আমার সঙ্গে আয়োজকদের কেউ এ বিষয়ে আলোচনা করেনি বুঝতে পারার পর আমার অসহ্যবোধ হলো। পরে মনে হলো আমাকে বেশি সাদাসিদে ও কলাকৌশলবর্জিত মনে করে হয়তো তারা তাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা বলেনি পাছে আমি ওই অনুষ্ঠানে না আসি এবং সার্ত্রের সঙ্গে দেখা না করি। পুরো ব্যাপারটা যখন মাথায় এল ততক্ষণে সব আলোচনা রেকর্ড করা হচ্ছিল এবং যেটি পরে ওই বৈঠকী সার্ত্রের পত্রিকা '*লেস টেমপ্স মডার্নস*'এর বিশেষ সংখ্যায় (১৯৭৯ সেপ্টেম্বর সংখ্যা) ছাপা হয়। পরে ভেবেছি পুরো বিষয়টিই অসন্তোষজনক। আমরা যার যার ক্ষেত্রে কম বেশি মোটামুটি পরিচিত। আমরা নৈতিক মনস্তাত্ত্বিকভাবে যা সমর্থক করিনা সার্ত্রে কৌশলে আমাদের দিয়ে তা সমর্থন করিয়ে নিলেন।

দ্বিতীয় দিন বেভোয়ার ইসলাম ও মুসলিম নারীদের পর্দা প্রথাকে রীতিমতো গালাগাল করে, হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে বৈঠকী রুমের পরিবেশটাই গরম করে ফেললেন। তার বক্তব্য শুনে মনে হলো তিনি সেখানে যদি অনুপস্থিত না থাকতেন তাহলে আমার দুঃখ করা উচিত হতো না। একটা বিষয় আমাকে হতবাক করলো। সেখানে সার্ত্রের উপস্থিতি ছিল যেন অনেকটাই পরোক্ষ, প্রতিক্রিয়াহীন ও এ্যাফেক্টলেস। কয়েক ঘণ্টা আলোচনার মধ্যে তিনি কিছুই বললেন না। দুপুরের খাবারের সময় আমার টেবিল থেকে বেশ দূরের একটা টেবিলে খেতে বসলেন। তাকে সে সময় বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল এবং কারও দিকে খেয়াল করছিলেন না। খাওয়ার সময় মুখে ডিম লেপ্টে একাকার অবস্থা করে ফেললেন। আমি তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলাম না। কে জানে তিনি সে সময় বধির হয়ে গিয়েছিলেন কিনা। সে মুহূর্তে সার্ত্রেকে ভূতগ্রস্ত ও উন্মাদ প্রকৃতির মনে হচ্ছিল। তার মুখের জ্বলন্ত পাইপ এবং পরনের সৃষ্টিছাড়া জামাকাপড়গুলোকে লোকজনশূন্য ফাঁকা মঞ্চের বিক্ষিপ্ত খুঁটি বলে মনে হচ্ছিল। ১৯৭৭ সালে আমি ফিলিস্তিনি রাজনীতি সঙ্গে খুব বেশি জড়িত ছিলাম। ৭৭'এ আমি ন্যাশনাল কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলাম এবং আমি প্রায়ই আমার মাকে দেখার জন্য বৈরৎ যেতাম (তখন লেবাননে গৃহযুদ্ধ চলছিল)। ওই সময় আরাফাতসহ শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে প্রায়ই কথা হতো। আমার মনে হলো

ইসরাইলের পক্ষ নিয়ে এবং ফিলিস্তিনিদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে করে বক্তারা যেভাবে এক পক্ষীয় বাকযুদ্ধে নেমেছেন তাতে আরাফাতের সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততার বিষয়টি মনে করিয়ে দিয়ে সার্ত্রেকে ক্ষেপিয়ে তোলা যেতে পারে। মধ্যাহ্নভোজের পর বিকেলের সেশন শুরু হলো। আমি আগে সতর্ক ছিলাম পিয়েরে ভিক্টর নামে ভদ্রলোকটি এ আলোচনার মধ্যে স্টেশন মাস্টারের ভূমিকা পালন করবে। কেউ কোন গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিচ্ছেন ভিক্টর হাতবাড়িয়ে তা থামিয়ে দেবেন; এবং ভিক্টরের এই হস্তক্ষেপ থেকে সার্ত্রে নিজেও মুক্তি পাবেন না।

যা ভেবেছিলাম তাই হলো– কিছুক্ষণ পরপর ভিক্টর সার্ত্রের সঙ্গে কানাকানি করছিলেন এবং সম্মতিসূচক মাথা নাড়ছিলেন; আর সেই মোতাবেক আলোচনা মর্ডারেট করছিলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে উপস্থিত প্রত্যেকের তাদের কথা বলতে চাচ্ছিলেন। তাদের সকলের বক্তব্য থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হলো যে এটা ছিল মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনার নামে ইসরাইল বন্দনা (যেটাকে আজ বলা হচ্ছে নরমালাইজেশন)। এ আলোচনার মধ্যে আরব অথবা ফিলিস্তিনিদের কোন কথা ছিল না। আলোচনা যখন শেষের পথে, তখন আমি একটি বিষয় ভেবে সাংঘাতিক বিরক্তি বোধ করছিলাম। আমি ভাবছিলাম নিউ ইয়র্ক থেকে আমি ফ্রান্স এসেছি সার্ত্রের বক্তব্য শোনার জন্য। অন্যদের মধ্যে যারা আলোচনা করছিলেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগকেই আমি আগে থেকে চিনি এবং তারা যা বলছিলেন তা থেকে ধারণ করার মতো কোনো বিষয় আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি আর থাকতে পারলাম না। আলোচনায়– অনেকটা বিঘ্নঘটিয়েই বললাম, অবিলম্বে আমরা সার্ত্রের বক্তব্য শুনতে চাই। আমার কথা শোনামাত্রই সার্ত্রের লোকলস্করের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক দেখা দিল বলে মনে হলো। আলোচনা মুলতবি রেখে তারা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ শুরু করলো।

এ সময় পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে হাস্যকর ও করুণ বলে মনে হলো, বিশেষ করে যখন দেখলাম তাদের সে শলাপরামর্শে স্বয়ং সার্ত্রের কোনো ভূমিকাই নেই। অবশেষে পিয়েরে ভিক্টর আবার আমাদের বৈঠকি টেবিলে ডাকলেন এবং রোমান সিনেটরদের মতো ভারিক্কি গলায় ঘোষণা করলেন, "মহামান্য সার্ত্রে আগামীকাল কথা বলবেন। ফলে আমরা সেই 'আগামীকালের' আলোচনা শোনার আগ্রহ নিয়ে সেদিনকার বৈঠক শেষ করলাম।

পরের দিন সার্ত্রে যা শোনালেন তা সত্যিই যথেষ্ট। টাইপ করা দুইপাতা পূর্ব লিখিত ভাষণ তিনি পড়ে শোনালেন যাতে অত্যন্ত গতানুগতিক, মামুলি উক্তি সর্বস্ব ভাষায় আনোয়ার সাদাতের প্রশংসা করা হয়েছে। বক্তব্যের বিষয় এত গতানুগতিক ছিল যে আমার ২০ বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতালব্ধ মেধার এক মুহূর্তের ভাবনায় তার বক্তব্য লেখা সম্ভব ছিল। তার সে বক্তব্যে ফিলিস্তিনিদের কথা, সীমান্ত সমস্যার কথা, ৬৭'র করুণ ইতিহাস ছিল বলে আমার মনে পড়ে না। তার বক্তব্যে ইসরাইলি বসতি স্থাপনার আধিপত্যবাদের কথা ছিল বলে মনে পড়ে না। রয়টার্সের একপেশে সংবাদের মতো তার বক্তব্য ছিল চরম স্থূল। আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে ওই বক্তব্য ছিল ভিকটরের লেখা।

নির্যাতিত মানুষের পক্ষে যে লোকটি একসময় লড়াই করেছেন, এবং এক সময় ফিলিস্তি নিদের পক্ষে কথা বলেছেন সেই লোকটি (সার্ত্রে) শেষ জীবনে এসে এমন একজন

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রণাদাতার খপ্পরে পড়ে বশীভূত বালকের মতো হয়ে গেছেন ভেবে আমি ক্রোধে ফেটে পড়ছিলাম। পঠিত বক্তব্য শেষ করে বাকি সারাদিন সার্ত্রে আবার তার নিরবতায় হারিয়ে গেলেন এবং আগের মতোই অন্যান্যরা আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকলো। অথচ সার্ত্রে সম্পর্কে একটা গল্প প্রচলিত রয়েছে যে তিনি নাকি একবার রোমে ফ্যাননের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন এবং আলজেরিয়ার নাটক সম্পর্কে ১৬ ঘণ্টা এক দীর্ঘ বক্তব্য দিয়েছিলেন। সেই সার্ত্রে সিমোন ডি বেভোয়ারের পাল-্লায় পড়ে চিরদিনের মতো নির্বাক হয়ে গেলেন!

কয়েকমাস বাদে সেমিনারের ট্রান্সক্রিপ্ট যখন প্রকাশিত হলো, তখন দেখা গেল সার্ত্রের সেই বক্তব্যকে পুনরায় সংশোধন করে যতদূর সম্ভব দোষমুক্ত করা হয়েছে। কেন এমন করা হলো আমি তা বুঝিনি বোঝার চেষ্টাও করিনি। 'লেস টেমপ্স মর্ডানস'এর ওই সংখ্যা এখনো আমার কাছে রয়েছে কিন্তু তা পুনর্বার পড়ার প্রবৃত্তি আমার হয় না। ওই কাগজটাকে এখন আমার যাচ্ছেতাই মনে হয়। মিশরে আমন্ত্রিত হয়ে সার্ত্রে যেইভাবে উৎসাহ নিয়ে আসতেন আমিও সেইভাবে প্যারিসে গিয়েছিলাম। তার দেশের লোকজনদের মিশরে যেইভাবে সমাদর করা উচিৎ বলে মনে করতেন আমিও সেই আশা করেছিলাম। কিন্তু সেখানে আমি পিয়েরে ভিক্টর নামের একজন মধ্যস্থতাকারীর হস্তক্ষেপে সংকুচিত হয়েছিলাম যিনি এখন কালের গলিত অন্ধকারে হারিয়ে গেছেন। আরেকটা ঘটনা বলি। কয়েক সপ্তা আগে বার্নার্ড পিভোটের সাপ্তাহিক টেলিভিশন টক শো 'বুইলোন ডি কালচার' এর আমি অংশ নিয়েছিলাম যেটি ফ্রান্স টেলিভিশনে এবং কিছুক্ষণ পরে মার্কিন টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। ওই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবত সার্ত্রের তীর্যক সমালোচনার মাধ্যমে তাকে মৃত্যুপরবর্তী পুনর্বাসিত করা। অনুষ্ঠানে বার্নার্ড হেনরী লেভি যিনি সার্ত্রের রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রজ্ঞার কাছে প্রায় তুচ্ছ পর্যায়ের তিনিও তার সমালোচনা করেন এবং সার্ত্রে যেসব প্রাচীন দার্শনিকদের গ্রহণযোগ্য বলে অনুমোদন দিয়েছেন তাদের তিনি কোনোভাবেই মূল্যায়ন করতে চাননি (অবশ্য স্বীকার করেই বলছি সার্ত্রে নির্দেশিত ওই দার্শনিকদের বই আমি এখনো পড়িনি এবং শিগগিরই পড়ার কোনো পরিকল্পনাও আমার নেই)। কিন্তু অনুষ্ঠানের আয়োজক সংগঠন বিএইচএল এর প্রতিনিধি বললেন, সার্ত্রে আসলে খুব খারাপ লোক ছিলেন না। খারাপ ছিলেন না তার কারণ বিএইএল'র মতে, 'ইসরাইল বিষয়ে সার্ত্রের চিন্তাভাবনা সঠিক ছিল, তিনি কখনো তার আদর্শচ্যুৎ হননি এবং জীবনের শেষে এসে তিনি ইহুদী রাষ্ট্রের একজন পূর্ণ সমর্থক ছিলেন।

তবে সার্ত্র যে কন জিওনিজমের পক্ষের মৌলবাদী সমর্থক ছিলেন তা আজো আমরা জানি না।

হয়তো এমনও হতে পারে যে তাকে 'এন্টি-সিমেটিক' বলা হতে পারে সে ভয় তার ছিল, হয়তো ইহুদী নিধন হওয়ার পর সার্ত্রে নিজেকেই অপরাধী বলে মনে করেছেন সেজন্যে, অথবা, হয়তো ফিলিস্তিনি আন্দোলনের স্বপক্ষে কথা বলে এবং ইসরাইলি জাস্টিসের বিপক্ষে কিছু বলে তিনি ভিকটিম হতে চাননি। এমন অনেক কারণ থাকতে পারে যা আমি কোনোদিনই জানতে পারব না। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি সার্ত্রে তার যৌবনকালে যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিলেন শেষ বয়সে এসে তা আবার খুইয়েছেন:

প্রত্যেকটি আরব নাগরিক (আলজেরীয়রা ছাড়া) যারা একদা সার্ত্রের প্রশংসা করতেন তারা তাঁর ক্রমপরিবর্তনে, চরম দুঃখ পেয়েছিলেন। অবশ্যই বার্ট্রান্ড রাসের এক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে ভাল ভূমিকা রেখেছেন (যদিও সার্ত্রের মতো তিনিও বৃদ্ধ বয়সে আমার এক সময়ের বন্ধু ও সহপাঠী র‍্যালপ সোয়েনমেরের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন)। আবার রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি সব সময়ই ইসরাইল পলিসির সমালোচনা করে এসেছেন। আমার মনে হয় আমাদের সুক্ষ্মভাবে উপলব্ধী করা দরকার কেন মহান মহান ব্যক্তিত্বরা শেষ বয়সে এসে তাদের অনুজদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তাদের হাতের মুঠোয় চলে যায় এবং অশুদ্ধ রাজনৈতিক বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে। এই চরম দুঃখজনক ব্যাপারটি সার্ত্রের ক্ষেত্রে পুরোপুরি ঘটেছিল।

আলজেরিয়া বাদে (আলজেরিয়া ইহুদি অধ্যুষিত হবার কারণে) সমগ্র আরব বুদ্ধিজীবীদের বেশিরভাগকেই সার্ত্রে খুশি করতে পারেননি। এর কারণ হয়তো তার অত্যাধিক ইসরাইলপ্রীতি, এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার কট্টরবাদীতা দায়ী। এক্ষেত্রে তার বন্ধু জিন জেনেট অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ছিলেন। জেনেট ফিলিস্তিনিদের প্রতি তার সহমর্মিতা প্রকাশ করেছিলেন তার '*কাতরে হিয়ারেস আ সাবরা এট চ্যাটিলা*' এবং '*লে ক্যাপটিফ এ্যামুরেক্স*' নামের দুটি অসাধারণ গ্রন্থে। প্যারিসের ওই বৈঠকের এক বছর পরে সার্ত্রে মারা গেলেন এবং আমার মনে পড়ছে তার মৃত্যু আমাদের কতখানি দুঃখ দিয়েছিল!

আজকের কাগজ, ২ সেপ্টেম্বর, '০৪

www.pathagar.com

আমার গুরু

এডওয়ার্ড ডবি-উ সাঈদ

অনুবাদ : শরীফ আতিক-উজ-জামান

ইব্রাহিম আবু লাঘোদ ও ইকবাল আহমদকে সাঈদ গুরু মানতেন। তাঁর প্রাচ্য ভাবনার অনেকখানিই এঁদের দর্শন ও

চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। সে কথা সাঈদ লুকাননি বরং অকপটে স্বীকার করেছেন। তবে গুরু মানলেও বিশ্বব্যাপী সাঈদের পরিচিতি আবু লাঘোদ ও ইকবালকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল অনেকখানি। আরব সংস্কৃতি সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্বের ভ্রান্ত ধারণা, মুসলিম বিদ্বেষ, ফিলিস্তিনী নিপীড়ন ও মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে এই তিন মনীষীর কণ্ঠ সর্বদা সোচ্চার ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাত্র ছয় বছরের ব্যবধানে এই তিনজনই লোকান্তরিত হন। ১৯৯৯ সালের ১১ মে ইকবাল, ২০০১ সালের ২৩ মে আবু লাঘোদ ও ২০০৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর সাঈদ পরলোকগমন করেন। আবু লাঘোদ ও ইকবাল থেকে সাঈদ বয়সে কিঞ্চিত ছোট ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর গার্ডিয়ান, ডনসহ অনেক পত্রিকায় তিনি এঁদের নিয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন। 'আমার গুরু'ও এই ধরনের একটি রচনা। তবে রচনাটি পুরোপুরি অনুধাবনের জন্য আবু লাঘোদ ও ইকবালের সংক্ষিপ্ত জীবনী উলে-খ প্রয়োজন মনে করছি।

ইব্রাহিম আবু লাঘোদ : *১৯২৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি প্যালেস্টাইনের জাফায় ইব্রাহিমের জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন লোহার কারবারী। তাঁদের পরিবার মানসিয়া কোয়ার্টারে বসবাস করতেন। স্থানীয় আমিরাহ্ স্কুল থেকে তিনি ্াতক ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ফিলিস্তিনীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ইব্রাহিমের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। তখন ফিলিস্তিনে ব্রিটিশদের অবস্থানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাঁদের পরিবার জাফা ছেড়ে নাবলুসের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সেখান থেকে তিনি প্রথমে আম্মান ও পরে আমেরিকা চলে যান। আমেরিকার ইলিনয়স থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ইউনেস্কোর চাকরির মাধ্যমে তিনি তাঁর পেশাগত জীবন শুরু করেন এবং মিশরে এর সামাজিক গবেষণা বিষয়ে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬১ সালে ইব্রাহিম প্রথমে নর্দাম্পটন ম্যাসাচুসেটস-এর স্মীথ কলেজে ও পরে কানাডার মন্ট্রিলের ম্যাগগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সেখান থেকে আমেরিকায় ফিরে এসে নর্থ-ওয়েস্টার্ন*

বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং ১৯৯২ সালে ফিলিস্তিনে ফিরে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়েই কর্মরত ছিলেন। ওখানে তিনি আফ্রিকান স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। ফিলিস্তিনে তিনি বারজেইত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পরই আবু লাঘোদ নর্থ-আমেরিকায় আরব ছাত্রদের মাঝে যোগাযোগ গড়ে তোলার ব্যাপারে তৎপর হয়ে ওঠেন। ১৯৬৭ সালে ইসরায়েল-মিশর ও জর্ডান-সিরিয়া যুদ্ধের পর গাজার পশ্চিম তীর ও গোলান মালভূমি এলাকা ইসরায়েলের দখলে চলে যায়। ১৯৬৮ সালে তিনি আরব-আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। ফিলিস্তিনীদের বাস্তুচ্যুতির কারণ অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন করে তিনি প্রচুর বই ও নিবন্ধ লিখেছেন। তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সাঈদ অন্যত্র বলেছেন : তৃতীয় বিশ্ব, আরব সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভাষা বিষয়ে তাঁর ছিল Encyclopedic knowledge, এই বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না।

ইকবাল আহমদ : ইকবাল আহমদ জন্মেছিলেন বিহারের ইরকিতে, ১৯৩৩ অথবা ১৯৩৪ সালে। জন্মের কয়েক বছর পর জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে ইকবালের পিতা খুন হন। যে বিছানায় তাকে হত্যা করা হয় শিশু ইকবাল সেই একই বিছানায় পিতার পাশে ঘুমিয়ে ছিলেন। দেশ বিভাগের পর বড় ভাইদের সাথে তিনি পাকিস্তানে অভিবাসী হন। ১৯৫১ সালে লাহোরের ফোরম্যান ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে ইকবাল স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। অল্প কিছুদিন সামরিক অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর তিনি রোটারী ফেলো হিসাবে ক্যালিফোর্নিয়ার অক্সিডেন্টাল কলেজে তালিকাভুক্ত হন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তিনি প্রিন্সটনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনো করেন এবং পরবর্তী সময়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত তিনি উত্তর আফ্রিকায় বসবাস করেন বিশেষ করে আলজেরিয়ায়। সেখানে তিনি ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টে যোগ দেন এবং ফ্রানজ ফ্যাঁনোর সাথে কাজ করেন। তিনি এভিয়ানে শান্তিচুক্তি বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিলেন।

১৯৬৪ সালে আমেরিকায় ফিরে তিনি দু'বছর ইলিনয়স বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব লেবার রিলেশন্স বিভাগের শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। এই সময় তিনি ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ায় আমেরিকার নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদকারী হিসাবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি লেখিকা-শিক্ষক জুলি ডায়মন্ডকে বিয়ে করেন।

১৯৭১ সালে ইকবাল যুদ্ধবিরোধী ক্যাথলিক যাজক ড্যানিয়েল ও ফিলিপ বেরিগানসহ আরো চারজন ক্যাথলিক শান্তিবাদীর সাথে হেনরী কিসিঞ্জারকে অপহরণের ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। কিন্তু বিচারে এই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

১৯৭২ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত ইকবাল ইনস্টিটিউট ফর পলিসি স্টাডিজের ফেলো হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮২ সালে তিনি হ্যাম্পশায়ার কলেজে যোগ দেন। সেখানে তিনি বিশ্ব-রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে পড়াতেন। নব্বই দশকের শুরুতে তিনি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর কাছ থেকে একখণ্ড জমিসহ আমন্ত্রণ পান

www.pathagar.com

'খালদুনিয়া' নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বেনজিরের কীর্তিমান স্বামীপ্রবর আসিফ আলী জারদারী গলফ কোর্স ও ক্লাব তৈরির জন্য সেই জমি দখল করে নেন।

একজন অতিপ্রজ লেখক ও সাংবাদিক ইকবাল সারাবিশ্বের বিপ-বী, সাংবাদিক, নেতা, কর্মী, নীতি-নির্ধারকদের সাথে বৈশ্বিক রাজনীতি নিয়ে কথা বলেছেন। জার্নল অব রেস এন্ড ক্লাস-এর সম্পাদক হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন, পাকিস্তান ফোরামের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন, ছিলেন আরব স্টাডিজ কোয়ার্টারলির সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্য।

১৯৯৭ সালে হাম্পশায়ার থেকে অবসর নেয়ার পর তিনি স্থানীয়ভাবে পাকিস্তানে বসবাস করতে থাকেন। তখনকার সবচেয়ে পুরনো ইংরেজি দৈনিক ডনে সাপ্তাহিক কলাম লিখতেন। ১৯৯৯ সালের ১১ মে ইসলামাবাদে ইকবাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সপ্তাহখানেক আগে তার মলাশয়ে কর্কট রোগের অস্তিত্ব ধরা পড়লে দ্রুত শল্য চিকিৎসা দেওয়া হয়, কিন্তু অস্ত্রাঘাতের ধকল সইতে না পেরে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

নর্থ-ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে অবস্থিত বারজেইত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম আবু লাঘোদ দীর্ঘ রোগ ভোগের পর গত ২৩ মে ৭২ বছর বয়সে তাঁর রামাল-র বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁকে দেখতে গিয়ে তেলআবিব বিমান বন্দর থেকে বেরুনোর মুখে আমি তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাই। তিনি আমার প্রবীণ ও প্রিয়তম বন্ধু, আন্তর্বীক্ষণিক চিন্তাবিদ ও একজন ক্যারিশম্যাটিক রাজনৈতিক গুরু ও নেতা হিসাবে যার প্রচুর খ্যাতি ছিল, যার গভীর অন্তর্দৃষ্টি আমাদের বন্ধুত্বকে বিগত প্রায় ৫০ বছর টিকিয়ে রেখেছিল। জাফায় তাঁর শেষকৃত্যে, রামাল-র কাস্তান কেন্দ্রে ও তাঁর বাড়িতে মৃত ইব্রাহিমের পাশে সারারাত ধরে শত শত লোক বিলাপ করেছেন। মৃত্যুর পরদিন স্থানীয় এক থিয়েটার হলে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় তাঁর বন্ধুরা স্মৃতি তর্পণ করেছেন। পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি গোরস্তানে পিতার কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে যেখান থেকে সাগরের ছোট্ট খাড়িটি নজরে পড়ে। এখানে তিনি তাঁর অতিথিদের সাঁতার কাটতে নিয়ে যেতেন, কিন্তু ভুলেও কখনো খাড়ি সংলগ্ন ইসরাইলী বিচ ক্যাফেতে যেতেন না দর্শনার্থীদের কাছে যা সব সময়ই খুব আকর্ষণীয়। তাঁর শেষকৃত্যানুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানকারীদের মধ্যে ফয়সাল হুসেইনী একজন যিনি আবু লাঘোদের মৃত্যুর ঠিক এক সপ্তাহ পর কুয়েতের একটি হোটেল কক্ষে মৃত্যুবরণ করেন।

ইব্রাহিমের কীর্তিময় জীবন-মৃত্যু উভয়ই সব দিক দিয়ে সুস্পষ্টরূপে সেই দুর্দৈব ও যন্ত্রণার কাহিনী তুলে ধরে যা রয়েছে সমস্ত ফিলিস্তিনীদের অভিজ্ঞতার মর্মমূলে। আর সেই জন্যই তাঁর জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশে-ষণ প্রয়োজন। তাঁর জীবনে যে অনবস্থিতি তার সাথে ফিলিস্তিনীদের সার্বিক পরিস্থিতির মিল রয়েছে। তবে মৃত্যুর সময় সবার কাছে একটি বিষয় অসাধারণ মনে হয়েছে তা হল জন্মভূমি জাফায় প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে আবু লাঘোদের ব্যক্তিগত অধিকার আদায়, যা একজন মানুষ শুধু তাঁর অসাধারণ ইচ্ছাশক্তির

www.pathagar.com

জোরেই সম্ভব করে তুলতে পারেন। ১৯৯২ সলে দীর্ঘ ৪৪ বছর পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি উলে-খ করতে কেউই ভোলেননি, ভোলেননি জীবনের শেষ দশকটি তিনি কীভাবে শিক্ষক, গণবুদ্ধিজীবী ও নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে গেছেন তা উলে-খ করতে।

ওই নাটকীয় পরিসমাপ্তি সত্ত্বেও তার মাঝে এক ব্যাপক স্থিতিহীনতা ছিল। তিনি তখনও ছিলেন অপূর্ণ, পারেননি থিতু হতে। প্রত্যাবর্তন তাকে পাল্টে দিতে পারেনি যদিও নির্বাসনে থাকাকালীন সময়ের চেয়ে স্বদেশে তিনি অধিক পরিতৃপ্ত ছিলেন। তাঁর জন্য ফিলিস্তিন ছিল এক জিজ্ঞাসা যার কখনোই কোনো জবাব তিনি পাননি বা স্পষ্ট করে কিছু জানা হয়ে ওঠেনি। তাঁর ব্যক্তিত্বের সবটুকুই এক অস্থিরতাকে নিশ্চিত করে– তাঁর সঙ্গলিপ্সা থেকে ভাবগম্ভীর অন্তর্বীক্ষণ, আশাবাদ ও কর্মশক্তি থেকে নিশ্চল ক্ষমতাহীনানুভূতি যা আমাদের অনেকেরই মনযোগ কেড়েছে। তাঁর জীবন যুগপৎ জয়-পরাজয়, ব্যর্থতা-প্রাপ্তি, হতাশা ও দৃঢ়কল্প মনোভাবের প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। সংক্ষেপে এ যেন ফিলিস্তিনীদের একটি সংকলন যা আমাদের সময়ের একজন চমৎকার ফিলিস্তিনী কর্তৃক রচিত যিনি সব রকমের জটিলতার মাঝে বাস করতেন।

একজন নির্মম স্পষ্টবাদী হিসেবে ইব্রাহিমকে মানুষ তাঁর লেখনীর জন্য কমই মনে রাখবে কারণ তাঁর লেখনীর সংখ্যা উলে-খযোগ্যভাবে কম। তার চেয়ে মানুষকে সংগঠিত করা ও প্রতিষ্ঠান গড়ার দক্ষতার জন্য লোকে তাকে বেশি করে মনে রাখবে। কারণ এতে করে এককভাবে তারা যে ভূমিকা রাখতে পারতো তার চেয়ে আরো কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। আমেরিকাতে AAUG (ASSOCIATION OF ARAB-AMERICAN UNIVERSITY GRADUATES), ইউনাইটেড হোলিল্যান্ড ফান্ড, ইনস্টিটিউট অব আরব স্টাডিজ, আরব স্টাডিজ, আরব স্টাডিজ কোয়ার্টারলি ও মদিনা প্রেস প্রতিষ্ঠায় তিনিই ছিলেন মূল উদ্যোক্তা। প্রস্তাবিত ফিলিস্তিন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই ছিলেন মুখ্য প্রস্তাবক যার সদর দফতর হওয়ার কথা ছিল বৈরুতে। কিন্তু ১৯৮২ সালের যুদ্ধের কারণে এই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। পাঠ্যসূচি সংস্কারকল্পে তিনি পশ্চিম তীরে একটি কেন্দ্র ও শিক্ষা বিষয়ে গবেষণার জন্য কাত্তান কেন্দ্রের নকশা প্রণয়ন করেন। এতদসত্ত্বেও তিনি বোধহয় জানতেন না যে, এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে, প্রত্যাবর্তন বা পুনর্বাসনের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিরা তাদের সংগ্রামে জয়ী হতে পারবে না। কারণ তারা শেষ পর্যন্ত আত্ম-নিমগ্ন, আপন-আপন বৃত্তের ভিতরে থেকেছে, অধিকার চ্যুতি, সংগ্রাম এবং অনিঃশেষ ক্ষতির দ্বারা উত্তরোত্তর দুর্বল হয়েছে। কনরাডের নায়কের মত ইব্রাহিম সম্ভবত, তাঁর চতুর্পার্শ্বে সার্বক্ষণিক ঘটতে থাকা নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহ ও সেইসাথে তাঁর নিজস্ব দুর্বলতা থেকে তার মানে ও আত্মতৃপ্তি খুঁজে পেতে সব সময় চেষ্টা চালাতেন।

তাঁর জীবন ঘিরে আবর্তিত ঘটনাপ্রবাহ বিবেচনা করা যাক। তাঁর মৃত্যুর সময় শক্তিশালী কিন্তু লক্ষ্যহীন ইনতিফাদার দলকে তাঁর জানালার বাইরে প্রকাশ্যে জড়ো হতে দেখা গেছে। ১৯৮২ সালে বৈরুত অবরুদ্ধ হলে সাবরা ও শাতিলায় সংঘটিত হয়েছিল গণহত্যা এবং তাকে ও পিএলওকে লেবানন থেকে উচ্ছেদ হতে হয়েছিল: তারও আগে ১৯৪৮ সালে জাফার পতন ঘটলে তার পরিবার বাস্তুহারা হয়, সেই সাথে শুরু হয় আমেরিকায় তার দীর্ঘদিনের অভিবাসী জীবন: ফিলিস্তিনীদের দাবির সপক্ষে চালিয়েছেন

বাক্-লড়াই, অবশেষে ১৯৯২ সালে হঠাৎ করেই ফিরে এসেছেন পশ্চিম তীরে। প্রায় প্রত্যেক আরব-আমেরিকান যারা সংগ্রাম করেছে গৎবাঁধা জাতিগত চেতনা, সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির বিরুদ্ধে, তারা ফিলিস্তিনীদের মত ক্লেশ ভোগ করেছে এবং ইসলামের প্রতি দীর্ঘস্থায়ী বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছে, তারা আবু লাঘোদের কাছে দারুণভাবে ঋণি। প্রথম কথা তিনি যুদ্ধটা শুরু করেছিলেন এবং আমাদের অনেকের জন্য যুদ্ধটাকে সম্ভব করে তুলেছিলেন।

উত্তর-আমেরিকায় প্রায় চলি-শ বছরের সংগ্রাম শেষে তার 'আওদা' আসলেই এক প্রকার ফিরে আসা কিন্তু তা ইব্রাহিমকে স্বাধীন ফিলিস্তিনে নয়, জটিল এক বিকল্প অবস্থানে ফিরিয়ে এনেছিল তাঁর আমেরিকান পাসপোর্টসহ অসলোর এলাকা 'এ'-তে, ফিরিয়ে এনেছিল সেই জাফায় যা পুরোপুরি ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনিই প্রথম যিনি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, একজন ফিলিস্তিনের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অর্থ হল ইসরাইলের বশ্যতা মেনে নেয়া (এমনকি তাঁর মৃত্যুর সময়ও অজ্ঞাত পরিচয় বুদ্ধিজীবীরা তাঁর শেষকৃত্যানুষ্ঠান বয়কটের হুমকি দিয়েছিলেন)। একইভাবে তিনিই প্রথম যিনি ১৯৮৮ সালে বুঝতে পেরেছিলেন ফিলিস্তিন জাতীয় পরিষদ এবং পিএলও স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সরে এসেছে যা অসলোর মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছিল।

কীভাবে পরাজয়ের হতাশাকে কোন প্রাপ্তিতে রূপান্তরিত করতে হয় তা ইব্রাহিমের চেয়ে ভালো আর কেউ জানতো না। কিন্তু নির্ভেজাল নৈতিক বিষয় নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট হতেন না। নগ্ন সামরিক শক্তি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান বাস্তবতার সাথে এতটাই সঙ্গতিপূর্ণ যে, ১৯৮২ সালে বৈরুতে ভয়াবহ যুদ্ধের পরও আরাফাতের বেঁচে যাওয়ার দৃষ্টান্ত দ্বারা ধোঁকা দেয়ার অবকাশ নেই। তিনি বলতেন, 'আমাদের কোনো ট্যাঙ্ক নেই, আমাদের আসলে কোনো শক্তি নেই, আর সেই জন্যই আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করা, আমাদের জনগণকে হত্যা করা ইসরাইলের জন্য এত সহজ।'

ইব্রাহিমের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৫৪ সালে প্রিন্সটনে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো স্নাতক ছিল না, ছিল না কোনো আফ্রো-আমেরিকান, কোনো নারী, ছিল শুধু শ্বেতাঙ্গ অভিজাতশ্রেণীর তরুণরা যাদের চমৎকার ধ্রুপদী শিক্ষা প্রদান করা হত এবং ধারণা দেয়া হত যে পৃথিবীতে শুধুমাত্র তারাই শাসন করার অধিকার নিয়ে জন্মেছে। তাদের কেউ কেউ পরবর্তীতে তা করেছেও। শহরের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি্াতক ছাত্রদের প্রিন্সটনের অভিজাত কনসার্ট অনুষ্ঠানে পাঠানোর জন্য টিকিট কিনতে সঙ্গীত বিভাগে অর্থ দিতেন। একবার আমাকে টিকিট বিতরণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কোনো এক সেপ্টেম্বরের তপ্ত-অবসন্ন বিকেলে নীল-সবুজ তীক্ষ্ণ চোখ ও গুরুবাচনভঙ্গির চটপটে এক তরুণ এসে দ্রুত তার পরিচয়পত্র দেখিয়ে টিকিট চাইল (তার নাম পড়ার সুযোগ ছিল না, শুধু্াতক কিনা তা লিপিবদ্ধ করা কাজ ছিল)। তারপর চলে যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়াল, জানতে চাইল আমার নাম কী বলেছি। যখন আমি আমার নাম বললাম তিনি ঘুরে কাছে আসলেন এবং জানতে চাইলেন 'আমি কোথা থেকে এসেছি।' 'এখন মিসর থাকি কিন্তু আমি আদতে ফিলিস্তিনী' আমি এই রকম কিছু একটা বলে থাকব। তাঁর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'আমিও ফিলিস্তিন থেকে এসেছি, জাফায় আমার বাড়ি'-

তিনি বলেছিলেন। ইব্রাহিম ফিলিপ হিটির সাথে পড়তেন। ফিলিপ লেবানিজ অভিবাসী, 'ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ' নামে একটি বিশেষ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মূলত; আরবের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে সঠিক পড়াশুনোর জন্য। তিনি আমাকে অন্যান্য আরব্‌¸াতক ছাত্রদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে আমার বয়সী বন্ধুদের একটি দল গড়ে ওঠে যাদের সাথে আমি আরবীতে কথা বলতে পারতাম। আমরা প্রিন্সটনে জীয়নবাদীদের উপস্থিতির জন্য আফসোস করতাম এবং সুয়েজ খাল সংকটের সময় এই বিষয়টি খুব স্পষ্ট ছিল।

১৯৫৭ সালে আমরা উভয়ই প্রিন্সটন ছেড়ে যাই, ইব্রাহিম পিএইচডি নিয়ে আর আমি ¸াতক হয়ে এক বছরের জন্য মিশরে যাই। কায়রোতে নিয়মিত ইব্রাহিম ও তাঁর স্ত্রী জ্যানেট-এর সাথে আমার দেখা হত। সেখানে ইব্রাহিম ইউনেস্কোর হয়ে কাজ করতেন। সেই পর্যায়ে আমাদের কারো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার সামান্যতম সম্ভাবনাও দেখা যায়নি। আমি আবার হার্ভাডের¸াতক স্কুলে ভর্তি হলাম, তখন কদাচিৎ ইব্রাহিম ও তাঁর স্ত্রীর সাথে দেখা হত যদিও আমি জানতাম তারা উভয়ই শিক্ষকতা পেশা শুরু করতে আমেরিকায় ফিরে এসেছেন। তখনই '৬৮ সালের যুদ্ধ আমাদের আঘাত হানে। সেইসময় খানিকটা আকস্মিকভাবেই ইব্রাহিম আমাকে চিঠি লিখে আরব ওয়ার্ল্ড-এর বিশেষ সংখ্যার একটি লেখা চান। এই মাসিকটি নিউইয়র্ক থেকে বের হত, ইব্রাহিম অতিথি সম্পাদক হিসেবে কাজ করতেন।

তাঁর অনুরোধ ছিল লেখাটাতে একজন আরবের দৃষ্টিকোণ থেকে যেন যুদ্ধকে দেখার চেষ্টা করা হয়। আমি সুযোগটা গ্রহণ করি এবং মধ্যযুগের দৃষ্টান্ত টেনে মিডিয়া, জনপ্রিয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উপস্থাপনায় আরবের যে চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস থাকে তার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করি। এই ঘটনাই ছিল আমার '*ওরিয়েন্টালিজম*' লেখার সূত্রপাত যা আমি ইব্রাহিম ও জ্যানেটকে উৎসর্গ করেছি।

পরবর্তী বছরগুলোতে যদিও ইব্রাহিম পরিবার শিকাগোতে আর আমি বসবাস করতাম নিউইয়র্কে, তবুও আমরা কাছাকাছি আসতে পেরেছিলাম। সে সময় আমরা উভয়ই আরো বেশি করে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি। অমারা কংগ্রেসে সাক্ষ্য দিয়েছি, ১৯৮৮ সালে জর্জ শুলজের সাথে দেখা করেছি, বোস্টনে ইনস্টিটিউট অব আরব স্টাডিজ প্রতিষ্ঠা করেছি, 'আরব স্টাডিজ কোয়ার্টারলি'র মত পত্রিকা বের করেছি এবং কায়রো, আম্মান ও আলজিয়ার্সে ফিলিস্তিন জাতীয় পরিষদের সভায় যোগ দিয়েছি। সেই কর্মমুখর দিনগুলোতে তখন আমেরিকা ও আরববিশ্বে মেধাবী ব্যক্তিত্ব খুঁজে খুঁজে তাদের পরস্পরের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দেয়ার ও একসাথে কাজ করার ক্ষেত্রে ইব্রাহিম তাঁর মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্যারিসে বছরখানেক কাটানোর পর ১৯৮২ সালের জুনে ইব্রাহিম বৈরুত ফিরে আসেন ফিলিস্তিন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে যার জন্য তিনি পিএলও এবং ইউনেস্কোর সাথে কাজ করেছেন। তাঁর ফিরে আসার দু'দিন পর আইডিএফ লেবাননে হানা দেয় এবং পরপরই ইসরাইরলী রকেট হামলায় তাঁর নতুন এ্যাপার্টমেন্ট ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তী দুই মাস তিনি বৈরুত সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে ছিলেন। তখন তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সোহেল মিয়ারির সাথে আমার মায়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেই সংকটময় দিনগুলোতে আমরা প্রতিদিনই একে অপরের সাথে

যোগাযোগ রক্ষা করেছি বেশীরভাগ সময় আরাফাতের অনুরোধে। তখন আমাকে ও আরো কয়েকজনকে তিনি দায়িত্ব দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য।

বৈরুতের অভিজ্ঞতা আগে-পরের যে কোনো অভিজ্ঞতা থেকে ইব্রাহিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমত, এ থেকে তিনি যে শিক্ষা পেয়েছিলেন তা হল, মধ্যপ্রাচ্যের সমাজ ও রাজনীতির মাঝারি মান ও বর্বর অস্থিতিশীলতার কারণে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যন্ত উত্তরোত্তর দুর্বল হতে থাকে। দ্বিতীয়ত, এই হামলা থেকে তিনি ক্ষমতার ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন, বুঝেছিলেন ক্ষমতা যার আছে আর যার নেই তাদের উভয়ই এর দ্বারা আক্রান্ত হয়। তৃতীয়ত, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন তা হল একজন অনবরত চাপ সৃষ্টি করতে পারে, এমনকি ব্যর্থতার আশংকা থাকলেও। প্রকৃত ইব্রাহিম সেই মানুষ যিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, একমাত্র বিষয় হল চাপ সৃষ্টি করা, আশাবাদী হওয়া এবং সঙ্গীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।

প্রায়ই তিনি আমাকে বলতেন; আমরা মাঝারি মানের, সাঈদ এবং শেষমেষ এই মাঝারী মানই হয়তো ইসরাইলের প্রখর বুদ্ধিমত্তাকে হারিয়ে দেবে। এর সাথে আরো যোগ করতেন; আমরা মানুষ হিসেবে ভালো, জেদিও, হয়তো ততটা স্মার্ট নই। তাকে যা বিব্রত করতো তা হল অসলো চুক্তি যা ফিলিস্তিনীদের উপর অবমাননার ভারী বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। আরাফাতের আজ্ঞাবহ ভাঁড়ের মত আচরণ আমাদের উভয়কেই যথেষ্ট বিব্রত করতো এবং আমরা ভীষণ লজ্জাবোধ করতাম ভেবে যে, তিনি আমাদের উভয়কেই এই চুক্তির আগে ধোঁকা দিয়েছেন। ইব্রাহিম সেই ফিলিস্তিনের অংশ হতে চেয়েছিলেন অসলো চুক্তি যা খুঁড়ে বের করেছে, ইসরাইলী এলাকা এ থেকে আংশিক আলাদা করেছে এবং এইখানেই তিনি নিজে, তাঁর সহকর্মী ও ছাত্রদের কাজ করার ঝামেলায় ফেলেছিলেন। আরব বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যা-ই হোক না কেন, মান সম্মত মনীষা ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর ইব্রাহিমের অগাধ আস্থা ছিল। কারো মাঝে প্রতিশ্রুতি বা মেধার স্ফূরণ দেখতে পেলে ইব্রাহিম খুবই আনন্দিত হতেন কারণ এতে তার সুযোগ মিলতো সেই ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভাকে উন্মোচিত ও শাণিত করার। এমন অনেকেই আছেন যাদের মধ্যে আমিও একজন– যারা মনে করেন ইব্রাহিম তাদের আবিষ্কার ও সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে কুলীন গোত্রভুক্ত করেছেন। তিনি একজন দারুণ উৎসাহদাতা, রক্ষাকর্তা ও দায়িত্ব পালনকারী। তাঁর কাছ থেকে 'তুমি সত্যিই দারুণ' শোনার মত প্রশংসাসূচক যেমন আর কিছুই ছিল না তেমিন কাউকে নামাতে হলে 'সে একটা গবেট' শোনার মত চূড়ান্ত মন্তব্যও আর ছিল না। শিক্ষক হিসাবে তিনি কর্তৃত্ব করার তাড়নার টানাপোড়েনে ক্ষত-বিক্ষত হতেন। সাম্যের বহুল প্রচলন তিনি আশা করতেন। তিনজন মেধাবী কন্যা সন্তানের পিতা ও একজন গুণী বিদূষী নারীর স্বামী ইব্রাহিম একজন আরব বা একজন পশ্চিমা পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রতি অধিক সহনশীল যখন তিনি পরিপূর্ণ পিতাসুলভ হয়ে উঠতেন তখনও তদারকি করার ক্ষেত্রেও চিন্তা-ভাবনা, আদান-প্রদানের মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁর মাঝে কোনো স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ খুঁজে পাওয়া যেত না যদিও প্রয়োজন পড়লে তেমন আচরণ তিনি করতে পারতেন তবে তা ভালো উদ্দেশ্যে। তাঁর তর্জন-গর্জনের নিচে কোমল একটি হৃদয় ছিল।

www.pathagar.com

আমাদের অনেকের মত তিনি ফিলিস্তিন হারানোর বেদনা ভুলতে পারেননি। শরণার্থী হিসাবে কাটানো শৈশবের দিনগুলো মুছে যাওয়ার মত ছিল না। তখনকার স্মৃতি যদিও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়নি তা সম্ভবত ইসরাইলের উপর ক্ষোভের অংশ হিসেবে ছিল। তিনি বুঝতেন আমাদের সংগ্রাম হবে দীর্ঘ ও জটিল এবং আমাদের জীবদ্দশায় আমরা একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের অধিকারী হব না। নানা কারণে 'ফিলিস্তিনের রূপান্তর' (তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ সংকলনের শিরোনাম এবং এক ইহুদীবাদ কর্তৃক দেশটি চুরি হয়ে যাওয়ার জন্য সুভাষণ) তাঁর জীবনের উলে-খযোগ্য কর্ম, কিন্তু তিনি মূঢ় জঙ্গী ছিলেন না, ছিলেন দৃঢ়সংকল্প স্বাধীনতা কামী, সমালোচক ও বুদ্ধিজীবী। পেশাগত ও ব্যক্তিগতভাবে তিনি এই উদ্দেশ্যে কাজ করা সত্ত্বেও তাকে পেশাজীবী হিসেবে ভাববার অবকাশ নেই। তিনি বরং বেশিমাত্রায় সৌখিন যিনি ভালোবাসা ও অঙ্গীকার দ্বারা চালিত।

ইব্রাহিমই ফিলিস্তিনের মূল বিষয়াবলীর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমার চেয়ে বছর সাতেকের বড় এবং স্বাধীন ফিলিস্তিনি জীবনের স্বপ্নে বিভোর ইব্রাহিম আমিসহ অনেকের মনে 'নাকবা-পূর্ব' শৈশবের বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছিলেন। আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর ছিল সুস্পষ্ট অগাধ জ্ঞান এবং কে কোথা থেকে এসেছিলেন, কোথায় গেছেন, বর্তমানে কোথায় বাস করছেন, কখন তাদের অন্তর্ধান ঘটলো সব ঠিকঠাক মনে রাখতে পারতেন।

চলি-শের দশকে জাফা নিঃসন্দেহে একটি উলে-খযোগ্য জায়গা ছিল। ইব্রাহিমের স্কুল আমিরিয়াহ্ তাক লাগানো সব মানুষ সৃষ্টি করেছে যারা অভিবাসী হিসেবে বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক কর্মী, শিক্ষাবীদ, ব্যবসায়ী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইব্রাহিম এদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং পরবর্তী সময়ে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়েছেন। এর মধ্যে আছেন তাঁর ষণ্ডা মার্কা বন্ধু, (পিএলও নেতা ও বাগ্মী শাফিক-আল-হাউত যিনি কখনো বৈরুতে তাঁর অবস্থান পরিত্যাগ করেননি এমনকি ১৯৮২ সালে ইসরাইলী কর্তৃক শহরটি দখলের সময়ও। কিন্তু অসলো চুক্তি নিয়ে আরাফাতের সাথে মতদ্বৈততার কারণে নির্বাহী কমিটি থেকে তিনি ইস্তফা দেন। আরো আছেন সফল ব্যবসায়ী আব্দেল মহসীন-আল-কাত্তান যিনি তাঁর সৌভাগ্যের অনেকটাই ফিলিস্তিনীদের নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পিছনে ব্যয় করেছেন। ইব্রাহিম ও শাফিকের মত তিনিও অসলো চুক্তি নিয়ে তীব্র সমালোচনামূলক।

ইব্রাহিম একজন মধ্যযুগীয় কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী লিপিবদ্ধকারীর মত আগ্রহ নিয়ে তাদের জীবনের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। জাতীয় পরিষদের সভায় কিংবা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের জমায়েতে তিনি আমার সাথে ক্রমাগত ভারী হতে থাকা ফিলিস্তিনী দলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন, তাদের উপস্থিতিতে কিছুটা বিব্রত করে তাদের জীবন থেকে বিস্ময়কর রকমের পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্য ও দরকারী হিতোপদেশের উদ্ধৃতি টানতেন। শিক্ষক, আইনজীবী, ব্যাংক কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীরা ফিলিস্তিন কাহিনীর বাস্তব অংশীদার হওয়ার জন্য তাঁর প্রশংসা লাভ করতেন। তাদের বিস্তৃতি তিনি প্রত্যাখ্যান করছেন বোঝা যেত যখন তাঁর গল্প আরেক কনরাডীয় বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করতো- যা তিনি কী বলছেন তাকে এক গভীর ব্যঞ্জনা দান করতো।

ইব্রাহিম আরবদের আমেরিকা, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জগত ও উত্তর ঔপনিবেশিক

www.pathagar.com

রাজনীতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। আঞ্চলিক ফিলিস্তিনী জাতীয়তাবাদী নয়, তার ছিল এক বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি যা লালিত হয়েছিল সমগ্র পৃথিবীকে দেখবার ঈর্ষণীয় লক্ষ্যের দ্বারা। পেরু, চিন ও রাশিয়াসহ যে সমস্ত জায়গায় আমি কখনো যাওয়ার কথা ভাবিনি তিনি খুব আকর্ষণীয়ভাবে সেখানকার গল্প বলতেন। তিনি বড় শহরে থাকতে ভালোবাসতেন আর সেই জন্য প্রায়ই প্যারিস, কায়রো বা শিকাগোতে সময় কাটাতে যেতেন। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামে সহযোগিতা করার ব্যাপারে মানুষের সামর্থের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। আমার অন্ততঃ একদশক আগে তিনি CLR সম্পর্কে বুঝতে পেরেছিলেন। জেমস তাকে একজন পশ্চিমা হিসাবে দেখতেন এবং সহজে আরবদের সাথে মেলাতে পারতেন না। একইভাবে নর্থ-ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম অব আফ্রিকান স্টাডিজের পরিচালক হিসেবে আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক জানাশোনা ছিল এবং তাই সংগ্রামের অনেক নেতাকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন এবং নর্থ-ওয়েস্টার্নে আমন্ত্রণ জানাতেন। তিনি এমিলকার কারবাল ও অলিভার তামাবোর মত ব্যক্তিদের মূল্যায়নে, তাদের আন্দোলন ও যে ধরনের উপনিবেশবাদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম করেছেন যার সাথে তিনি ফিলিস্তিনের অবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে তা চিহ্নিতকরণে তিনি তাঁর সময় থেকে অনেক অগ্রগামী ছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই মোহাম্মদ হাসানেইন হেকেল বা মুনাফ আল রাজ্জাকের মত আরব জাতীয়তাবাদ-প্রবর্তকের ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎ সম্ভব হত।

ধন্যবাদ ইব্রাহিমের প্রাপ্য, কারণ ১৯৭০ সালে তাঁর মাধ্যমেই আমার পরিচয় ঘটেছিল আর এক সহযোদ্ধা ইকবাল আহমদের সাথে যার মৃত্যু আমাকে দুর্বল করে দিয়ে গেছে। ইব্রাহিমের মত ইকবাল ছিলেন 'আসিল' (প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত ইব্রাহিমের সর্বোচ্চ নিজস্ব পরিভাষা) খাঁটি মানুষ, যার রয়েছে একই রকমের উর্বরতা, অবিশ্রান্ত বাগ্মীতা। গভীর রাতে তাদের উভয়ের সাথে বসার মানে ধীরে ধীরে ভয়ে চুপ মেরে যাওয়া, কারণ তারা দীর্ঘ জটিল আলোচনা, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও দুর্বোধ্য বিশে-ষণ চালিয়ে যেতেন এবং তা এবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আমেজমুক্ত ছিল না। আমার কোনো গুরুই সময়ের ব্যাপারে কৃপণ ছিলেন না এবং সম্ভবতঃ একই কারণে মুদ্রণের তুলনামূলক ব্যয়কুণ্ঠা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন না। শব্দ উচ্চারণে শৈরীনিষ্ঠ, বহুভাষিক, মতাদর্শের ক্ষেত্রে উদার এই ব্যক্তিযুগল আমার অসুস্থতার সময় যেভাবে আমাকে সাহস যুগিয়েছেন তা এখানে উলে-খ করতে যথেষ্ট বিব্রত বোধ করছি। আমাকে যা হতাশ করেছে তা হল আমার আগে তাঁদের মৃত্যু, বিশেষ করে এই সময়ে যখন তাদের কণ্ঠস্বর হতে পারতো খুবই কার্যকর, মানবিক তথ্যসমৃদ্ধ।

দুই বছর আগে মৃত্যুর সময় ইকবাল এবং এখন ইব্রাহিমকে নিয়ে লিখতে গিয়ে দেখছি তাদের কৃতিত্বপূর্ণ মৌলিক অর্জনসমূহের বর্ণনা তুলে ধরা কত কঠিন। তারা উভয়ই যাদের সাথে পরিচিত হয়েছেন তাদের মনে দাগ কেটেছেন, তাদের স্মারক একত্রে প্রকাশিত হয়নি কিন্তু বিভিন্ন সংগঠন, গোষ্ঠী, সমাজ ও পরিবারের মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে যারা এই দুই মনীষীর প্রকৃতি ও কৃতি দ্বারা অল্প-বিস্তর পাল্টে গেছেন।

জীবনের শেষদিনগুলোতে তারা উভয়েই নিজ নিজ উৎসভূমে প্রত্যাবর্তন করেন। বিহারের জাতক ইকবাল ফিরে যান ইসলামাবাদে আর জাফার জাতক ইব্রাহিম রামাল-ায়। কিন্তু তাঁরা আসলে বাড়িতে ফিরতে পারেননি। তাঁদের স্মৃতি রোমন্থনে

www.pathagar.com

প্রত্যেকেই এই বিষয়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন এবং পূর্ণগর্ভ করে ফেলেন আর এইভাবেই ভুলের ফাঁদে পা দেন। এই দুই মনীষী সক্রীয়তা, গতিময়তা, আবিষ্কার ও ঝুঁকির প্রতীক। ফিলিস্তিনের অজানা কাহিনী উন্মোচনে আমার বিশ্বাস, ইব্রাহিম একটি মতাদর্শের প্রতি নিবেদিত প্রাণ মডেল হিসেবে বিবেচিত হবেন, যে আদর্শ বশ্যতা স্বীকারের নয়, মাথা উঁচু করে বাঁচবার এবং বারংবার পুনর্মূল্যায়নের দাবিদার। তাকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে যে সংগ্রাম আর আদর্শের প্রতি তিনি পূর্ণমাত্রায় নিবেদিত ছিলেন সেই কাহিনী পুনঃমঞ্চায়ন করতে হবে, তবে নকল করে নয়, নতুনভাবে শুরু থেকে জিইয়ে রেখে, সেইমত কাজ করে এবং ভবিষ্যতে পুনর্বিবেচনা ও সমালোচনামূলক অনুধ্যানের জন্য খোলা রেখে।

আজকের কাগজ, ২৩ সেপ্টেম্বর, ০৪

www.pathagar.com

নাগিব মাহফুজ ও উত্তরসাহিত্য

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ
অনুবাদক : দিলীপ কুমার দত্ত

নাগিব মাহফুজ-এর আরবী তথা বিশ্বসাহিত্যে অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জীবিত আরব ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রথম আরববাসী, যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মতো এক বিরল সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তিনি আরবী সাহিত্যকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেছেন, যা প্রমাণ করে যে তার মতো কেউই আঞ্চলিক পর্যায়ে খ্যাতি অর্জন করতে পারেনি। বিলম্বে হলেও পশ্চিমা জগৎ তাঁর প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে আরবী ভাষা ও সাহিত্য সবচেয়ে কম পরিচিতি। ইউরোপীয় ও আমেরিকানগণ প্রসন্নচিত্তে এর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। কিন্তু আরববাসীগণ মনে করেন, তাদের ভাষায় লিখিত সাহিত্য এবং তাদের সংস্কৃতি বিশ্ব সমাজে অন্যতম এক বিশেষ অবদান রেখেছেন। আল কোরানের ভাষা আরবী। ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করেই অবস্থান করছে আরবী ভাষা।

ইসলাম ধর্মের ইতিহাস এবং এ ধর্মের নিত্যদিনের চর্চার কথা লিপিবদ্ধ আছে এ ভাষায়। আরববাসীগণ মনে করেন, বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের সংস্কৃতির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর স্থানে অবস্থান করছে তাদের সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষা। আরবী ভাষা আরবীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম বিকাশের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করে, তার জন্য এবং পশ্চিমা সাম্রাজ্যনীতির বিরোধিতার সাথে এ ভাষার সম্পৃক্ততার জন্য, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত হতে, আরব দেশের ইতিহাস নানা গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে ঋদ্ধ। আধুনিক সাংস্কৃতিক জগতে আরবী ভাষা এক প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান গ্রহণ করে আছে। এই ভাষায় যাঁরা কথা বলেন, তাঁরা এবং এ ভাষার লেখকবৃন্দ এ ভাষার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। অপরদিকে বিদেশীরা এ ভাষাকে খাট করে দেখে, এ ভাষাকে আক্রমণ করে নানাভাবে, কিংবা কোন কোন সময় বিদেশীদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়। বিদেশীদের চোখে এ ভাষা আরববাদ ও ইসলামের দুর্গ হিসেবে বিবেচিত।

আলজিরিয়াতে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘ ১৩০ বছর দৃঢ় আসন গেড়ে বসেছিল। সেখানে দৈনন্দিন ব্যবহারের কাজে আরবী ভাষা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তিউনিসিয়া ও মরোক্কোতে আরবী ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধার মাত্রা ছিল কম। সেখানে ফরাসী ও আরবী ভাষা এক অস্বস্তি কর দ্বৈত অবস্থানে অধিষ্ঠিত ছিল। নেটিভ আরববাসীদের ওপর রাজনৈতিক স্বার্থে ফারসী ভাষা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ সব দেশ ছাড়া, আরব জগতের অন্যত্র সংস্কার ও

www.pathagar.com

রেনেসাঁ ও নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হয়। 'মাসরীক' আরবী ভাষা। বেনিডিক্ট এ্যান্ডারসন-এর মতে, আরব ভূখণ্ডে শিক্ষা প্রসারের সাথে আধুনিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়। এই জাতীয়তাবাদের হৃদয় হতে বর্ণনাধর্মী গদ্য উপন্যাসের জন্ম। জাতীয় সচেতনতা সৃষ্টিতে এক প্রধান ভূমিকা পালন করে এ গদ্য উপন্যাস। বিংশ শতকের প্রথম দিককার ঔপন্যাসিকগণের রচনায় যেমন, ঐতিহাসিক রোমান্সগুলির মাধ্যমে এবং ঐতিহাসিক জর্জি জেদান (Jurji-Zaydan)-এর রচনার মাধ্যমে পাঠকগণ আরবদের সাধারণ অতীত সম্বন্ধে অবহিত হন। শুধু তাই নয়, অতীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল এবং যা স্থায়ীভাবে বিরাজ করছিল, সে বিষয়টিও উল্লিখিত হয়েছে। আরবী ভাষী ঔপন্যাসিকগণ দুর্ভাগ্য পীড়িত মানব, সমাজ-এরকম যে সব বিষয়ই হোক না কেন, তারা তাদের উপন্যাসে সরাসরি সেগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আমাদের একটা বিষয় ভুললে চলবে না যে, পশ্চিমা জগতে যে সাহিত্য মাধ্যমটাকে উপন্যাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেটা আরবী সাহিত্যের জগতে অপেক্ষাকৃত একটা নূতন ধারা। এ বিষয়টির সাথে আমাদের মনে রাখতে হবে, আরবী ভাষার উপন্যাস একটি আকর্ষণীয় মাধ্যম। আমাদের শতাব্দীতে যে সব বড় বড় ঘটনা ঘটেছে, যে সব ঐতিহাসিক আন্দোলন হয়েছে, তার কথা পাঠককূল উপন্যাসের মাধ্যমে জেনেছে। ঔপন্যাসিকগণ তা আকর্ষণীয়ভাবে পাঠকদের নিকট তুলে ধরেছেন। আমাদের শতাব্দীর সকল বিজয়, সকল ব্যর্থতার অংশীদার পাঠক ও ঔপন্যাসিকগণ। আমরা নাগিব মাহফুজ-এর কথা উল্লেখ করতে পারি। তিনি অল্প সময়ের ব্যবধানে, বলা যায়, তিরিশ দশকের শেষ প্রান্ত হতে শুরু করে তাঁর লেখা রচনাগুলির মধ্যে আরবী উপন্যাসের মধ্যে ইউরোপীয় উপন্যাসের ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। আরবী উপন্যাস সাহিত্যে তিনি কেবল একজন হুগো বা ডিকেন্স নন, তিনি একজন গলসওয়ার্দী, একজন থমাস মান, একজন জোলা এবং একজন জুলেস রোমেন।

আরবী উপন্যাস জগতে আছে রাজনীতির খেলা। স্বভূমির প্রতি মমতৃবোধ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ-এ দুয়ের মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্ব-সংঘাত-এর কথা আছে আরবী উপন্যাসে। তাই সাহিত্য মাধ্যম হিসেবে আরবী উপন্যাস এক সরল রেখার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। নাগিব মাহফুজ-এর ১৯৫৯ সালে লেখা রূপকধর্মী ত্রয়ী উপন্যাস আওলাদ হার্টিনা-এর উপজীব্য ইসলাম। তিনি যখন এ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, তখন মিশরে উপন্যাসটি নিষিদ্ধ করা হয়। এর আগের লেখা কায়রো ট্রিলজী (১৯৫৬-৫৭)তে নাগিব মাহফুজ মিশরীয় জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন স্তরের কথা বলেছেন, যার চরম পরিণতি ১৯৫২ সালের বিপ্লবের মধ্যে নিহিত। এক সমালোচকের দৃষ্টিতে তিনি এ জাতীয়তাবাদকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মিশরীয় সমাজকে পুনঃনির্মাণ করতে চান। মিশরীয় সমাজের সাথে তার অন্তরঙ্গ পরিচয়। রাসমোহন ভঙ্গীতে লেখা তাঁর উপন্যাস 'মিরামার' (১৯৬৭)-এর বিষয়বস্তু আলেকজান্দ্রিয়া নগরী। নাসের-এর সমাজতান্ত্রিক নীতির ওপর এক কালির আঁচর এঁকে দিয়েছেন তিনি। রাষ্ট্রপতি নাসেরের অনুসৃত সমাজতান্ত্রিক নীতির ওপর এক কালির আঁচর এঁকে দিয়েছেন তিনি। রাষ্ট্রপতি নাসেরের অনুসৃত সমাজতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসরণের অভ্যন্তরে যে দুর্নীতি, যে অসঙ্গতি রয়েছে, তার কথা বলেছেন এ উপন্যাসে।

www.pathagar.com

এ সমাজতন্ত্র যে কত মানুসের জীবন ধ্বংস করেছে, তার কথা বলতেও ছাড়েননি তিনি। ১৯৬৭ সালে ইসরাইলীদের সাথে যুদ্ধের পরিণামে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে উপজীব্য করে তাঁর ষাটের দশকের শেষ দিককার লিখা ছোট গল্প ও উপন্যাসগুলি। তিনি প্যালেস্টাইনদের জাগ্রত প্রতিরোধের প্রতি সমর্থন জানালেও, ইয়েমেন-এ মিশরীয় সামরিক অভিযানের তীব্র বিরোধী ছিলেন। নাগিব মাহফুজ একজন বিখ্যাত লেখক। তিনি মিশরের তথা সমগ্র আরব বিশ্বের একজন বিশিস্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। ১৯৭৯ সালে মিশর-ইসরাইলীদের মধ্যে যে শান্তিচুক্তি হয়, তিনি তাঁর সমর্থক ছিলেন। তাঁর এ সমর্থনের জন্য তাঁর লেখা বইগুলি আরব জগতে নিষিদ্ধ হয়। শান্তিচুক্তির প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে তিনি মিশরে খুব একটা জনপ্রিয় ছিলেন না। যত নিন্দাবাদ কুড়ান না কেন, তাতে তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতির কমতি হয়নি। সাময়িক প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠে তিনি একজন সম্মানিত ও প্রশংসিত ব্যক্তিতে পরিণত হন।

এক অসাধারণ দীর্ঘ সময়ব্যাপী তিনি লেখালেখির সাথে সংযুক্ত-কেবল এ কারণেই যে তিনি সমগ্র আরব বিশ্বে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন, তা নয়; আর এ বিশিষ্ট স্থান দখল করার কারণ, তিনি মাথা থেকে পা পর্যন্ত একজন মিশরীয় এবং তিনি অঞ্চল ভিত্তিক এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখেন, যা মধ্যপ্রাচ্যের প্রেক্ষাপটে অসামান্য এক ধারণা। তিনি মিশরের মৌলিক অখণ্ডতা ও সাংস্কৃতিক ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন।

তাঁর যুগটি হলো এক বিশাল পটভূমি, বিচিত্র সব উপাদানে গঠিত এ যুগ, নানা প্রান্ত থেকে প্রভাব এসে পড়েছে এ যুগে। এসব উপাদান হলো: মিশর, আরব, মুসলিম, গ্রীক, ইউরোপীয়, খ্রিস্টীয়, ইহুদী। এ সত্ত্বেও মিসর-এক নিত্য সমাজ, এর আছে নিজস্ব পরিচিতি, বিংশ শতকে এ সব ইস্যু উবে যায়নি। অথবা আমরা যদি ভিন্নভাবে কথাটি বলি, তবে দাঁড়ায়, বিংশ শতকের মিশরে আরবী ভাষায় লেখা উপন্যাস যথেষ্ট বিকশিত হয়েছে। মিশর, এত যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিপ্লব রাজনৈতিক আন্দোলন সত্ত্বেও, এর নাগরিক সমাজের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়নি-এর পরিচিতিও কখনও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়নি এবং এর অস্তিত্ব কখনই রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়নি। মাহফুজ-এর মতো ঔপন্যাসিকগণ এ সব বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করেছেন। তাঁরা তাঁদের উপন্যাসের মাধ্যমে সমাজের সাথে এক প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন।

এছাড়া নাগিব মাহফুজ কায়রো নগরীর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক যে ছবি চিত্রিত করেছেন সে ছবির ধারা উত্তরকালের লেখক গোষ্ঠীও অনুসরণ করেছেন, যারা ১৯৫২-এর পরবর্তীকালে পরিপক্ব লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। গামেল আল-ঘিটানী, নাগিব মাহফুজ-এর মতো তার উপন্যাসের সেটিং করেছেন গামালিয়া-এর মতো এক জেলাতে। আল ঘিটানী।

'৫২-এর পরবর্তীকালের লেখক। তাঁর জাইনী বরাকত (Zayni Barakat) সম্প্রতি অনুদিত হয়েছে ইংরেজিতে। নাগিব মাহফুজ-এর বাস্তবধর্মী উপন্যাস মিডাক এ্যালী'-এর সেটিং গ্যামিলিয়াতে। ঘিটানী মনে করেন, তিনি মাহফুজ-এর উত্তরাধিকার। তাঁরা উভয়েই একই স্থানকে উপন্যাসের সেটিং হিসেবে বেছে নিয়েছেন, তাতে তাঁদের জেনারেশনগত সম্পর্ক অর্থাৎ পুরাতন ও নতুনের মধ্যে এক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সম্পর্কের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কায়রো নগরী ও মিশরের সাংস্কৃতিক

www.pathagar.com

পরিচিতির ক্ষেত্রে তাদের অভিন্ন মতের কারণে। মাহফুজ তাঁর পরবর্তীকালের মিশরীয় লেখকদের এ মর্মে আশ্বস্ত করেন, তাঁরা যেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে পরিচিত পথ পরিহার করে নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেন।

নাগিব মাহফুজ মিশরীয় উপন্যাসের জন্মদাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তিনি কোন আঞ্চলিক লেখক নন, কিংবা তাঁর প্রভাব যে কেবল বিশেষ কোন অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাও নয়। এখানে একটা বৈপরীত্য উল্লেখ করার মতো। মিশর-এর আকৃতি ও এর নিজস্ব ক্ষমতার সুবাদে, সকল আরবীয় মতাদর্শ ও আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু মিশর। এর অতিরিক্ত যোগ্যতা আছে মিশরের। বই-পত্র ছাপা, ছায়াছবি নির্মাণ, রেডিও ও টেলিভিশন ইত্যাদির কেন্দ্র হলো এই মিশর। মিশরের মাধ্যমে এসব বই ও ছায়াছবি অন্যত্র যায়; এখানকার বেতার ও দূরদর্শনের মাধ্যমে আরবের অন্য অঞ্চলের লোকদের কথা শোনা যায়। মরক্কো ও ইরাক-এ দু'দেশের আরবদের মধ্যে কমন কোন বিষয় নেই বললেই চলে। এ দু'দেশের আরব জনগণ মিশরের ছায়াছবি বা দূরদর্শনের ধারাবাহিকগুলি দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসছে। তারা এ ছায়াছবি ও ধারাবাহিকগুলির সাথে নিজেদের সংযুক্ত করেছে। তেমনিভাবে, শতাব্দীর শুরু থেকে আধুনিক আরবী সাহিত্য মিশর হতেই বিকশিত হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মিশরের কথা সমগ্র আরব জগতের প্রভাবশালী দৈনিক আল-হারাম-এর আবাসিক লেখক ছিলেন নাগিব মাহফুজ, দীর্ঘ বছর ধরে। তাঁর লিখিত উপন্যাসের চরিত্র ও বিষয়বস্তু অন্যান্য আরব ও ঔপন্যাসিকদের নিকট সুবিধাজনক এক আদর্শ হিসাবে বিবেচিত; কিন্তু কোন ঔপন্যাসিকই মাহফুজ-এর উপন্যাসকে সব সময় ছাপিয়ে উঠতে পারেননি। আরব ঔপন্যাসিকগণ এমন এক সময় মাহফুজ-এর উপন্যাসকে আদর্শ ভেবেছে, যখন পশ্চিমা সাহিত্য পাঠকেরা সামগ্রিকভাবে আরবী সাহিত্যকে প্রান্তিক হিসেবে বিবেচনা করেছে। এই পশ্চিমা পাঠকদের দৃষ্টিতে খ্যাতমাত্র লেখক যেমন, ফুয়েনটিস (Fuentes), গার্সিয়া মার্কুয়েজ, সোয়েংকা এবং রুশদী সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব হিসেবে বিবেচিত।

আমি সমকালীন আরব উপন্যাসের পটভূমিকা নিয়ে আলোচনা করলাম। মিশরীয় নয় এমন ক্ষমতাবান ঔপন্যাসিক আরবী ভাষায় উপন্যাস লিখতে আগ্রহী। নাগিব মাহফুজ-এর আরবের ওপর প্রভাব বিষয়ক উদ্বেগ, অগ্রাধিকার লাভ করে। ইজিপ্ট-এর মতো একটা দেশে, যেখানকার সমাম সেটেল্ট ও ইন্টিগ্রেটেড, সেখানে মাহফুজ-এর মতো লেখকের মনে উদ্বেগ থাকবে। এ দেশে সম্ভবপর যা কিছু ঘটছে, তার গতিধারা নির্ধারণ করে দেওয়ার জন্যই কেবল নয়, সে উদ্বেগ থাকছে ভেঙ্গে যওয়া, বিকেন্দ্রীত, এক দেশকে নিয়ে, সেখানে যা ঘটছে তার গতিধারা নির্ধারিত করে দেওয়ার বিষয়ে। আপনি যদি আপনার বাসস্থান ছেড়ে অন্যত্র কোন আরব দেশে যান, তবে ফিরে এসে দেখবেন, যে অবস্থায় বাসস্থান ছেড়ে গিয়েছিলেন, আপনার বাসস্থান সে অবস্থায় নেই। সেখানকার স্কুল, হাসপাতাল,সরকারী দপ্তর অন্যান্য অঞ্চলের স্কুল-কলেজ-সরকারী দপ্তরের মতো কাজ করে না, করলেও তা কাজ করে অল্প সময়ের জন্য। সেখানকার জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, অন্যান্য সমাজে যেমন হয়, তেমনভাবে রেকর্ডেড হয় না। এর নিবন্ধনকরণ সম্পাদিত হয় না। সেখানকার জীবনের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ধরনের। সেখানে অর্থ ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে জীবনের সমস্যা মীমাংসিত হয় না, সেখানে সমস্যার নিরসন হয়

www.pathagar.com

বন্দুক ও রকেট ... নেভের মাধ্যমে। প্রতিদিন দুর্যোগ ঘটে দু'টি দেশে, প্যালেস্টাইন ও লেব... এ দেশ দু'টির প্রথমটি, অর্থাৎ প্যালেস্টাইন-এর অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি ... ১৯৪৮ সালে, কিন্তু এর পুনর্জন্ম ঘটে ১৯৮৮-এর ১৫ নভেম্বরে। দ্বিতীয় দেশ ...নের আত্মহনন শুরু হয় ১৯৭৫-এর এপ্রিলে। এ আত্মহনন শেষ হয়নি। উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসীগণের আত্ম-পরিচিতি হুমকির সম্মুখীন। তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়ার পথে। যেমন প্যালেস্টাইন-এর ক্ষেত্রে দেশের নিজস্ব পরিচিতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তেমনি লেবাননের ক্ষেত্রে। এমনতর দেশের সমাজে উপন্যাস বিপজ্জনক ও সমস্যা সংকুল এক সাহিত্য মাধ্যম। যেমনটি সাধারণভাবে হয়ে থাকে, এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু রাজনীতি জরুরীভাবে। এই উপন্যাসে অস্তিত্ববাদ স্থান পায়। সুস্থিত সমাজে যেমন মিশরে, সাহিত্য যে রূপলাভ করবে, প্যালেস্টাইন ও লেবানন সমাজে তেমনটি আশা করা যায় না। প্যালেস্টাইন ও লেবানীজ লেখকগণ তাদের লেখনীতে প্যারডি ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেন। লেবানীজ ও প্যালেস্টাইন লেখকগণ সাহিত্যে সমাজ জীবনকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং তার মধ্যে যে প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটে, তার ফল হয় অনিশ্চিত। প্যালেস্টাইন ও লেবানীয় উপন্যাসের ক্ষেত্রে ফরম যেন একটা এ্যাডভেঞ্চার। উপন্যাসের বর্ণনাভঙ্গী অনিশ্চিত ও ঘোরানো-প্যাঁচানো এবং চরিত্রচিত্রণ, কেবল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি ছাড়া কিছু নয়। তাতে ভাষার কারুকার্যের বিষয়টি জরুরী নয়।

প্যালেস্টাইন-এর দু'জন উপন্যাসিক ঘাসান কানাফেনি এবং ইমিলী হাবিবী। ঘাসান কানাফেনি-এর উপন্যাসে লেখক চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, আর ইমিলী হাবিবী-এর উপন্যাস পরীক্ষা-নিরীক্ষাধর্মী। কানাফেনী-এর উপন্যাস রিজাল ফিল সারনস (১৯৬৩)-এর ইংরেজি নাম মেন ইন দি সান। প্যালেস্টাইনীদের ক্ষতি ও মৃত্যুর গল্প যেমন সোচ্চার হওয়ার কথা, তা হয়নি; এর নিজস্ব গদ্যের কারণে প্যালেস্টাইন গল্পটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার বাক্যভঙ্গী এমনভাবে নির্মিত যে, তা থেকে পাঠকদের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব হয় না, কখন গল্প শুরু হচ্ছে, আর কোথায় ঘটনাটি ঘটছে। বাক্যগুলি তিনটি বাক্যের একটা গ্রুপ রচনা করে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল এক অবস্থা রচনা করে। কানাফেনী এর জটিল বর্ণনাধর্মী রচনা "*মা তাবাক্কা লাকুম*" যার ইংরেজী অনুবাদ "*হোয়াট ইজ লেফট ফর ইউ*" (১৯৬৬)-এ তাঁর বাক্যগঠন রীতি এমন এক স্তরে উপনীত, যে ছোট্ট একটা প্যারাগ্রাফ-এ পাঠকের প্রসঙ্গ উঠলে বলতে হয়, অনেক বক্তা কথা বলে ওঠে, এবং কথা বলতে তাদের কোন বাধা থাকে না, কোন চিহ্ন ব্যবহার করে না, কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে না, কোন সীমা থাকে না। প্যালেস্টিনিয়ান যে চরিত্রগুলি কানাফেনী অংকন ক... যে সুখের নয়, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই যখন গল্প, চরিত্র ও ভাগ্য বেসুরা হয়ে একত্রে এসে মেলে, তখন এক ধরনের ... হয়ে ওঠে ... লেখা এক উন্যাসে তিনজন উদ্বাস্তু কুয়েত-ইরাক সীমান্তে ... ট্রাক-এ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। পরবর্তীতে লেখা এ ... ইত্যাদি করে। এই স্বামী নোংরা কথা বলে। ব... মরিয়াম-এর ভাই হামিদ এক ইসরাইলীর সাথে ...

ইমিলী হাবিবী-এর গ্রন্থ *পেসেপটমিস্ট* (১৯৭৪)। প্রচুর প্যারোডি আর প্রহসনে ঠাসা এ বইটি। পাঠক এ গ্রন্থটি পাঠ করে বিস্মিতবোধ করে, মনে মনে আঘাত পায়। লেখক যেন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করে। উপন্যাস রচনার এক নির্ধারিত মানদণ্ড আছে। প্রত্যেক উপন্যাসিক তা অনুসরণ করে থাকেন। হাবিবী এ বিষয়ে কোন ছাড় দেন না। পেসিমিজম ও অপটিমিজম-এ দুটি শব্দের মিশ্রণে পেসিমিটিস্ট শব্দটির উদ্ভব। এ উপন্যাসটির প্রধান চরিত্রটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি এশপ, আল-হারিরি, কাফকা, ডুমা ও ওয়াল্ট ডিজনী-এ সব ব্যক্তির চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির মিশ্রণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নস্তরের রাজনৈতিক প্রহসন, বিজ্ঞানভিত্তিক প্রহসন, অভিযান, বাইবেল উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী এসব উপাদানকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ রচিত হয়েছে। হাবিবী-এর গদ্য সেমি কথোপকথনের ভঙ্গী ও সেমি ক্ল্যাসিক্যাল গদ্য-এ দুয়ের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যে বন্দী। অপরদিকে কানাফেনির রচনাশৈলীতে মাঝেমধ্যে কৃত্রিম অতি নাটকীয়তার ছাপ থাকলেও তার উপন্যাসগুলোর রচনা শৈলী নাগিব মাহফুজ এর রচনা শৈলীর সমতুল্য হয়ে ওঠে যখন আমরা তার উপন্যাসে অনুসৃত শৃংখলা ও ঘটনাপ্রবাহ এ প্রসঙ্গকে বিচার বিশ্লেষণ করি। ইমিলী হাবি-বী-এর জগৎ র‍্যাবালেই-এর উচ্ছ্বসিত কল্পনা ও অশ্লীল রসিকতাপূরণের জগৎ। এ জগৎ জেমস জয়েস সৃষ্ট জগৎ। হাবিবী যেন মিশরীয়দের ব্যালজাক এবং গলসওয়ার্দী। প্যালেস্টাইন সমস্যা এখন পঞ্চম দশকে পদার্পণ করেছে। এ সমস্যার ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মেঘে ঢাকা। হাবিবি-এর উপন্যাসের মাধ্যমে আমরা স্পেনের যে পিকারেক্স উপন্যাসের প্রেম আদর্শ গড়া আছে, তার এক ত্রুটিপূর্ণ উদাহরণ লাভ করলাম। তার উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণহীনভাবে এদিক ওদিক বেড়ে চলে যেন তার মধ্যে পাঠক এক বর্ণউন্মাদনার সাথে পরিচিত হয়। অযত্নে লেখা এ উপন্যাসটি নিয়ে পাঠক গর্ববোধ অনুভব করে। আরবী গদ্যে এ উপন্যাস। নাগিব মাহফুজ-এর আরবী গদ্য রাজর্সিক।

লেবানন দেশটিতে আমরা অস্বাভাবিকত্ব লক্ষ্য করি। এখানকার সমাজ প্রতিবাদমুখর সর্বদাই। উপন্যাস বা গল্পের মধ্যে এ সমাজ প্রতিধ্বনিত হয়। সমগ্র লেবানন প্রতিফলিত হয়েছে সাংবাদিকতা, জনপ্রিয় গান, চিত্তবিনোদনের বিভিন্ন ব্যবস্থাযুক্ত রেস্তোরাঁ, প্যারোডি ও প্রবন্ধের মধ্যে। ১৯৭৫-এর এপ্রিলে দেশটিতে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয় সরকারীভাবে। এর প্রভাবে দেশটির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আশা তিরোহিত হয়। দেশটি দুর্বল হয়ে পড়ে। লেবানন-এর পাঠকগণকে লেখনীর মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন পড়ে যে, এ দেশটি একটি আরব দেশ এবং সব ভাষা ও ঐতিহ্য নাগিব মাহফুজ-এর মতো লেখকদের ভাষা ও ঐতিহ্যের মতো। লেবাননে উপন্যাস সাহিত্য মাধ্যম হিসেবে সকল নয়া উপন্যাসের স্থান দখল করেছে আত্মজীবনীমূলক বাণী (লেবাননের নারীগণ প্রচুর পরিমাণে লিখছেন), সাংবাদিক প্রতিবেদন, অন্য উৎস থেকে ধার করে নির্মাণ করা কোন সাহিত্য রচনা, যাকে বলা যেতে পারে লেখকহীন আলোচনা।

নাগিব মাহফুজ-এর অপর মেরুতে অবস্থিত আছেন উজ্জ্বল এক ব্যক্তিত্ব যার নাম ইলিয়াস খউরী (Elias Khoury)। আমরা রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও গতিশীলতা প্রত্যক্ষ করি তার রচনায়। তার প্রথম পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস *দ্য লিটিল মাউন্টেন* (১৯৭৭)

যা সর্বপ্রথম ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। খউরীর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি, প্রচুর পরস্পর বিরোধিতা। তাকে যখন তার কালের অন্যান্য লেখকদের সাথে তুলনা করি, তখন এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। ঘিটানী (Ghitany)-এর মতো খউরী সাংবাদিকতা পেশার সাথে জড়িয়ে ছিলেন প্রায় বার বছর। ঘিটানী-এর মতো খউরী উদ্ভাবনী শক্তি ও জন্মগত অসাধারণ শৈলীর অধিকারী, তবে এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। তা হলো ঘিটানীর রাজনৈতিক কোন অঙ্গীকার নেই, অপরদিকে খউরী তার জীবনের সূচনালগ্ন থেকে একজন রাজনৈতিক শক্তি। ষাটের দশকে লেবানন ও প্যালেস্টাইন-এর রাস্তা-ঘাটে যে সংঘাতময় রাজনীতির চর্চা হয়েছিল, তার মধ্য দিয়ে তিনি গড়ে উঠেছিলেন। ১৯৭৫-এর হেমন্ত ও ১৯৭৬-এর শীতে লেবানন-এর গৃহযুদ্ধে লেবানন-এর শহরে পাহাড় অঞ্চলে রক্তক্ষয়ের যে বর্ণনা দ্য লিটিল মাউন্টেনে আছে তা তার অভিজ্ঞতাপ্রসূত। উভয় লেখকের মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্যটি হলো, খউরী এক প্রকাশনা শিল্পের সাথে জড়িত। তিনি একদশকব্যাপী বৈরুতের একটা প্রভাবশালী প্রকাশকের সাথে কর্মরত ছিলেন। এ সময়ে তিনি আধুনিকতা উত্তর তৃতীয় বিশ্বের বিখ্যাত ক্লাসিক রচনা গুণের বিশেষ করে ফুয়েন্টিস (Fuentes) মার্কুয়েস ও অস্টুরিয়াস (Asturias)-এর রচনাবলী আরবী ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ঘিটানীর এসব অভিজ্ঞতা ছিল না।

খউরী একজন উচ্চমানের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচক। প্রগতির পুরোধা কবি এডনিস এবং তার বৈরুত কোয়ার্টারলি মায়োকিফ-এর সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। যে সব লেখক মায়োকিফ পত্রিকার সাথে সংযুক্ত ছিলেন তারা গত সত্তর দশকে আধুনিকতা বিষয়ে নানা গবেষণা করেছিলেন। এই গবেষণালব্ধ জ্ঞান এবং তার নিজের পেশা সাংবাদিকতা এ দুয়ের সাহায্যে, খউরী, খ্রীস্টিয়ান লেবানীজ লেখক কুরের মধ্যে একাকী, পশ্চিম বৈরুতের কেন্দ্রস্থল থেকে এবং নিজের জীবনের ওপর যে ঝুঁকি আসতে পারে, সে সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে, দক্ষিণ লেবাননের ইসরাইলীর দখলদারিত্বের বিরোধিতা করেছেন। খউরী জয়েসীয় অর্থে এক উপন্যাস রচনা করলেন, যাতে প্রকাশ পেয়েছে তার গভীর জাতীয়তাবোধ। খউরী আধুনিকতা উত্তর একজন সাহিত্যিক।

এখানেই নাগিব মাহফুজ-এর সাথে পার্থক্য। মাহফুজ এর সাহিত্যচর্চায় ফ্লবারিয় আত্মমগ্নতা আছে। তিনি কম-বেশী আধুনিক ধারা অনুসরণ করেন। সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে খউরী-এর ধারণা বিহবল হয়ে যাওয়া লেবাননের খণ্ডিত বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি তার ধারণার কথা ব্যক্ত করেছেন তার প্রবন্ধাবলীতে। তিনি বলেছেন, অতীত সুখকর নয়, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় ঢাকা, বর্তমান অজ্ঞাত। তিনি মনে করেন, আধুনিক আরবী লেখনীর সুন্দরতম ধারাটি আরবী ঐতিহ্যের সহজাত স্থায়ী ও উচ্চমানের সাহিত্যের হুবহু অনুসরণ নয়, কিংবা তা পশ্চিমা জগৎ হতে আমদানী করাও নয় (যেমন উপন্যাস) এ ধারাটি হলো ঐ সব রচনা হতে উৎসারিত, যেগুলির কোন বিশেষ আকার বা ফরম নেই, যেমন, তৌফিক আল হাকিম-এর '*ডাইরীম অফ-এ কান্ট্রি লইয়ার*', তাহা হোসেন-এর '*স্ট্রীম অফ ডেইজ*', এবং জিব্রান ও নুআইমার রচনাবলী। ইলিয়াস খউরী এর মতে, এসব রচনা পাঠকগণ গভীর আগ্রহের সাথে পাঠ করে। এগুলিই হলো নব্য আরবী সাহিত্য। এ সাহিত্যের মূল অবশ্য চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসরণকারী ঔপন্যাসিক সৃষ্ট ঐতিহ্য আশ্রয়ী উপন্যাস-এর মধ্যে নিহিত নয়। ইলিয়াস

www.pathagar.com

খউরী এসব আকার বা ফরমহীন সাহিত্যের মধ্যে এমন সব উপাদান খুঁজে পান, যাকে পশ্চিমা সাহিত্য তাত্ত্বিকগণ পোস্ট মর্ডান বা উত্তর আধুনিক নামে অভিহিত করে দেন। আত্মচরিত গল্প, উপকথা, অন্য শিল্পীর অনুকরণে রচিত সাহিত্য, আত্মলালিকা, যা এক ভূতুড়ে নস্টালজিয়ার স্পর্শে উজ্জীবিত।

দ্য লিটিল মাউন্টেন- এক আকারহীন গ্রন্থ। এ এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত সাহিত্য। এই ফরমহীন গ্রন্থের মধ্য দিয়ে খউরী তার জীবনের গল্প বর্ণনা করছেন। এ বইটি পাঠ করে আমরা জানতে পারি তার জীবনের প্রথম বছরগুলো কেটেছিল আশ্রাফিয়াতে। আশ্রাফিয়া হলো খ্রীস্টিয়ান ইস্ট বৈরুত যা লিটিল মাউন্টেন নামে পরিচিত। এখান থেকে তিনি নির্বাসিত জীবন শুরু করেন এবং জাতীয়তাবাদীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। এই জাতীয়তাবাদী আদর্শ হলো মুসলিম ও প্যালেস্টাইনদের নিয়ে এক যৌথ মরু। আমরা জানতে পারি, বৈরুতের প্রধান শহরে এবং লেবাননের পূর্বাঞ্চলের পাহাড়িয়া অঞ্চলে যেসব সামরিক অভিযান পরিচালিত হয় ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে, তার কথা। শেষে নির্বাসিত ব্যক্তির সাথে এক বন্ধুর মোলাকাত হয়, প্যারিস-এ। গ্রন্থটি পাঁচ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ঘটনাক্রম আশ্রাফিয়ার এক পারিবারিক গৃহ হতে বিকশিত হয়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে। এ বাসায় খউরী কিংবা গ্রন্থটিতে ঘটনার বর্ণনাকারী কেউই ফিরে আসতে সমর্থ হয় না। লেবাননের গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে। বইটির সব পরিচ্ছেদই যখন শেষ হয়, তখন পাঠকগণ লক্ষ্য করেন যুদ্ধ শেষ হয়নি, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ছন্দের কোন উত্থানপতন নেই। উরীতার প্রজ্ঞাবলে ১৯৭৭ সালে লিখিত এই *দ্য লিটিল মাউন্টেন* গ্রন্থটিতে লেবাননের রাজনৈতিক, সামাজিক সব ঘটনার খারাপ অবস্থার এক চিত্র প্রত্যক্ষ করার কথা বর্ণনা করেছেন। এই চিত্রের মধ্যে পরিসমাপ্তি ঘটার কথা লেবাননের আধুনিক ইতিহাসের। এ অবস্থা থেকে জন্ম নেবে অকল্পনীয় সব বিপর্যয়– গণহত্যা, সিরিয়া ও ইসরাইলের হস্তক্ষেপ, চলমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা, দেশবিভক্তি ইত্যাদি সব ঘটনা।

প্রথমত '*দ্য লিটিল মাউন্টেন*'-এর রচনা শৈলীতে পুনরাবৃত্তি লক্ষ্যণীয়। বইটির বর্ণনাকারী এই পুনরাবৃত্তির পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছে এ বিষয়টি প্রমাণ করতে যে, অসম্ভব ঘটনাও ঘটতে পারে। বর্ণনাকারীর মতে, নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য এই পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। মনে মনে নানান সব ঘটনা স্মরণ করতে হয়, যেন সেগুলোর মধ্য হতে এক অন্তর্দেশীয় প্যাটার্ন গড়ে ওঠে; গড়ে ওঠে এমন সব নিয়ম-কানুন, যার দ্বারা সামাজিক সকল বিপর্যয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিপর্যয়, সেই গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। পুনরাবৃত্তির পথ বেয়ে আসে গীতিধর্মীতা, আসে ঐ সব প্রতীকধর্মী চিত্র যাতে অংকিত ভীতিপ্রদ সব কথা "মোঙ্গলদের কাল হতে আমরা মাছির মতো মরছি। আমরা মরছি কোন চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকেই। আমরা অসুখে মরছি, মরছি বিলহারজিয়া রোগে, মরছি প্লেগে। আমাদের কোন সচেতনতা নেই, কোন সম্মানবোধ নেই, কিছুই নেই।"

এমনি চিত্র দ্রুত আঁকা হয়ে যায়, আবার সেগুলি কে অঙ্কিত করল, তার নাম যায় হারিয়ে।

খউরীর মতে, লেখকের রচনাশৈলী হলো কমেডির আত্মার মতো হাস্যরসিকতাময় এবং তা কোন শ্রদ্ধার বিষয় নয়। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য আছে, যার জন্য মানুষ যুদ্ধ করে, যেমন খৃষ্টধর্মের সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ করে অনেকে। সেই ধর্মীয় বৈচিত্র্যের

www.pathagar.com

কথা কে অনুধাবন করতে পারবে, যদি গীর্জাগুলো পরিণত হয় সৈনিক ক্যাম্পে আর ফাদার মার্সেল-এর মতো ধর্মযাজক হয়ে ওঠেন বাচাল ও উন্মাদ জাতিগত বিদ্বেষী? গৃহযুদ্ধের প্রভাবে লেবাননের দৃশ্যপট প্রভাবিত হয়েছে। এই লেবাননকে ঘিরেই ইলিয়াস খউরীর ভবঘুরে জীবন গাঁথা রচিত। তার দৃষ্টিতে এই লেবাননে অনিশ্চয়তা, এক উৎকণ্ঠার দেশ। এমন লেবাননের কথা ভাবেনি কেউ। শৈশবের উদ্বেগহীন শান্তির কালই হোক, বা প্রাচীন গোষ্ঠী শ্রেণী বা পরিবারের দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক নিশ্চয়তাই হোক, লেবানন এক অনিশ্চয়তার দেশ। খউরী-এর চিত্র থেকে যা বেরিয়ে আসে, তা সুগঠিত, সুবিবেচিত কোন ফরম নয়, যেমন নাগিব মাহফুজ-এর মত শিল্পী নির্মাণ করেছিলেন। সেখান থেকে লেবাননের এমন সব অঞ্চলের ছবি বেরিয়ে এসেছে যেখানে পাঠক পরিচিত হয় অর্ধ্ব-উচ্চারিত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, নানান সব স্মৃতি ও অসমাপ্ত সব কর্মের সাথে। মাঝে মধ্যে খউরী পাঠকদের কাছে কোন কোন বিষয় অসাধারণ স্পষ্ট করে তোলেন। অল্প কথার মধ্য দিয়ে ধর্ম, নৈতিকতার অসারত্ব তুলে ধরেন। এমনি একটা কাব্যঃ "পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করল যে, তারাও লুট-তরাজ করতে পারে।" তিনি যখন সমুদ্র সৈকতের ছবি আঁকেন, তখন তাতে দুর্বোধ্যতা থাকে না। কিন্তু সমগ্র রচনাতে লেখকের সঠিক নির্দেশনার অভাব আছে, বিভ্রান্তকর এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং তা দূর করা সম্ভব নয়।

খউরী-এর রচনার মধ্যে আমরা অনেক তথ্যের সাথে পরিচিত হই। চমৎকার তথ্যের অনুভূতি পাই আমরা। তার "*দ্য লিটিল মাউন্টেন*" গ্রন্থে আমরা এক সমাজকে চিত্রিত হতে দেখি। এই গ্রন্থের বর্ণনাকারী তার গৃহ ছেড়ে চলে আসে। সে তার গৃহ ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। সে বৈরুতের রাস্তায়। বৈরুতের পাহাড়ে যুদ্ধ করে চলে। সে তার চোখের সামনে তার সঙ্গীদের মৃত্যুবরণ করতে দেখে। মৃত্যু হয় তার প্রিয়জনের, তার ভালবাসা। প্যারিস মেট্রোর মঞ্চে তার সাথে বিক্ষিপ্ত মনের অধিকারী এক পুরাতন অভিজ্ঞ সৈনিকের সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে বইটির পরিসমাপ্তি গটে। খউরী রচিত '*দ্য লিটিল মাউন্টেন*-এ রোমাঞ্চকর ভাব প্রবণতা পূর্ণ মিলনান্তক কোন রচনা নয়। তিনি সচেতনভাবে কোন মেলো-ড্রামা লিখতে চাননি। গল্প রচনার প্রচলিত রীতিও তিনি অনুসরণ করেননি। এ বিষয়টিই গ্রন্থটির মৌলিকত্ব। খউরী তার গল্পকে পর্বে বিভক্ত করেছেন; তবে এ কাজ করতে গিয়ে তিনি পূর্ব পরিকল্পিত কোন ছক অনুসরণ করেননি। পৃথিবীর অধিবাসী নয় এমন এক বন্দী তার বন্দী দশা থেকে মুক্তি পেলো মুক্তির স্বাদে উদ্বেলিত হয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে, সামনে-পিছনে ঘুরে বেড়ায়। বিস্ময়করভাবে সে সুন্দরভাবে পৃথিবীর ভাষা ব্যবহার করছে। তবে এ ভাষা ব্যবহারে সে বিব্রত বোধ করছে কারণ এ ভাষা পৃথিবীর মানুষের ভাষার মত হুবহু এক নয়। এরকম কল্পিত এক বন্দীর সাথে ইলিয়াস খউরী-এর গ্রন্থের প্লটকে তুলনা করা যেতে পারে। খউরী-এর রচনায় লেবানন-এর বাস্তব দুর্ভাগ্য চিত্রিত শেষমেশ এ কথাই বলা যেতে পারে। এর বিপরীতে নাগিব মাহফুজ-এর ফিক্সান-এ উন্নতমানের ফরম-এর সাথে পরিচিত হয় পাঠকেরা।

আমি মনে করি, বর্তমানে মধ্য প্রাচ্যের ঘটনাধারাকে যদি আলোচনায় আনা হয়, তবে খউরী মধ্যপ্রাচ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক যে বাস্তবতার ছবি অংকিত করেছে, সেটাই

www.pathagar.com

বাস্তবভিত্তিক ছবি। সাহিত্য মাধ্যম হিসেবে উপন্যাস সব সময়ই রাষ্ট্রের মূল আত্মার সাথে সংযুক্ত, কিন্তু আরব বিশ্বের প্রেক্ষাপটে একটা আধুনিক রাষ্ট্র হলো কলোনীতন্ত্রের অভিজ্ঞতা হতে উৎসারিত। উপরের কোন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সৃষ্ট এবং বংশ পরম্পরায় এ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রবাহমান থাকে। এ অবস্থায় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে পরিশ্রম, যে রক্তক্ষয় ঘটে এ ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। নাগিব মাহফুজ-এর অর্জন বিশাল। বিংশ শতকে আরব লেখকের কাছে যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল, তারই প্রভাবে নাগিব মাহফুজ মাধ্যম হিসেবে এক প্রচলিত মাধ্যমকে বেছে নিয়েছিলেন এবং তাকে ব্যবহার করেছিলেন এক সম্মানজনক অর্থে। এ জন্য তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা ঠিক হবে না। তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে উপন্যাসকে সাহিত্য মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি এই উপন্যাসে মিশরের মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আরব পরিচিতি খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে মিশরীয় রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করেছেন, নিজের যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু এই রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতি তার কোন বিদ্বেষ নেই। কিন্তু ইলিয়াস খউরীর কৃতিত্ব ভিন্ন মেরুতে অবস্থিত। ইতিহাস তাঁকে মাতৃপিতৃহীন করেছে। তিনি সংখ্যালঘু খ্রীস্টান। তাঁর ভাগ্য যাযাবরের ভাগ্য। কারণ ঐ অঞ্চলে অন্য সংখ্যালঘুদের সাথে খ্রীস্টধর্মাবলম্বীগণ জাতির মূলধারা থেকে পৃথক যে ধারা গড়ে তুলেছে, সেই পৃথক ধারার সাথে খউরী নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি। তাঁর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য চিন্তার যে রূপ, তাহলো সমন্বয়ের এক রূপ। এর কারণ তিনি একজন আরব এবং তিনি আরব সংস্কৃতির একটা অংশ। তাঁর সেই সৌন্দর্য ধ্যানের মধ্যে আছে পরিত্যাগ, প্রবাহমানতা এবং অনিশ্চয়তা। আরবরা নিজের অস্তিত্ব খোঁজ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালনার সময় যে কঠিন দিনের সম্মুখীন হয়, খউরীর লেখায় সে দিনগুলির কথা আছে। পূর্ব আরবে প্যালেস্টাইন 'ইন্তেফাদা' আন্দোলনের মধ্যে এখন খউরীর উচ্চারিত আন্দোলন প্রকাশ পাচ্ছে। এই 'ইন্তেফাদা' আন্দোলনের মাধ্যমে নতুন শক্তির জন্ম হয়েছে, জাতীয় জীবন আত্মপ্রকাশিত হচ্ছে এবং এর প্রভাবে নাগরিক জীবনে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। মহাম্মদ দরভিস-এর মতো ইলিয়াস খউরী একজন শিল্পী। তিনি নির্বাসিতদের কণ্ঠ। তিনি আটকে পড়া উদ্বাস্তুদের কণ্ঠ। আরব ভূখণ্ডে সীমানা হারিয়ে যাচ্ছে। আত্মপরিচিতি পরিবর্তিত হচ্ছে, সংস্কারপন্থী দাবী উত্থিত হচ্ছে, নতুন নতুন ভাষার প্রতি আনুগত্য প্রকাশিত হচ্ছে। এ সবই ইলিয়াস খউরীর শিল্পের মধ্যে উচ্চারিত। খউরীর রচনাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হলে, নাগিব মাহফুজকে বিদায় জানাতে হবে। এ বিদায় অবশ্যম্ভাবী, তবে এ বিদায়ের মধ্যে থাকবে এক গভীর শ্রদ্ধাবোধ।

ছয় বছরের মধ্যে প্রথম দরিভিস, খউরী ও আমি আলজিয়ার্স-এ মিলিত হই। প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল কাউন্সিল-এ। শেষ কথা হিসেবে এ বিষয়টি উল্লেখ করতে পারি। এই ঘটনার মধ্যে বিদ্রূপ ও স্ববিরোধিতা আছে। দরভিস 'রাষ্ট্রের ঘোষণা' পত্রটি লিখলেন। আমি তাঁকে পুনরায় খসড়া করতে এবং এটা ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করতে সাহায্য করি। এই ঘোষণাপত্রের সাথে প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল কাউন্সিল ঐতিহাসিক প্যালেস্টাইন অঞ্চলে দুটি রাষ্ট্রের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়। এর একটি হবে আরবদের আর একটি হবে ইহুদীদের জন্য। তারা পরস্পর সহাবস্থান করবে। উভয় জাতিই

www.pathagar.com

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সুনিশ্চিত করবে। আমরা যা করেছি, তার উপর কান্তিহীনভাবে, তবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে খউরী মন্তব্য করেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, হয়ত লেবাননও হবে প্যালেস্টাইন-এর মতো একটা দেশ। আমরা তিনজনই ছিলাম অংশগ্রহণকারী ও দর্শক। আমরা আলোচনায় গভীরভাবে প্রভাবিত হই। তবে দরভিস ও আমি এটা লক্ষ্য করে উদ্বিগ্ন হলাম যে, রাজনীতিবিদগণ আমাদের লেখা টেকস্ট বিকৃত করেছেন। আরো বেশী উৎকণ্ঠিত হলাম একথা ভেবে যে, আমরা যে রাষ্ট্রের কথা বলেছি, তা একটা ধারণা মাত্র। আমাদের মতো নির্বাসিতদের কথা উঠলে বলতে হবে, নির্বাসিত ব্যক্তির অভ্যাস ও উৎকেন্দ্রিকতা পরিবর্তিত হয় না। তবে আলোচনায় যখন অল্প সময়ের জন্য কেউ কথা না বলে, তখন টেকস্ট-এ প্যালেস্টাইন ও লেবাননের নাম জীবন্ত হয়ে পড়ে।

ইত্তেফাক, ১৭ অক্টোবর '০৩

www.pathagar.com

অপবাদ, সংশোধনবাদী রীতি

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ
অনুবাদক : শরীফ আতিক-উজ-জামান

ইসরাইল ও প্যালেস্টাইনের মধ্যে চূড়ান্ত সমঝোতার যে প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে সেখানে সীমানার বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪৮ সালে একটি সমগ্র জাতি হিসেবে যারা বাস্তুহারা হয়েছিল সেই আদি ফিলিস্তিনীদের অধিকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ইসরাইলের দক্ষিণপন্থীরা (জেবতিনস্কি ও নেতানিয়াহু'র সংশোধনবাদীরা) সমস্তভূখণ্ড দাবি করে অনেক দূর এগোবে বলে মনে হয়। সম্প্রতি রক্ষণশীল ইহুদীদের ছোট্ট মাসিক মুখপত্র *Commentary*'র সেপ্টেম্বর সংখ্যায় আমার ব্যক্তিজীবন নিয়ে কটাক্ষপূর্ণ খবর ছাপা হয়েছে যেখানে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, আমি কখনোই ফিলিস্তিনী ছিলাম না এবং আমার পরিবার কখনোই ১৯৪৮ সালে বাস্তুহারা হয়নি। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, গত বিশ বছরের মধ্যে এটা আমার উপর *Commentary*'র তৃতীয় দফা আক্রমণ। প্রথম ১৯৮১ সালে আমার বই *The Question of Palestine* নিয়ে সমালোচনার নামে আমাকে তুলোধুনা করা হয়; দ্বিতীয়দফা ১৯৮৮-৮৯ সালের দিকে *The Professor of Terror* শিরোনামে ছাপা হয় অতি অসংযত এক নিবন্ধন; আর তৃতীয়টি হল এই যার রচয়িতা জাসটাস উইনার নামে একজন আমেরিকান বংশোদ্ভূত ইসরায়েলি যিনি জেরুজালেমে অখ্যাত এক স্ব-ঘোষিত 'নব্য-রক্ষণশীল' গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করেন। তার আগে তিনি 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'র বিরুদ্ধে বলবার জন্য ইসরাইলের আইন মন্ত্রক কর্তৃক নিয়মিত মাসোহারা পেতেন। উইনার তার যুক্তিসমূহ মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য গর্বভরে বলেছেন যে, তিনি আমার উপর তিন বছর পড়াশুনো করে, ৮৫ জন লোকের সাথে কথা বলে ও কয়েকটি মহাদেশ সফর করে আমার বক্তব্যে অনেক অসামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছেন, যেগুলোকে তিনি 'আমার গল্প' বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং নিজের মনগড়া বক্তব্যে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই কাজ করার জন্য তিনি তহবিল যোগাড় করতে সক্ষম হয়েছেন যদিও চাতুর্যের সাথে চেপে গেছেন কার কাছ থেকে, কি জন্য এবং কত পেয়েছেন। শুধু বলেছেন যে, মাইকেল মিলকেন ও তার প্রতিষ্ঠান এই অর্থ যুগিয়েছে।

কিন্তু মজার ব্যাপার হল, এই তিন বছর ধরে নিষ্ঠার সাথে গবেষণা করার সময় উইনার একটিবারের জন্যও আমার সাথে যোগাযোগ করেননি। এই বর্জন সত্যিই অসাধারণ, আর তা করেছেন এমনই একজন ব্যক্তি যিনি নিজেকে যুগপৎ পণ্ডিত ও সাংবাদিক

www.pathagar.com

ভাবতে ভালোবাসেন। কিন্তু কাজটিতে সাংবাদিকতা বা পাণ্ডিত্য কোনোটিরই তেমন কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। তিনি বলছেন তিনি একবার আমার সহকারীর সাথে কথা বলেছেন যা নির্জলা মিথ্যা। আরো খেদের কথা হল, তিনি আমার স্মৃতিকথা *Out of Place* থেকে একটি উদ্ধৃতি ভুলভাবে ব্যবহার করেছেন। এই লেখাটি আমি ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে শেষ করি এবং পরবর্তী মাস থেকে *Knopf*-এ ছাপা হতে থাকে। (এর থেকে উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি খুব শীঘ্রই *নিউইয়র্ক রিভিউ অব বুকস, দ্য অবজারভার, হারপার'স এণ্ড গ্রান্টা*-তে প্রকাশ হবে)। সেখানে আমি সৎভাবেই আমার জেরুজালেম, কায়রো ও লেবাননের দ্যুর এল সিয়্যর-এর শৈশবের দিনগুলোর ঘটনা তুলে ধরেছি। আমি কখনোই রিফ্যুজি থাকার দাবি করিনি বরং আমাদের একান্নবর্তী বিশাল পরিবার ছিল কাকা-মামা,খালা-ফুফু, দাদা-দাদী, নানা-নানী, চাচাত-মামাত-ফুফাত ভাই-বোনদের নিয়ে, কিন্তু ১৯৪৮ সালে জাতিগত শুদ্ধির নামে জিয়নবাদীরা তাদের সবাইকে দেশ ছাড়া করে। আমার স্মৃতিকথা তার একটি নিবন্ধের প্রতিবাদে লেখা বলে তিনি যে দাবি করেছেন তা সম্পূর্ণ অবাস্তব, কারণ আমার স্মৃতিকথার জন্য আমি ১৯৮৯ সালে চুক্তিবদ্ধ হই, কিছু অংশ জমা দেই ১৯৯৪ সালে আর শেষ করি ১৯৯৮ সালে, কিন্তু উইনারের নিবন্ধন যে ১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসের আগে ছাপাই হয়নি তা তিনি বেমালুম চেপে গেছেন।

ডজনখানেক ভুল তথ্য উত্থাপনের মাধ্যমে উইনার তাঁর জ্ঞানের বহর দেখাতে যেয়ে বিষয়টি আরো জটিল করে ফেলেছেন। তিনি বাউলোস সাঈদকে আমার বাবার ভাই বলেছেন, আসলে তিনি আমার বাবার কাজিন এবং তাঁর স্ত্রী নাবিহা আমার ফুফু। উইনার তা জানেন না। তিনি বুঝতে পারেননি আরবীয় অর্থে একটি পারিবারিক বাড়ি বলতে তাকেই বোঝায় যেখানে পরিবারের সমস্ত সদস্যদের মালিকানার অধিকার সংরক্ষিত থাকে। সেখানে আমি ১৯৩৫ সালে এবং আমার বোন জেন ১৯৪০ সালে জন্ম গ্রহণ করে। বাউলোস, আমার বাবা ওয়াদি সাঈদ, তাদের কাজিন, বন্ধু ও ব্যবসায়িক অংশীদারদের একত্রে প্যালেস্টাইন শিক্ষা কোম্পানীর মালিকানা ছিল যার শাখা ছিল জেরুজালেম ও হাইফাতে। বাড়িঘর, ব্যবসায়–সবকিছুই আমাদের হারাতে হয় ১৯৪৮ সালে। আমার বাবা ঐ সম্পত্তি ও ব্যবসায়ের প্রতি আর কোনো আগ্রহ দেখান নাই। এই ব্যবসায়ের ৫০ শতাংশের মালিকানা তাঁর ছিল। উইনার ১৯৪৭ সালে আমাদের জেরুজালেম শাখা পুড়ে গিয়েছিল বলে যে তথ্য দিয়েছেন তা সর্বৈব মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে ঐ শাখা ১৯৪৮ সালে জিয়নবাদীদের দখল পর্যন্তও অক্ষত ছিল। উইনার আরো বলেছেন যে, আমরা আমাদের সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ আদায়ের কোন চেষ্টা করিনি যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অসৎ উদ্দেশ্যে তিনি দুইটি সত্য অস্বীকার করেছেন : এক. আমার বাবা ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য ইসরাইল সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন এবং আমার কাজিন ইউসিফ ১৯৯৬ সালে পুনরায় ক্ষতিপূরণের দাবী তুলেছিলেন; দুই. ১৯৫০ সালে ইসরাইল সরকার গরহাজির ব্যক্তির সম্পত্তি আইন পাশের মাধ্যমে একতরফাভাবে সমস্ত ফিলিস্তিনীদের সম্পত্তি ইসরাইলি সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করেছিল। আমাদের প্রচেষ্টা এখনও যে সফল হয়নি তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী আছে।

তিনি আরো বলেছেন আমি সেইন্ট জর্জেস স্কুলে পড়িনি যা আরো একটি নির্জলা মিথ্যা।

www.pathagar.com

তিনি স্বীকার করেননি যে, স্কুলের রেকর্ডপত্র ১৯৪৬ সালে শেষ হয়ে যায় আর আমি ওখানে ছিলাম ১৯৪৭ সালে এবং আমার বাবা ও তাঁর কাজিনরা ১৯০৬ সাল থেকে শুরু করে সেখানে পড়ত। যদি তিনি একজন সৎ গবেষক হতেন তাহলে নিশ্চয় আমার ঐ স্কুলের সহপাঠীদের একজন হেইগ বয়াগিয়ানকে খুঁজে বের করতেন। তিনি এই নিউইয়র্ক শহরেই বসবাস করেন এবং কাকতালীয়ভাবে গত সপ্তাহে আমাকে ফোন করেছিলেন। এছাড়াও আছেন টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মাইকেল মারমৌরা, যিনি ঐ স্কুলে আমার অংকের শিক্ষক ছিলেন। সত্য যাচাইয়ের জন্য তিনি এঁদের সাথে যোগাযোগ করতে পারতেন। ডেভিড এ্যাজরা নামে আমার যে সহপাঠীর সাথে তিনি কথা বলেছেন তিনি আমাকে চিনতে পারেননি যদিও আমি তাকে চিনতে পেরেছি। উইনার বলেছেন আমার মা একজন লেবানীজ যদিও সত্য হল তিনি পুরোপুরি লেবানীজ ছিলেন না, কারণ তাঁর বাবা ছিলেন ফিলিস্তিনী। তাঁর একটি ফিলিস্তিনী পাসপোর্ট ছিল যেটা ১৯৪৮ সালে রিফিউজি হওয়ার কারণে তিনি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তালবিয়েহ্ ভবন, যেখানে আমি ও আমার ছোট বোন জন্মেছিলাম, ১৯৩২ সালে আমাদের পরিবারের জন্য সাব সামাহা কর্তৃক তৈরী হয়েছিল। উইনার এই বিষয়টাও ভুল বলেছেন। আমাদের পারিবারিক ব্যবসায়ের মিসর শাখার জাতীয়করণ হয়নি, ওটা আমরা নাসের সরকারের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলাম। আর তা বিপ্লবী জনতারা পুড়িয়ে দেয়নি, দিয়েছিল মুসলিম ভায়েরা।

এই সবকিছু বলছেন এমন একজন যিনি দাবি করছেন আমি নিজেকে বৈরী পরিস্থিতির শিকার প্রমাণ করতে আমার অতীত জীবনের মিথ্যা বয়ান উপস্থাপন করেছি। ১৯৯২ সালের একটি সাক্ষাৎকারে আমি কায়রো সম্পর্কে বলেছি যেখানে আমি আমার শৈশবের অনেকটা সময় কাটিয়েছি। এসবের কিছু কিছু পূর্বাভাস আছে ১৯৮৭ সালে হাউস এন্ড গার্ডেনে প্রকাশিত '*কায়রো রিকলড*'-এ। উইনার ইচ্ছাকৃতভাবে এসব বিষয় এড়িয়ে গেছেন, যেভাবে প্যালেস্টাইনে আমার সময়গুলো ছিল যথেষ্ট 'গঠনমূলক' এই কথা বলতে পারার অধিকারের প্রশ্নটি এড়িয়ে গেছেন। তিনি যা বোঝেন না বা আমার কোনো লেখা থেকে বুঝতে পারেননি তা হল এই যে, আমি যথাযথভাবে শরণার্থীদের দুর্দশার কথা তুলে ধরেছি কারণ আমি কখনো এই যন্ত্রণা ভোগ করিনি আর তাই আমার দেশের ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষরা যেন যন্ত্রণা ভোগ না করে সেই দুর্দশা লাঘবে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছি। উইনার একজন রটনাবিদ যিনি আরো অনেকের মত ফিলিস্তিনীদের বাস্তুহারা হওয়াটাকে একটি ভাবাদর্শগত কল্পকাহিনী মনে করতে ভালোবাসেন। ১৯৩০ সাল থেকে এটি জিয়নবাদীদের অপপ্রচারের এক অনড় বিষয়বস্তু হিসাবে চলে আসছে। তিনি কখনোই তার বক্তব্যের প্রকৃত উৎসের খোঁজ দেন না, কিন্তু বক্রোক্তি করেন, প্রতারণাপূর্ণ যুক্তি ও সাবুতবিহীন বক্তব্য উপস্থাপন করেন। আমাদের দোকানের প্রতিটি স্টেশনারী দ্রব্য, প্রতিটি নিদর্শন, নির্দেশিকা ও বাৎসরিক জমা-খরচের হিসাবের খাতা প্রমাণ দেয় যে, আমাদের প্যালেস্টাইনের ব্যবসায়ের মালিকানা ছিল যৌথভাবে বাউলোস ও ওয়াদি সাঈদের।

তার লেখার কোনো জায়গায় তিনি উল্লেখ করেননি চারটি মহাদেশে তিনি কার কার সাথে কথা বলেছেন, কোন্ কোন্ তথ্যপ্রমাণ ঘেঁটেছেন, কখন এবং কোন্ কোন্ প্রশ্নের

www.pathagar.com

উত্তরে আসলে কি বলেছেন। আমার কাজিন রবার্ট আমাকে জানিয়েছে যে, যখন সে উইনারের সাথে (নামটা সে মনে করতে পারছিল না) কথা বলতে অস্বীকৃতি জানায় উইনার তাকে রীতিমত হুমকী দেন। সকল ফিলিস্তিনীদের ফিরে আসা ও ক্ষতিপূরণের দাবীর মুখে কলঙ্ক লেপনের উপায় হিসাবে উইনারের প্রচেষ্টা এখন কার্যকরী হবে এবং এইটাই হবে শান্তি প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ের মূল বিচার্যবিষয়। উইনারের বাক্‌চাতুর্য ইসরাইলের প্রত্যার্পন আইনের অন্যায্যতার বিষয়টিও গোপন করে গেছে। এই আইনে একজন ইহুদি ইসরাইলের যে কোন অংশে যেতে বা বাস করতে পারবে, পক্ষান্তরে কোন ফিলিস্তিনী, যদি সে সেখানে জন্মও নেয় তাহলেও সেই অধিকারপ্রাপ্ত হবে না। এডওয়ার্ড সাঈদ না হয় মিথ্যাবাদী, তাহলে সেইসব কৃষকদের কথা কি অবিশ্বাস করবেন যাদেরকে তাদের নিজ নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে? সংশোধনবাদী লিকুদ পার্টির যুক্তি হ'ল (উইনারেরও) ইসরাইলের জনগণের সমস্ত জমিজমা ঈশ্বরের দান; বাকি দাবীদাররা মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড।

সৌভাগ্যক্রমে ১৯৪৮-এর ঘটনার সাথে পরিচিত আমার পরিবারের কতিপয় সদস্য এখনো জীবিত আছেন। আমার সবচেয়ে বয়োজেষ্ঠ্য কাজিন, যিনি সবার শেষে আমাদের তালবিয়াহ্'র বাড়ি ছেড়েছিলেন, এখন টরেন্টোতে বসবাস করেন; তাঁর বয়স এখন আশি বছর। তাঁর সাথে কেন যোগাযোগ করা হ'ল না? আমার বিধবা খালার বড় ছেলে মার্টিন বাবরের সাথে আলোচনা করেছিলেন এবং তাঁকে কোর্টে নিয়ে গিয়েছিলেন যখন তিনি লিজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও বাড়ি ছাড়তে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং আমাদের পরিবার কায়রো থেকে এক বছর পর ফিরে এসেছিল। প্রসঙ্গক্রমে উইনার খোঁড়াযুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আমাদের বাড়িটা পরিবারের ১৪ জন সদস্যের বসবাসের জন্য খুবই ছোট। প্রকৃত ঘটনা হ'ল, আমাদের পরিবারের বিবাহিত সন্তানদের, স্কুল-পড়ুয়ারা যারা বাইরে থাকত, তখনও জন্ম নেয়নি এমন অনেককে এবং একজন মৃত অভিভাবককেও উইনার তার তালিকাতে জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু উল্লিখিতরা যদি বাদ যান তাহলে সংখ্যাটি নেহায়েত ছোট হয়ে যায় আর তাহলে যেকোনো বাড়িতেই স্থান সংকুলান হওয়াটা অসম্ভব নয়।

আমাদের প্রতিবেশী, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং গীর্জা-পরিবারের সদস্যরা কোথায় গেলেন? তাদের সাথেও যোগাযোগ করা যেত, কিন্তু করা হয়নি। যাদের মাধ্যমে আমার দীক্ষা হয়েছিল তারাও অনেকে বেঁচে আছেন তাদের সাথেও কথা বলা হয়নি। ১৯৪৮ সালের পর বাড়ির মালিকানা ইসরাইল কর্তৃক দখল হয়েছিল; সে ব্যাপারে উইনার একদম নিশ্চুপ কেন? আসলে *Commentary* পত্রিকার লক্ষ্য সত্য উদঘাটন নয়, আমার নামে অপবাদ দেওয়া ও আমার চরিত্র হনন করা। কিন্তু নিয়তির চরম পরিহাস যে, কয়েক মাস আগে আমেরিকার কয়েকটি সংবাদপত্র তাদের প্রথম পাতায় ইসরাইলের স্কুলপাঠ্য বইয়ের ইতিহাস সংশোধন নিয়ে যে নিবন্ধ ছেপেছিল সেখানে স্বীকার করা হয়েছে ১৯৪৮-এর ঘটনাবলী সত্য। নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী নির্মূল, বাড়ি-ঘর-গ্রাম ধ্বংস, গণহত্যা ইত্যাদি ঘটনা সত্যিই ঘটেছিল যা দীর্ঘদিন ধরে অস্বীকার করা হয়েছে। ধন্যবাদ দেই নবীন ইসরাইলি এবং অবশ্যই ফিলিস্তিনী ইতিহাসবেত্তাদের। এগুলো *Commentary*'র জন্য একটু বেশি রকমের সত্য। এই পত্রিকাটি এখনো ফিলিস্তিনীদের

প্রতি বেশী মাত্রায় 'নরম' হওয়ার জন্য নেতানিয়াহু'র কঠোর সমালোচনা করছে। আমি সবসময়ই অতীতে ইহুদি ও ফিলিস্তিনীদের একে অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সমালোচনা করেছি। এইভাবে কি তারা ভবিষ্যতে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে পারবে? উইনার অতীত ব্যবহারে উৎসাহী যদিও নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির ইতিহাস নয়, কিন্তু তাতে করে সঠিক উপলব্ধি ও পুনঃএকত্রীকরণের পথে তা এক অন্তরায় হয়ে উঠবে শুধু। খুবই দুঃখের বিষয় যে, এত সময় ও অর্থ তিনি ব্যয় করেছেন, এত গরল উগরে দিয়েছেন যা কখনোই কোন সৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হতে পারে না।

আজকের কাগজ, ২ অক্টোবর '০৩

www.pathagar.com

সাদ্দাম হোসেনের চালের পশ্চাদপট

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ

অনুবাদক : মানস চৌধুরী

সাদ্দাম হোসেন একজন ভয়াবহ ধরনের স্বৈরশাসক ইরাকে যাঁর শাসন অঞ্চলটাকে গণতন্ত্রের একটা বধ্যভূমিতে পরিণত করেছে। সকলেই এটা জানেন, বিশেষত আরবরা। কিন্তু কুয়েতে তাঁর শোচনীয় আক্রমণের কারণে তাঁকে দানবীকরণের, বিচ্ছিন্নকরণের এবং ধ্বংস করবার মার্কিনী প্রচেষ্টাতে, অসঙ্গতভাবে তাঁকে আলাদা করা হয়েছে সেই পরিবেশ এবং রাজনীতি থেকে যা তাঁকে তৈরি করেছে। এই শেষোক্তগুলি, অবশ্য বলা দরকার, অনেকদূর পর্যন্ত রূপলাভ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির কারণে, মার্কিনী দৃষ্টিকোণ থেকে আপাত সাফল্যের প্রায় পাঁচ দশক কাটবার পর যার একটা অস্থায়ী পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে এখন। অধিকন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর জাগ্রত আত্ম-ন্যায়পরায়ণতা এবং ইরাকের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক তৎপরতা সত্ত্বেও, এটা উপলব্ধি করা জরুরী যে মধ্যপ্রাচ্য নেহায়েৎ একটা তেল-উৎপাদক মরুভূমি মাত্র নয়, বরং সর্বাত্মকভাবে একটি আরব ও মুসলিম অঞ্চল, নিজস্ব ইতিহাসরাজি, সমাজমণ্ডলী, এবং রাজনৈতিক তৎপরতা দ্বারা পূর্ণ। আমি মনে করি এটা এখন জরুরীভিত্তিতে মনোযোগ দাবি করে, কেবল এ কারণেই নয় যে আরবরা যন্ত্রণা ও ধ্বংসযজ্ঞের দহন বয়ে নিয়ে বেড়াবে, বরং এ কারণেও যে বর্তমান সংকটটি অন্যভাবে বোধগম্য নয়। যে ঘটনাবলী এখন উন্মোচিত হচ্ছে তা নিছক ভাল বনাম মন্দের ব্যাপার নয়। আক্রমণ এবং দখলের কারণে একটা সমাজের অন্তর্ধান গুরুভার এবং মর্মান্তিক। কুয়েতের পতনে যে মাত্রায় মানবিক ভোগান্তি দেখা দেবে সেটা ভয়ঙ্কর: বহু প্রাণ চূর্ণবিচূর্ণ হবে কিংবা খোয়া যাবে চিরতরে, পরিবার বিচ্ছিন্ন হবে, কাজ এবং জীবিকা শেষ হবে। এটা খুব অস্বস্তি কর যে ইরাকের আগ্রাসনে পাশ্চাত্যের সকল শুভ নিন্দাবাদে খোদ কুয়েতের হতভাগ্য অধিবাসীদের ব্যাপারে সামান্যই ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। এমনকি সকলে গাল্ফ এলাকায় আগেও ভাল ছিলেন না। অধিকাংশ আরবের কাছে এখানকার শাসকেরা দুর্নীতিপরায়ণ, তেল উৎপাদনে লিপ্ত যেটা কিনা আরব প্রয়োজনানুযায়ী চালিত নয় বরং মার্কিন চাহিদানুযায়ী, আর প্রতিবাদে অক্ষম যখন ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন সমর্থন সীমাহীন প্রশ্রয়ের এবং কপট। তেলের অবাধ প্রবাহের বিনিময়ে, উপসাগরীয় নেতারা পেয়েছেন মার্কিন সামরিক সহায়তার আশ্বাস (এবং উপস্থিতি সৌদি আরবের বেলায়)। উপসাগরীয় শাসকেরা – কুয়েতীরা এক্ষেত্রে নমুনাস্বরূপ – আঞ্চলিক উন্নয়নে কিছু টাকা খরচ করেছেন এবং ফিলিস্তিনি আন্দোলনে যথেষ্ট সহায়তা দিয়েছেন, কিন্তু বিপুল সম্পদের মোটা অংকটাই জমা করেছেন

www.pathagar.com

পশ্চিমে। ক্রমবর্ধমান আরব অসন্তোষ অনুধাবন করেছে যে আরব বিশ্বের প্রধান সম্পদ পশ্চিমা ভোক্তাদের কব্জা হয়েছে, সস্তা তেল যাদের দরকার নিজেদের 'লাইফস্টাইল' বজায় রাখার জন্য কোন সচেতনতা, বিবেচনার যারা ধার ধারে না, কিংবা এই অঞ্চলটির সংস্কৃতি এবং বাসনার প্রতি যাদের কোন মর্যাদা নেই। উপরন্তু, উপসাগরীয় নেতারা ইসরায়েল সমর্থকদের রেওয়াজমাফিক গণ উপহাস ও হেনস্তা সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন যখন তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রশস্ত্র অত্যন্ত চড়ামূল্যে কিনবার সুযোগ লাভের জন্য ওয়াশিংটন বরাবর আবেদন করেছিলেন; ইসরায়েলি হামলা থেকে আরবদের রক্ষা করার জন্য এসব অস্ত্র যে অপর্যাপ্ত সেটা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা হয়েছিল।

সাদ্দাম ভীষণ রকমের অনাকর্ষণীয়, সত্যিকার অর্থে নৃশংস ধরনের শক্ত ও ভাবলেশহীন একজন নেতা, যিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দমিয়ে ফেলেছেন, যথেষ্ট সহজাত ও পরিশ্রমী তাঁর জনগণকে অকল্পনীয় দুর্ভোগ সইয়েছেন, ইতোমধ্যেই আমলযোগ্য মাশুলে প্রতিবেশীদের হয়রানি এবং দখল করেছেন। তাঁর কুয়েত আক্রমণ পরিষ্কার এবং সহজ আগ্রাসন। কিন্তু তিনি উন্মাদ নন কিংবা, আমার মতে, সাম্প্রতিক আরব ইতিহাসকে যা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে সেই শূন্যতা থেকে উদ্ভূত অসঙ্গত কোন ব্যক্তিত্বও তিনি নন। তিনি এখন বহু আরববাসীর কাছে বরেণ্য যাঁরা তাঁর পদ্ধতিকে নিন্দা জানিয়েছেন, কিন্তু যাঁরা বলেন যে বিশ্বটাতে আমরা বসবাস করি তা অবধারিতভাবে সেসব ক্ষমতার বশীভূত যেসব ক্ষমতা আক্রমণ করে, জমি দখল করে, সরকার বদলে দেয় এমনসব মূল্যবোধ এবং নৈতিক উৎকর্ষের সামান্য বালাই রেখে যেগুলো তারা দাবি করে সবিশেষভাবে আরব, অশ্বেতাঙ্গ, উয়োগ, এবং সমগোত্রীয়দের বিরুদ্ধে। কয়েক বছর আগে তুরস্ক সাইপ্রাসের একাংশ দখল করল; রাশিয়ানরা আফগানিস্তানে হানা দিল; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রেনাডা, লিবিয়ায় বোমা মেরে আক্রমণ করল, এবং কয়েক মাস মাত্র আগে, পানামায়, কারণ হচ্ছে এটা তার স্বার্থের অনুকূল, যেমনটা প্রেসিডেন্ট একে ব্যাখ্যা করেছেন; সর্বোপরি, প্রত্যেক আরব সক্ষোভে জ্ঞাত যে যেহেতু আমেরিকার সবুজ সংকেত ছিল, ১৯৮২ সালে ইসরায়েল লেবানন আক্রমণ করল, ২০,০০০ মানুষ মারল, পিএলও ধ্বংস করতে উদ্যত হল, মূলত একটা পুতুল সরকার বসিয়ে দিল, এর আগে সিরীয়, জর্দানীয়, এবং সৌদি আরবীয় আকাশসীমা লংঘন এবং ইরাক ও তিউনিশিয়ায় বোমা মারার কথা বাদই গেল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করেনি, এবং পশ্চিম তীর, গাজা, গোলান হাইট, এবং দক্ষিণ লেবাননের একাংশে ইসরায়েলী দখলদারিত্ব তারা অব্যাহতভাবে সমর্থন দিয়ে আসছে। জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগতভাবে ইসরায়েলের কোন সমালোচনা ঠেকিয়ে দিয়েছে; একত্রে এই দুই দেশ গোটা পৃথিবীকে উপেক্ষা করেছে, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা একমাত্র সেসব সিদ্ধান্তমালা অনুমোদন করছে যা "উভয়পক্ষের সহিংসতাতে খেদ প্রকাশ করেছে", যুগপৎ বিরাগময় এবং অপমানজনক বাক্যাংশ এটা। ইরাকের বিরুদ্ধে অবরোধের আলোকে, যেটার মধ্যে জাতিসংঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঔদ্ধত্যপূর্ণ দুর্ব্যবহার সয়ে আসছে, ইসরায়েলের প্রতি যথারীতি মার্কিন দুর্বলতা দীর্ঘকাল যাবৎ আরব ও তৃতীয় বিশ্বের দাবিকে যথার্থ প্রমাণ করেছে যে একটা বেহায়া রকমের দুমুখো-নীতি কাজ করছে।

সাদ্দাম এসূত্রে নিজেকে দেখছেন কেবল ইরাকী স্বার্থের পক্ষে কাজ করছেন হিসেবে নয় –

www.pathagar.com

কুয়েত লম্বা সময় ধরে ইরাকী অঞ্চলের একটা অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে এবং বিগত কয়েক মাসে তেল উৎপাদন তারা বাড়িয়েছে ইরাকের যথেস্ট মাশুলের বিনিময়ে – বরং আরব স্বার্থের পক্ষেও। শেষোক্ত এই লক্ষ্যে তিনি বেশ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছেন। তিনি "পারসিয়া"র বিরুদ্ধে আরব যুদ্ধে লড়াই করেছেন, এবং সমর্থিতও হয়েছেন। তিনি আরব "মডারেট"দের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়েছেন (বর্তমান আরব বিশ্বে এই শব্দটার একটা নেতিবাচক ব্যঞ্জনা রয়েছে) যাঁরা মার্কিন পোষ্যে পরিণত হয়েছে এবং যাঁরা, মিশরের মুবারক এবং সৌদি আরবের আল-সাউদ এর মত, আরব রাজনীতির কেন্দ্র থেকে প্রান্তে পিছলে গেছেন। তিনি যুগপৎ বিরোধিতা করেছেন ক্যাম্প ডেবিডের (যা আরব বিশ্বকে বিখণ্ডিত করেছে) এবং নড়বড়ে আরব জাতীয়তাবাদের, যা ঐক্য এবং ঔজ্জ্বল্যের আশায় গুড়েবালি দিয়ে এনেছে দলাদলি, গৃহযুদ্ধ, দুর্বল আর অপ্রিয় শাসকদের মাতবরি, পাতি স্থানীয় একগাদা জাতীয়তাবাদের মতাদর্শিক আধিপত্য। এর সবটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদদে ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়, আরব জাতীয়তাবাদেরও যে মহাশক্র, এবং ইসরায়েলের নিশ্চিত মিত্র।
ফলে আরববাসীদের কাছে সাদ্দামের আবেদন খাটো করে দেখা আমাদের ঠিক হবে না যাঁরা অনুভব করেন আর যাই হোক আরব সভ্যতার ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন। যে পশ্চিম সাধারণভাবে আরবদের গ্রাহ্য করে ঘৃণার সঙ্গে এবং একটা বর্ণবাদী চশমায় যা তাদেরকে বিবেচনা করে মূলত থলথলে তেল-যোগানদাতা হিসেবে, সন্ত্রাসবাদী, কিংবা উটের জকি হিসেবে, ঐতিহাসিকভাবে সেই পশ্চিমের বিরাগভাজন বিক্ষুব্ধ একটা আরব জাতীয়তাবাদ আত্মা সংগ্রহ করেছে ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদা সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ থেকে, নানাবিধ ইসলামী দল থেকে, এবং ইরাকী প্রেসিডেন্ট থেকে।
আমেরিকা এবং এর মিত্ররা (ইসরায়েলের প্রতি অবাধ সমর্থন ব্যতীত) ক্রমাগত যা দিয়ে আসছে তা হচ্ছে ফিলিস্তিনি স্ব-শাসনের সীমাহীন মুলতবিকরণ – ফিলিস্তিন এখনো পশ্চিমের সঙ্গে আরব বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বিরোধ – এবং আরব ললাটের উপর আরব সার্বভৌমত্বের একটা অপমান। ইয়াসির আরাফাতের সংশোধন এবং আপোষের নিস্তেজ পিএলও নীতিমালার বিরুদ্ধে আবুল আব্বাসকে সমর্থন যুগিয়ে, সাদ্দাম তাঁর মুখ্য জাতীয়তাবাদী গুটির যতগুলো সম্ভব সংগ্রহ করেছেন বড় সংঘর্ষের লক্ষ্যে, নিশ্চিতভাবেই, তিনি জানতেন তাঁর লড়তে হবে। তিনি যেহেতু দেখেছেন, ইসরায়েলকে এমনকি ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি করাতেও অসমর্থ আধামনস্ক এবং অপমানজনক একচোখা মার্কিন নীতির ব্যর্থতা, সোভিয়েত ইহুদীরা ঝাঁকে ঝাঁকে ইসরায়েল/ফিলিস্তিন অভিমুখে যাত্রা, যেহেতু আরব তেল বাহ্যত স্থানীয় দুষ্টচক্রের হাতে ধারাবাহিকভাবে বন্দী হয়ে আছে পশ্চিমা তেল কোম্পানি এবং সরকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে এবং যেহেতু তাঁর নিজের সমাজ একটা যুদ্ধের যুদ্ধোত্তর ভয়াবহতায় ভুগেছে এমন একটা যুদ্ধে যেটা তিনি সকল আরবদের পক্ষ হয়ে লড়েছিলেন মনে করেছেন – এর সর্বকিছুই তাঁকে উজ্জীবিত করেছে বলে মনে হয়, কণ্ঠ খুলতেও, একটা বিভক্ত, হতোদ্যম এবং দুর্বলচিত্ত আরববিশ্বের সম্মুখে, বাহ্যত তাঁর নিজের বলিষ্ঠতা, সাহস এবং অদম্য মনোবলের প্রয়োজনে। এর পরিণতি মর্মান্তিক এবং ভয়ঙ্কর দেখতে হবে। সম্ভবত আমরা যা দেখব তা একজন বা দুইজনের নয় বরং একটা পুরোদস্তুর জড়ন যার একদিকে দীর্ঘকাল-দমিত, দীর্ঘকাল-বিলম্বিত এবং প্রায়শ সাজাপ্রাপ্ত জাতীয়তাবাদী কর্মসূচি যার মধ্যকার নৈতিক জোর এবং অঙ্গীকারগুলো সাদ্দাম নিজেই দৃঢ়বদ্ধ

www.pathagar.com

করেছেন, এবং অন্যদিকে, আমেরিকার নেতৃত্বাধীন অভিযান যার পরিকল্পনা মূলত সাদ্দামকে শায়েস্তা করা এবং, এই মুহূর্তে লক্ষণ দেখা যায় যে, আরো একবার আরব জাতীয়তাবাদের ডানাগুলোকে ছেঁটে দেয়া।

এটাই সবটা নয়। স্ব-শাসনের প্রতি ফিলিস্তিনি অনুপ্রেরণাকে সামাল দেয়া হচ্ছে চরম দুঃখজনক, এমনকি হয়তো হতভাগ্য আঘাত দিয়ে: অবস্থাদৃষ্টে এখন মনে হয় যেন ইসরায়েল এবং আরব উভয়পক্ষ সবকিছু ঠেলে সেই ১৯৪৮-এ যেমন ছিল সেদিকে নিয়ে যেতে চাইছে, যেখানে আরব রাষ্ট্রসমূহ এবং ইসরায়েল ফিলিস্তিন-বিষয়ে অপরকে সামাল দিচ্ছে। মিশর, সৌদি আরব এবং সম্ভবত জর্ডানের সরকারেরা (উপসাগরীয় ছোটখাট রাষ্ট্র সম্পর্কে কিছুই বলছি না) সামরিক প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন তাড়াহুড়ার ক্ষয়ক্ষতি থেকে কায়ক্লেশে বেরিয়ে আসছে বলে মনে হয়, আদৌ যদি তাই হয়। তাদের সামনে অননুমেয় প্রচণ্ড অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত পরিবর্তন, আমি মনে করি, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের আদল বদলে দেবে। এবং যেটা আরো একবার ধূলিস্মাৎ হবে বলে আমি অত্যন্ত ভীত – আরব জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা এবং সাংস্কৃতিক স্বাধিকার – তা পুনর্প্রবাহিত হবে সংকীর্ণতা, ধর্মভিত্তিক পুনরুত্থান, শত্রুতা আর প্রতিশোধের রাজনীতির মধ্যে।

ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠা এবং বিবিধ আরব জাতীয়তাবাদী আর স্বাধীন সরকারের ক্ষমতায় আসার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে কালটা শুরু হয়েছে তার চূড়ান্ত বেদনা আমরা এখন অবলোকন করছি। দুর্নীতিগ্রস্ত এবং বেইনসাফ শাসন, চরম সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, আতঙ্কজনকভাবে পশ্চাদপর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক স্থাপনা, অত্যধিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, এবং বিলুপ্ত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার সমকালীন ভয়াবহ দৃশ্যের পক্ষে কোন আরবই সাফাই গাইতে পারে না। এসবই সেখানে রয়েছে সকলের দেখে দেখে শরম বোধ করার জন্য। কিন্তু, আমি প্রশ্ন রাখি, আরবদেরকে একটা সত্যকার আলোচনায় জড়ো করার ক্ষেত্রে পশ্চিমা এবং বিশেষত আমেরিকান ব্যর্থতা কি, তাঁদের আশা আর ভয়কে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে পারা, দায়িত্বের সঙ্গে তাঁদের বেদনাকে নিতে পারার ব্যর্থতা – এটাও কি যা কিনা আরব বিশ্বে অনাকাঙ্ক্ষিত তার অনেকটাতেই মদদ দেয়নি, এর বিকাশকে কি চ্যুত এবং বিকৃত করেনি প্রতিশোধ, অসন্তোষ এবং ক্রুদ্ধ শত্রুতার দিকে? ইরাকের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াটাকে বর্তমান এই বিশৃঙ্খলভাবে ছেড়ে না দিয়ে, আমাদের কি বরং জর্জ বুশের কাছেও আশা করা উচিৎ না যাতে তিনি বিচক্ষণতা আর সৌহার্দ্য দিয়ে আরব বিশ্বকে সম্ভাষণ করেন যেমনটা তিনি যে কোন মহৎ জনগোষ্ঠী কিংবা সংস্কৃতির বেলায় করতেন, কর্কশ উপদেশাবলী, অনমনীয় আর নিষ্ঠুর ফর্মুলা যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরবদেরকে এক প্রজন্ম ধরে উপহার দিয়ে আসছে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরো বড় ধরনের সর্বনাশ ঘটাবে যদি সে সেই পুরানো কায়কারবারে [modus vivendi] থেকে যায় এবং ইরাকী দখলদারিত্বের অগ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক স্থাপনে বাস্তবে ব্যর্থ হয়।

[Edward W. Said, The Politics of Dispossession. The Struggle for Palestinian Self-Determination, 1969-1994, Vintage, New York, 1994, pp. 278-282]

দি ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর-এ প্রকাশিত, আগস্ট ১৩, ১৯৯০

www.pathagar.com

গোলকায়নের সংকট

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ

অনুবাদক : মোস্তফা জামান

একটি ছোট খবর থেকে জানা গেল যে সৌদি আরবের প্রিন্স ওয়ালিদ ইবনে তালাল কায়রোর আমেরিকান ইউনিভার্সিটিকে দশ মিলিয়ন ডলার দান করেছেন। এই টাকা আমেরিকান স্টাডিজ সেন্টার গড়তে ব্যয় করা হবে। এই তরুণ বিলিয়নয়ার ১১ সেপ্টেম্বরের পর নিউইয়র্ক শহরের জন্য দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান দেন। এই অনুদানের সঙ্গে যে চিঠি পাঠানো হয় তাতে নিউইয়র্কের প্রতি অর্ঘ্যের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি মার্কিন পরিকল্পনার পুনর্বিবেচনার ইঙ্গিত ছিল। তিনি ইসরাইলের প্রতি বলগাহীন মার্কিন পক্ষপাতের দিকেই নির্দেশ করেছেন। কিন্তু তাঁর অমায়িক প্রস্তাবে ইসলামকে ধর্ম হিসেবে পর্যুদস্ত করার যে সাধারণ ভূমিকা অথবা নিদেন পক্ষে এই ধর্মের বিরুদ্ধে অসম্মান প্রকাশের দিকটিও নির্দেশ করা হয়েছিল।

নিউইয়র্কের তৎকালীন মেয়র রুডলফ গালিয়ানি, যিনি ইহুদী ধর্মাবলম্বিদের সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠীর এই নগরীর প্রতিনিধি, তিনি ক্রোধ সংবরণ করতে না পেরে এই চেকটি ফিরিয়ে দেন। তাঁর এই প্রতিক্রিয়ায় আমি বলবো মাত্রাছাড়া বর্ণবাদী ঘৃণা এবং অপমান করবার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। নিউইয়র্কের ইমেজ বা ভাবমূর্তির পক্ষে তিনি এই শহরের সাহসিকতা ও বাইরের বিশ্বের বিরুদ্ধে নীতিগত প্রতিরোধের মনোভাবকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন এবং একটি আপাত সংঘবদ্ধ ইহুদি নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের সন্তুষ্ট করেছেন।

তার এই দুর্ব্যবহার ১৯৯৫-এর ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেই বছর (ওসলোর সিদ্ধান্তে র অনেক পরে) ফিলার মনিক হলে অনুষ্ঠিত কনসার্টে জাতিসংঘের অন্য সবার সঙ্গে ইয়াসির আরাফাতকে প্রবেশাধিকার দেয়ার ব্যাপারে তিনি অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। অর্থাৎ তরুণ অবয়বের বিরুদ্ধে তার যে ভূমিকা বা উত্তর তা অবসম্ভাবিই ছিল। যদিও ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের স্বীকার নিউইয়র্কে টাকার প্রয়োজন ছিল এবং এই টাকা মানবিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছিল। মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং এর কর্তাব্যক্তিগণ ইসরাইলকে সবকিছুর ওপরে গুরুত্ব দেয়, ইসরাইলের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী (টাকার মালিক হিসেবে) এবং সদা-সক্রিয় লবিইস্টরা কোন ভূমিকা নিলো কিনা তা গৌণ বিষয়।

গালিয়ানী টাকা ফেরত না দিলে কী হতো তা কেউ জানে না। তবে অবস্থাদৃষ্টে বলা যায়

www.pathagar.com

যে, তিনি ইসরাইলি লবির কাজটি অগ্রিম সাধন করেছেন। নিউইয়র্ক রিভিউ অফ বুক্স (১)-এ উপন্যাসিক জোন ডিডিয়ন যেমন লিখেছিলেন যে, এটি (ইসরাইল) মার্কিন পলিসির সারবস্তু, যা প্রথম সচ্ছতা পায় রুজভেল্টের মাধ্যমে, তাঁর মতে আমেরিকা সমস্ত যুক্তির বিপরীতে একদিকে সৌদি রাজতন্ত্র ও অপরদিকে ইসরাইল রাষ্ট্রের পক্ষে দাঁড়িয়ে আছে। এই বৈপরিত্ব এতোই তীব্র যে ডিডিয়নের মতে 'ইসরাইলের বর্তমান সরকারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের যে বিষয় খুবই স্পর্শকাতর বলে বিবেচিত সেই বিষয়েই আমরা আলোচনাও করতে পারছি না।'

প্রিন্স ওয়ালিদের বিষয় মার্কিনিদের প্রতি আরবদের দৃষ্টিভঙ্গির একটি ধারাবাহিকতা তুলে ধরে। প্রায় তিন জেনারেশনের আরব নেতৃত্ব, রাজনীতিবিদ ও আমেরিকায় শিক্ষিত উপদেষ্টারা তাদের নিজ দেশের জন্য যে পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছেন তার ভিত্তি ছিল আমেরিকা সম্পর্কে প্রায় গল্পের মতো মনোলোভা ধারণাসমূহ। মূল ধারণাটি হলো এই যে, মার্কিনীরাই সবকিছু পরিচালনা করে। এই ধারণার ডিটেইলে বা মধ্যে যা খুঁজে পাওয়া যায় তা বিস্তৃত এক বিষয়, যা-তে নানান জগাখিচুড়ী মতামত দিয়ে সৃষ্ট। আমেরিকাকে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখা থেকে শুরু করে নিঃস্বের জন্য ত্রাণ কার্যের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার হিসেবে গণ্য করা যার সর্বশীর্ষে অলিম্পিয়ান ঈশ্বরের মতো বসে আছেন হোয়াইট হাউজের সেই সাদা চামড়ার গদিধারী ব্যক্তিটি।

আমার মনে পড়ে সেই সময় যখন ২০ বছর আগে আরাফাতকে আমি বোঝাতে চেয়েছি যে আমেরিকা একটি জটিল সমাজ যেখানে নানান স্রোত, স্বার্থ, চাপ ও ইতিহাস একে অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত। সিরিয়া যেভাবে শাসিত হয়েছে তেমনটা আমেরিকায় ঘটেনি, ক্ষমতা এবং শাসনের একটি ভিন্নধরণ বুঝতে পারার প্রয়োজন আছে। আমি একবাল আহমেদকে মার্কিন মুল্লুকের উপর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করি। আমার এই প্রয়াত বন্ধু ছিলেন সম্ভবত ঔপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের পক্ষের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক। আশির দশকে শুরুর দিকে প্যালেস্টাইনদের সঙ্গে মার্কিনিদের বাদানুবাদের দিনগুলোতে আমি ঐ ব্যক্তি ও আরো অন্যান্য বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আরাফাতকে কথা বলতে বলি। এই অনুরোধের কোন প্রকার ফল হয়নি। আহমেদ আলজেরিয়ার জাতীয় মুক্তি ফৌজের সঙ্গে ফ্রান্সের ১৯৫৪ থেকে ৬২ সাল পর্যন্ত যুদ্ধকালীন সম্পর্কের ওপর এবং উত্তর ভিয়েতনামিরা কিভাবে হেনরী কিসিঞ্জারের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন সে বিষয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। ভিয়েতনামবাসী ও আলজেরীয়দের মেট্রোপলিটন সমাজ সম্পর্কে যে স্পষ্ট জ্ঞান ছিল তার পাশে মার্কিনীদের সম্পর্কে প্যালেস্টাইনিদের মতামত ক্যারিক্যাচার বা ব্যাঙ্গর মতো। শোনা কথা ও টাইম পত্রিকায় সামান্য চোখ বুলানোর ফলে যে ধারণা এর বাইরে প্যালেস্টাইনিদের কোন জ্ঞানই ছিল না। আরাফাতের ধারণা ছিল যে হোয়াইট হাউসে গিয়ে সবচেয়ে সাদা লোকটির সঙ্গে কথা বললেই কর্ম সিদ্ধ হবে। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে দিয়ে কাজ সমাধা করে নেয়াকে তিনি ইজিপ্টের মুবারক বা সিরিয়ার হাফেজ আল আসাদের মাধ্যমে কিছু করানোর মতো বিষয়ই মনে করেছিলেন।

ক্লিনটন নিজেকে মার্কিন রাজনীতির প্রভূপ্রতীম সত্তা হিসেবে তুলে ধরে প্যালেস্টাইনিদের হতবিহ্বল এবং পরাভূত করে ফেলেছেন অনায়াসে তাঁর মোহ এবং প্রয়াসকে ইচ্ছানুযায়ী

www.pathagar.com

নাড়াচাড়া করতে পারার ক্ষমতা দিয়ে। তবে মার্কিনীদের সম্পর্কে ধারণা অপরিবর্তিতই রয়ে যায় এবং এখনও তা একই রকম। প্রতিরোধের বিষয়টি বা এক সুপার পাওয়ারের বিশ্বে কিভাবে রাজনীতির খেলা খেলতে হবে সে বিষয়ে অবগত হওয়ার ব্যাপারটি গত অর্ধেক শতাব্দীর নানা বিষয়ের মতো অজ্ঞাত বা অচর্চিত রয়ে যাচ্ছে অধিকাংশ মানুষ তাঁদের হাত উপড়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হলো নৈরাশ্যজনক, আমি আর সেখানে ফিরে যেতে চাই না।'

আশাব্যঞ্জক যে গল্প তা প্রিন্স ওয়ালিদের পরিবর্তিত দিক নির্দেশনায় লক্ষণীয়। এই বিষয়ে আমি কেবল আন্দাজ করতে পারি। আরব বিশ্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মার্কিন সাহিত্য এবং রাজনীতির গুটিকতক কোর্স ছাড়া অন্য কোন একাডেমী নেই যেখানে পদ্ধতিগত উপায়ে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এর জনগণ এবং সমাজ ও ইতিহাস পড়ানো হয়। এমনকি কায়রো এবং বৈরুতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলোতে এমন শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। সমগ্র তৃতীয় বিশ্ব এমনকি কিছু ইউরোপীয় দেশেও এই অবস্থা তথৈবচ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অপ্রতিরোধ্য এক মহাশক্তির মুষ্ঠির মধ্যে যে পৃথিবী তার অধিবাসী হয়ে সেই শক্তির ঘূর্ণিগতিকে জেনে নেয়া একান্ত আবশ্যক। এবং এটি সাধন করতে যে ইংরেজীর দক্ষতা প্রয়োজন খুব কম আরব নেতারই তা আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে ম্যাকডনাল্ড, হলিউড, সিএনএন, জিন্স ও কোকাকোলার রাজ্য। সহজে ভোগের সুবিধার্থে তৈরি বিষয়ের প্রতি যে ক্ষুধা তা মেটাতে সাহায্য করছে গোলকায়নের প্রক্রিয়া, বহুজাতিক কোম্পানি। কিন্তু এইসব বস্তুর উৎপত্তি স্থল সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিষয়ে সরলীকরণের বিষয়টির বিপদ থেকে দূরে থাকতে উৎপত্তির সঙ্গে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াগুলো জড়িত তার বিশ্লেষণ জরুরি।

এ লেখা আমি যখন লিখছি তখন সারা পৃথিবী আমেরিকার দ্বারা দলিত হচ্ছে যখন এই পরাশক্তি ইরাককে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই জনবিরোধী ও অসমর্থিত কাজে পক্ষে পেয়েছেন সুবিধাবাদী সহশক্তি যেমন স্পেন ও ইতালি। যেভাবে সারা বিশ্বময় যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও মিছিলের মাধ্যমে সাধারণের বিবেক প্রতিফলিত হচ্ছে, যুদ্ধ করার মানে দাঁড়াবে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন দখলদারিত্বের উলঙ্গ প্রকাশ।

অথচ যে হারে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন আমেরিকান, ইউরোপিয়ান, এশিয়ান, আফ্রিকান ও লাতিন আমেরিকানরা যুদ্ধের প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নেমেছেন তাতে বোঝা যায় যে অনেক পরে হলেও মানুষ আমেরিকা সম্পর্কে অথবা বলতে হয় যে গুটিকতক জুডিও খ্রিস্টান সাদা মানব সন্তান বর্তমানে আমেরিকার সরকার চালাচ্ছে তাদের একনায়কোচিত গোয়ার্তুমীর বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে।

আমি এখন মার্কিন দেশের ব্যতিক্রমী দৃশ্যপটটি তুলে ধরতে চাই। আমেরিকার একজন হয়ে, আমেরিকায় আয়েশ সহকারে বহু বছর বসবাসের পর, আমি একজন প্যালেস্টাইনি বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে আউটসাইডার বা বাইরের একজন হিসেবে যে তুলনামূলক দৃষ্টিক্ষেপে পারদর্শী সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমেরিকাকে দেখাবো। আমার উদ্দেশ্য হবে আরব বিশ্বে যে একক বা একহারা সত্তা হিসেবে আমেরিকাকে দেখা হয় রোহিত করে একে বুঝে ওঠার নানান পথ নির্দেশ করা।

www.pathagar.com

আমেরিকা এবং অতীতের ধ্রুপদী সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, সাম্প্রতিক এই সাম্রাজ্য অদ্ভুতভাবে জোড় দিচ্ছে অনিত্য এক হিতৈষণার আকাঙ্ক্ষা ও এক ধরনের সাধুবৎ সরলতার ওপর। এটি উৎকণ্ঠার বিষয় যে এমন অলীক নৈতিকতাকে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে। আরো উৎকণ্ঠার বিষয় হলো প্রশ্রয় দিচ্ছেন তারা যারা এক সময় বামপন্থী ও উদার নৈতিক বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত ছিল। এই ব্যক্তিগণই আগে মার্কিনিদের বিদেশের মাটিতে যুদ্ধ করার ঘোর বিরোধী ছিল কিন্তু আজ এরাই নৈতিক সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্রিয়াশীল। একাকী সান্ত্রীর ইমেজটিকে বিশেষায়িত করা হচ্ছে এবং এই বুদ্ধিজীবীরা এমন ধারায় ক্রিয়াশীল যার প্রকাশ জনগণের জোশ জাগানিয়া দেশাত্মবোধ থেকে শুরু করে মিনিমিজম... পর্যন্ত বিস্তৃত। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা সবকিছুর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো যে টুইন টাওয়ার ও প্যান্টাগনে হামলার ঘটনা ধরে নেয়া হচ্ছে আকস্মিক এক ঘটনা হিসেবে। এটিকে মোটেও সাগরের অপর পারের পৃথিবীর মার্কিন উপস্থিতি ও খবরদারির প্রতি উন্মত্ত উত্তর হিসেবে দেখা হচ্ছে না। ইসলামিক সন্ত্রাসকে ছাড় দেবার জন্য এমনটা করা হচ্ছে না, এই সন্ত্রাস সর্বোতভাবেই ঘৃণ্য। আফগানিস্তানের প্রতি মার্কিন জবাবের যে লোকদেখানো সৎ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং এখন ইরাকের ক্ষেত্রে যেমনটা করা হচ্ছে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইতিহাস ও মাত্রাজ্ঞান দুইই তিরোহিত।

চরম বিদেশনীতিতে বিশ্বাসী উদারপন্থীরা কখনো খ্রিস্টীয় ডানপন্থীদের কথা মুখে আনেন না (এই দল সবদিক থেকেই ইসলামী চরমপন্থীদের সঙ্গে তুলনীয়)। মার্কিন রাজনীতিতে এই ডানপন্থীদের মূখ্য ভূমিকা রয়েছে। এদের দর্শন ওল্ডটেস্টাম্যান্ট থেকে উদ্ভূত, ইসরাইলের সঙ্গে যার হুবহু মিল। এই দলের নিকট বন্ধু ও এর সঙ্গে সবদিক থেকে তুলনীয় দেশ হল ইসরাইল। ইসরাইলের প্রভাবশালী নব্য রক্ষণশীলদের সঙ্গে আমেরিকার নব্য রক্ষণশীলতা ও খ্রিস্টিয় চরমপন্থীদের সাপোর্টারদের একটি অদ্ভুত মিল রয়েছে। এরা (মার্কিনী রক্ষণশীলরা) জায়নিজম্ বা ইহুদিবাদের পক্ষ নেন কারণ তারা ইহুদিদের নিজ ভূমে ফিরে আসা ও ত্রাণকর্তার (ম্যাসায়া) দ্বিতীয় আবির্ভাবের জন্য ইহুদীদের প্রস্তুত করায় বিশ্বাস করেন, এই প্রস্তুতি মূলত ইহুদিদের দল থেকে খ্রিস্টান হওয়ার উপলক্ষে, তা না হলে নিশ্চিহ্ন হওয়ার অপেক্ষায়। এই উদ্ভট ও মাত্রাতিরিক্ত সেমেটিক বিরোধী ধর্মতত্ত্বের প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করা হয় সামান্যই, ইসরাইলপন্থী ইহুদিরাতো অবশ্যই এটিকে এড়িয়েই চলেন।

আমেরিকা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ধার্মিক দেশ। আল্লাহর উল্লেখ এখানে সর্বত্র– কয়েন থেকে শুরু করে দালান কোঠা, বক্তৃতায় 'আমরা আল্লাহ'র বিশ্বাসী', 'আল্লাহর দেশ', 'আমেরিকাকে আল্লাহ রহমত করুক' এইসব বাক্যে তা প্রকাশিত। প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের ক্ষমতার ভিত্তি ষাট থেকে সত্তর মিলিয়ন খ্রিস্টান মৌলবাদী, যারা তার মতোই বিশ্বাস করে যে খ্রিস্টকে তারা দেখেছেন এবং আল্লাহর দেশে তারা সবাই আল্লাহ'র কার্যসাধন করতে এসেছেন। ফ্রান্সিস ফুকুইমাসহ আরো অনেক ভাষ্যকার তর্ক উত্থাপন করেছেন যে, আমেরিকাতে সমকালীন ধর্ম কমিউনিটি ও স্থিরতার প্রতি তৃষ্ণা থেকে জন্ম নিয়েছে। মার্কিন সমাজের প্রায় ২০% মানুষ এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে সদা ভ্রাম্যমান, এই সঞ্চরণশীলতা থেকে স্থায়িত্বের তৃষ্ণার জন্ম। এই বিষয়টি এক পর্যায়

www.pathagar.com

পর্যন্ত সত্যি। আরো বেশি যে বিষয়টি ক্রিয়াশীল তা হলো ধর্মের রকম-সকম। রসুলীয় জ্ঞান, একটি শেষ উদ্দেশ্য সাধনে দুর্মর প্রত্যয় এবং ছোট বাধা-বিপত্তিকে ধর্তব্যে না আনার এই বিষয়গুলি আমেরিকানদের পাথেয়। এমনকি মার্কিন মুলুক থেকে যে অপরাপর অস্থির বিশ্বের দূরত্ব যোজন, এই বিষয়টিরও একটি ভূমিকা রয়েছে। কানাডা ও মেক্সিকোর মতো দেশ প্রতিবেশী হিসেবে পাওয়ার ব্যাপারটিও একই কারণে একটি জরুরি বিষয়, কারণ মার্কিন স্ফূর্তি ধ্বংস করার মতো ক্ষমতা এদের নেই।

মার্কিন ত্রুটিহীনতা, শুভ ভাব, মুক্তি, অর্থনৈতিক প্রতিজ্ঞা এবং সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ওপরের বিষয়গুলো তাদের প্রতিদিনের জীবন যাপনে এমন নিবিড়ভাবে জড়িত যে তা মোটেও মতবাদ বলে প্রতিভাত হয় না বরং প্রাকৃতিক সত্য বলে মনে হয়। আমেরিকা শুভ বা কল্যাণভাবের প্রতীক, আর কল্যাণভাব দাবি করে সর্বাত্মক ভালোবাসা এবং সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততা। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি এদের অন্ধ ভক্তি বিদ্যমান এবং সংবিধানের প্রতিও এই একই ভক্তি দেখানো হয়। কারণ এটিকে এক যুগান্তকারী রচনা বলে মনে করা হয়। যদিও তা মানুষের সৃষ্টি। প্রাক মার্কিন যুগ যেন আকাট্টা প্রমাণের শেকড়।

পৃথিবীর অন্য কোন দেশে উড়ন্ত পতাকা এমন আইকনগ্রাফি বা প্রতীক চিহ্নে পরিণত নয়। আমরা একে সর্বত্র বিরাজ করতে দেখি– টেক্সিক্যাবে, কোটের লেপেলে, বাড়ী-ঘরেরসামনে, জানালায় এবং ছাদে। এটিই জাতীয় ভাবমূর্তির মূল কাঠামো এবং এটি ঘৃণ্য অপগণ্ড শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ও বীর বিক্রমে টিকে থাকার প্রতীক। দেশাত্মবোধ হল সর্বোৎকৃষ্ট গুণ, যা ধর্মাধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং দেশে ও বিদেশের মাটিতে সঠিক কাজটি সাধন করার অনুপ্রেরণা। দেশাত্মবোধও এখন ক্রয় ক্ষমতার শক্তি প্রকাশ করার মাধ্যমে নির্ধারিত। সেপ্টেম্বর এগারো'র পর আমেরিকানরা কেনাকাটা করার মাধ্যমে সন্ত্রাসের বিরোধিতা করেছে।

বুশ, ডোনাল্ড রামসফিল্ড, কলিন পাওয়েল, কণ্ডালিজা রাইঝ এবং জন এশক্রফ্ট ৭,০০০ মাইল দূরে সাদ্দামকে শিক্ষা দেবার মাধ্যমে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলছেন। এই সবকিছুর নিচে পুঁজিবাদের কাঠামোটি স্পষ্ট, যা বর্তমানে আমূল ও নাজুক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।

অর্থনীতিবিদ জুলি শোর দেখিয়েছেন যে, মার্কিনিরা বর্তমানে অনেক ঘণ্টা বেশী শ্রম দিয়েও আগের চেয়ে টাকা কম রোজগার করছেন। তিন দশক আগেও আরো কম শ্রমে তারা বর্তমানের চেয়ে বেশি রোজগার করতো। কিন্তু পুঁজিবাদের 'মুক্ত বাজারের সুযোগ' এই ডগমা বা দুর্মর প্রত্যয়ে কোনরূপ আমূল রাজনৈতিক পরিবর্তন সংগঠিত হয়নি। ব্যাপারটা যেন এমন যে, করপোরেট বা কোম্পানী কাঠামো প্রজাতন্ত্রের সহযোগী হয়ে সব মানুষকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না করতে পারলেও এই বিষয়ে কারো কোন মাথাব্যথা নেই।

এটিই হচ্ছে মার্কিন মতৈক্যের একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া রুল, একেই ব্যবহার করে রাজনীতিবিদরা এবং সরলীকৃত করে স্লোগানে এবং ভাষ্য আকারে প্রচার করছেন রাজনীতিবিদগণ। কিন্তু এই জটিল সমাজটির মধ্যে যা আবিষ্কার করা যায়, তা হলো একটি একক মতের বিরুদ্ধে আরো কত বিপরীত মত ও স্রোত বহমান আছে। যুদ্ধের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে জাগ্রত কণ্ঠস্বর, এটি আমেরিকার ফর্মাল ও মিডিয়ায় প্রকাশিত উল্টা দিক থেকে শক্তি সংগ্রহ করছে। প্রেসিডেন্ট বুশ একে ছোট করে দেখতে চাচ্ছেন এবং মূল স্রোতের প্রচার মাধ্যম (নিউইয়র্ক টাইমস্-এর মতো পত্রিকা, টেলিভিশন সম্প্রসার কেন্দ্রগুলো এবং অন্যান্য পাবলিশিং ও ম্যাগাজিন ইণ্ডাস্ট্রি) সব সময় এই ভিন্ন স্রোতকে রোহিত করতে প্রস্তুত। সাদ্দামের নামের সঙ্গে যেভাবে সিএনএন-এর সংবাদ পাঠকেরা বারবার কুকীর্তি ও শয়তানির কথা উচ্চারণ করেন এবং যেভাবে 'আমাদের' এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কথা বলেন, সরকার ও প্রচার মধ্যমগুলোর মধ্যেকার এমন নির্লজ্জ ঐক্য এর আগে কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। এয়ার ওয়েভে কেবলই অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার, সন্ত্রাস-বিশেষজ্ঞ ও মধ্যপ্রাচ্য পলিসি এনালিস্টে ভরে গেছে। কিন্তু এঁদের কেউই এই বিষয়ের প্রয়োজনীয় ভাষাও জানে না, কখনো হয়তো মধ্যপ্রাচ্যেও গমন করেন নাই এবং যে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার মতো উপযুক্ত শিক্ষাও এরা গ্রহণ করেন নাই। এরা তাদের বিতর্কে যে বিষয়টি উত্থাপন করতে ওস্তাদ, তা হলো 'আমাদের' কিভাবে ইরাককে রোহিত করতে হবে এবং কিভাবে ইরাকের পয়জন গ্যাস আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি হিসেবে জানালায় ডাক টেপ লাগাতে হবে। এই সবই তারা রিচুয়ালে উচ্চারিত মন্ত্রের মতো বলে যেতে থাকেন।

যেহেতু মার্কিন ঐকমত্যের বা কনসেনসাসে একটি নিয়ন্ত্রিত বিষয়, তাই এটি একটি শাশ্বত বর্তমানে অবস্থান করে। এই ঐকমত্যের কাজে ইতিহাস একটি অচ্ছুৎ বিষয়। এমনকি সাধারণের আলোচনাতেও ইতিহাস শব্দটি শূন্যতার সমার্থক। কাউকে অপদার্থ ও অপ্রয়োজনীয় হিসেবে চিহ্নিত করতে আমেরিকানরা সব সময়ই একটি বিদ্বেষমূলক উক্তি করেন– 'তুমি ইতিহাস'। আমেরিকাতে ইতিহাস হচ্ছে আমেরিকান হিসেবে নিজেদের সম্পর্কে তর্কাতীত, ইতিহাসবিচ্ছিন্ন কিছু বিশ্বাস (ইতিহাস বাকী পৃথিবী সম্পর্কিত নয়, কারণ তা পুরনো এবং এই কারণে অপ্রাসঙ্গিক)। এখানে একটি বিস্ময়কর বৈপরিত্ব বিদ্যমান। জনমানসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিহাসের উর্ধ্বে বিদ্যমান। অথচ সমস্ত কিছুর ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক সর্বগ্রাসী তৃষ্ণাও রয়েছে। ছোট অঞ্চল থেকে শুরু করে বিশাল সাম্রাজ্য-এই সকল কিছু নিয়েই তাদের অনুসন্ধিৎসা। আমেরিকার নানান কাল্ট বা চিন্তাস্রোত ভারসাম্য রক্ষাকারী দুই বিপরীত থেকে উৎসারিত– এ দিকে উগ্র জাতীয়তাবাদ আর অপরদিকে আধ্যাত্মবাদিতা ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস। কোন প্রকৃতির ইতিহাস শেখানো হবে এই বিষয়টি নিয়ে আমেরিকাতে এক ভয়াবহ বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ হয়ে গেছে। যারা মার্কিন ইতিহাসকে এর ধনাত্মক প্রতিক্রিয়া নির্ভর একটি একমুখো বা একক রচনা হিসেবে প্রচার করেন তারা এটিকে তাদের আইডোলজি বা মতাদর্শের প্রতিনিধিত্বকারী বিষয়ের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করেন। কারণ ছাত্রদেরকে বাধ্য নাগরিকে পরিণত করতে এটি জরুরি এবং এই মতের অধিকারীরা সর্বদাই আমেরিকার সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্কের বিষয়ে নির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব অপরিবর্তনীয় ধরে নেন। এই চরম এসেনশিয়ালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উত্তর-আধুনিকতা ও বিভেদের ইতিহাস (সংখ্যালঘু, নারী ও কৃতদাস) বিতাড়িত। কিন্তু এর ফলাফল দাঁড়াচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত, এই হাস্যকর মানদণ্ড চাপিয়ে দিয়েও কাজ হচ্ছে না।

লিণ্ডা সিমকক্স লিখেছেন, 'বন্য রক্ষণশীলরা সাংস্কৃতিক শিক্ষার নামে যা চেষ্টা করেন তা

হলো ছাত্রদের মধ্যে ইতিহাস বিষয়ে এক দ্বন্দ্বহীন, ঐকমত্যের ভিত্তিতেগড়া দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করা। কিন্তু এই প্রকল্প ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে। সামাজিক ও বৈশ্বিক ঐতিহাসিকদের হাতে যে স্টেণ্ডার্ডস বা মানদণ্ডগুলি নির্মিত হয়েছে তা শেষমেশ বহুত্ববাদী দর্শনকে ত্বরান্বিত করেছে। অথচ সরকার বহুত্ববাদিতা রোহিত করার জন্যই তৎপর। যে সমস্ত ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, সামাজিক সুবিচার এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, এই বিষয়গুলো অতীত বিষয়ে আরো বিমিশ্রিত বক্তব্য দাবি করে তাঁদের ছাড়াই ঐকমত্যের ইতিহাস খণ্ডিত হচ্ছে।'

গণ-পরিসরে মূলস্রোতের মিডিয়াগুলো তাদের ন্যারেথিমস বা বিষয় বর্ণনার মাধ্যমে আলোচনা নির্মাণ, নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও ওপরে ওপরে তারা বৈচিত্র ও বহুত্বের ভান করে। আমি যে সমস্ত বিষয়ে এখন আলোচনা করবো যা প্রাসঙ্গিক মনে হয়। এর একটি জরুরী বিষয় হচ্ছে– একত্রিত উচ্চারণ 'আমরা'। এই শব্দটি হচ্ছে জাতীয় পরিচয় যা বাঁধাহীনভাবে প্রেসিডেন্ট, জাতিসংঘ রাষ্ট্রের সেক্রেটারি, মরুভূমিতে সেনাবাহিনী অনায়াসে উচ্চারণ করে। এবং 'আমাদের' স্বার্থ দেখা হয় প্রতিরক্ষার পরিসর থেকে। কোন ভিন্ন উদ্দেশ্য এই স্বার্থ যেন কখনোই পরিচালিত হয় না এমন ইনোসেন্ট বা অবলাভাব এতে সংযোজিত হয়, যেমন ঐতিহ্যমণ্ডিত নারীকে ভাবা হয় অবলা, শুদ্ধ ও পাপবিরোহিত সত্ত্বা হিসেবে।

২.

আরেক ন্যারেথিম বা বিশেষ গল্প হলো ইতিহাসের অপ্রাসঙ্গিকতা এবং ঐতিহাসিক যোগসূত্রগুলো অস্বীকার করা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, সাদ্দাম ও বিন লাদেনকে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একদিন অস্ত্র সরবরাহ করেছে অথবা ভিয়েতনাম যে আমেরিকার জন্য 'মন্দ' ছিলো– যেমন জিমি কার্টার এই যুদ্ধ সম্পর্কে একদা উল্লেখ করেছেন যে এটি ছিলো 'পারস্পরিক ধ্বংসযজ্ঞ', এই সব বিষয়ের উল্লেখ একেবারেই নিষিদ্ধ। অথবা আরো পোক্ত উদাহরণ দেয়া চলে যে, মার্কিন অভিজ্ঞতার দু'টি জরুরি ও মৌল বিষয়কে রাষ্ট্রীয়ভাবে অপ্রাসঙ্গিক করে রাখা হয়েছে। এর একটি হলো আফ্রো-আমেরিকানদের ক্রীতদাস হিসেবে আমেরিকায় নিয়ে আসা ও মানবগোষ্ঠী হিসেবে নেটিভ আমেরিকানদের ডিসপোজেস বা ত্যাগ করা, এমনকি প্রায় গণহত্যার মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। ঐকমত্যের দুর্মর সত্যে এই বিষয়গুলোর কোন ছোঁয়া এখনো পর্যন্ত লাগেনি। ওয়াশিংটন ডিসিতে বৃহৎ এক হলোকস্ট জাদুঘর আছে, কিন্তু নেটিভ আমেরিকান বা আফ্রো-আমেরিকানদের জন্য কোন মেমোরিয়াল নেই।

অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপরিলক্ষিত প্রত্যয়টি হলো এই যে, বিরোধিতা মানেই মার্কিন স্বার্থ পরিপন্থী। এর উৎস 'আমাদের' গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সম্পদ এবং বীরত্ব অথবা বিদেশী নোংরামি (যেমনটা ফরাসীদের মার্কিন যুদ্ধ বিরোধিতায় মার্কিনীরা খুঁজে পান) এসব বিষয়ে মিথ্যা গর্ব। মার্কিনীরা ইউরোপীয়দের বার বার মনে করিয়ে দেয় যে তারা বিংশ শতকে দুইবার তাদের উদ্ধারকর্তা ছিলো এবং এর মাধ্যমে তারা প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে ইউরোপিয়রা বসে বসে কেবল নেত্রপাত করেছে যখন মার্কিনিরা আসল যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলো।

www.pathagar.com

এই ন্যারেথিম বা বিশেষ গল্পের বদল হয়ে যায় যখন মিডল ইস্ট বা লাতিন আমেরিকায় পঞ্চাশ বা তারও অধিক সময় ধরে আমেরিকানদের উপস্থিতির প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়। এক্ষেত্রে মার্কিনীরা হয়ে ওঠেন সৎ ব্রোকার বা মধ্যস্থতাকারী, পক্ষপাতহীন কাজী বা বিচারক ও এমন এক কল্যাণকামী শক্তি যে অজাতশত্রু। এই বিশেষ-গল্পে ক্ষমতা অর্থনৈতিক স্বার্থ, সম্পদ হস্তগত করা, বর্ণের প্রতি পক্ষপাত কিংবা জোরপূর্বক অথবা গোপনে শাসক পরিবর্তনের মতো বিষয় (যেমনটা ইরানে ১৯৫৩ তে এবং চিলিতে ১৯৭৩-এ ঘটিয়েছে) আলোচিত হওয়ার সুযোগ নাই। এই বিষয়গুলো আড়ালেই থাকে, যদি না কেউ হঠাৎ মনে করিয়ে দিয়ে গোলমাল সৃষ্টি করে। কেউ যদি এই বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিতও করতে চান তবুও তা সরকারি বুদ্ধি ধারা অনুযায়ী ইউফেমিজম বা আপাত কোমল প্রতিশব্দ ও ভাষা ব্যবহার করে করতে হয়। এমন বাক্যবন্ধন ব্যবহার করা হয় যা লঘু ক্ষমতা, তার প্রয়োগ এবং মার্কিন স্বপ্ন স্পষ্ট করে তোলে। সবচেয়ে বেশী যে বিষয়টি আড়াল করা হয় তা হলো পৃথক পৃথক পলিসি, যেগুলো মার্কিনীদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়েছে। যেমন ইরাকে অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে যে সাধারণ মানুষের ক্ষতি, আরিয়াল শ্যারনের প্যালেস্টাইন জনগণ বিরোধী কেম্পেন, তুর্কী ও কলাম্বিয়ান দুঃশাসকদের পক্ষে ও তাদের নিজ নিজ জনসাধারণের প্রতি যে নাশকতা তারও পক্ষে দাঁড়ানোর বিষয়গুলো নিয়ে লুকোচুরি খেলা হয়। পলিসি বা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনায় এই সব বিষয় ধর্তব্যের সীমানার বাইরে থাকে।

সবশেষে যে ন্যারেথিম বা বিশেষ গল্প সেটি হচ্ছে হেনরী কিসিঞ্জার, ডেভিড রকে ফেলারের মতো ব্যক্তিত্বসহ সাম্প্রতিক সরকারের সকল অফিসিয়ালদের নৈতিক প্রজ্ঞা সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করা। রিচার্ড নিক্সন যুগের দুই অপরাধি এলিওট আব্রাহাম ও জন পোয়েনডেক্সটারকে বর্তমান সরকার মূল্যবান পদে বসিয়েছেন, কিন্তু এই বিষয়ে কোন মন্তব্যই শোনা যায়নি, বিরুদ্ধাচরণতো পরের বিষয়। অতীত ও বর্তমান প্রশাসনের প্রতি যে অন্ধ ভক্তি তা ভাষ্যকারদের সম্ভাষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে কোন ভাষ্যকারই কোন প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তার মসৃণ বদনের বর্ণনা দেন, যা কোন রকম অপরাধের প্রমাণ দ্বারা কলঙ্কিত নয়।

এই যে ব্যবহার, এর পেছনে রয়েছে মার্কিনিদের প্রেগমেটিজম বা প্রয়োগবাদী দর্শনকে বাস্তবতা বোঝার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে বিশ্বাস করা। প্রয়োগবাদীতা হচ্ছে অধিবিদ্যা ও ইতিহাস বিরোধী, এমনকি দর্শন বিরোধী। উত্তর আধুনিকতায় নাম ও চিহ্ন বিরোধিতার নামে সব কিছুকেই বাক্যের যে স্ট্রাকচার এবং ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিয়ে যাচাই করে, এই বিষয়টিও এই গোত্রীয়। উত্তর আধুনিকতা হলো এনালিটিক বা বিশ্লেষণী দর্শনের পাশাপাশি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চিন্তার জগতের সবচেয়ে প্রভাবশালী ধারা। আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে হেগেল এবং হাইডেগার বিষয় হিসেবে ইতিহাস ও সাহিত্য বিভাগে পড়ানো হয়, কিন্তু দর্শন হিসেবে এদের পাঠ করা হয় না বললেই চলে। মার্কিনীদের তথ্য প্রচারের নতুন উদ্যোগ (বিশেষত মুসলিম বিশ্বে) এই মহাগল্প ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

মার্কিন এই ট্রেডিশনের তুমুল বিরোধী স্রোত এবং ইমিগ্রেন্ট সমাজের ভিন্ন ভাবনা, এই সবই প্রশাসনের তৈরি ন্যারেথিম বা বিশেষগল্পের পাশাপাশি ও ভিতরে ভিতরে বেড়ে

www.pathagar.com

উঠছে। কিন্তু এই বিষয়গুলো উদ্দেশ্যমূলকভাবেই স্পষ্ট হতে দেয়া হচ্ছে না। বহিঃবিশ্বের চিন্তাবিদেরা হামেসাই এই বিরুদ্ধস্রোত চিহ্নিত করতে সক্ষম হন।

আমরা যদি ইরাকে যুদ্ধের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যে তীব্র বাধাগুলোর জন্ম হয়েছে তার প্রতিটি অংশকে বিশ্লেষণ করি তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। এই মার্কিন দেশ বাইরের সাহায্য-সহযোগিতা, আলোচনা ও ঘটনার প্রতি অধিক সদয় ও সহনশীল। আমি ঐসব লোকদের বাদ রাখছি যারা রক্তক্ষয় ও সম্পদের ক্ষতি এবং অর্থনৈতিক বিপত্তির ভয়ে এই যুদ্ধ এড়াতে চাচ্ছেন। আমি ডানপন্থীদের মত নিয়েও ভাবিত না। যারা সর্বদা বিষোদগার করে যে আমেরিকা দুষ্ট বিদেশী, জাতিসংঘ ও আল্লাহীন কমিউনিস্টদের দ্বারা আক্রান্ত।

ব্যক্তি স্বাধীনতাবাদী ও একাকিত্বপন্থীরা, যারা ডান ও বামের অদ্ভূত মিশ্রণে তৈরি, তাদের সম্পর্কে মন্তব্য নিস্প্রয়োজন। আমি এই আলোচনায় যুক্ত করতে চাই মার্কিন দেশের একটি আদর্শবাদী বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে। এই দল হচ্ছে মার্কিন অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন ও পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে ঘোর সন্দেহ পোষণকারী ছাত্র সমাজ। এরা আদর্শ তাড়িত এবং কখনো কখনো কিছুটা এনার্কিকধর্মী। এই দলই ভিয়েতনাম, সাউথ আফ্রিকা এবং মার্কিন সিভিল রাইট বিষয়ে ক্যাম্পাসগুলো সবসময় সরগরম করে রাখতো। এদের পর বাকি থাকে আরো কতেক গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস তাড়িত দল। ইউরোপ এবং আফ্রো ভাষায় যাদের বাম বলে চিহ্নিত করা চলে। যদিও আমেরিকাতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পার্লামেন্টারী বাম বা সমাজতান্ত্রিক ধারা বলে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। দুই দলীয় শক্তির দলনে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ডেমোক্রেটিক দল কখনো কখনো বামের শূন্যস্থান পুরণে মৃদু এগিয়ে আসতো। বর্তমানে ডেমোক্রেটিক দল এমন দূরবস্থায় পতিত যা থেকে সহজে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব।

আফ্রো-আমেরিকান জনগোষ্ঠীর প্রগতিশীল অংশকেও আমি উপরোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করতে চাই। এরা সেই সমস্ত নাগরিক দল বা গোষ্ঠী যারা পুলিশের অত্যাচার, চাকুরী ক্ষেত্রে বৈষম্য, শিক্ষা ও বাসস্থানের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করে আসছে। এদের নেতৃত্বে আছেন রেভারেন্ড অ্যাল শার্পটন, কর্নেল ওয়েস্ট, মোহম্মদ আলী, জেসি জ্যাকসন (যদি ইনি এখন এক ম্রিয়মান নেতা) এবং অন্যান্যরা। এরা সকলেই মার্টিন লুথারের ভূমিকায় নিজেদের কল্পনা করেন।

বিপরীত স্রোতের এই আন্দোলনে আরো অনেক নৃগোষ্ঠীর একটিভিস্টরা জড়িত। এদের মধ্যে লাতিন আমেরিকান, নেটিভ বা আদি আমেরিকান ও মুসলিমরা রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই কমবেশী চেষ্টা করেছেন মূল ধারার সাথে সংযুক্ত হতে। প্রত্যেকেই সরকারের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্ম সাধনে অথবা টেলিভিশনের টক শোতে হাজির হয়ে অথবা বিভিন্ন ফাউন্ডেশন, কলেজ ও করপোরেশনের প্রশাসনিক পদে নিয়োজিত হতে চেষ্টা করে আসছেন। এই জনগোষ্ঠীগুলো উচ্চাকাঙ্ক্ষার বদলে তাদের প্রতি যে সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ ও অনাচার সেই বিষয়ে সচেতনতার দ্বারাই পরিচালিত। এ কারণেই এরা আপাদমস্তক আমেরিকান স্বপ্নে (বিশেষ করে সাদা মধ্যবিত্তের স্বপ্নে) ডুবে যেতে রাজি না। শার্পটন ও রেল্ফ নাদের ও তাঁর পক্ষের অনুসারীদের কষ্ট করে টিকিয়ে রাখা গ্রীণ পার্টির মার্কিন মুল্লুকে কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা আছে। এমনকি প্রচার ও প্রকাশও

www.pathagar.com

রয়েছে। তবে মজার ব্যাপার হলো এসব সত্ত্বেও এঁরা সকলেই আউট সাইডারের মতো এবং মার্কিন সমাজের গতানুগতিক পুরস্কারের লোভ তাঁদের আপন আদর্শের প্রতি কোন ঝুঁকির কারণ নয়। কারণ এরা সকলেই নিজ আদর্শে অটল এবং সামাজিক পুরস্কারের প্রতি তাঁদের কোন লোভ নেই।

মার্কিন সমাজের নারী আন্দোলনের মূল ধারাটিও এই সমাজের মূল স্রোত বিরোধী। এঁদের এবোরশনের অধিকার, যৌন হয়রানি ও অত্যাচার এবং চাকুরী ক্ষেত্রে সম অধিকারের মতো ইস্যুগুলোর মাধ্যমেই তাঁরা বিরোধী স্রোতের শক্তিশালী অংশ। আপাত দৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয় এবং স্বাভাবিক স্বার্থ ও উন্নয়ন অনুসারী জীবিকায় নিয়োজিত দলগুলো (যেমন চিকিৎসক, আইনজীবী, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞ শিক্ষক সম্প্রদায় এমনকি কিছু কিছু শ্রমিক ইউনিয়ন ও পরিবেশ আন্দোলনে জড়িত গোষ্ঠীসমূহ) বিরুদ্ধ স্রোতের গতিকে চালিত করে। যদিও এই গোষ্ঠীসমূহ তাদের স্বার্থের কারণেই সমাজের নিয়মানুগ কার্যক্রম ও তা থেকে সৃষ্ট এজেণ্ডা বা পরিকল্পনাসমূহের ওপর আস্থা রেখেই চলে।

পরিবর্তন ও বিরুদ্ধাচরণের ক্ষেত্র হিসেবে চার্চগুলোকেও বাদ দেয়া চলে না। মৌলবাদী ও টেলিএভেনজেলিস্টরা (যারা টিভি মারফত ধর্ম প্রচারে বিশ্বাসী), তাদের থেকে এই সংগঠিত চার্চের সদস্যরা পৃথক। কেথোলিক বিশপ, যুদ্ধের বিরুদ্ধে এপিসকোপালিয়ান চার্চের যাজক ও সাধারণ সদস্য, কোয়াকার (যে সব খৃস্টান ইনফর্মাল ধর্মীয় সম্মেলনে বিশ্বাসী) এবং প্রেসবাইট্যারিয়ানদের সিনোড় বা সভা অবিশ্বাস্যরকম দৃঢ়। এরা শান্তির পক্ষে উদারনৈতিক ভূমিকা নিচ্ছে এবং মানব অধিকার লঙ্ঘন ও অতিশয় স্ফীত মিলিটারী বাজেট ও নব্য উদারনৈতিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিরুদ্ধেও এরা কথা বলতে প্রস্তুত। ঐতিহাসিকভাবেই ইহুদী সমাজের একাংশ সব সময়ই প্রগতিশীল সংখ্যালঘুর অধিকার সম্পর্কে দেশে ও বিদেশে আন্দোলনে জড়িত। কিন্তু রিগান আমলে নব্য-রক্ষণশীলরা ক্ষমতায় আরোহণের পর মার্কিন ও ইসরাইলি ধর্মীয় ডানপন্থীদের একত্রিত শক্তি ইসরাইলের যে কোন রকম সমালোচনাকে সেমেটিক বিরোধিতা বলে চিহ্নিত করা শুরু করে। ফলে ইহুদী এই প্রগতিশীল ধারার ধ্বনাত্মক দিক প্রায় নিশ্চিহ্ন।

অন্য গোষ্ঠীদের মধ্যে যারা রেলী, প্রতিবাদ মার্চ এবং শান্তি-সমাবেশের মাধ্যমে সেপ্টেম্বর এগারো পরবর্তী হৃদয় অন্ধকার করা দেশাত্মবোধের বিরোধিতা করেছে তাদের কথা বলব জরুরী। এঁরা মার্কিন 'পেট্রিওট এক্ট'-এর বলীতে পরিণত সিভিল মুক্তি ও বাক স্বাধীনতার পক্ষে জড়ো হয়েছেন। যে বিষয়গুলো মধ্যবিত্তের গতি-প্রকৃতিকে লঙ্ঘিত করে, এই দলগুলো তারই বিরোধী ধারণার প্রবক্তা। কেপিটাল পানিশম্যান্ট, গুয়েনতানামো সাগরের ডিটেনশন ক্যাম্পে মানবাধিকার লঙ্ঘন, এছাড়াও সামরিক বাহিনীতে সিভিলিয়ান নেতৃত্বে অবিশ্বাস ও ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত মার্কিন জেল-হাজত ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা, এই সবকিছুর বিরুদ্ধেই এরা সোচ্চার।

এসবের সমান্তরালে রয়েছে সাইবার জগতের মজাদার যুদ্ধ। যেখানে সরকার ও সাধারণ দ্বন্দ্বে রত। বর্তমান পতনোন্মুখ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ধনী-গরীবের পার্থক্য, করপোরেট গুরুদের অপব্যয় ও দুর্নীতি এবং প্রাইভেটাইজেশনের লালসার তোপে পরা সোশাল সিকিউরিটি ব্যবস্থা মার্কিন পুঁজিবাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারণাগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন হলো– বুশের আক্রমণাত্মক বিদেশ নীতি ও বিপদজ্জনকরকম সাদামাটা অর্থনৈতিক দর্শনের পেছনে আমেরিকানরা একত্রিত কি না? আমেরিকার পরিচিতি কি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে? এবং আমেরিকা এমন কিছু বিষয় কি ধারণ করে যার বিপরীতে পৃথিবীর কোন কোন শক্তি (শান্ত থাকতে চাইছে না) দাঁড়াতে সক্ষম?

এই লেখায় আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেখার অন্য একটা পথ বাতলাতে চেষ্টা করেছি। বলতে চেয়েছি যে এটা একটা বিপদে আক্রান্ত দেশ এবং এর মধ্যে নানান বিবাদমান বাস্তবতা বর্তমান। আমার মনে হয় আমেরিকাকে বলা যায় যে, এটি নানান পরিস্থিতির দ্বন্দ্বে পতিত এক জাতি। যেমন মার্কিনীরা বাইরের বিশ্বে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হচ্ছে তেমনটা অভ্যন্তরেও। আমেরিকা হয়তো কোল্ড ওয়ার বা স্নায়ু যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, কিন্তু এর ফলাফল এদেশের ভিতরেই এখনো স্পষ্ট না। আর এই দ্বন্দ্ব এখনো শেষ হয়ে যায়নি। মার্কিন হোমড়াচোমড়াদের মিলিটারী ও রাজনৈতিক শক্তির এককেন্দ্রীকতার দিকে এমনভাবে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখা হয় যে আভ্যন্তরীণ ঘটমান দ্বন্দ্বগুলিকে হেলা করা হয়। এই দ্বন্দ্বের সমাধান এখনো অনেক দূরে। এবোরশনের অধিকার এবং বিবর্তনবাদ শিক্ষা দেয়া,.এই বিষয়গুলোর কোন সুরাহাই এ যাবতকাল পর্যন্ত হয়নি।

ফুকুইয়ামার ইতিহাসের সমাপ্তির থিসিসের ভুল এবং হান্টিংটনের সভ্যতার দ্বন্দ্ব বিষয়ক তত্ত্বের ত্রুটি অনেকটা একই রকম। তারা দু'জনেই ভুলবশত ধরে নেন যে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র আছে, শুরু, মধ্য এমনকি শেষও আছে। অথচ সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রটি হচ্ছে এর চরিত্র, স্বনির্ধারিত সংজ্ঞা এবং এই বিষয়ের ভবিষ্যতে প্রক্ষেপণের চেষ্টার ক্ষেত্র। দুই তাত্ত্বিকই সঞ্চরণশীল সংস্কৃতির অনিত্য উত্তালতার ধারণাকে বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট সীমানা ও সুনির্দিষ্ট আভ্যন্তরীণ নিয়ম-কানুন মেনে নেন।

সংস্কৃতি– বিশেষ করে ইমিগ্রেন্ট সংস্কৃতি–আমেরিকাতে অপর সংস্কৃতির সাথে সংমিশ্রিত হচ্ছে। গোলকায়নের অনভিপ্রেত একটি ফল হচ্ছে আন্তঃজাতীয় কমিউনিটিগুলোর আত্মপ্রকাশ। মানবাধিকার, নারীর পক্ষে ও যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যমে এই কমিউনিটি বা সমাজগুলো সৃষ্ট ও পরিচালিত। এগুলোর দ্বারা আমেরিকা মোটেই অপমাণিত হচ্ছে না। তবে, আমেরিকার আপাত ঐক্যের অভ্যন্তরে যে মতবিরোধ তা পৃথিবীর সকল সমাজেই বিদ্যমান। এই সত্য আবিষ্কারে আশা ও প্রেরণা জাগ্রত হয়।

আল আহরাম
খবরের কাগজ, ৮ এপ্রিল '০৩

www.pathagar.com

সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃণ্য যুদ্ধ

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ
অনুবাদক : মশিউল আলম

বুশ প্রশাসনের অবিরাম একতরফা যুদ্ধতৎপরতা অনেকগুলো কারণে অত্যন্ত আপত্তিজনক ও বিরক্তিকর। কিন্তু আমেরিকান জনগণের কথা ভাবলে এই পুরো দুঃস্বপ্নময় দৃশ্যটি গণতন্ত্রের এক বিশাল ব্যর্থতা। বিপুল সম্পদশালী ও প্রবল পরাক্রমশালী একটি রাষ্ট্র ছিনতাই হয়ে গেছে কতিপয় ব্যক্তির একটি ক্ষুদ্র চক্রের হাতে। তারা কেউই নির্বাচিত নন, তাই জনমতের চাপকে ভ্রূক্ষেপ করছে না, স্রেফ মুখ ফিরিয়ে আছে। এই যুদ্ধকে সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে অজনপ্রিয় যুদ্ধ বললে অতিরঞ্জন হবে না।

ষাট ও সত্তরের দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের চরম পর্যায়ে বিশ্বজুড়ে যেসব যুদ্ধবিরোধী মিছিল-সমাবেশ হয়েছে, এবার ইরাকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ যুদ্ধবিরোধী মিছিল করেছে শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই। লক্ষণীয়, ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী মিছিল-সমাবেশগুলো হয়েছিল কয়েক বছর ধরে যুদ্ধ চলার পর, আর ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে মিছিল-সমাবেশ হয়েছে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই।

আমি কত জায়গায় ঘুরে বেড়াই, কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু একজন মানুষও আমি এ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি যিনি ইরাকে যুদ্ধ চান। আরো খারাপ কথা হচ্ছে, অধিকাংশ মার্কিন নাগরিক এখন মনে করছেন, যুদ্ধের প্রস্তুতি এত দূর এগিয়ে গেছে যে এটা আর থামবে না, আর তাই আমরা এখন আমাদের দেশের এক বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। ডেমোক্র্যাটিক দলের কথাই ধরুন না কেন, অল্প কয়েকজন ব্যতিক্রম ছাড়া দলটির অধিকাংশ সদস্যই মেকি দেশপ্রেম দেখাতে নির্লজ্জভাবে প্রেসিডেন্ট বুশের পক্ষে মত দিয়েছেন। কংগ্রেসের যেখানেই তাকাই না কেন, সবখানেই হয় ইহুদি লবি, দক্ষিণপন্থী খ্রিস্টান লবি, নয়তো সামরিক শিল্পপতি লবির প্রতি সহানুভূতির লক্ষণ দেখা যাবে। এই তিনটিই অত্যন্ত প্রভাবশালী সংখ্যালঘু গ্রুপ, যারা আরব বিশ্বের প্রতি সমানভাবে শত্রু মনোভাবাপন্ন আর চরমপন্থী ইহুদিবাদের প্রতি তাদের সমর্থন সীমাহীন। এবং তারা মনে করে যে তারা ফেরেশতাদের পক্ষে কাজ করছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০০টি কংগ্রেসীয় এলাকায় একটি করে প্রতিরক্ষা শিল্প আছে। তাই যুদ্ধ এখন একটা কর্মসংস্থানের ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এটি কোনো নিরাপত্তার বিষয়

www.pathagar.com

নয়। যে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন– দেশের চলমান অর্থনৈতিক মন্দা, সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থার প্রায়নিশ্চিত দেউলিয়াত্ব, ক্রমবর্ধমান জাতীয় ঋণ, সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক ব্যর্থতা ইত্যাদির প্রতিকার এই অবিশ্বাস্য রকম ব্যয় সাপেক্ষ যুদ্ধ থেকে কীভাবে হবে?

অন্যদিকে আমেরিকার সংবাদমাধ্যম বুশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টারই একটা হাতিয়ারের ভূমিকা পালন করছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া, বিশেষ করে টেলিভিশন থেকে যুদ্ধবিরোধী কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেছে। বড় বড় প্রতিটি টেলিভিশন চ্যানেল অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল, সাবেক সিআইএ এজেন্ট, সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ আর সুপরিচিত নয়া রক্ষণশীল ব্যক্তিদের 'কনসালট্যান্ট' হিসেবে নিয়োগ করছে। তারা এমনভাবে কথা বলে, যেনবা তারা নিজেদের স্বাধীন মত ব্যক্ত করছে। কিন্তু কার্যত তাদের সব কথাই মার্কিন প্রশাসনের পক্ষে যায়– জাতিসংঘ থেকে শুরু করে আরবের মরুভূমি পর্যন্ত যেখানে যা-ই করুক না কেন বুশ প্রশাসন। শুধু বাল্টিমোরের একটি দৈনিক পত্রিকা রিপোর্ট ছেপেছে যে আমেরিকা নিরাপত্তা পরিষদের ছয়টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যকার কথাবার্তায় আড়ি পেতেছে, বার্তা আদান-প্রদানে, ইন্টারসেপ্ট করেছে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে মূলধারার সংবাদ মাধ্যমে যুদ্ধবিরোধী কথা শোনা বা পড়ার সুযোগ মিলছে না। সরকারি প্রচারমাধ্যম, নিউইয়র্ক টাইমস, নিউইয়র্কার-এ, ইউএস নিউজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট, সিএনএন-কোথাও কোনো আরব বা মুসলমানের বক্তব্য বা ইসরায়েলের সমালোচনার জায়গা নেই। এই প্রচার মাধ্যমগুলো ফলাও করে প্রচার চালিয়েছে, যে ইরাক জাতিসংঘের ১৭টি প্রস্তাব লঙ্ঘন করেছে। কিন্তু ইসরায়েল যে জাতিসংঘের ৬৪টি প্রস্তাবকে স্রেফ উড়িয়ে দিয়েছে (যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে) এই তথ্যটি তারা কখনোই উল্লেখ করেনি। গত ১২ বছর ধরে ইরাকের জনগণ যে অবর্ণনীয় কষ্ট-দুর্ভোগের মধ্যে দিনযাপন করছে, সেকথাও কখনো উল্লেখ করা হয় না।

সাদ্দাম যা করেছেন, আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট ইসরায়েল আর শ্যারনও তা-ই করেছেন। কিন্তু ইসরায়েল ও শ্যারনের ব্যাপারে কেউ কিছু বলছেন না, অথচ সাদ্দামের ব্যাপারে তর্জন-গর্জন চলছে। বুশ বা অন্যরা যখন বলেন যে, জাতিসংঘকে নিজের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করতে হবে, তখন সেটা মশকরা ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবে আমেরিকার জনগণের সঙ্গে মিথ্যাচার করা হচ্ছে, ভুল ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে তাদের স্বার্থগুলো বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বুশ ও তার পারিষদবর্গের এই যুদ্ধের আসল লক্ষ্য ও অভিপ্রায়গুলো তাদের চরম ঔদ্ধত্যের আড়ালে রয়েছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড, যিনি কোনো নির্বাচিত ব্যক্তি নন, পেন্টাগনে তার সেবক কর্মকর্তারা-উলফোভিৎস, ফেইথ আর পার্ল, কিছু সময় ধরে পশ্চিম তীর ও গাজায় ইসরায়েলের ভূমি দখলের পক্ষে এবং অসলো শান্তি প্রক্রিয়া থামানোর পক্ষে প্রকাশ্যে ওকালতি করেছেন, তারা ইরাকের বিরুদ্ধে (পরে ইরানের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন। ১৯৯৬ সালে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য নেতানিয়াহুর পক্ষে সফল প্রচারাভিযানের সময় তার ব্যক্তিগত উপদেষ্টা হিসেবে তারা ফিলিস্তিন থেকে কেড়ে নেওয়া ভূমিতে বেশি করে ইসরায়েলি বসতি গড়ে তোলার পক্ষে ওকালতি করেছিলেন। আজকে তাদের কথাগুলোই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

ইসরায়েলি সৈন্যদের হাতে নিরীহ সাধারণ ফিলিস্তিনি হত্যার খবর যদি আদৌ কখনো ছাপা হয়, প্রতিবেদনের শেষের দিকে সেগুলো সামান্য জায়গা পায়। কিন্তু সাদ্দামের অপরাধের সঙ্গে ইসরায়েলের এসব বর্বর হত্যাযজ্ঞের তুলনা টানা হয় না। ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের অন্যায় দস্যুনীতি চরিতার্থ করার জন্য আমেরিকার জনগণের মতামত না নিয়ে তাদের করের টাকা ইসরায়েলে পাঠানো হয়। গত দু'বছর ইসরায়েলি সৈন্যরা পরিকল্পিতভাবে প্রায় আড়াই হাজার নিরীহ সাধারণ ফিলিস্তিনি নারী, পুরুষ ও শিশু হত্যা করেছে। গুরুতরভাবে জখম করেছে ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষকে। আধুনিক ইতিহাসে দীর্ঘতম সামরিক দখলদারিত্বের এই সময়কালে একটি জাতিকে শাস্তি দেওয়ার, লাঞ্ছিত করার, অপমাণিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ইসরায়েলি সৈন্যদের।

ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছার পর থেকে আমেরিকার সংবাদ মাধ্যমের মূলধারায়, তা সে উদারপন্থি, মধ্যপন্থি বা প্রতিক্রিয়াশীল যে অংশই হোক না কেন, কোনো আরব বা মুসলমানের বক্তব্য নিয়মিতভাবে স্থান পায়নি। আরো একটা বিষয়, এই যুদ্ধের প্রধান পরিকল্পনাকারীরা কেউই কয়েক দশক ধরে আরব বিশ্বের কোনো দেশে বাস করা দূরে থাক, ধারেকাছেও যাননি (তথাকথিত বিশেষজ্ঞ বার্নার্ড লুইস ও ফুয়াদ আজামির কথা বলাই বাহুল্য)। কলিন পাওয়েল, কন্ডোলিৎসা রাইস ও ডিক চেনির মতো সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারা এবং তাদের মহান ঈশ্বর খোদ জর্জ ডব্লিউ বুশও মুসলমান বা আরব বিশ্ব সম্পর্কে যেটুকু জানেন তা ইসরায়েল,তেল কোম্পানি আর সামরিক সূত্রে জানেন। এর বাইরে তারা কিছুই জানেন না। তাই ইরাকের বিরুদ্ধে এই মাত্রার একটি যুদ্ধ সেখানে বসবাসরত জনমানুষের জন্য কী পরিণতি বয়ে আনবে সেই ধারণাও তাদের নেই।

অথবা পেন্টাগনে উলফোভিৎস ও তার সহযোগীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কথাই ধরা যাক। নিদ্রিতপ্রায় কংগ্রেস তাদের জিজ্ঞেস করল যে যুদ্ধের সম্ভাব্য খরচ ও পরিণতিগুলো কী রকম হতে পারে। কোনো সুনির্দিষ্ট জবাব ছাড়াই তাদের পার পাইয়ে দেওয়া হলো। এর অর্থ হচ্ছে, আর্মি চিফ অব স্টাফ যে বলেছেন ১০ বছরে ৪ লাখ সৈন্য বিশিষ্ট সামরিক বাহিনীর পেছনে খরচ হবে প্রায় ১০ হাজার কোটি ডলার– এটা সত্য নয়। কতিপয় ব্যক্তির একটি ছোট গ্রুপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব এমনভাবে নিয়েছে, যেনবা এটিও আরব বিশ্বের একটি দেশ। এটা খুবই সঙ্গত প্রশ্ন-যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় কারা? কারণ খুব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বর্তমান মার্কিন প্রশাসন যে যুদ্ধের পাঁয়তারা করছে তার মধ্যে জনমত প্রতিফলিত হচ্ছে না। আর আমেরিকার সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করছে ছোট একটি গ্রুপ যারা সরকারের জন্য চিন্তার বা উদ্বেগের কারণ হতে পারে এমন সবকিছু গণমাধ্যম থেকে ছেঁটে ফেলে।

দি ডন

প্রথম আলো, ১৯ মার্চ '০৩

www.pathagar.com

ইসলাম এবং পাশ্চাত্য অসম্পূর্ণ ছায়াতল

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ
অনুবাদ : বরকত উল্লাহ্ মারুফ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে (এবং সামান্য কম মাত্রায় ওয়াশিংটনে) সন্ত্রাসী হামলা ও তার পরবর্তী ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে বিশ্ববাসী আঁচ করেছে এক অদৃশ্য সন্ত্রাসীকে, প্রত্যক্ষ করেছে কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য ও উদ্দেশ্য ছাড়াই সন্ত্রাস এবং তার অন্ধ ও যুক্তিহীন ধ্বংসলীলাকে। আক্রান্ত শহরবাসীর এই আতঙ্ক, উদ্বেগ আর বিদ্যমান ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া সুনির্দিষ্টভাবেই দীর্ঘসময় ধরে থেকে যাবে, এতো বেশি হত্যা এতো বেশি নিষ্ঠুরভাবে আরোপিত হয়েছে যে তার জন্য সত্যিকার দুঃখবোধ আর সহানুভূতিও মানুষের ভেতর থেকে যাবে। নিউইয়র্কবাসীর ভাগ্য যে এই ঘটনার কারণেই মেয়র রুডি জুলিয়ানির মতো গোমড়ামুখো, অপ্রীতিকর রকম যুদ্ধংদেহী এবং জনপ্রিয়তায় পড়তির দিকের লোকও রাতারাতি চার্চিলীয় সম্মান অর্জন করে ফেলতে পারলেন। শান্ত ও আবেগহীনভাবে তিনি শহরের বীর পুলিশ, অগ্নি ও নিরাপত্তাবাহিনীকে তাদের সমীহ জাগানো ত্যাগ আর অসামান্য আত্মাহুতির মধ্য দিয়েই পরিচালনা করলেন (হায়! বড় বেশি সংখ্যক সে মৃত্যু)। শহরের বিপুল সংখ্যক আরব আর মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর জেহাদি জোশে ঝাঁপিয়ে পড়া আর ক্রমবর্ধমান আতঙ্কের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী, ক্ষোভ প্রশমনে সুবিবেচনা এবং ধ্বংসের পর নতুন করে জীবন শুরু করার আহ্বান তার কণ্ঠ থেকেই অবশ্য প্রথম শুনতে পাওয়া গেল।

জাতীয় টেলিভিশন রিপোর্ট বিরামহীনভাবেই ধ্বংসের সে অপদেবতা ও তার কীর্তিকে ঘরে ঘরে পৌছে দিয়েছে, সবসময় যদিও তা নির্মোহ থাকেনি। তার বেশিরভাগ বক্তব্যই ছিল অতিকথন আর স্ফীত, স্বাভাবিকভাবেই যা প্রতিটি মার্কিনির মনেই ঢুকিয়ে দিয়েছে এক অপূরণীয় ক্ষতি, রাগ-ক্ষোভ ও নির্যাতিতের নিঃস্বতার অনুভূতি, জাগিয়ে তুলেছে প্রতিহিংসা আর অসংযত প্রতিশোধস্পৃহা। শোক আর দেশপ্রেমের মিশ্র এক বল্গাহীন অনুভূতিতে আপ্লুত হয়ে মার্কিন রাজনৈতিক পাণ্ডা আর পণ্ডিতেরা দায়িত্বপূর্ণভাবে অবিরাম বাগ্মীতায় বলে গেছে,কীভাবে তারা–মার্কিনিরা হারতে পারেন না, ভয় পেতে পারেন না, সন্ত্রাস নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তারা থামতে পারেন না। প্রত্যেকেই বলে গেলেন– এ যুদ্ধ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, কিন্তু কার বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ, কোথায় তার শেষ– এসবের উত্তর পাওয়া গেল না। শুধু জানা গেল মধ্যপ্রাচ্য বা ইসলাম হলো সেই শত্রু যার বিরুদ্ধে 'আমরা' অবস্থান করছি এবং সন্ত্রাসকে অবশ্যই ধ্বংস হতে হবে। সবচে' হতাশার ব্যাপার হলো,

www.pathagar.com

বিশ্ব পরিস্থিতিতে আমেরিকার ভূমিকা উপলব্ধিতে খুবই কম সময় বরাদ্দ করা এবং আটলান্টিকের দু'তীরের বাইরের বিশ্বের জটিল পরিস্থিতি ও সেখানে আমেরিকার জড়িত থাকার চিত্র বারবারই সাধারণ মার্কিনিদের জানা বোঝার বাইরে রাখা হয়ে আসছে। সমস্ত ইসলামি বিশ্বের চলমান যুদ্ধ বা দ্বন্দ্বগুলোর ক্ষেত্রে 'আমেরিকা'কে কোনো পরাশক্তির বদলে ঘুমন্ত দানব বলেই বেশি প্রতীয়মান হয়। ওসামা বিন লাদেন মার্কিনিদের কাছে এতো বেদনাদায়কভাবে পরিচিত হয়েছে যে, তার আর তার অনুসারীদের ইতিহাস, তা সে যাই তারা সৃষ্টি করে থাকুক, প্রচণ্ড ঘৃণা আর ন্যাক্কারজনক বস্তুর মতোই তা মুছে ফেলতে সর্বতোভাবেই তারা বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে। আর অনিবার্যভাবেই তাই, সে সামষ্টিক আবেগ মবি ডিকের ওপর ক্যাপ্টেন আহাবের ঝাঁপিয়ে পড়ার অতিপ্রাকৃত কাহিনীর মতো করে যুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অভূতপূর্বভাবে কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজ দেশে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে, যার সমীকরণে কোনো সুস্পষ্ট সীমারেখা বা দৃশ্যমান প্রতিপক্ষ ছাড়াই পাল্টে গেল দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভূগোল। পরস্পরের প্রতি হুমকি-ধামকি ছোঁড়া আর রহস্যপূর্ণ পরিণাম সবিস্তারে বর্ণনার ক্ষেত্রে সংযমের পাঠ উবে গেল বাতাসে। রণ-দামামা বাজানোর চেয়ে এখানে পরিস্থিতির বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধিই কাঙ্ক্ষিত ছিল। জর্জ বুশ আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা পরিষ্কারভাবে আগেরটিই চেয়েছেন। ইসলামি ও আরব বিশ্বের বেশিরভাগ লোকের কাছে তাই মার্কিন কর্মকর্তা আর উদ্ধৃত ক্ষমতা সমার্থক, কারণ তারা দেখে আমেরিকা পবিত্রতার ভাণ করে মহানুভবতার সঙ্গে শুধু ইসরাইলকেই সহযোগিতা করে তাই নয়, দমনমূলক কিছু আরব সরকারকেও তারা মহা উৎসাহে মদদ দেয়, আর তাদের প্রচণ্ড অনীহা শুধু ধর্মনিরপেক্ষ আলোচনার সম্ভাবনার প্রতি এবং প্রকৃত দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের প্রতি। এই আমেরিকা-বিদ্বেষ কোনো আধুনিকতা বিরোধ বা প্রযুক্তির প্রতি বিদ্বেষ থেকেই সৃষ্ট নয়। এর উৎপত্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমেরিকার জবরদস্তি হস্তক্ষেপ, সুনির্দিষ্ট দস্যুবৃত্তি, বিশেষ করে ইরাকের ওপর চাপিয়ে দেয়া মার্কিন যুদ্ধে জনগণের অবর্ণনীয় দুর্দশা, ফিলিস্তিনি 'সন্ত্রাসীদের' দমনে ৩৪ বছর ধরে ইসরাইলকে মদদ দিয়ে যাওয়া থেকে। ইসরাইল এখন যুক্তরাষ্ট্রে হামলার দোষী ঠাউরে ফিলিস্তিনে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে দখল চাপিয়ে দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের হালের রাজনৈতিক তত্ত্বও এখন 'সন্ত্রাস' 'স্বাধীনতা' এইসব গালভরা শব্দের দোহাই দিয়ে মাছি তাড়ানোর মতো করে এসব ব্যাপার একেবারেই উড়িয়ে দিচ্ছে, অথচ এইসব বায়বীয় শব্দের আড়ালে নানা নোংরা বৈষয়িক স্বার্থ থেকে যাচ্ছে, তেল, প্রতিরক্ষা এবং জায়নবাদী লবি প্রভাব খাটিয়ে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হয়েছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে সেই পুরানো ধর্মীয় বিদ্বেষ ও অজ্ঞতা প্রতিদিন এক একটি নতুন রূপ ধারণ করছে।

বুদ্ধিবৃত্তিক দায় হিসেবে হলেও বাস্তবতা সম্পর্কে একটা মাত্রা পর্যন্ত কাণ্ডজ্ঞান থাকা দরকার। সন্ত্রাস অবশ্যই আছে। এমনকি নিকট সময়ের কিছু প্রগতিশীল সংগ্রামও সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছে। এটা ম্যান্ডেলার এএনসি'র ক্ষেত্রে যেমন সত্য ছিল, তেমনি জায়নবাদসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা অগ্রাহ্য করবার নয়। এফ-১৬ বিমান বা হেলিকপ্টার গানশিপ নিয়ে নিরস্ত্র জনগণের ওপর বোমাবাজি করাও সেইসব প্রথাসিদ্ধ জাতিগত সন্ত্রাসেরই রকমফের।

www.pathagar.com

ধর্ম রাজনৈতিক অস্পস্টতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইতিহাস এবং কাণ্ডজ্ঞান থেকে মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়া সন্ত্রাসের কারণ যাই হোক, তা অত্যন্ত গর্হীত। মধ্যপ্রাচ্য হোক আর আমেরিকা, ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ নিজে থেকে বোঝার একটা বিষয়। কোনো ধর্ম, কোনো গুরুতর কারণ বা কোনো ভাবগত ধারণাই নির্দোষ লোককে গণহারে হত্যা করা অনুমোদন করে না, বিশেষ করে যখন গুটিকয়েক লোক কোনো প্রকার এখতিয়ার ছাড়াই পদক্ষেপ নেয় এবং তার পক্ষের যুক্তি নিজেরাই দাঁড় করায়। পাশাপাশি ইসলামে পথ ও মতবিরোধ আছে, ইসলাম একেবারে একাট্টা নয়, দ্বিমত আছে, তেমনি মার্কিনিদের মধ্যেও ভিন্নতা আছে– এ ভিন্নতা সমস্ত জাতি, ধর্ম ও ঐতিহ্যের মধ্যেই আছে, যদিও এরই মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের চারপাশে একটা স্বাতন্ত্র্যের বেড়া বাঁধতে চায়, তাদের আচারের পুঙ্খতা গেঁথে রাখতে চেষ্টা করে। তার ওপর আছে বক্তৃতাবাগীশ নেতাদের বাচালতা, যার চেয়ে ইতিহাস আরো অনেক বেশি জটিল এবং স্ববিরোধী, এসব নেতাদের আবার নিজের পক্ষের অনুসারীদের কাতারে ফেলা যায়, না বিপক্ষের দাবির সাথে তাদের মেলানো যায়। মুশকিলটা হচ্ছে, এই ধর্ম আর নীতিবাগীশ মৌলবাদীদের প্রাচীনপন্থী বিপ্লব বা প্রতিরোধের ধারণা, তাদের হত্যা করা বা শহীদ হতে চাওয়ার প্রবণতার সঙ্গে পশ্চিমের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিবাদীদের অসাধু আইন চাপানো আর আতঙ্ককর প্রতিশোধের মিলের দিকটা বড় বেশি নগ্ন। নিউইয়র্ক বা ওয়াশিংটনে আত্মঘাতী হামলাকারীরা মোটেও দরিদ্র বা বাস্তুহারা শরণার্থী নয়, তাদের বেশির ভাগকেই শিক্ষিত ও বিত্তশীল বলেই মনে হয়। পিঠ ঠেকা দরিদ্রদের মধ্যে বিজ্ঞতার সাথে নেতৃত্ব অর্জন, তার জন্য প্রয়োজনীয় পঠনপাঠন বা জনসম্পৃক্তি ও সুশৃঙ্খল পার্টি চর্চার বদলে এই ধরনের জাদুকরী কায়দায় সাফল্য পেতে রাতারাতি রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাসের মডেল উৎসাহ সৃষ্টি করে, যেটা ধর্মের মিথ্যা বাহবা দিয়ে মোড়ানো থাকে।

অপরদিকেও দেখা যাচ্ছে বিশাল সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিও কিন্তু সেই জ্ঞান বা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিচ্ছে না। আবার একটি 'আমেরিকা' উদগ্র দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে এই বিপর্যয়ের মুহূর্তে কোনো সংশয় প্রকাশ করছে না কেউ, শোনা যাচ্ছে না কোনো মানুষের কণ্ঠ, অথচ আমেরিকার এ যুদ্ধবাসনা তার মিত্রদেরই এক লক্ষ্যহীন ও অনিশ্চিত শেষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু এখন সমস্ত মারমুখী রৈ রৈ উপেক্ষা করে দুই দিগন্তে থাকা দুই জনগোষ্ঠীর একে অপরের প্রতি বিষোদগার আর শত্রুতার কুহক আর তার নানা রঙের মোড়ক উন্মোচন করে আমাদের হাত গুটিয়ে নেয়া দরকার। যেটুকু সম্ভাবনা এখনও বিদ্যমান তার প্রতি সুবিবেচনা করা আশু দরকার। কারণ অন্ধভাবে অনুসরণ করার মতো পথ বা মত হিসেবে 'ইসলাম' আর 'পশ্চিম' দুটোই তাদের সীমাবদ্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা প্রমাণ করেছে। কিছু লোক হয়তো তারপরও এদের পেছনে দৌড়াবে, কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিবেচনাহীন অবিরাম যুদ্ধ আর তার ফলশ্রুত দুর্দশার জন্য, অবিচার আর দখলদারিত্বের পরস্পর নির্ভর ইতিহাসের মূল্যায়ন না করার জন্য, প্রয়োজনের বদলে ব্যাক্তিক চরিতার্থতার লক্ষ্যে নীচ রাজনীতির বেড়াজালে সাধারণকে আটকে রাখার জন্য এদের ঠিকই সমালোচনার কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। প্রতিপক্ষকে দানবে পরিণত করা কোন ধরনের সুস্থ রাজনীতির ভিত্তি হতে পারে না, বিশেষ করে এই সময়– যখন অবিচারের মধ্যেই সন্ত্রাসের বীজ চিহ্নিত হয়েছে এবং

www.pathagar.com

সন্ত্রাসীরা বিচ্ছিন্ন, নিরুৎসাহিত কিংবা প্রত্যাখ্যাত। দুনিয়াজোড়া এখনও বিদ্যমান সন্ত্রাস আর তার বেদনা দূর করতে তার চেয়েও বড় আকারে এখন যে দীক্ষা আর সহমর্মিতা প্রয়োজন তাকে আরো শক্ত পায়ে দাঁড়াতে হবে।

সৌমিত্র বসু, অনিন্দ্য সেন, অনলাভ বসু সংকলিত সিপিআই (এমএল), কলকাতা জেলা কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত সংকলন, অক্টোবর ২০০১।
নতুন পাঠ, মার্চ-এপ্রিল '০২

www.pathagar.com

মার্কিন মুলুকে মুসলমানদের প্রতি বৈষম্য

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ

অনুবাদক : সাহাদত হোসেন খান

আমি এমন একজন আরব অথবা মুসলমানকে চিনি না, যিনি এ মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রে নিজেকে শত্রু শিবিরের সদস্য হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন না। এদেশে বসবাসের বর্তমান অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মুসলমানরা পরিকল্পিত বিদ্বেষের শিকার হচ্ছে এবং তাদের সঙ্গে শত্রুতামূলক আচরণ করা হচ্ছে। মাঝে মধ্যে সরকারী পর্যায়ের বিবৃতিতে দাবী করা হচ্ছে যে, ইসলাম ও মুসলমানরা যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু নয়। তবে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন কথাই বলছে। শত শত আরব তরুণকে আটক করা হয়েছে এবং ফেডারেল গোয়েন্দা ব্যুরো (এফবিআই) ও পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। মুসলিম অথবা আরবীয় নাম হলে রক্ষা নেই। এমন নামের লোক বিমানবন্দরে উপস্থিত হলেই তার প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয় এবং তাকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে জামা-কাপড় খুলেও পরীক্ষা করা হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। আরবদের প্রতি বৈষম্যের এমন ভুরি ভুরি ঘটনা রয়েছে। কেউ আরবীতে কথা বললে অথবা আরবীতে লেখা কোন কাগজপত্র পাঠ করলে তার প্রতি কটাক্ষ করা হয়। প্রচার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ, ইসলাম ও আরবদের ব্যাপারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার জন্য বহু 'বিশেষজ্ঞ' ও 'ভাষ্যকার' নিয়োগ করা হয়েছে। এদের উচ্চারিত প্রতিটি ছত্রই ইসলামের প্রতি বৈরিতায় পরিপূর্ণ। শুধু তাই নয়, তারা আমাদের ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও ভুল ধারণা দিচ্ছে। প্রচার মাধ্যম আফগানিস্তানে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লড়াইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে এবং ইরাকে সম্ভাব্য হামলার ব্যাপারেও তারা একই ভূমিকা পালন করছে। সোমালিয়া ও ফিলিপাইনসহ বেশ কয়েকটি দেশে মার্কিন বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করেছে। ইরাকের বিরুদ্ধে সমরসজ্জা গড়ে তোলা হচ্ছে। ইসরাইল পরিকল্পিতভাবে ফিলিস্তিনী মুসলমানদের হত্যা করছে এবং এতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড ও অন্যরা যা বলছেন— আমেরিকা ঠিক তা নয়। প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার উপদেষ্টারা বলছেন যে, তারা একটি 'ন্যায় যুদ্ধে' জড়িয়ে পড়েছেন এবং তারা এ যুদ্ধকে সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াই হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। আমাকে এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী অভিবাসীদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, আমাদের অবশ্যই এ যুদ্ধের যৌক্তিকতা মেনে নিতে হবে এবং এ ব্যাপারে

www.pathagar.com

আমাদের কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। আরও বলা হচ্ছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করার অনুমতি পাওয়ায় আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতা হচ্ছে ভিন্ন। আমেরিকা বরাবরই একটি অভিবাসীদের দেশ। এদেশে ঈশ্বর নয়, জনগণই আইন তৈরী করে। আমেরিকায় আজকে যারা বসবাস করছে তাদের প্রায় সবাই অভিবাসী। এমনকি প্রেসিডেন্ট বুশ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও। এদেশের সত্যিকার বাসিন্দা হচ্ছে রেড ইন্ডিয়ানরা। যুক্তরাষ্ট্রে একেকজন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর জন্য সংবিধান আলাদা নয়। কিন্তু আমেরিকান 'তালিবানরা' তাই মনে করছে। আফগান তালিবানদের মত মার্কিন তালিবানরাও অন্যের বাক-স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। মিঃ বুশ আমেরিকায় ধর্মের গুরুত্বের উপর জোর দিচ্ছেন। তিনি চীন এবং অন্যান্য দেশে গিয়ে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রচার করছেন। কিন্তু তিনি তার মতামত নাগরিকদের উপর চাঁপিয়ে দিতে পারেন না অথবা তার সুরে কথা বলতে বাধ্য করতে পারেন না। মার্কিন সংবিধান রাষ্ট্র ও সংবিধানের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য টেনেছে।

গত নভেম্বরে প্যাট্রিয়ট এ্যাক্ট নামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনে প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম সংশোধনীর পুরো ধারা হয় বাদ দেয়া হয়েছে নয়ত উপেক্ষা করা হয়েছে। নতুন আইনে ঘটনার শিকার ব্যক্তি আইনজীবী নিয়োগে সমস্যায় পড়বে এবং সে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবে। এ আইনে গোপনে বিচার, আড়িপাতা ও অনির্দিষ্টকাল আটক রাখার জন্য সরকারকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এটি মার্কিন সরকারকে 'যুদ্ধবন্দীদের অস্ত্রহরণ' তাদেরকে অনির্দিষ্টকাল আটক এবং জেনেভা কনভেনশন লংঘন করার ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে। এ আইন পাস হওয়ার জন্যই গুয়ানতানামো ঘাঁটিতে বিদেশী বন্দীদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করা এবং তাদেরকে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী প্রাপ্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র জেনেভা কনভেনশনে স্বাক্ষরদানকারী একটি দেশ। স্বাক্ষরদানকারী কোন দেশ তাই এই আন্তর্জাতিক চুক্তি লংঘন করতে পারে না। তবু এদেশে তাই ঘটেছে। এ ব্যাপারে খোদ যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতিবাদ উত্থিত হচ্ছে। ওহাইও'র ডেমোক্রেট দলীয় কংগ্রেস সদস্য ডেনিস কুচিনিচ গত ১৭ ফেব্রুয়ারী এক জ্বালাময়ী ভাষণে বলেছেন যে, সীমা-পরিসীমা ও যুক্তিছাড়া সারাপৃথিবীর' বিরুদ্ধে যুদ্ধ (অপারেশন এনডিউরি ফ্রীডম) ঘোষণার, প্রতিবছর ৪০ হাজার কোটি ডলারের বেশী সামরিক বাজেট বৃদ্ধি এবং বিল অব রাইটস বাতিল করার ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট অথবা সরকারের নেই। এ ধরনের ক্ষমতা তাদেরকে কেউ দেয়নি। তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে আরও বলেন, আমরা চাইনি যে, ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী হামলায় নিহত নিরীহ মানুষের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য আফগানিস্তানের নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা করা হোক।

কংগ্রেসম্যান কুচিনিচই মার্কিন সরকারের আগ্রাসী নীতির প্রতিবাদকারী সর্বোচ্চ মার্কিন কর্মকর্তা। আমার মতে, তার বক্তব্যে আমেরিকার নীতি ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে। এ জন্য আমি চাই যে, তার ভাষণটি আরবীতে পুরোপুরি প্রকাশিত হোক, যাতে আরবীভাষী মানুষ জানতে পারে যে, বুশ ও ডিক চেনিই যুক্তরাষ্ট্রের সবকিছু নয়। বর্তমান মার্কিন নীতির সমালোচনা চলছে এবং নানা কথা হচ্ছে। কিন্তু সরকার এগুলো চাপা দেয়ার চেষ্টা করছে।

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও নজিরবিহীন ক্ষমতাকে কিভাবে মোকাবেলা করা যায় সেটাই আজকের বিশ্বের সমস্যা। বুশের আশপাশে যে ক'জন মুষ্টিমেয় লোক রয়েছে তারা বিশ্বাস করে যে, মার্কিন স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলে ওয়াশিংটন যা খুশী তাই করতে পারে। এ ব্যাপারে অন্যান্য দেশের সমর্থন অথবা তাদের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষারও কোন প্রয়োজন নেই। যুক্তরাষ্ট্রের এ মনোভাব এখন আর গোপন নেই। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্য প্রশ্নে মার্কিন নীতিতে ইসরাইলীকরণ ঘটেছে। জর্জ বুশের মনোযোগ কেবলমাত্র সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইয়ে। অন্য কিছু নিয়ে ভাবার তার সময় অথবা প্রয়োজন কোনটাই নেই। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন বুঝতে পেরেছেন যে, ফিলিস্তিনীদের হত্যার এটাই সুযোগ। তাই তিনি ফিলিস্তিনী জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কথা হচ্ছে যে, ইসরাইল যুক্তরাষ্ট্র নয়, আবার যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইল নয়। কিন্তু এ বাস্তবতা সত্ত্বেও ইসরাইল প্রেসিডেন্ট বুশের সমর্থন পাচ্ছে। ইসরাইল একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যার ভৌগোলিক অবস্থান হচ্ছে মুসলিম আরব রাষ্ট্রগুলোর ভেতরে। তাকে টিকে থাকতে হবে ঐ এলাকার পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে, মার্কিন সমর্থন অথবা আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে নয়। এই সত্য অধিকাংশ ইসরাইলীও অনুধাবন করতে পারছে। তাই তারা শ্যারনের আগ্রাসী নীতিকে আত্মঘাতী বলে আখ্যায়িত করছে। ফিলিস্তিনী ভূখণ্ডে আগ্রাসী অভিযানের বিরুদ্ধে ইসরাইলের রিজার্ভ সৈন্যরাও প্রতিবাদ করছে। রিজার্ভ সৈন্যদের সঙ্গে কোন কোন ইসরাইলীও কণ্ঠ মিলাচ্ছে। এদের সংখ্যা দিন দিনই ভারি হয়ে উঠছে। খোদ ইসরাইলীদের মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা হলেও মার্কিন নীতিতে পরিবর্তন আসছে না। যুক্তরাষ্ট্র একের পর এক কাল্পনিক ভীতির পেছনে ছুটছে এবং নিজেকে সংঘর্ষে জড়িয়ে ফেলছে। প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার পরিষদবর্গও মনে করছেন যে, তারা সঠিক পথে রয়েছেন। বিগত সপ্তাহগুলোর পত্র-পত্রিকা যারা পাঠ করেছেন তারা একথা বুঝতে পেরেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে জনগণ মার্কিন নীতির অস্পষ্টতায় বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে যে, যে কোন দেশকে টার্গেট করার অধিকার তাদের রয়েছে। এ ধরনের মনোভাব থেকে সে বিশ্বজুড়ে নতুন নতুন শত্রু সৃষ্টি করছে এবং এসব শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছে। লক্ষ্য অর্জন এবং যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। 'দুই সন্ত্রাসবাদ' দমন বলতে যুক্তরাষ্ট্র কি বুঝাতে চায়? সে তার বিরুদ্ধাচরণকারী প্রত্যেককে উৎখাত অথবা তার ইচ্ছামত বিশ্বের মানচিত্র বদলাতে পারে না। আমরা যাদেরকে 'সুবোধ ব্যক্তি' অথবা সাদ্দাম হোসেনের মত যাদেরকে 'দুর্বৃত্ত' বলে আখ্যায়িত করি, তাদের কাউকে সে উৎখাত করতে পারে না। ওয়াশিংটনের কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রকে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে দেখতে চান এবং এ লক্ষ্যে তারা একটি দূরবর্তী টার্গেট হিসেবে বিশ্বকে বেছে নিয়েছেন। তাদের চিন্তাধারা হচ্ছে বাস্তবতাবর্জিত। কারণ, তারা বসে থাকেন পেন্টাগনের ডেস্কে।

তাদের কাছ থেকে যে কোন দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রের দূরত্ব অন্তত ১০ হাজার মাইল। তবু এসব রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র হুমকি হিসেবে গণ্য করছে। হাজার হাজার জঙ্গী বিমান, ১৯টি বিমানবাহী জাহাজ, কয়েক ডজন সাবমেরিন, প্রায় ১৫ লাখ সৈন্য ও হাজার হাজার পারমাণবিক অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট বুশ ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কনডোলিসা রাইস স্বস্তি পাচ্ছে না। ইতোমধ্যেই প্রতিরক্ষা খাতে হাজার হাজার কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে। তারপরেও

প্রতিরক্ষা খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বুশ দেশকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এদেশের প্রায় সকল বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিক তাকেই সমর্থন করছেন। মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাগুলো তারা এড়িয়ে যাচ্ছেন। তারা এটা বুঝতে চান না যে, যে বিশ্বে আমরা বসবাস করছি সে বিশ্ব গতিশীল এবং বিশ্বকে বুঝতে হলে বিশ্ব রাজনীতিকে বুঝতে হবে। মার্কিনীদের মধ্যে এমন একটা ধারণা কাজ করে যে, আমেরিকা বরাবরই ন্যায়ের পক্ষে এবং তার শত্রুরা অন্যায়ের পক্ষে। টমার্স ফ্রিডম্যান অক্লান্তভাবে বক্তৃতা-বিবৃতি দিচ্ছেন এবং এসব বক্তৃতা-বিবৃতিতে তিনি আরবদেরকে আত্মসমালোচনাকারী হওয়ার জন্য বার বার পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু তার মত অন্য মার্কিনীদেরও যে আত্মসমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে তা তিনি মানতে নারাজ। ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার জন্য তিনি চোখের পানি ফেলছেন এবং এ হামলায় নিহতদের জন্য রোদন করছেন। তার মনোভাব এরকম যে, যুক্তরাষ্ট্রেই কেবল এ ধরনের ভয়ংকর হামলা হয়েছে এবং মার্কিনীরাই কেবল সন্ত্রাসীহামলায় প্রাণ হারাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য দেশে ১১ সেপ্টেম্বরের চেয়েও ভয়াবহ ঘটনায় যারা নিহত হয়েছে এবং হচ্ছে তাদের প্রতি তার কোন অনুভূতি নেই এবং অন্যান্য দেশে সংঘটিত ঘটনাগুলো তার বিচারে কোন ঘটনাই নয়। ইসরাইলী বুদ্ধিজীবীদের অবস্থাও মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের অনুরূপ। ইসরাইলী বুদ্ধিজীবীরা শুধু নিজেদের লোকজনের মৃত্যুই দেখতে পায়; কিন্তু ইসরাইলী ট্যাংক, বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতি মুহূর্তে যে অগণিত ফিলিস্তিনী নিহত হয়েছে সেদিকে তাদের চোখ যায় না। এজন্য তাদের কোন দুঃখবোধ নেই। জুলুমের প্রতি সহনশীল হওয়া অথবা দেখেও না দেখার ভান করা আজকের বিশ্বে একটি স্বভাবে পরিণত হয়েছে। বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে চক্রান্তের অংশীদার হওয়া অথবা ফাঁদে পা দেয়া শোভনীয় নয়। এ ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তাদেরকেই উদ্যোগী হতে হবে। সকল মানুষের দুর্ভোগ সমান, একথা মুখে উচ্চারণ করে পরবর্তী মুহূর্তে শুধু নিজেদের লোকজনের জন্য বিলাপ করাই যথেষ্ট নয়। বিরোধে জড়িত শক্তিশালী পক্ষ কি করছে তা দেখতে হবে এবং শক্তিশালী পক্ষের কার্যকলাপ সমর্থন করার পরিবর্তে এগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে হবে। বৃহৎ শক্তিকে সমালোচনা করা এবং এ শক্তির বিরোধিতা করাই বুদ্ধিজীবীদের কাছে বিবেকের দাবী। বুদ্ধিজীবীরা বিবেকের এ দাবী পূরণ করছেন না বলেই ভিকটিমকে উল্টো দোষারোপ করা হচ্ছে এবং অত্যাচারীরা উৎসাহিত হচ্ছে।

৬০ জন মার্কিন বুদ্ধিজীবী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের লড়াইকে সমর্থন দিয়ে একটি বিবৃতি দেন। এ বিবৃতি ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী ও ইউরোপের বড় বড় কাগজগুলোতে প্রকাশিত হলেও ইন্টারনেট ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে কোন পত্রিকায় ছাপা হয়নি। এক সপ্তাহ আগে এক ইউরোপীয় বন্ধু এ বিবৃতি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বিস্মিত হই। এ বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেন স্যামুয়েল হান্টিংটন, ফ্রান্সিস ফুকয়ামা, ড্যানিয়েল প্যাট্রিক ময়নিহাস প্রমুখ।

রক্ষণশীল নারীবাদী বুদ্ধিজীবী জীন বেথকি এ্যলসটেইন বিবৃতিটি তৈরী করেছিলেন। অধ্যাপক মিশেল ওয়ালজারের উৎসাহে তিনি এ বিবৃতি তৈরি করেন। অধ্যাপক ওয়ালজার ইসরাইলী লবির লোক হিসেবে পরিচিত। এ ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে ইসরাইলের

www.pathagar.com

কোন ভুল ধরা পড়ে না। বরং ইসরাইল যা কিছু করে সবকিছুই তার কাছে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত। অধ্যাপক ওয়ালজার একজন মেকি সমাজতন্ত্রী। সমাজতন্ত্রীর খোলস গায়ে দিয়ে তিনি ইসরাইলের পক্ষে ওকালতি করেন। তবে এ বিবৃতি তৈরীতে উৎসাহ যোগানোর সময় তিনি তার সমাজতন্ত্রী খোলস খুলে ফেলেন। তিনি তার বর্তমান ভূমিকার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমেরিকাকে সন্ত্রাস ও শয়তানের বিরুদ্ধে একটি আদর্শ যোদ্ধা হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল হচ্ছে এমন দু'টি দেশ যাদের লক্ষ্য হচ্ছে অভিন্ন। অধ্যাপক ওয়ালজারের উক্তি সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। ইসরাইল হচ্ছে এমন এক রাষ্ট্র যেখানে ইহুদী ছাড়া আর কেউ নাগরিক নয়। পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে সকল নাগরিকের দেশ। ওয়ালজারের একথা বলার সাহস কখনো হবে না যে, তিনি ইসরাইলকে সমর্থন করতে গিয়ে বরং ইসরাইলের ইহুদীবাদী নীতিকেই সমর্থন দিচ্ছেন। ঘটনাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রকে শ্বেতাঙ্গ ও খ্রিস্টান রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হলে তিনি নিশ্চিতভাবে বিরোধিতা করবেন। বিবৃতির পেছনে অধ্যাপক ওয়ালজারের ভূমিকা যেমন গোপন রাখা হয়েছে তেমনি মুসলমানদের ধোঁকা দেয়ার ইচ্ছাও গোপন রাখা হয়েছে। বিবৃতিতে মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের এ লড়াই নয়, বরং যারা সকল ধরনের ন্যায়-নীতির বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে এ লড়াই। সকল মানুষ সমান। ধর্মের নামে নরহত্যা পাপ, বিবেকের স্বাধীনতা সবার উপরে, মানুষই হচ্ছে সমাজের মূল শক্তি এবং মানুষের মৌলিক বিকাশের শর্তগুলো লালন এবং রক্ষা করাই হচ্ছে সরকারের কাজ। বিবৃতিতে এসব নীতিকথা উল্লেখ করে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্র আক্রান্ত। এজন্য কোথাও কোথাও ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটছে। ধর্ম, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা সম্পর্কে নীতিবাক্য আউড়ে বিবৃতির শেষাংশে একটি ফিরিস্তি দেয়া হয়। এ ফিরিস্তিতে ১৯৮৩ সালে বৈরুতে বোমা বিস্ফোরণে মার্কিন সৈন্যদের হতাহত হওয়ার ঘটনাসহ কোন আরব ও মুসলিম দেশে এবং অন্যান্য ঘটনায় কতজন মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়। তবে ইরাকে মার্কিন মদদে জাতিসংঘ অবরোধে কতজন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, ফিলিস্তিনে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরী ইসরাইলী বিমান হামলায় এবং আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক অপারেশনে নিহতদের সম্পর্কে বিবৃতিতে একটি লাইনও নেই।

ইনকিলাব, ২৫ মে '০২

www.pathagar.com

আমরা কখন প্রতিবাদী হবো?

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ

অনুবাদক : মাসুদা ভাট্টি

আমেরিকায় যারা বসবাস করেন (অথবা যারা ইন্টারনেটে দেখেন), তারা যদি প্রতিদিনকার *নিউইয়র্ক টাইমস* পড়েন, তাহলে তারা নিশ্চয়ই আমেরিকার যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে থাকবেন। আরো এক ব্যাটালিয়ন সৈন্যসহ এয়ারক্রাফট ও ক্রুইস বহনকারী রণতরী, নতুন ধরনের মারণাস্ত্র সজ্জিত এয়ারক্রাফট ও হাজার হাজার সেনা অফিসার পারস্য উপসাগরের দিকে রওনা হয়ে গেছে– এসব সংবাদপত্রের প্রধান হেডলাইন। নিজ দেশের বাইরে আমেরিকা এমনিভাবেই একটা ইচ্ছাকৃত উত্তেজনা সৃষ্টি করে রেখেছে; কিন্তু দেশের ভেতরে কী হচ্ছে? আমেরিকার অভ্যন্তরে তখন অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুঃসংবাদের বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

মনে হচ্ছে, ধনতন্ত্রের সবচেয়ে বড় মেশিনটি (প্রেসিডেন্ট বুশ) অচল হতে চলেছে, যদিও প্রবল জনপ্রিয়তা সহকারেই তিনি ক্ষমতায় বসেছিলেন। জর্জ বুশ তার দেশের জনগণের জন্য এক শতাংশ ট্যাক্স কমিয়েছেন, যদিও এর সরাসরি সুফল যাবে ধনীর ঘরে। পাবলিক এডুকেশন সিস্টেমে ধস নামছে, ৫০ মিলিয়ন আমেরিকানের হেলথ ইন্স্যুরেন্স এখন নামে আছে, কাজে নেই। ইসরায়েল সামরিক সাহায্য ও ধার হিসেবে আরো ১৫ বিলিয়ন ডলার দাবি করছে। প্রতিদিন চাকরি হারানোদের তালিকা ভয়ংকরভাবে বেড়ে চলেছে।

এতোকিছুর পরও জনগণের আস্থা ছাড়াই অকল্পনীয় ব্যয়বহুল একটি যুদ্ধের প্রস্তুতি এগিয়েই চলেছে, যদিও সম্প্রতি জনমত ঘুরে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। জনগণের মধ্যে এখন বিভক্তিটা বড্ড স্পষ্ট হয়ে গেছে, একটি বড় অংশ (যাদের অজ্ঞ ও অভিজ্ঞতাহীন বলেই ধরা হয়) প্রশাসনের যুদ্ধংদেহী মনোভাবকে সমর্থন দিচ্ছে। কিন্তু এই দলটিই আবার উত্তর কোরিয়ার ব্যাপারে সন্দেহজনকভাবে নীরবতা পালন করছে। ইরাকের ক্ষেত্রে যেখানে গণবিধ্বংসী অস্ত্র নেই বলে বার বার বলা সত্ত্বেও যুদ্ধ প্রস্তুতি অব্যাহত রয়েছে, সেখানে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক মারণাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও তাকে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সাহায্য দেয়ার কথা বলা হচ্ছে। একই রকম অবস্থা ও একই রকম স্বৈরশাসন বলবত দু'টি দেশের জন্য কী ন্যক্কারজনক দ্বিবিধ ব্যবস্থা আরবের জন্য যুদ্ধ আর উত্তর কোরিয়ার জন্য সম্মান!

www.pathagar.com

আরব ও মুসলিম বিশ্বের অবস্থাটা বেশ হাস্যকর। প্রায় এক বছর যাবত আমেরিকার প্রশাসন, ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদরা প্রকাশ্যেই আরব ও ইসলামের প্রতি তাদের ভীতি প্রকাশ করছেন। বিশেষ করে, ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাবলীর সঙ্গে জড়িয়ে এই ভীতি। আজকের দিনে হঠাৎ করেই জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন রিপোর্টে সুর তোলা হয়েছে যে, আরব, বিশ্বের বাকি অংশ থেকে সর্বতোভাবেই পেছনে পড়ে রয়েছে, কী গণতন্ত্রে, কী জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, কী নারীর অধিকারে কোথায়ও আরব পিছিয়ে নেই। সবাই বলছেন, ইসলামের 'রিফর্ম' প্রয়োজন (তাদের কথায় যুক্তি আছে সন্দেহ নেই) এবং তাদের মতে, আরবের এডুকেশন সিস্টেম নিদারুণভাবে ধ্বংসাত্মক। তারা বলছে, ধর্মীয় মৌলবাদী, আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণকারী তৈরির স্কুলগুলো শুধু পাগলা ইমাম ও তাদের ধনী অনুসারীদের (যেমন ওসামা বিন লাদেন) অর্থায়নেই চলে না; বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক মিত্র সরকারও এদের অর্থের জোগান দিয়ে থাকে। তাদের মতে, 'ভালো আরব' তারাই, যারা মিডিয়ার সামনে নিজেদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে চরম ঘৃণা প্রকাশ করে থাকে। তারা নিজেদের দেশ, জনগণ, সংস্কৃতি সম্পর্কে ভিন্ন কিছুই বলে না, তারা তারই পুনরুচ্চারণ করে মাত্র, যা ইতোমধ্যেই আমেরিকার আকাশ ও স্থলের গণমাধ্যমগুলো তুলে ধরেছে। তারা বলেন, আমাদের গণতন্ত্র নেই, আমরা কখনোই ইসলামকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারি না, আরব জাতীয়তাবাদের ধুয়া থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে এবং এক আরব নীতি থেকেও দূরে সরতে হবে। এসব কথার কোনো প্রতিবাদ হয় না, এগুলোকে নর্দমায় ফেলে দেয়াই ভালো। অবশ্য তারা একটি সত্য কথা বলে থাকে যে আরব ও ইসলাম উভয়ই মিডিওকারদের খপ্পরে। তারা আর যা বলে, বাকি সবাই 'বোগাস'। আমাদের আধুনিক হতে হবে, এখানে আধুনিকতা মানে পশ্চিমকে অনুসরণ, বিশ্বায়নে যোগ দেয়া, মুক্তবাজার অর্থনীতি, পশ্চিমা গণতন্ত্রের দিকে ধাবিত হওয়া, ওরা যা-ই বলুন না কেনো, ওদের মতে আধুনিকতা মানেই এসব। তাদের কিছু ভাড়াটে অ্যাকাডেমিক রয়েছেন, যারা সাজিয়ে-গুছিয়ে, সত্য-মিথ্যার ভেজাল দিয়ে এসব কথাই আমাদের গেলানোর চেষ্টা করে থাকেন।

'ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশন' বা সভ্যতার আসল দ্বন্দ্ব হচ্ছে জর্জ ডব্লিউ বুশ ও তার অনুগামীরা তেল ও একটি 'হেজিমনি ওয়ার'কে বৈধ করার জন্য যে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন সেটা। এর আসল লক্ষ্যকে এড়ানোর জন্য গণতন্ত্রে উত্তরণ, শাসক পরিবর্তনসহ আরো বহু প্রপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে। যদিও সেখানে বোমা ফেলে মানুষ মারা অথবা স্যাংশন (অবরোধ) করে মানুষ মারার কথা সব সময়ই উহ্য রাখা হচ্ছে। কিন্তু এই যুদ্ধের আসল লক্ষ্য হচ্ছে, সাদ্দামকে সরিয়ে একজন পছন্দমতো ব্যক্তিকে সেখানে বসিয়ে এই অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। এ এলাকায় একটি 'নিউ সাইকেস পিকট', 'নিউ বেলফার', 'নিউ উইলসনিয়ান ফোরটিন পয়েন্টস' তথা একটি নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। ইরাকিদের বলা হবে তাদের নব্য এই স্বাধীনতাকে বরণ করে নিতে এবং পেছনের সকল যন্ত্রণাকে ভুলে যেতে। হয়তো এটা সবাই ভুলেও যাবে।

কিন্তু এরই মধ্যে 'আত্মা ও শরীর' বিধ্বংসী ফিলিস্তিন পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে। কোনো শক্তির পক্ষেই অ্যারিয়েল শ্যারন ও তার প্রতিরক্ষামন্ত্রী শাউল মোফাজলকে থামানো সম্ভব নয়, যারা মনে করে যে, তাদের পদতলেই সমস্ত পৃথিবী। আমরা বাধা

www.pathagar.com

দেবো, আমরা শাস্তি দেবো, আমরা বন্ধ করে দেবো, আমরা ভাঙবো, আমরা ধ্বংস করবো। প্রয়োজনে আমরা অত্রাঞ্চলের জনগণের সমস্ত বিরোধিতাকে গুঁড়িয়ে দেবো।

আমি এসব কথা লিখছি সত্য; কিন্তু এর অর্থ হচ্ছে আমি একই সঙ্গে পশ্চিম তীরের কালকলা এলাকার আল-দাবা গ্রামের দিকে ছুটিয়ে দিচ্ছি আমেরিকার তৈরি ৬০ টন ইসরায়েলি বুলডোজার, যা ২৫০ জন ফিলিস্তিনির ৪২টি বাড়িঘর ধ্বংস করবে, ৭০০ একর জমির ফসল নষ্ট করবে, একটি মসজিদ ভাঙা এবং একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ধ্বংস করবে, যেখানে ১৩২টি শিশু লেখাপড়া করতো। জাতিসংঘ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে যে, প্রতি ঘণ্টায়ই তাদের বেঁধে দেয়া নীতিসমূহ কেমন করে লঙ্ঘন করা হচ্ছে। দুঃখ এই যে, অ্যারিয়েল শ্যারনের পক্ষেই থাকবেন জর্জ ডব্লিউ বুশ, অথচ একটি ১৬ বছরের ফিলিস্তিনি তরুণের সঙ্গে তিনি নেই, যে তরুণটি ইসরায়েলি সৈন্যের মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এরই মধ্যে হয়তো ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ একটি শান্তি বৈঠকের আহ্বান জানাবেন, সম্ভবত বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে নরওয়ের রাজধানী অসলোয়। প্রায় ১০ বছর যাবত দগ্ধ আরাফাত এর থেকে অন্তত কিছু অর্জন চাইবেন। তার বিশ্বস্ত লেফটেন্যান্টরা অতি চালাকির সঙ্গে গণমাধ্যমের জন্য একটি বার্তা খাড়া করবেন, যাতে বলা হবে, শান্তি র জন্য যে কোনো শর্ত তারা মেনে নিতে প্রস্তুত। যদিও এই বৈঠক শেষ হবে কোনো চুক্তি ছাড়াই, অব্যাহত থাকবে রক্তপাত, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও প্রতিদিনকার মৃত্যু। আইনের প্রতি এই নেতাদের অপরিসীম শ্রদ্ধা, যে কারণে তারা বারবার ইসরায়েলের কাছেই তা আশা করে থাকেন। ইসরায়েলি দখলদারীর বিরুদ্ধে একজন ফিলিস্তিনি যে প্রতিরোধে এগিয়ে আসে সে-ই গিয়ে দেখে যে, তাদের নেতারা আমেরিকার সামনে নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই যোদ্ধার কাছে এর চাইতে লজ্জার আর কী হতে পারে। এখন গোটা আরব বিশ্বই চরম অসহায় ও বধির অবস্থার ভেতর বন্দি। আমেরিকান সরকার ও তাদের চাকরশ্রেণীর রাষ্ট্রগুলো বিবৃতির পর বিবৃতি দিয়ে চলেছে; সেনাবাহিনী ও অস্ত্র পাঠাচ্ছে; ট্যাংক ও ডেস্ট্রয়ারে মরুভূমি ছেয়ে গেছে; কিন্তু এর বিরুদ্ধে আরব সম্মিলিতভাবে টু-শব্দটি পর্যন্ত করতে পারছে না। তারা ছোট্ট একটি 'না' বলতে পারে যে, তোমরা আমাদের দেশের সীমানায় সামরিক ঘাঁটি বাধিও না, কিন্তু এই 'না' তাদের বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে, কেনো এই প্রকাণ্ড নিষ্ক্রিয়তা ও অসহায়তা? এখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আরব বিশ্বের একটি স্বাধীন কিন্তু ভয়ংকর শাসকের অধীন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে যাচ্ছে, যার উদ্দেশ্য শুধু সে দেশের বাথ পার্টির শাসন খর্বকরা নয়; বরং গোটা অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। পেন্টাগন এখন নির্লজ্জের মতো একথা গোপন করছে না যে, তারা আরব ভূখণ্ডের মানচিত্রে পরিবর্তন আনতে চায়। তারা একই সঙ্গে অন্য কয়েকটি দেশে শাসক ও সীমানা পরিবর্তন করার কথাও লুকোতে চাইছে না। ধ্বংস যখন এগিয়ে আসবে, তখন তার হাত থেকে কারো মুক্তি নেই। অথচ এখন পর্যন্ত সামান্য গাঁইগুঁই ছাড়া প্রকৃত কোনো বিরোধিতার শব্দ কারো মুখে নেই। তারা বুঝতে পারছে না যে লাখ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যদি তাদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই আমেরিকার যুদ্ধ পরিকল্পনা সফল হয়। আমাদের কি আসলেই এরকম বর্ণবাদী সহিংসতা প্রাপ্য ছিল?

না, এই নগ্নতা আমাদের যে শুধু প্রাপ্য নয়, তা-ই আশ্চর্যের নয়; বরং এটা বিশ্বাসের অতীত বটে। ৩০০ মিলিয়ন আরব কেমন করে একটি অনিবার্য ধ্বংসের মুখে সমবেত প্রতিবাদবিহীন রয়েছে, সেটাই সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের কথা। তাহলে কি আরব জাতি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে? মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি পর্যন্ত ফাঁসির আগে কথা বলে থাকে। একটি বিশাল সভ্যতা ও ইতিহাস যখন ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে, তখন কেনো এখনো কারো মুখ থেকে শেষ বাক্যটি উচ্চারিত হচ্ছে না?

আরবে এখনো শিশুর জন্ম হচ্ছে, শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে, নর-নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে, স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছে, সন্তান উৎপাদন করছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, হাসছে, দুঃখিত হচ্ছে, রোগ ও মৃত্যুতে আক্রান্ত হচ্ছে। সেখানে এখনো ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও উত্তেজনা বলবৎ। হ্যাঁ, আরবরা অধীনস্থ ভুল শাসন ব্যবস্থার শিকার; কিন্তু তরপরও তারা জীবনের সকল উপাত্তের ভেতর দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আরব ও আমেরিকান নেতৃত্ব যখন 'মামুলি ওরিয়েন্টালিস্ট'দের তৈরি রাস্তা দিয়ে ভ্রমণ করেন, তখন তারা উপরোক্ত সত্যগুলোকে মানতে চান না। আমাদের জনগণের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্নাবলী এখন কে উত্থাপন করবে? এটা কোনো ধর্মীয় উগ্রবাদী বা অদৃষ্টবাদী ভেড়ার দলের কর্ম নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু কার্যত মনে হচ্ছে, এই কাজটি এখন এরাই সমাধা করছে। বেশিরভাগ আরব দেশগুলোর সরকার কোনো কথাই না বলে অপেক্ষায় আছে কবে ভেড়ার মতো সারি বেঁধে আমেরিকান সৈন্য এফ-১৬ নিয়ে এগিয়ে এসে তাদের পশ্চাৎদেশে লাথি কষাবে তার জন্য। তাদের নীরবতাই যেনো আত্মরক্ষার ঢাল।

বছরের পর বছর ধরে যন্ত্রণাক্লিষ্ট সংগ্রাম, আটলান্টিক থেকে উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হাজার হাজার শাস্তির চেম্বর, দরিদ্র হাজার হাজার পরিবারের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ইতিহাস আমরা জানি। আমরা এও দেখি যে, বিপুল ব্যয়ে পালিত হচ্ছে সেনাবাহিনী। কিন্তু কেনো এর কারণ রাজনৈতিক ভাবাদর্শ বা অন্য কিছু নয়, এর কারণ বিখ্যাত থিওলজিস্টের বর্ণনা মোতাবেক 'আলটিমেট সিরিয়াসনেস' ছাড়া কিছু নয়– টেকনোলজি, আধুনিকতা এবং বিশ্বায়ন, এসব কিছুই আমাদের প্রশ্নের উত্তর নয়, যে প্রশ্ন এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিনিয়ত ভয় দেখিয়ে চলেছে। আমাদের জীবন ও মৃত্যু, ভালোবাসা ও ঘৃণা, সমাজ ও ইতিহাসে শেষ পর্যন্ত আমাদের সেক্যুলার ও ধর্মীয় সাহসের অভাবই আঘাত হেনে চলেছে। যে কারণে কেউ ব্যক্তিগত বা সম্মিলিতভাবে এসব কথা উচ্চারণের সাহসটুকু পর্যন্ত করে উঠতে পারছে না।

আমরা এখন বিশাল এক ধ্বংসের মুখোমুখি। আমাদের রাজনৈতিক, ভাবাদর্শিক, ধর্মীয় নেতারা এই ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে বন্ধ দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে শুধু একটু মুচকি হাসতে পারেন অথবা একই সঙ্গে তারা ঝড়ের ওপারে যাওয়ার পরিকল্পনা আঁটতে পারেন। তারা নিজেদের রক্ষার অথবা একই সঙ্গে বেহেশতে যাওয়ার কথাও ভাবতে পারেন। কিন্তু বর্তমানের দায়িত্ব নেবে কে? এই বিশ্ব, এই ভূখণ্ড, এই পানি, বায়ু ও জীবন যা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল, তার দায়িত্বই বা কে নেবে? কাউকেই আমরা এ দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসতে দেখছি না।

যখন শক্তি সঞ্চয় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, ঠিক সে সময়েই আমরা সবচেয়ে বেশি শক্তিহীন, অসহায় ও আপনা-বিমুখ। আমাদের অবস্থা এখন এমন যে, 'সর্বশেষ যিনি

www.pathagar.com

বেরিয়ে আসবেন তিনি বাতিটি নিভিয়ে দিয়ে আসবেন।'– এরকম একটি ধারা আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। আমরা এখন এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে যে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই যার সামান্য দাঁড়াবার জায়গাটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে কি-না সন্দেহ। সময় কি এখনো আসেনি, আমরা একটি বিকল্প আরব শক্তি একত্রিত হয়ে দাঁড়িয়ে বলি, আমাদের পৃথিবী আমরা রক্ষা করবোই? এটা কোনো দেশের শাসক পরিবর্তনের মাধ্যমে নয়, অবশ্য ঈশ্বর জানেন যে, আমরা ইচ্ছে করলে সেটাও পারি। এটা অসলোয় গিয়ে শান্তি সম্মেলনও নয়, যেখানে ইসরায়েলকে আর একবার আমাদের উপস্থিতি মেনে নিয়ে আমাদের শান্তিতে থাকতে দেয়ার জন্য পায়ে ধরা হবে অথবা ক্ষমতা প্রার্থনা করে কান্নাকাটি করা হবে। কেউ কি আছেন, যিনি একদিন প্রখর সূর্যালোকে বেরিয়ে এসে বলবেন, 'ডোনাল্ড রামসফেল্ড ও পল উলফোউইটজের হাতে আমাদের ভবিষ্যৎ রচিত হবে না, আমরা তা মানবো না, আমরা তা প্রতিহত করবো?' আমি আশা করি, আমার এই বাক্য কোথাও না কোথাও কেউ না কেউ একজন হলেও শুনেছেন।

দি গার্ডিয়ান, লন্ডন
সাপ্তাহিক মৃদুভাষণ, ৩ ফেব্রুয়ারী '০৩

www.pathagar.com

বেঁচে থাকার পর কী ঘটবে?

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ

অনুবাদক : মশিউল আলম

প্যালেস্টাইনের সঙ্গে যদি কারও সামান্যতম সংযোগও থাকে তিনি বিমূঢ়, ক্রোধ ও যন্ত্রণার মধ্যে দিনযাপন করছেন। ১৯৮২-এর ঘটনার পুনরাবৃত্তিই ঘটল তবু জর্জ বুশের হতবাক করা অজ্ঞতা এবং বীভৎস রহস্যময়তায় প্রলিপ্ত সমর্থন সমেত প্যালেস্টাইনের ওপর ইসরায়েলের সাম্প্রতিক ঔপনিবেশিক চূড়ান্ত হানাদারি প্যালেস্টিনীয় জনতার ওপর শ্যারনের ১৯৭১ ও ১৯৮২-এর গণসন্ত্রাসের থেকে অনেক বেশি ন্যক্কারজনক। এক্ষণের রাজনৈতিক পরিবেশ অনেক বেশি ভোঁতা, নৈতিক পরিবেশ অবক্ষয়গামী। গণমাধ্যমের ভূমিকা সম্পূর্ণ ধ্বংসাত্মক, তারা প্যালেস্টিনীয় ভূখণ্ডের ওপর ইসরায়েলের ৩৫ বছরব্যাপী অবৈধ দখলদারির প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে শুধু প্যালেস্টাইনির আত্মঘাতী আঘাত হানার প্রয়াসকেই বিচ্ছিন্নভাবে তুলে ধরছে এবং ইসরায়েলের দৃষ্টিভঙ্গিকে আনুকূল্যের প্রসাদ দান করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিমত্তা প্রায় প্রতিপক্ষহীন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আন্তর্জাতিক আলোচনাসূচির পুরোটাই দখলে নিয়ে ফেলেছে এবং তারই সঙ্গে আরব পরিমণ্ডলের কথা যদি বলতে হয় এত অসমন্বয় ও এত বেশি বিখণ্ডিত চরিত্র আগে কখনও দেখা যায়নি।

শ্যারনের 'খুনি' প্রবণতা (শব্দটি যদি সঠিক হয়) আগের তুলনায় অনেকখানি বেড়ে গেছে, দানবীয় হয়ে উঠেছে। এর অর্থ হলো এই আগের তুলনায় হত্যা ও ধ্বংসে তিনি আরও সক্রিয় হবেন, যদিও ঘৃণা এবং অস্বীকার করার একবল্গা প্রবণতার কারণে শ্যারন যেভাবে ব্যর্থ হয়েছে। রাজনৈতিক ও সামরিক সাফল্যের ক্ষেত্রে যে নিষ্ফল ব্যর্থতায় তিনি পৌঁছেছেন তাকে ছোট করে দেখানো হচ্ছে। জনগণের মধ্যেই যে দ্বন্দ্বের বিষয়গুলো রয়ে গেছে তাকে তো ট্যাঙ্ক আর বোমারু বিমান দিয়ে মুছে ফেলা যায় না এবং নিরস্ত্র জনতার বিরুদ্ধে এই যে যুদ্ধ– শ্যারন যতবারই তার 'সন্ত্রাস', 'সন্ত্রাস' মন্ত্রের দুন্দুভি বাজান না কেন– কোন দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান আনতে পারে না, যেমনটা নাকি তিনি স্বপ্ন দেখছেন। প্যালেস্টিনীয়রা সরে যাবে না। তদুপরি তার নিজের জনতার দ্বারাই শ্যারন নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত, প্রত্যাখ্যাত হবেন। প্যালেস্টাইন ও প্যালেস্টিনীয়দের সর্বস্ব ধ্বংস করা ছাড়া শ্যারনের আর কোন প্রকল্পই নেই। এমনকি আরাফাত ও সন্ত্রাস বিষয়ে তার বদ্ধ বুলিতে তিনি তার জনতার সম্মান তো বাড়াতে পারেননি বরং নিজের আধিপত্যবাদী বিকারকেই প্রকাশ করে ফেলেছেন।

www.pathagar.com

সুতরাং আদতে তিনি ইসরায়েলেরই সমস্যা। দস্যুবৃত্তির যুদ্ধে মানুষের ওপর প্রচণ্ড কষ্ট ও ধ্বংস চাপিয়ে দেয়া হলো তার বিরুদ্ধে আমাদের ক্ষমতায় যা কিছু করা যায়, যতদূর করা যায় আমাদের দিক থেকে তা করতে হবে। বিগনিউ ব্রেজনস্কির মতো প্রখ্যাত, সম্মানীয় অবসরপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদ টেলিভিশনে যখন বলেন, শ্বেত আধিপত্যবাদী শাসনকালের বর্ণবিদ্বেষীদের মতোই আচরণ করছে ইসরায়েল, আমরা তখন অনুভব করি, ওই দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি একাকী নন এবং আমেরিকাসহ অন্যত্র এমন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, যারা ক্রমশ মোহমুক্ত শুধু নয়, ইসরায়েলের ওপর বিরক্ত হচ্ছেন। আমেরিকার বখাটে এবং অপচয়কারী কুসন্তান হিসেবেই দেখছেন, যার জন্যে বড্ড বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে, যার জন্যে মিত্রদের কাছে, নাগরিকের কাছে দেশের সুনাম নষ্ট হচ্ছে : প্রশ্ন হলো এই তীব্র সংকটের এই প্রহরকালে বর্তমান পরিস্থিতিতে কী আমরা স্বচ্ছ যুক্তিবাদ দিয়ে বুঝে নিতে পারব এবং সেই অনুযায়ী আমাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা স্থির করে নিতে পারব?

আমার এখন যা বলার, তা যথেষ্ট নির্বাচিত এবং এই কথাবার্তা আরব ও পশ্চিমি-উভয় দুনিয়ারই একজন মানুষের কথা, যে দীর্ঘদিন ধরে প্যালেস্টাইনের জন্য কাজ করে চলেছেন। আমি সবটাই জানি, এমন নয়। সুতরাং সব বলছিও না। এগুলো একগুচ্ছ চিন্তাসূত্র মাত্র, যা এই সঙ্কটময় সময়ে আমি তুলে ধরতে পারি। নিচে যে ৪টি সূত্র উল্লেখ করছি, তারা একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।

(১) ভাল এবং মন্দ উভয় অর্থে প্যালেস্টাইন শুধু আরব ও ইসলামি ঘটনা নয়, স্ববিরোধযুক্ত এবং স্রোত প্রতিস্রোতসম্পন্ন বিভিন্ন দুনিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনা। প্যালেস্টাইনের জন্য কাজ করতে হলে এসব ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিত সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং প্রতিনিয়ত সেগুলো বিষয়ে নিজেকে শিক্ষিত করতে হবে। সে জন্য আমাদের প্রয়োজন প্রবলভাবে শিক্ষিত, সতর্ক দৃষ্টিসম্পন্ন সুদক্ষ নেতৃত্ব এবং তার পক্ষে গণতান্ত্রিক সমর্থন। এবং সর্বোপরি, ম্যান্ডেলা যেমন তার সংগ্রাম সম্পর্কে অক্লান্তভাবে বলতেন, আমরাও যেন সচেতন থাকি, প্যালেস্টাইন আমাদের অন্যতম নৈতিক বিষয়। একথা মনে রেখে এ বিষয়ে আমাদের কর্মধারা পরিচালিত হবে। এটি কোন বাণিজ্যিক বিষয় নয়, চুক্তিগত দর কষাকষি নয় অথবা পেশা বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পদ্ধতি নয়। এটি একটি ন্যায্য বিষয়, যা প্রত্যেক প্যালেস্টিনীয়র উচ্চতর নৈতিক ক্ষেত্র অধিকার করার কথা এবং সে অধিকার কায়েম রাখার কথা বলে।

(২) ক্ষমতার বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে, তাদের মধ্যে সামরিক ক্ষমতা অধিকতর স্পষ্ট : গত ৪৫ বছর ধরে প্যালেস্টাইনে ইসরায়েল যা করে আসছে অত্যন্ত প্রযত্ন ও বৈজ্ঞানিক প্রকল্পে নির্মিত প্রচার-কৌশলের ফলে সম্ভব হয়েছে। এই প্রচার-কৌশলে ইসরায়েলের কাজ-কর্মে বৈধতা দেয়া হয়েছে এবং একই সঙ্গে প্যালেস্টাইনের কাজ-কর্মের অবমূল্যায়ন এবং তাকে মুছে দেয়া হয়েছে। শুধু দুর্ধর্ষ সমরবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণ করা নয়, মতামতকে সংগঠিত করা এবং তা থেকে শক্তি সংগ্রহ করা। ধীরে এবং অত্যন্ত পরিকল্পনামাফিক মতামত সংগঠনে মানুষ ইসরায়েলের বিষয়কে নিজের বিষয় ভাববে এবং প্যালেস্টাইনকে ভাববে ইসরায়েলের শত্রু। সুতরাং প্যালেস্টাইন 'আমাদের' বিপক্ষে এবং ঘৃণ্য বিপজ্জনক। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সমাপ্তিকাল থেকে মতামত ভাবমূর্তি এবং চিন্তা

www.pathagar.com

সংগঠনের ক্ষেত্রে ইউরোপের ভূমিকা মলিন হয়ে প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছে। আমেরিকা হলো যুদ্ধের মূল ক্ষেত্র। এই দেশটাতে পরিকল্পনামাফিক রাজনৈতিক কর্মসংগঠনের গুরুত্ব আমরা শিখিনি, যাতে করে গড়পড়তা আমেরিকানরা প্যালেস্টাইনের নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্রই 'সন্ত্রাসবাদ'-এর কথা না ভাবে। এই সংগঠনই ইসরায়েলি দখলদারি প্রতিরোধ করতে গিয়ে আমরা যা অর্জন করেছি তা রক্ষা করবে। আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ে ইসরায়েলকে যা সমর্থন করেছে তা হলো আমাদের রক্ষা করবে। আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ে ইসরায়েলকে যা সমর্থন করেছে তা হলো আমাদের রক্ষা করার জন্য কোন জনমত পরিসর নেই, যা যুদ্ধের অপরাধে শ্যারনকে প্রতিরোধ করতে পারে; যা করছি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য করছি- শ্যারনের এই বুলি থামিয়ে দিতে পারে। সিএনএন-এর প্রকাণ্ড, প্রসারিত, চাপিয়ে দেয়া প্রচার ধারার কথাই যদি উল্লেখ করা যায়, প্রতি ঘণ্টায় অন্তত ১শ' বার এরা 'সুইসাই বোমা'র কথা বলছে এবং আমাদের দিক থেকে চূড়ান্ত ঔদাসীন্যের বিষয় হলো হান্নান আশরাবি, লায়লা শাহিদ, ঘাসান খাতিব, আফিক সাফিদের (কয়েকটি মাত্র নাম বললাম) নিয়ে আমাদের কোন দল নেই, যারা সিএনএন অথবা অন্য কোন চ্যানেলে চলে যেতে পারে শুধু প্যালেস্টাইনের কথাগুলো বলতে, যাতে মানুষ পরিপ্রেক্ষিতটা বুঝতে পারে এবং যাতে করে অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে আমাদের নৈতিক ও বর্ণনাত্মক উপস্থিতি নিশ্চিত হয়। আমাদের প্রয়োজন আগামী নেতৃত্ব, যারা বৈদ্যুতিক গণসংযোগের যুগের এই অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। এবং এই পাঠ গ্রহণ না করাই আজকের দিনের ট্রাজেডির বড় একটা অংশ।

(৩) বৃহৎ শক্তিধর আমেরিকা বিষয়ে নিবিড় পরিচিতি ও জ্ঞান ছাড়া ওই বৃহৎ শক্তিধর দেশের আধিপত্যদলিত পৃথিবীতে রাজনৈতিক ও দায়িত্বশীলভাবে বিচরণ করা নেহাৎ অর্থহীন। আমেরিকার ইতিহাস, প্রতিষ্ঠান, স্রোত-প্রতিস্রোত এবং একইসঙ্গে প্রয়োজন আমেরিকার ভাষা নিয়ে কাজ চলার মতো দখল। আরবের অন্য দেশগুলোসহ আমাদের দেশের মুখপাত্রদের কথা শুনে মনে হয়, আমেরিকা বিষয়ে কখনো তারা হাস্যকর কিছু বলছে, কখনো আমেরিকার দয়ার কাছে নতজানু হচ্ছে, একবাক্যে আমেরিকাকে অভিশাপ দিচ্ছে। অন্য বাক্যে তার সহায়তা মাগছে, আর সবটাই করছে ভয়ঙ্কর এক ভঙ্গুর ইংরেজিতে এবং এই আদিম স্তরের অদক্ষতা দেখলে কান্না পেয়ে যায়। আমাদের বন্ধু আছে এবং আমাদের সম্ভাব্য বন্ধুও আছে। আমরা এই কৌমের চর্চা করতে পারি, তাকে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি এবং আমাদের কৌমের মিত্র কৌমগুলোকে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের রাজনীতিতে ব্যবহার করতে পারি, যেমন করে দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যবহার করেছিল অথবা যেমন করে আলজেরিয়া ব্যবহার করেছিল ফ্রান্সে তাদের মুক্তি সংগ্রামের সময়। পরিকল্পনা, শৃঙ্খলা এবং সমন্বয়–অহিংসার রাজনীতিকে আমরা আদৌ বুঝতে পারিনি। তদুপরি ইসরায়েলবাসীকে সরাসরি সম্বোধন করার প্রয়াসের শক্তিও আমরা বুঝতে অসমর্থ হয়েছি, যেমন করে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস জড়িয়ে নেয়া এবং পারস্পরিক সম্মানের রাজনীতি হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদেরও সম্বোধন করেছিল। ইসরায়েলি নিষ্কাশনবাদ ও হানাদারির বিরুদ্ধে সহাবস্থানই আমাদের উত্তর। এটা পিছিয়ে আসা নয়, বরং ঐক্য নির্মাণ করা এবং এভাবে নিষ্কাশনবাদী, জাতিবিদ্বেষী

www.pathagar.com

ও মৌলবাদীদের বিচ্ছিন্ন করা।

(৪) আমাদের পক্ষে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে পাঠ গ্রহণ করতে হবে তা ইসরায়েল দখলিকৃত ভূখণ্ডে, যা ঘটিয়ে চলেছে সেই মর্মান্তিক ট্রাজেডিতে প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। ঘটনা হলো আমরা মানবগোষ্ঠী, সমাজ এবং ইসরায়েলের হিংস্র আক্রমণ সত্ত্বেও আমাদের সমাজ এখনো কাজ করে চলেছে; আমরা মানবগোষ্ঠী, কারণ আমাদের একটি কার্যকরী সমাজ আছে যা কাজ করে চলেছে– প্রত্যেক অপব্যবহার, ইতিহাসের সকল নিষ্ঠুর বাঁক, সহে যাওয়া সকল দুর্ভাগ্য, মানবগোষ্ঠী হিসেবে। প্রত্যেকটি বিয়োগান্ত অধ্যায়ের মধ্যে পথচলা সত্ত্বেও আমাদের সমাজ গত ৫৪ বছর ধরে কাজ করে চলেছে; ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আমাদের মহত্তর জয় হলো এই শ্যারন এবং তার ধরনের মানুষের আমাদের সমাজের এই সপ্রাণতা বোঝার ক্ষমতাই নেই এবং সেই কারণেই প্রকাণ্ড শক্তিমত্তা, ভয়াবহ, অমানবিক নৃশংসতা সত্ত্বেও তাদের পতন অনিবার্য। আমরা আমাদের ট্রাজেডি, অতীতের স্মৃতিকে অতিক্রম করতে পেরেছি, অথচ শ্যারনের মতো ইসরায়েলিরা পারেনি। একজন আরব-হত্যাকারী, একজন ব্যর্থ রাজনীতিবিদ হিসেবেই তিনি কবরে যাবেন, তিনি তার জনগণের জন্যে অধিকতর অশান্তি ও অনিরাপত্তা বয়ে এনেছেন। একজনের নেতৃত্ব তার পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে উত্তরাধিকার হিসেবে নিশ্চয়ই এমনকিছু রেখে যাবে, যার ওপর ভাবি প্রজন্ম নির্মাণকার্য চালাতে পারবে। শ্যারন, মোফাজ এবং তাদের সঙ্গে জড়িত অন্যরা তাদের এই হুঙ্কার, হত্যা ও ধ্বংসের অভিযানে কবরখানার ইটকাঠ ছাড়া আর কিছুই রেখে যাচ্ছেন না। নেতিমূলকতা নেতিমূলকতারই জন্ম দেয়।

প্যালেস্টিনীয় হিসাবে আমি মনে করি, আমরা আজ বলতেই পারি আমরা একটি ভবিষ্যৎ ছবি এবং একটি সমাজ রেখে গেলাম, যাকে খুন করার সকল প্রয়াস সত্ত্বেও সে বেঁচে ছিল এবং এটাই অনেকখানি। এটি আমার এবং আপনার সন্তানদের প্রজন্মের জন্য ওই দিগন্ত থেকে যাত্রা করতে হবে সমালোচনামূলক, যুক্তিবাদী, মানসভঙ্গি এবং আশা ও সহিষ্ণুতাকে সঙ্গে নিয়ে।

সংবাদ, ২১ মার্চ '০৩

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের সাক্ষাতকার

www.pathagar.com

ফিলিস্তিনিদের পরিচয় সন্ধানে
এডওয়ার্ড সাঈদের সঙ্গে সালমান রুশদীর বাক-বিনিময়

অনুবাদক : সাখাওয়াত টিপু ও সারফুদ্দিন আহমেদ

সালমান রুশদী : পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে প্রাচ্যের সদর-অন্দরের চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও সংঘাত একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে যারা দেখেছিলেন তাদের মধ্যে এডওয়ার্ড সাঈদ একজন বুজুর্গ ব্যক্তি। সাহিত্যভিত্তিক বহু বইয়ের জনক এবং কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি ভাষা ও তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক এডওয়ার্ড সাঈদের এত জগতখ্যাতি যে তিনি বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ এমনভাবে পড়তে (বিশ্লেষণ করতে) পারেন, যেন তা বই পড়ার মতো।

তার নতুন বই *'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই'*-এর আগে লেখা প্রধান ট্রিলজি আমাদের মূল ভাবনার খোরাক। ট্রিলজির প্রথম ভলিউম *'ওরিয়েন্টালিজম'*-এ তিনি ক্ষমতাধর জ্ঞানের ব্যাখ্যা করেছেন। *ওরিয়েন্টালিজম*-এ তিনি দেখিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদী শাসনামলে ক্ষমতাঅলা পণ্ডিতরা কিভাবে প্রাচ্যের ভাবমূর্তিকে তুলে ধরেছেন যার শেষ বিচারে সাম্রাজ্যবাদের ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠার সহায়ক। ওরিয়েন্টালিজম'র পরের বই *'দ্য কোয়েশ্চেন অব প্যালেস্টাইন'*, *'দ্য কোয়েশ্চেন অব প্যালেস্টাইন'*র মধ্যে সাঈদ পশ্চিমা মতাদর্শ তথা ইসরাইলের ইহুদিবাদী বিশ্বের সঙ্গে আরব ফিলিস্তিনিদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বয়ান করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় লিখিত হয় *'কভারিং ইসলাম'*, সাঈদের মতে, তার উপ-শিরোনাম এই রকম– *'হাউ দ্য মিডিয়া এন্ড এক্সপার্টস ডিটারমাইন হাউ সি দি রেস্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড।'* যাতে পশ্চিমা দেশের প্রাচ্য আবিষ্কারের সময় এবং ইসলামী জাগরণের বিষয়ে বিস্তারিত বয়ান করা হয়।

'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই' লেখা হয় জাঁ মোর নামের এক ফটোগ্রাফারকে কেন্দ্র করে। ইউরোপের শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত, জন বার্জারস্ এর বই- *'এ সেভেনেথ ম্যান'*-এ জাঁ মোরের উল্লেখ আছে। *'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই'* শিরোনাম নেয়া হয়েছিল ফিলিস্তিনের জাতীয় কবি মাহমুদ দারবিশের বিখ্যাত কবিতা *'দি আর্থ ইজ ক্লোজিং অন আস'* অবলম্বনে– এ কবিতার ভাবার্থ এমন–

'আমাদের দুনিয়া ছোট হয়ে আসছে–
দুনিয়া ছুঁড়ে ফেলছে আমাদের তার শেষ সীমানায়
আর আমরা কান্দি অবিরাম
পলায়নপর দুনিয়া আমাদের ক্রমাগত চেপে ধরছে

www.pathagar.com

আমার মনে হচ্ছে আমরা এ দুনিয়ায় শস্যদানা
তাই যদি মরতে পারি তবে হয়তো আবার
বেঁচে উঠতে পারবো।
আমার মনে হচ্ছে দুনিয়া আমাদের দাই মা
দুনিয়া আমাদের প্রতি দয়াময় হবে—
পাহাড়ের ভাঁজের আয়নায় আমরা আমাদের স্বপ্ন খুঁজি—
আমাদের মধ্যকার শেষ বিপ্লবীর হাতে যেই সব
শ্রেণী শত্রু খতম হবে তাদের মুখগুলো দেখলাম—
আমরা তাদের হতভাগা পোলাপানদের জন্যে কাঁদলাম
যারা আমাদের পোলাপানদের জানালা দিয়ে
রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলেছিল আমরা তাদের মুখের
দিকে চাইলাম। আমাদের সৌভাগ্য নক্ষত্র
আয়নায় রবে বন্দী হয়ে—
ছুটতে ছুটতে দুনিয়ার শেষ মাথায় যাবার পর আমরা কোথায় যাব?
আসমানের সীমানা শেষ হলে পাখিরা উড়বে কোথায়?
যেখানে হাওয়ার শেষ আয়ু শেষ হয়ে গেছে—
সেখানে শিশু চারাগাছ বেড়ে উঠবে কী করে?
লালচে ধোঁয়ার আসমানে আমরা লিখবো আমাদের নাম
আমরা আমাদের হাড় মাংসের আঘাতে কেটে ফেলবো যত সঙ্গীতের ডানা
আমরা এখানে মরবো। দুনিয়ার শেষ মাথায়
এসে আমরা মরবো।
এদিক-ওদিক ছড়ানো আমাদের তাজা
রক্ত জন্মদেবে এক অমর অলিভ বৃক্ষ।'

['দি আর্থ ইজ ক্লোজিং টু আস'— মাহমুদ দারবিশ]

শেষ আসমানের পরে আর কোন আসমান নাই। শেষ সীমানার পরে আর কোন জমি নাই। সাঈদের লেখা *'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই'*র প্রথম পর্বের নাম তিনি দিয়েছেন 'স্টেটস্'। ভূমিহীন, দুর্গত, নির্বাসিত ও পরিচয়হীন মানুষের আর্তহাহাকার এ পারার মূল আমল। এ পারায় সাঈদের জিজ্ঞাসা, 'ফিলিস্তিনিরা কোন অর্থে বেঁচে আছে। তিনি বলেছেন, 'আমরা কী বেঁচে আছি? এর পক্ষে আমাদের কোন প্রমাণ আছে? এখন আমরা যে ফিলিস্তিনে আছি তা আগের চেয়ে ভয়াবহ। আমাদের মান-ইজ্জত এখন অনিশ্চিত, আমাদের শৌর্য-বীর্য ধ্বংসোন্মুখ, আমাদের অস্তিত্ব এখন জ্বরাক্রান্ত। আমরা কবে 'নাগরিক' বলে পরিচিত ছিলাম? আমরা কি প্রকৃত নাগরিক হবার উপায় কখনো অনুসরণ করেছি? একে অপরকে, এ প্রশ্নের জবাব আমরা কতটুকু দিয়েছি? আমরা অবিরাম একজন আরেকজনকে পত্র লিখে, শেষ করবার আগে গতানুগতিকভাবে 'ফিলিস্তিনি ভালোবাসা', 'ফিলিস্তিনি চুমু' উপহার দিয়ে যাচ্ছি। তাতে কি সত্যিকার ফিলিস্তিনি ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়ছে? ইহা কেবলই সৌজন্যমূলক আন্তরিকতার প্রকাশ, ইহা কি লোক দেখানো কোলাকুলি? এই ফিলিস্তিনি শুভেচ্ছা বিনিময়ের আগা-পাশতলায় কি কোন রাজনৈতিক মোটিভেশন নাই, যা বিশেষ একটি জাতি অথবা ব্যক্তির জন্য তাৎপর্যময়?"

www.pathagar.com

সাঈদের বইয়ের পরের অধ্যায়, *'মাইনরিটি ইনসাইড এ মাইনরিটি'* অর্থাৎ 'সংখ্যালঘুর সংখ্যালঘু' পড়ে আমি তার প্রতি গভীর সহানুভূতি অনুভব করেছি। সত্যিই তিনি একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক সংখ্যালঘু প্রতিনিধি। তার এ অনুভূতি এক ধরনের 'চাইনিজ বাক্স'র সঙ্গে তুলনীয়। সাঈদের ভাষায়, 'সুন্নী মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় গ্রীক বংশোদ্ভুত একটি ছোট খ্রিস্টান প্রোটেস্ট্যান্ট গ্রুপে আমার জন্ম।' এরপর তিনি তার হালের সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডে ফিলিস্তিনের সার্বিক অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি হলো 'ত্রিস্ত্রাম ম্যানডি' যা একজনের গোপন জীবন অবলম্বনে রচিত একটি কমেডি উপন্যাস। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রকে সাঈদ বলেছেন, 'ইল-ফেটেড পেসোপটিমিস্ট'। 'পেসোপটিমিস্ট' বলতে এমন কাউকে বোঝায় যে পৃথিবীর সবকিছু দেখে হতবাক হয়ে বিপদে পড়ে যায়। এর প্রথম অধ্যায়ের এক জায়গায় সাঈদ আগে বলেছেন, 'ইসলাম আবির্ভাবের তথাকথিত অজ্ঞতার যুগে আমাদের আগের জনেরা খেজুর দিয়ে তাদের দেবমূর্তি বানাত এবং যখন প্রয়োজন হতো তখন তারা তা খেয়ে ফেলতো। এখন বলুন দেখি মশাই, অই পরিস্থিতিতে কে বেশি অজ্ঞ? আমি না যারা তাদের দেবতাকে খেয়ে ফেলতো তারা? আপনি হয়তো বলবেন, দেবতা মানুষকে খেয়ে ফেলার আগে মানুষেরই আগে দেবতাদের খেয়ে ফেলা উচিৎ। আমিও জবাবে আপনাকেই সমর্থন করবো এবং বলবো– হ্, যেহেতু তাদের দেবতা ভক্ষণযোগ্য খেজুর নির্মিত।'

*'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই'*তে সাঈদ প্যালেস্টাইনের মানুষের শৈল্পিক অভিজ্ঞতার তাফসীর করেছেন।

এডওয়ার্ডের দৃষ্টিতে, ফিলিস্তিনিদের ভগ্ন অথবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঐতিহ্য সামাজিক রীতিনীতির ওপর এমনভাবে চেপে বসেছে যা কোনভাবেই সত্যসম্মত সমাজব্যবস্থা হতে পারে না। সুতরাং এখন ফিলিস্তিনিদের এই অস্থির ও শৃঙ্খলাহীন ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই কাজ করে যাওয়া উচিৎ যা তাদের অজ্ঞতাকে শনাক্ত করে। এডওয়ার্ড এ ভাবকেই বইয়ের পরের অংশে বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, ফিলিস্তিনি আরবদের ইতিহাস ফিলিস্তিনের বাইরের ইতিহাসে পরিণত হচ্ছে। এইভাব চিত্রায়িত হয়েছে একটি ফটোগ্রাফে। অই ফটোগ্রাফে নাজারাতের একটি জায়গার ছবি চিত্রায়িত হয়েছে। অই জায়গা 'আপার নাজারাত' বলে পরিচিত এবং জায়গাখানি আরব ফিলিস্তিনভুক্ত ছিল না। আরব ফিলিস্তিনকে একটি নব্য আবিস্কৃত ভূমি হিসেবে দেখা হয়। এবং প্রাচীন ফিলিস্তিনের আভ্যন্তরীণ ঐতিহ্য এখন ছবির মত অকার্যকর হয়ে গেছে। তবু ফিলিস্তিনিরা এখনও আওড়ায়–

'বরং সহজ দূর ছায়াপথ থেকে ভাজা মাছ তুলে খাওয়া–
বরং সহজ সাগর চষে ফেলা অথবা
কুমিরকে শেখানো কোন সদাচারী নীতিবাক্য
তবু একটি ছেড়ে কোথাও যাওয়া অতো সহজ নয়'

[ট্রিয়েনটি ইম্পসিবলস্– তৌফিক জায়াদ]

*'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই'*র দ্বিতীয় অধ্যায় 'ইনটেরিওরস্'-এ ফিলিস্তিনে বসবাসরত আরবদের সদর-অন্দরের জীবনযাপনের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের মধ্যে হাতে গোনা কিছু লোক ছাড়া বেশির ভাগ ফিলিস্তিনিরা এমনভাবে

www.pathagar.com

তাদের ঐতিহ্য ভুলে বসেছে যেন মনে হচ্ছে ইহুদি সংশ্রবে তারা অনেকখানি দূষিত হয়ে গেছে। এখন ফিলিস্তিনের হাল-হকিকত এমন যে সেখানকার কেউ ফিলিস্তিনি সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরে থাকলে তাকে এক বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়।

ফিলিস্তিনিদের এই অভিজ্ঞতাগুলোই সাঈদ দেখাতে চেয়েছেন। একবার এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। এডওয়ার্ডের কাছে এক মুসাফির একটা পত্র নিয়ে আসেন। পত্রদাতার দাবী- তিনি কারাত বিশেষজ্ঞ হয়ে ফিলিস্তিনি পরিচয়কে মহিমান্বিত করেছেন। 'অই পত্রে কী ছিল?'-এর জবাবে এডওয়ার্ড বলেছেন, 'প্রথমত লোকটি জানিয়েছেন, তিনি ফিলিস্তিনের জন্মগত নাগরিক- এখন থাকেন আমাদের আদি নিবাস জেরুজালেমে। তিনি আমার নাম লিখেছেন ইংরাজিতে। পুরাপত্রে কারাতে তার দক্ষতার কথা এমনভাবে বারবার বলেছেন যেন 'কারাতে দক্ষতাই ফিলিস্তিনিদের সর্বোচ্চ সাফল্য। কারাত মূলত আত্মোন্নয়ন নয় বরং তা কোন বিষয়ের রিপিটেশনের প্রতীক।' এরপর সাঈদ ফিলিস্তি নিদের চরিত্র বোঝাতে কয়েকটি পুনরাবৃত্তি ধর্মী চরিত্রকে উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। বইয়ে তৃতীয় অধ্যায় 'ইমার্জেন্সি' ও চতুর্থ অধ্যায় 'পাস্ট এ্যান্ড ফিউচার'-এ সাঈদের মূল কথা ফিলিস্তিনি কারা এবং ফিলিস্তিনিদের কেমন হওয়া উচিৎ। এখানে আরেক শক্তিকে দেখানো হয়েছে যার দিকে ফিলিস্তিনিরা আলবৎ ঝুঁকে পড়েছে। তা হলো অন্য ভাষার ওপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যাওয়া। এমনকি তাদের নামও প্রাচীন হিব্রু ভাষায় বদলানো হচ্ছে। পরিচয়ের মূলে যাবার জন্যে তারা প্রাচীন আরব ইতিহাসে ফিরে যাচ্ছে: তাদের পরিচয়ের আদর্শমডেল হিসেবে তারা ইয়াসির আরাফাত নয়, আবু ওমরকে বেছে নিচ্ছে। বিভিন্ন কারণে নামের অর্থও পাল্টে যাচ্ছে। লেবাননের সবচেয়ে বড় শরণার্থী শিবিরের নাম 'ঈন এল হিলবি'। এই 'হিলবি' বানান লেখা হয় আরবী 'হা' অর্থাৎ 'এইচ' দিয়ে কিন্তু বর্তমানে প্রাচীন হিব্রু বানানরীতি অনুসরণে তার নাম হয়েছে 'ঈন এল খিলবি'। 'ঈন এল খিলবি' মানে 'মধুর বসন্ত' আর বদলানো নামের অর্থ দাঁড়ায় 'ফাঁকা জায়গার বসন্ত'। সাঈদ এক জায়গায় লিখেছেন, 'আমিও ভেবে দেখেছি ইসরাইলিরা শূন্য বসন্ত দিয়ে ফিলিস্তিনিদের ক্যাম্প শূন্য করে ফেলেছে।' এ বইয়ে তিনি ইহুদিবাদীতার বিষয়েও কথা বলেছেন। তার আগের বই *দি কোয়েশ্চেন অব প্যালেস্টাইন* সে বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। 'সেমিটিজম' বা ফিনিশীয় আরব জাতীয়তাবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন ইহুদিবাদীতার যে কোন ধরনের সমালোচনা করার পেছনে যে জটিলতা তা আগে আমাদের 'নোট' করা দরকার। ঐতিহাসিক ধারায় জিওনিজম বা ইহুদিবাদীতাকে আমাদের বুঝতে হবে। জিওনিজমেরও রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস যা আরব জাতীয়তাবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

বইয়ের একটি জায়গায় তিনি বলেছেন, পশ্চিমা দেশের মানুষ অবরুদ্ধ ভূমি বলতে প্রাথমিক অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের আবাসস্থলকেই বোঝে। কিন্তু সাঈদ অবরুদ্ধভূমিকে এমন একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবাসস্থল বলে অভিহিত করেছেন যেখানে সম্ভাবনাময় উচ্চমার্গের দর্শন চিন্তা করা যায়। ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রে, তার বক্তব্য হলো এটা অবরুদ্ধ ভূমি কিন্তু মধ্যবিত্ত চেতনার ভূমি নয়- বরং এখানে বহু উচ্চ ভাবনার বিষয় রয়েছে। সবশেষে সাঈদ ক'গোছা প্রশ্ন করেছেন যা ফিলিস্তিনের মূল অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

www.pathagar.com

'ভূমিহীনদের কী হবে? এ দুনিয়ায় তুমি কোথায় দাঁড়াবে? তুমি কী ত্যাগ করবে?' তার একটা অনুচ্ছেদ আমার খুব দামী মনে হয়েছে– আমি নিজেও বিষয়টি নিয়ে অনেক ভেবেছি। তিনি লিখেছেন, 'আমাদের ক্ষেত্রে সত্য হল– আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা, এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতির দিকে দৌড়াতে চাই। আমরা যাযাবরের মত, এবং সম্ভবত আমরা শংকর জাতিভূক্ত মানুষ ছাড়া নিজেদের ভাবতে পারি নাই। অবরুদ্ধতাকে আমাদের এই প্রবণতাই আরো বেশি দীর্ঘায়িত করে রেখেছে।' এছাড়া নিজেদের সংস্কৃতিকে ছুঁড়ে ফেলে মুক্তির লড়াইয়ে শুধু সহিংসতাকেই বিদ্রোহের ভাষা মনে করার কারণেও সাঈদ ফিলিস্তিনিদের সমালোচনা করেছেন।

নিউইয়র্কে থাকাকালীন প্রফেসর সাঈদকে বহুবার 'জিউস ডিফেন্স লীগ'র কর্মীরা নানা ধরনের হুমকি দিয়েছে। নিউইয়র্কের মত জায়গায় নিজেকে ফিলিস্তিনি বলে পরিচয় দেবার জন্যই তাকে আমাদের শুভেচ্ছা জানানো দরকার, কারণ নিউইয়র্কে ফিলিস্তিনি পরিচয়ে বাস করা কপালের জন্য সুখবর নয়।

একবার আমার এক বোনকে ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকাকালীন তার দোস্তরা জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কোত্থেকে এসেছ?' যখন সে বললো, পাকিস্তান; তখন তাদের বেশিরভাগই এমন ভাব করলো যেন 'পাকিস্তান' সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নাই। একজন আমেরিকান তো বলেই ফেললো 'ও, প্যাকেস্টাইন!'– [যেন সে চিনে ফেলেছে] এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সে তার কয়েকজন ইহুদি দোস্তর গল্প শুরু করে দিল।

নিজেদের দুনিয়ার বাইরে আমেরিকানদের এহেন মূর্খতার কথা তো আমরা ভাবতেই পারি না। আমি যখন ১৯৮৬ সালে নিউইয়র্কের পেন কংগ্রেসে ছিলাম, তখন সিনথিয়া ওজিক নামের এক লেখিকা অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ক্রিসকিকে এন্টি-সিমেটি বলে তার বিরুদ্ধে নিন্দা চালিয়েছিল। ক্রিসকি নিজে ছিলেন একজন ইহুদি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে নির্বাসিত হাজার হাজার ইহুদি শরণার্থীদের অস্ট্রিয়ায় থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপরও তাকে এন্টি-সিমেটি বলা হয়েছিল। তার কারণ ছিল একটাই, তিনি একবার ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে বৈঠক এবং আলাপ আলোচনা করেছিলেন। আশংকার ব্যাপার হলো– সিনথিয়ার এই অভিযোগে পেন কংগ্রেসে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়। কংগ্রেসে সবাই একের পর এক ফিলিস্তিনিদের দোষারোপ করে ভাষণদান করলেন। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কেউ কোন কথা বলছেন না এবং আমি বলবো বলে মানসিকভাবে তৈরি হচ্ছিলাম। এমন সময় পিয়েরে ট্রুডিউ সবার মধ্য থেকে উঠে আসলেন এবং চমৎকার ভাষায় ফিলিস্তিনের পক্ষে তার ভাষণদান শুরু করলেন। কিন্তু পিয়েরের মত ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কথা বলার ঘটনা নিউইয়র্কে কদাচিৎ ঘটে। এটা একেবারেই ব্যতিক্রম ঘটনা। এডওয়ার্ড, অই সম্মেলনে আপনি উপস্থিত ছিলেন। যে পরিস্থিতি তা কি ভালো না খারাপের দিকে গড়াচ্ছে? এ জাতীয় পরিস্থিতিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

এডওয়ার্ড সাঈদ : ভালো কথা। আমার মনে হয় পরিস্থিতি খুব খারাপের দিকেই গড়াচ্ছে। প্রথমত, নিউইয়র্কে বেড়ে ওঠা আমেরিকানদের ফিলিস্তিনিদের সম্পর্কে কোন চাক্ষুস ধারণা নাই। তারা টেলিভিশনে ফিলিস্তিনিদের যেভাবে দেখে সেভাবেই তাদের সম্পর্কে ধারণা নেয়। মার্কিন টেলিভিশনে তাদের 'বোমাবাজ' 'খুনি' বলে, পররাষ্ট্র

www.pathagar.com

মন্ত্রণালয় 'সন্ত্রাসী' বলে আর তারাও ফিলিস্তিনিদের তাইভাবে। এ কারণেই ফিলিস্তিনিদের সম্পর্কে তাদের কিছু ভিত্তিহীন কু-ধারণা তৈরি হয়েছে। ফলে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কথা বলার কারণে আমার সম্পর্কেও তাদের ধারণা ভালো। তবে তারা যখন আমার সঙ্গে কথা বলে তখন তারা বলে ফেলে, 'তোমাকে দেখে যত খারাপ মনে হয় হয়তো তুমি তত খারাপ নও।' আমি ইংরাজিতে কথা বলি এবং স্বাভাবিক কারণেই ভালভাবেই তা বলতে পারি। ফলে একটা বড় ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করে। আমার কথা বলার বাইরে যে বইপত্র লিখেছি, তা যখন পাঠক পড়ে তখন তারা একজন 'ইংরাজি' সাহিত্যের অধ্যাপকের লেখা হিসেবেই পড়ে। কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন ১৯৮২ সালের পরে আমরা নতুন কিছু সমস্যা, নতুন কিছু সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লাম। অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে তখন আমাদের ভাঙন ধরলো যখন বৈরুত, আমাদের বৈরুত ভেঙে গেল। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত ইহুদি ও ইসরাইল সমর্থক এবং আমার মত লোক উভয়ের কাছেই বৈরুত ভেঙে যাওয়া একটি যুগের অবসান বলে চিহ্নিত। আপনি ভাবছেন যে এখানে নিরাপদে সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছেন। কিন্তু ভেবে দেখুন এখানেও কিছু নানা ধাচের হুমকির সম্মুখীন হতে হচ্ছে আপনাকেও। আপনি যে এখানে বহিরাগত তা কোন না কোনভাবে ঠিকই এখানকার আশপাশ আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

সালমান রুশদী : ফিলিস্তিনি ইস্যুতে ভাষণ রাখতে বা কিছু লিখতে এখানে কোন প্রতিবন্ধকতা টের পাচ্ছেন? মানে আপনার কোন লেখা বা ভাষণে অনিচ্ছাকৃত পরিবর্তন আনতে হচ্ছে?

এডওয়ার্ড সাঈদ : একটু দীর্ঘ জবাব দিতে হবে। আপনি জানেন ফিলিস্তিন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রে দুই ধরনের গ্রুপ তৈরি হয়েছে। একদল বামপন্থী আরেকদল ডানপন্থী। নোয়াম চমস্কি, আলেকজান্দার কোকবার্নের মত কিছু লেখক এখানে উঠে দাঁড়াতে চাচ্ছেন। কিন্তু এখানকার বেশিরভাগ লোকই ভাবে বিরুদ্ধ স্রোতের কিছু না করাই ভাল। তারপরও এখানে কিছু জায়গা আছে যেখানে খুব কম সংখ্যক শ্রোতা-পাঠক আপনি পাবেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, ফিলিস্তিনিদের পক্ষে যাবে এমন কিছু বললে বা লিখলে আপনাকে 'টোকেনাইজ' করা হবে। আপনাকে চিহ্নিত করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের কোথাও অপহরণ, বোমবাজি ইত্যাদি ঘটনা ঘটলে আমাকে বিভিন্ন মিডিয়া থেকে ফোন করা হয় এবং একা এসে সে বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য বলা হয়। মিডিয়াগুলোও আমাকে সন্ত্রাসীদের প্রতিনিধি মনে করে– এটা ভাবতেই আমার মধ্যে এক আশ্চর্য অনুভূতি কাজ করে। দুর্ঘটনা ঘটলে তারা ধরেই নেয় যে এটা ফিলিস্তিন সমর্থিত 'সন্ত্রাসী'দের কাজ। আপনি কোন অনুষ্ঠানে, কোন বৈঠকে যাবেন সেখানেও আপনাকে 'সন্ত্রাসী'দের কূটনৈতিক হিসেবে দেখা হবে। আমার মনে পড়ছে, একবার ইসরাইলি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে একটি টেলিভিশন বিতর্কে যোগ দেবার জন্য আমাকে ডাকা হলো। যদিও বিতর্কের বিষয় ছিল আমার যদ্দুর মনে পড়ছে 'এ্যাচিল লাউরোর' ঘটনা সংক্রান্ত। কিন্তু ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে বিতর্কে যোগ দিতে রাজি হলেন এক শর্তে– তা হলো তিনি একই রুমে আমার সঙ্গে কথা তো বলবেনই না। আলোচনা ও বিতর্ক যদি এক বিল্ডিংয়ের মধ্যে হয় তাহলেও তিনি রাজি নন। সরাসরি প্রচারিত অই অনুষ্ঠানের উপস্থাপক তখন দর্শকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিলেন, 'অধ্যাপক সাঈদ এবং রাষ্ট্রদূত নেতানিয়াহু দু'জনই কথা বলতে

www.pathagar.com

অস্বীকার করেছেন। ইসরাইলের রাষ্ট্রদূত তার সঙ্গে কথা বলবেন না এবং মিস্টার সাঈদ...' কিন্তু আমি তার কথার মধ্যেই বলে উঠলাম 'না–না, আমি কথা বলতে চাই কিন্তু তিনি চান নাই।' মর্ডারেটর তখন বললেন, 'ঠিক আছে আমিই সমাধান করছি; মিস্টার এ্যাম্বাসেডর, আপনি কেন প্রফেসর সাঈদের সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন না?' উত্তরে তিনি বললেন, 'কারণ উনি আমাকে হত্যা করতে চান।' মর্ডারেটর তখন একটুও অবাক না হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ও, তাই? তাহলে এ বিষয়ে আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।' তখন এ্যাম্বাসেডর মিস্টার নেতানিয়াহু বেশ রসিয়ে রসিয়ে কইতে লাগলেন, কীভাবে ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলিদের হত্যা করার প্ল্যান প্রোগ্রাম করছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মূল প্রসঙ্গ ফেলে তখন যে আক্রমণাত্মক ভাষণ তিনি দিলেন তাতে 'টোটালি একটি এ্যাবসার্ড সিচুয়েশন' তৈরি হল।

সালমান রুশদী : আপনি মাঝে মাঝে বলেন যে ইহাকে আপনি ফিলিস্তিনি বিদ্বেষ বলতে পছন্দ করেন না। কিন্তু কেন?

এডওয়ার্ড সাঈদ : আমার মনে হয় ইহা অন্য এক ধারণা থেকে জন্ম নিয়েছে। যেমন, জেরুজালেম থেকে একবার এক লোক আমার কাছে একটা পত্র পাঠিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা আরব দুনিয়ার ইহুদি।' আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ভিন্ন ধরনের চিন্তা-ভাবনা কাজ করে। আমরা ভাবতে পারি না, আমরা আরব দুনিয়ার মুসলমান বা আমরা আরব দুনিয়ার খ্রিস্টান।

হয়তো ইসরাইলিদের অই চিন্তা-ভাবনা আরও বেশি ভালো। ফিলিস্তিনিদের প্রতি তা হয়তো তাদের বিদ্বেষ নয়; হয়তো ইসরাইল কেন্দ্রীক জাতীয়তাবোধ তাদের ফিলিস্তিনিদের সম্পর্কে অন্ধভীতি তৈরি করেছে।

সালমান রুশদী : তাহলে এ ক্ষেত্রে আপনার দর্শন কী? কোন অর্থে ফিলিস্তিনি জাতি টিকে আছে?

এডওয়ার্ড সাঈদ : প্রথমত স্মৃতিচারণ অর্থে। আপনি ফিলিস্তিনের অসংখ্য লোক পাবেন যারা তাদের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে তাকাতে ভালোবাসে এবং ঐতিহাসিক আভিজাত্যের বড়াই করে। অনেক আধুনিক প্রজন্মের নবীন ফিলিস্তিনি পণ্ডিতরা ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় আবিষ্কার করছে যেসব বিষয় ফিলিস্তিনকে আরব বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

দ্বিতীয়ত, ফিলিস্তিনিরা রাজনৈতিক খবরা-খবরের দিক থেকে বহুত দূরে অবস্থান করছে। একটা খেয়াল করার মত ব্যাপার হলো কিছু কিছু ফিলিস্তিনি ইয়ংস্টাউন অথবা ওহিওতে এসে বসবাস করতে চায়। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা হয় ইহা কেমন জায়গা, বা সুনির্দিষ্ট ভৌগলিক অবস্থান কোথায় তাহলে তারা বলতে পারবে না। হয়তো তারা বলবে, ইয়ংস্টাউন অথবা ওহিও কোথায় তা জানা নাই। কিন্তু বৈরুতের সর্বশেষ ঘটনার খোঁজ ঠিকই রাখে। পপুলার ফ্রন্ট অথবা আল ফাতাহ্ মুভমেন্টের কোন চুক্তিভঙ্গ হল তার খবর তারা রাখছে– কিন্তু ইয়ংস্টাউনে বসবাসরত এমন ফিলিস্তিনিও পাবেন যে সেখানকার মেয়রের নাম পর্যন্ত জানে না অথবা বলতে পারে না সে কিভাবে নির্বাচিত হল। বোধ হয় তারা ধরে নেয় কোন একজনকে মেয়রের পদে ধরে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। শেষ কথা, জ্যঁ মোরের ছবিতে দেখা যায় ফিলিস্তিনিরা কাঁধে ব্যাগ নিয়ে অনবরত এক

www.pathagar.com

জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ভ্রমণ করছে। এখানে ফিলিস্তিনিদের যাযাবরের মত চিত্রায়িত করা হয়েছে। এসব আমাদের নাগরিক বোধকে স্পর্শ করে। আমাদের পরিচয় বোধকে জাগ্রত করে এবং আমরা চেঁচিয়ে বলতে পারি সে অনুভূতি এখনও মুছে যায় নাই। যেন ফিলিস্তিনিরা তাদের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। আশা-নিরাশার এক মধ্যবর্তী জায়গায় বাস করছে তারা।

সালমান রুশদী : বিষয়টি আরও করুণভাবে উপস্থাপনের জন্য আপনি সদ্য মরা ছেলের মায়ের গল্প বলেছেন। বিয়ের পর পরই এক ছেলে মারা গেল। তার বিধবা নববধূ যখন কাঁদছে তখন তার শাশুড়ি বলছেন, 'আল্লাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে সে এখন মরলো, নয়তো পরিস্থিতি ঢের খারাপ হতো।' সদ্য বিধবা মেয়ে তখন তার শাশুড়িকে ধমক দিয়ে বললো, 'এ আপনি কি বলছেন, আমার স্বামী এখন না মরলে পরিস্থিতি কীভাবে ঢের খারাপ হতো?'

উত্তরে শাশুড়ি বললেন, 'আমার ছেলে যখন বড় হয়ে যেত তখন তুমি পরপুরুষের হাত ধরে চলে যেতে, সেই শোকেই সে মারা যেত। তার চে' এখন মরাই তার জন্য ভালো হয়েছে।'

এডওয়ার্ড সাঈদ : আপনি নেগেটিভ দিকগুলো তালাশ করতে বরাবরই ওস্তাদ!

সালমান রুশদী : ফিলিস্তিনিদের পরিচয়ের ব্যাপারে তারা আশাবাদী না নৈরাশ্যবাদী তা ঠাহর করা ভারি মুশকিল। সে জন্য একে আমরা 'নৈরাশ্যপূর্ণ আশাবাদ' বলি। আপনি কি বলবেন ফিলিস্তিন পরিচয় নিয়ে দাঁড়াবার মত তাদের নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে?

এডওয়ার্ড সাঈদ : একটা ঘটনা বলি; তাহলে আপনার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। আমার খুব ঘনিষ্ট এক দোস্ত একদিন আমার বাসায় এলো এবং সেদিন রাতে আমার বাসায় থাকলো। সকাল বেলায় আমরা নাস্তা খেতে বসলাম। নাস্তার মেন্যুতে ছিল দুধের সর দিয়ে বানানো বিশেষএকটা খাবার। আরব অঞ্চলে এই খাবারকে বলে 'জা'আতার'। ফিলিস্তিন, লেবানন, সিরিয়াসহ আরব দুনিয়ার সবখানে অই খাবার একটি পরিচিত মেন্যু। কিন্তু আমার দোস্ত বললো, 'তোমার বাসায় যে ফিলিস্তিন সংস্কৃতি চর্চা হয় তা বোঝা যাচ্ছে। নাস্তার টেবিলে 'জা'আতার' দেখে।' তারপর কবির মত সে বোঝাচ্ছিল লেবানন বা সিরিয়ার সঙ্গে ফিলিস্তিনের রন্ধন প্রক্রিয়ার কী কী সূক্ষ্ম ফারাক আছে। এবং অন্যান্য অঞ্চলের 'জা'আতার'র সঙ্গে ফিলিস্তিনি 'জা'আতার'র কী কী তফাৎ রয়েছে। এবং অই দিন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে ফিলিস্তিনের রন্ধন প্রক্রিয়ার মধ্যেও সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।

সালমান রুশদী : তাহলে একজন ফিলিস্তিনি যে কাজ করে সেটাই 'ফিলিস্তিনি' কাজ হয়ে ওঠে। এটা বোঝাতে চাচ্ছেন কী?

এডওয়ার্ড সাঈদ : হাঁ ঠিক তাই। এমনকি তাদের ভাষার মধ্যেও বিশেষ বিশেষ কোড রয়েছে যা আপনাকে বুঝতে সহায়তা করবে যে অমুক লোক কোন ক্যাম্প অথবা গ্রুপ থেকে এসেছে। কথার উচ্চারণ, শব্দের প্রয়োগ শুনেই বুঝতে পারবেন সেকি পপুলার ফ্রন্ট না ফাতাহ্ গ্রুপের সমর্থক। এছাড়াও তাদের ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক টান রয়েছে। সবচে' তাজ্জব ব্যাপার, যে শিশুর জন্ম লেবাননের শরণার্থী শিবিরে এবং যে জীবনে

কোনদিন ফিলিস্তিনে যায় নাই তার সেই লেবাননীয় আরবী উচ্চারণের মধ্যেও হাইফা, জাফা, গাজার আঞ্চলিক টান রয়েছে।

সালমান রুশদী : প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে একটু অন্যদিকে যাই। প্রসঙ্গটি হল ফিলিস্তিনিদের চরিত্রের মাত্রাতিরিক্ত তার ব্যাপারে। আপনি নিজেও বলে থাকেন যে কোথাও যেতে আপনার মাত্রাতিরিক্ত বড় লাগেজ সঙ্গে নিতে হয়। কিন্তু তার চেয়ে মাত্রাতিরিক্ততার উদাহরণ হিসেবে আমার মনে পড়ছে: ইসরাইল রেডিওতে প্রচারিত এক ফিলিস্তিনি গেরিলার বক্তব্যের কথা। ইসরাইলি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ার পর রেডিওতে এক গেরিলার সঙ্গে ইসরাইলি অফিসারের যে কথোপকথন হয় তা প্রচার করা হয়। আসলে ইহা ছিল একটা অভিনীত সাক্ষাৎকার। ওই সাক্ষাৎকারে দেখা গেল গেরিলা নিজেকে ভয়ঙ্কর ও জঘন্য মানুষ হিসেবে অভিহিত করলো। একই সঙ্গে সে তার সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য সাংঘাতিক অনুশোচনা বোধ করছে বলেও জানালো।

এডওয়ার্ড সাঈদ : হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে। সেই ১৯৮২ সালের ঘটনা। ইসরাইল কর্তৃপক্ষ প্রায়ই ফিলিস্তিনিদের বিভ্রান্ত করার জন্য সাজানো কিছু সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান টেলিভিশনে প্রচার করত। কিন্তু মজার কথা হলো ফিলিস্তিনিরা তাতে বিভ্রান্ত তো হয়ই নাই বরং সন্ধ্যায় বিনোদনের জন্য তারা নিজেরা ওই ভিডিও টেপ চালিয়ে মজা করতো। সেরকম একটা সাক্ষাৎকারের নমুনা দেই :

ইসরাইলি উপস্থাপক : আপনার নাম?

আটককৃত ফিলিস্তিনি : আহমেদ আব্দুল হামিদ আবু সাঈদ।

ইসরাইলি : আপনার মুভমেন্টের নাম?

ফিলিস্তিনি : আমার মুভমেন্টের নাম আবু লেল। [আবু লেল মানে 'অন্ধকারে পিতা' যা এক আতংক সৃষ্টিকারী নাম।]

ইসরাইলি : এখন বলুন আপনার সন্ত্রাসী সংগঠনের নাম কী?

ফিলিস্তিনি : আমার সন্ত্রাসী সংগঠনের নাম 'পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন'।

ইসরাইলি : কখন আপনি এই সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে জড়ালেন?

ফিলিস্তিনি : যখনই প্রথম আমি সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে সচেতন হলাম।

ইসরাইলি : দক্ষিণ লেবাননে আপনার মিশন কী ছিল?

ফিলিস্তিনি : আমার মিশন ছিল সন্ত্রাস সৃষ্টি করা। আমরা স্রেফ গ্রামে ঢুকতাম এবং এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করতাম। শিশু ও নারীসহ সবাইকেই আমরা চরম ভীতির মধ্যে রাখার চেষ্টা করতাম: সোজা কথায় সেখানে আমরা যা করতাম তা সন্ত্রাসী তৎপরতা।

ইসরাইলি : আপনি কি কোন আদর্শগত কারণে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িয়েছিলেন না স্রেফ টাকার জন্য?

ফিলিস্তিনি : না, স্রেফ টাকার জন্য। টাকা ছাড়া এ ব্যাপারে কি আদর্শ থাকতে পারে? আসলেই কী কোন আদর্শ আছে? আমরা বহু আগেই আমাদের আদর্শ বেঁচে দিয়েছি।

ইসরাইলি : এই সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো কোথায় টাকা পায়?

ফিলিস্তিনি : সন্ত্রাস ছড়ানো যাদের স্বার্থ উদ্ধার হয় তারা দেয়।

ইসরাইলি : সন্ত্রাসী ইয়াসির আরাফাত সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

ফিলিস্তিনি : আমি শপথ করে বলতে পারি আরাফাত হচ্ছে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী। সে

আদর্শ বিকিয়ে আমাদের বেঁচে দিয়েছে। আসলে তার পুরো জীবনটাই সন্ত্রাসে ভরা। [একজন ফিলিস্তিনের কাছে মনে হতে পারে সে যা করছে তা আদর্শের জন্য করছে। কিন্তু আসলে তা নয়। সে আসলে টাকার জন্যই তার আদর্শের বুলি আওড়ায়।]

ইসরাইলি : ইসরাইলি নিরাপত্তা বাহিনী তাদের সঙ্গে কী রকম আচরণ করে বলে আপনি মনে করেন?

ফিলিস্তিনি : সততার সাথেই বলছি। ইসরাইলি নিরাপত্তা বাহিনীকে আমাদের ধন্যবাদ জানানো দরকার কারণ তারা আমাদের সঙ্গে যথার্থ সদয় আচরণ করে।

ইসরাইলি : যারা আইডিএফ [ইসরাইলি ডিফেন্স ফোর্স] এর ওপর সন্ত্রাসী হামলা চালাচ্ছে সেই সন্ত্রাসীদের প্রতি আপনার কোন উপদেশ বা পরামর্শ আছে?

ফিলিস্তিনি : তাদের প্রতি আমার উপদেশ হলো আইডিএফ এর কাছে এখনই তাদের অস্ত্র সমর্পণ করা দরকার। যা তাদের জন্য সব দিক থেকে মঙ্গলজনক হবে।

ইসরাইলি : অবশেষে, আপনি কি আপনার পরিবারের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন?

ফিলিস্তিনি : আমি আমার পরিবারকে আশ্বস্ত করতে চাই আমি ভাল আছি এবং সুস্থ আছি। আমি ইসরাইলি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তারা আমার শত্রুপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও আমাকে এ কথাগুলো বলার সুযোগ দিয়েছেন।

ইসরাইল : মানে আপনি এই টেলিভিশন চ্যানেল অর্থাৎ 'ভয়েস অব ইসরাইল'র কথা বলছেন?

ফিলিস্তিনি : হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ধন্যবাদ স্যার! অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার!

সালমান রুশদী : এভাবে প্রচার করত?

এডওয়ার্ড সাঈদ : একদম এভাবে। বৈরুত থেকে অইরকম বানানো ভিডিও চিত্র তারা গেরিলাদের মানসিক শক্তি ভেঙে দেওবার জন্য প্রচার করত। ভেবে দেখুন কী হাস্যকর, মজার কাহানী বটে?

সালমান রুশদী : এছাড়া আপনি একটা ফ্যাশন ম্যাগাজিনের ফটো আর্টিকেল সম্পর্কে বলেছিলেন। অই আর্টিকেলের শিরোনাম ছিল 'টেরোরিস্ট কালচার'। সে আর্টিকেলে দাবী করা হয় যে ফিলিস্তিনিরা প্রকৃতপক্ষে ফিলিস্তিনি নয়; তারা আদতে আরব সংস্কৃতি ও লেবাস ছিনিয়ে নিয়ে নিজেরা ফিলিস্তিনি বলে দাবী করছে।

এডওয়ার্ড সাঈদ : আমরা তো সব সময়ই তাই করি! [ব্যাঙ্গাত্মক হাসি]

সালমান রুশদী : অই আর্টিকেলে আরো বলা হয়েছিল, ফিলিস্তিনিরা আরবের সাধারণ মানুষ নয় বরং উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের পোষাকের অনুকরণ করে। অই আর্টিকেলের মার্কিন লেখিকা শ্যারন চার্চারের প্রতি নির্দেশ করে আপনি লিখেছিলেন, 'গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে অই মহিলা একটি ভাড়াটে ফ্যাশন ম্যাগাজিনের একজন ভাড়াটে লেখিকা।' এরপর আপনি বলেছেন শ্যারন চার্চারের মিথ্যা মন্তব্য ভুল প্রতিপন্ন করতে ফিলিস্তিনের গোড়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হবে। তাহলেই বোঝানো যাবে ফিলিস্তিনিরা যে পোশাক পরে তা কতখানি মৌলিক। কিন্তু ফিলিস্তিনিদের মৌলিকত্ব নিয়ে বার বার অভিযোগ তোলার পর যদি বার বার অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করতে যান তাহলে ব্যাপারটাকে ক্লান্তিকর মনে হবে না?

এডওয়ার্ড সাঈদ : হ্যাঁ তা হবে। কিন্তু তারপরও আমি তা করবো। *'মিডনাইট'স*

চিলড্রেন' উপন্যাসের আদলে ইহা সবকিছু সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত অনুসন্ধানের মতো। আপনি 'মিডনাইট' সম্পর্কে পরিচিত সে কারণে আপনি অতীতে ফিরে যাবার কথা বুঝতে পারবেন। অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করা খুব কঠিন। কারণ দৈনিক পত্র-পত্রিকাগুলো তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে এত ভুল তথ্য দিয়ে রেখেছে যে অতীতের সঠিক তথ্য পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

সালমান রুশদী : কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তো দীর্ঘদিন থেকেই বলা হচ্ছে।

এডওয়ার্ড সাঈদ : আপনি ঠিক বলেছেন। কিন্তু ইসরাইলিরা শক্ত মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে কব্জা করে রাখায় তা হচ্ছে না।

সালমান রুশদী : আপনি ফিলিস্তিনিদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। ফিলিস্তিনিদের মিডিয়া অপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আপনি ফিলিস্তিনিদের সমালোচনা করেছেন।

এডওয়ার্ড সাঈদ : ঠিক তাই। একটা আজব ব্যাপার হলো ১৯৪৮ সালের পর থেকে যত ফিলিস্তিনি লেখকের লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার বেশির ভাগের মধ্যেই দেখা যায় তারা যেন আশঙ্কা করছেন যে তারা তাদের দেশ হারিয়ে ফেলছেন। তাদের লেখার মধ্যে ফিলিস্তিনের শহরগুলোর এমনভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যেন ফিলিস্তিনি এক জেলখানা যেখানে এখনই কোন কয়েদিকে জেরা করতে হবে। ফিলিস্তিনিরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার পর লক্ষ্যণীয়ভাবে ফিলিস্তিনি সাহিত্যে আকাল পড়ে। অবশ্য পঞ্চাশের দশক থেকে ষাটের দশকে আবার তা জেগে উঠতে শুরু করে। কিন্তু তাদের এই সাফল্যের মধ্যে এমন একটি বই আপনি পাবেন না যাতে ফিলিস্তিনির সঠিক ইতিহাস বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। অথচ তারা অনেক সময় পেয়েছেন– কিন্তু তারা শুধু তাদের লেখায় প্রতিপক্ষের সমালোচনাই করেছেন। কাজের কাজ কিছুই করেন নাই। এ সুযোগে ইসরাইলিরা তাদের সব তল্পীতল্পা সরিয়ে ফেলেছে। ১৯৮২ সালে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ প্যালেস্টাইন রিসার্চ সেন্টারের সব তল্পীতল্পা তেল আবিবে নিয়ে যায়, যে ঘটনা আমাকে দারুণভাবে মর্মাহত করেছিল।

সালমান রুশদী : সাহিত্যের প্রসঙ্গে আপনি বলেছেন ফিলিস্তিনিরা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ার কারণে ফিলিস্তিনি লেখকদের লেখায় তাদের জন্মভূমির বিস্তারিত বিবরণ ও ইতিহাস অনুপস্থিত। ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে তা কি খুব বড় বাধা?

এডওয়ার্ড সাঈদ : হ্যাঁ। ফিলিস্তিনের বিভিন্ন বিষয় রয়েছে যেগুলোকে ইতিহাসের একটি কোষে সংকলিত করা সম্ভব নয়। ফিলিস্তিনের ইতিহাস লিখতে হলে অবশ্যই লেবাননে অবস্থানরত শরণার্থী ফিলিস্তিনি অথবা সীমানাবর্তী উদ্বাস্তুদের ইতিহাসও লিখতে হবে। এইখানে মূল সমস্যা। কেবল এককভাবে ফিলিস্তিনের বর্ণনা দিলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ফিলিস্তিনের ইতিহাস লিখতে হলে তার অস্থির সময়কে নির্দেশ করতে হবে, ফিলিস্তিনিদের দেশ ছাড়া বা দেশে ফেরা সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। *'মিডনাইটস চিলড্রেন'* উপন্যাসে এ দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুটা চেষ্টা করা হয়েছে।

সালমান রুশদী : আপনি কিছুক্ষণ আগে 'পেসোপটিমিস্ট' বা 'নৈরাশ্যব্যঞ্জক আশাবাদী' লেখককে এমন এক ফর্মের লেখক বলেছেন যার কোন ফর্ম নাই। এবং যাকে আপনি অস্থিরতাপূর্ণ পরিস্থিতির আয়না বলে চিহ্নিত করেছেন। তাদের বিষয়ে আরেকটু বিস্তারিত কিছু বলবেন কী?

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড সাঈদ : এটা উৎকেন্দ্রীক দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছি। আমি নিজে ফিলিস্তিনি পণ্ডিত নই এবং আরবী সাহিত্যের তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞও নই।

কিন্তু কানাফানি'র লেখা উপন্যাস *'মেন ইন দ্য সান'* সবাইকে মুগ্ধ করেছে দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। তার উপন্যাসের রচনাশৈলী এবং কাহিনীর মধ্যে সময়ের অনিশ্চয়তাকে নির্দেশ করা হয়েছে। তার উপন্যাসের একটি অংশ 'হাইফায় প্রত্যাবর্তন'-এ একটা পারিবারিক কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। কাহানীতে দেখানো হয়েছে ১৯৪৮ সালে দেশছাড়া একটি পরিবার রামাল্লায় ফিরে আসে। এর বহুদিন পরে অই পরিবার আবার হাইফায় তাদের পুরানা বাসস্থান দেখার জন্য ফিরে যায় এবং তাদের হারিয়ে যাওয়া পোলাপানদের খোঁজ করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় অই পরিবার হাইফায় তাদের ছোট ছেলেকে ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় যে পরকালে হাইফায় একটি ইহুদি পরিবারের আশ্রয়ে বেড়ে ওঠে। এ গল্পে কানাফানি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু ছাড়াই গুলিয়ে ফেলেছেন।

সালমান রুশদী : যাক, এবার আমরা আপনার লেখা *'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই'* সম্পর্কে একটু দীর্ঘ আলোচনা করব। ফিলিস্তিনি মহিলাদের অপ্রকাশিত কথা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আপনার এ বইটিতে। আপনি লিখেছেন 'এবং আমি লক্ষ্য করলাম ফিলিস্তিনের অসংখ্য মৌলবাদী সমস্যার মধ্যে একটি হলো সার্বিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অনুপস্থিতি। অল্প কিছু মহিলা ছাড়া ফিলিস্তিনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের অবস্থান দাড়ি, কমা, হাইফেনের মত। যতক্ষণ না আমরা আমাদের সমাজে নারীদের একটি বুদ্ধিবৃত্তিক, সচেতন ও মূল পথে না আনতে পারব ততক্ষণ আমরা আমাদের ক্ষমতাহীনতার বিষয় উপলব্ধি করতে পারব না।' বক্তব্যের তাফসীর হিসেবে আপনি ফিলিস্তিনের তরুণ চিত্র পরিচালক মাইকেল ক্লিফির ছবি *'দি ফার্টাইল মেমোরি'র* কথা উল্লেখ করেছেন। অই ছবিতে দু'জন ফিলিস্তিনি নারীর অভিজ্ঞতাকে চিত্রায়িত করা হয়েছে।

এডওয়ার্ড সাঈদ : হ্যাঁ, অই ছবি আমাকে খুবই আন্দোলিত করেছে। অই ছবির আকর্ষণীয় দৃশ্যগুলোর মধ্যে একটি দৃশ্যে একজন বৃদ্ধার অভিজ্ঞতা দেখানো হয়েছে। অই মহিলা আদতে পরিচালক ক্লিফির চাচী হন। নাজারাতে অই মহিলার একখণ্ড জায়গা আছে। সেখানে একটি ইহুদি পরিবার দীর্ঘদিন ধরে ভাড়া থাকেন। কিন্তু একদিন সেই মহিলার মেয়ে ও জামাই এসে তাকে খবর দিল যে অই ইহুদি পরিবার এখন জায়গাখানি কিনে নিতে চায়। মহিলা সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন অই প্রস্তাবে তিনি রাজি নন। কিন্তু তার মেয়ে-জামাই বললো 'আম্মাজান, আপনি কী বলছেন? তারা সেখানে দীর্ঘদিন ধরে আছে অতএব এ জায়গা তাদেরই। বরং তারা দয়া করে আপনাকে জমির দাম দিয়ে ব্যাপারটাকে সহজ করতে চাচ্ছে।' কিন্তু বৃদ্ধা বললেন, 'না আমি কোনভাবেই তাদের প্রস্তাবে রাজি নই।' ছবিতে ক্লিফি তখন অই মহিলার আইনি অজ্ঞতা প্রসূত অসহায়তা দেখিয়েছেন। ছবিতে মহিলা বলেছেন, 'জমিখান এখন আর আমার নাই। কিন্তু কে জানতো এমন হবে? আমরা এক সময় এখানে (নাজারাতে) ছিলাম, তারপর ইহুদিরা এখানে এলো, তাদের পর আরও ইহুদি এলো। আমি এ জমির মালিক ছিলাম, এখন নাই কিন্তু জমি ঠিকই আছে। মানুষ আসে, যায়– কিন্তু জমি আগের জায়গাতেই থেকে যায়।' অই বৃদ্ধা তার পুরানা জমি দেখতে যায়। লেবাননে গিয়ে মরে যাবার আগে ১৯৪৮

www.pathagar.com

সালে বৃদ্ধার স্বামী তাকে এই জমি দিয়ে গিয়েছিল। ক্লিফি চমৎকার ভাবে অই জমির ওপরে বৃদ্ধার অসহায় পায়চারি করার দৃশ্য দেখিয়েছেন। এ সেই জমি যার ওপর অই বৃদ্ধার মধ্যে এক মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন দেখিয়েছেন ক্লিফি। তিনি দেখিয়েছেন, বৃদ্ধা অবশেষে বুঝতে পারলেন তার অজ্ঞতার কারণেই আজ তিনি মালিক হয়েও জমির মালিকানা দাবী করতে পারছেন না। ছবির এ দৃশ্যকে ফিলিস্তিনি নারীদের বাস্তব অবস্থার সচিত্র প্রতিচ্ছবি মনে হয়েছে। ফিলিস্তিনিরা তাদের অজ্ঞতার কথাও স্বীকার করে না। আরব সমাজে নারী বিদ্বেষী মনোভাব তীব্রভাবেই রয়েছে। তারা মহিলাদের সমাজে সম্মানজনক উত্থানকে ভয় পায়। আমার মনে পড়ছে একবার আমি আর আমার এক দোস্ত একটা চিত্র প্রদর্শনীতে গিয়েছিলাম। প্রদর্শনীর একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছিল হাস্যোজ্জ্বল এক নারী বুকে হাত বেধে দাঁড়িয়ে আছে। আমার দোস্ত স্বভাবসুলভ ভাষায় তার পরস্পর মতাদর্শ বিরোধী মন্তব্য করে বললো, 'তিনি একজন ফিলিস্তিনি মহিলা, কুৎসিত প্রগতিবাদী মহিলা।' আমার মনে হলো জ্যঁ মোরের আঁকা অই ছবি যেন এমন কিছু বলতে চাচ্ছে যা আমরা বুঝতে পারছি না।

সালমান রুশদী : *আফটার দ্য লাস্ট স্কাই*'র ভেতরে আপনি বলেছেন, দীর্ঘদিন পশ্চিমা সংস্কৃতির মধ্যে বাস করার পর আপনি বুঝতে পেরেছেন একজন অ-ইহুদি ভাবতেই পারে না ইহুদিদের ইহুদিবাদী ক্ষমতা কত। আপনি এই জিওনিজমের ক্ষমতাকে একটি 'স্লো এ্যান্ড স্টেডি প্রসেস' বলে অভিহিত করেছেন যা ইহুদি বিরোধী যে কোন কার্যক্রমের চেয়ে অনেক কার্যকর ও শক্তিশালী।

আপনার ভাষায় প্রধান সমস্যা হল, ইহুদিদের বিরোধিতা করা হলে তার বিরুদ্ধে ফিলিনশীয় আরব বিরোধিতার অভিযোগ আনা হচ্ছে। অর্থাৎ কেউ যদি 'এন্টি-জিওনিস্ট' হয় তাকে বলা হচ্ছে 'এন্টি-সেমিটিক'। আপনি আপনার এই বই এবং *'দি কোয়েশ্চেন অব প্যালেস্টাইন'* বইয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেই ইহুদিবাদীতার খোলা সমালোচনা করেছেন। এ বিষয়ে যদি কিছু বলেন–

এডওয়ার্ড সাঈদ : আমার দিক থেকে কথা হচ্ছে 'জিওনিজম' হলো এ অঞ্চলের হালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যাচাইয়ের কষ্টি পাথর। আপনি অনেক লোক পাবেন যারা জাতি বিদ্বেষসহ মধ্য আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের খবরদারির বিরোধিতা করে, কিন্তু তাদের মধ্যে আপনি এমন কাউকে পাবেন না যে ইহুদিবাদীতার সমালোচনা করে বা বলে ইহুদিবাদীতা ফিলিস্তিনিদের জন্য কতটা ক্ষতিকর। আপনি যদি নির্যাতনের শিকার কোন ফিলিস্তিনির পক্ষ নেন তাহলে দেখবেন কোন না কোন ইহুদি অথবা তার সংগঠন আপনাকে এমনভাবে উপস্থাপন করবে যাতে আপনি নিজেই তাদের শিকার হয়ে যাবেন। আপনার কোন উপন্যাসের কমেডি চরিত্রের মত আপনাকে 'ভিকটিম অব দ্য ভিকটিম' বানানো হবে। আর এখন একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ইসরাইল বিরোধী যে কোন বই অথবা কলামকে তারা 'এন্টি-সেমিটিজম' বলে নিন্দা করা শুরু করেছে। 'এন্টি-সেমিটিজম' শব্দটাকে তারা এখন ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। বিশেষ করে আপনি আরব অথবা মুসলিম সমাজের কেউ হয়ে যদি যুক্তরাষ্ট্রে বসে ইসরাইলের কোন কুকীর্তির নিন্দা করেন তাহলে তারা আপনাকে ইউরোপীয় অথবা পশ্চিমা এন্টি-সেমিটিজমের চর বলতে দ্বিধা করবে না। এখন সময় এসেছে সত্যিকার ইতিহাস পর্যালোচনা করবার।

www.pathagar.com

সময় এসেছে ইহুদিবাদীতার গোড়াপত্তন এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি তাদের মনোভাব নজরে আনবার।

সালমান রুশদী : কিন্তু সমস্যা হল 'ইহুদিবাদ' বিষয়টি এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে এখন তার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা মুশকিল। আপনি কী ভেবে দেখেছেন গেলো বছরগুলোতে 'জিওনিজম' শব্দটি এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেন তা যে কোন সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে?

এডওয়ার্ড সাঈদ : গত ১০ বছরে আমি অনেক ইহুদি'র সঙ্গে কথা বলেছি যারা তাদের সম্পর্কিত অন্যদের ধারণা বদলাতে আগ্রহী এবং ষাটের দশকে ইহুদিদের চরম উত্থান ও ইহুদিবাদ বিষয়ে অস্বস্তিবোধ করে।

সালমান রুশদী : আপনাকে কয়েকটি একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনি বলেছেন, মুসলিম কালচার থেকেই ফিলিস্তিনি হবার বাসনা জাগ্রত হয়েছে এবং ঘটনাক্রমে আপনি একজন অমুসলিম। এটাকে কি আপনি কোন সমস্যা হিসেবে দেখছেন? এ ক্ষেত্রে কী কোন ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব রয়েছে?

এডওয়ার্ড সাঈদ : আমি আমার ক্ষেত্রে বলতে পারি আমার কোন অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের অভিজ্ঞতা নাই। আমার ধারণা লেবাননের শরণার্থী ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে আমাদের ব্যাপক তফাৎ রয়েছে সেখানে সুন্নী-শিয়া উদারপন্থী-মৌলবাদীদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ হয়। আমাদের এখানেও হয় সেটা অন্য রাজনৈতিক কারণে ধর্মীয় কারণে নয়। ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবোধ আপনাকে এমন একটি স্বতন্ত্র চেতনায় জাগ্রত করবে যা আসলে কোন মুসিবত নয়, বরং উপহার। বিশ শতকে আরব দুনিয়াসহ অনেক জায়গার অনেক জাতি তাদের স্বতন্ত্র পরিচয়কে নিজেরাই ধ্বংস করে ফেলেছে।

সালমান রুশদী : আপনি লিখেছেন, 'আমাদের ওপর পতিত দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে আমাদের এক বিশাল অংশের ফিলিস্তিনি জনগণ অতীষ্ট হয়ে পড়েছে। এই দুর্ভাগ্যের জন্য কিছুটা দায়ী আমাদের নিজস্ব ভুল, কিছু অংশ সৃষ্টি করেছে আগ্রাসী শক্তি এবং কিছু অংশ তৈরি হয়েছে আমাদের কৌশলগত ত্রুটির জন্য অর্থাৎ হয় আমরা আমাদের মিত্রদের একত্রিত করতে ব্যর্থ হয়েছি নয়তো আমরা শত্রু দমন করতে ব্যর্থ হয়েছি। এসব কারণেই আমাদের ওপর এত মুসিবত পতিত হয়েছে। ফলে ফিলিস্তিনের অধিকাংশ লোকই এখন উদ্ভ্রান্ত, কিন্তু আশার কথা– আমি একজন ফিলিস্তিনিও পাই নাই যে হতাশায় ভেঙে মুষড়ে পড়েছে।'

এডওয়ার্ড সাঈদ : একদম সত্যি কথা!

সালমান রুশদী : আপনার আগের তিনখানি বইয়ে পশ্চিমা ও প্রাচ্যের সংস্কৃতিগত বাহ্যিক ব্যবধান দেখিয়েছেন কিন্তু *'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই'*তে ফিলিস্তিনিদের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে বলে মনে হয়। আপনি বলেছেন, ফিলিস্তিনিরা বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে কৌতূহল গুটিয়ে নিয়ে এখন তাদের আত্মপরিচয়ের দিকে ঝুঁকছে। কেন? এ সম্পর্কে আপনার নিজের কী ধারণা?

এডওয়ার্ড সাঈদ : ভালো কথা। এখন ফিলিস্তিনিদের মোহমুক্তির পর্যায়। আমার প্রজন্মের অনেক লোকই প্রবল দুঃখের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন। কিন্তু ষাটের দশকের শেষে এবং সত্তরের প্রথম দিকে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে নবজাগরণ খেয়াল করা যায়। বাইরের

www.pathagar.com

দিকে এই জাগরণ তেমন কোন সুফল বয়ে আনে নাই; এ জাগরণে কোন অধিকৃত জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। তবে, ফিলিস্তিনি জাগরণকে আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান বলে অনেকে অপব্যাখ্যা দিয়েছে। কিন্তু এখন তাদের সেই মোহমুক্তি ফিলিস্তিনিদের মধ্যে প্রশ্নের উদ্রেক করছে, 'আমি কে? আমরা ফিলিস্তিন ছেড়ে কোথায় যাব?' আমি এই বিষয় নিয়েই *'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই'* লিখেছি।

সালমান রুশদী : আপনার বইয়ের কভারে ছাপা জঁ্য মোরের তোলা ছবিটি সত্যিই ব্যতিক্রম। ভাঙা চশমা চোখে একজন ফিলিস্তিনি– আপনি বলেছেন লোকটির ডান চোখ গুলিতে নষ্ট হয়ে যায়– কিন্তু সে জেনেছে কিভাবে এক চোখে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। গুলিতে আহত ছবির লোকটি এখনও হাসছে।

এডওয়ার্ড সাঈদ : জঁ্য মোর আমাকে বলেছেন, লোকটি তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ছেলেকে দেখতে যাবার পথে ছবিটি তোলা হয়েছিল।

লেখাটি সালমান রুশদী'র 'ই হোমল্যান্ড' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত এবং অনূদিত

www.pathagar.com

দি প্রোগ্রেসিভ পত্রিকার সাথে এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের কথোপকথন

মূল : ডেভিড বার্সামিয়ান*
অনুবাদক : সালমা রহমান শুভ্রা

শহুরে সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ও কৃত্রিমতায় ভরপুর নিউইয়র্কবাসীদের মাঝে এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। নিউইয়র্ক শহরের প্রতি তার দরদ সহজেই বোধগম্য। তার ভাষায় এই শহরটি তাকে আজকের সাঈদ হয়ে ওঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে তিনি যে ধরনের সমালোচনা ও বিশ্লেষণে অভ্যস্ত তার পেছনে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেছে এই শহর। ঐ শহরের বিরামহীন কর্মশক্তি আর বৈচিত্র তিনি যেন নিজের ভেতরে অনুভব করেন। সাহিত্যের প্রতি তীব্র অনুরাগী আর রাজনীতির প্রতি চির উৎসাহী সাঈদের নাটক ও ধ্রুপদী সঙ্গীতের ব্যাপারের অসীম আগ্রহ। মার্জিত রুচিসম্পন্ন পিয়ানিস্ট সাঈদের নিউইয়র্কের আপার ওয়েস্ট সাইডের বাড়িটি যেন বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা লেখক, শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞদের স্বর্গরাজ্য।

১৯৬৩ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পর থেকে তিনি নিউইয়র্কের স্থায়ী বাসিন্দা। জেরুসালেমে জন্ম নেওয়া এই মানুষটির স্কুল জীবন কেটেছে সেখানে ও মিসরের রাজধানী কায়রোয়। ১৯৫০-এর দশকের প্রথমভাগে সাঈদ যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। সেখানে প্রিন্সটন ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি লেখাপড়া করেছেন। ইদানিং অনেকেই বুদ্ধিজীবী মহলে হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ার মতো উদয় হন। এদের অধিকাংশই খুব বেশিদিন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন না। সাঈদ এদের থেকে ভিন্ন। তিনি একজন সত্যিকারের বুদ্ধিজীবী। তার গঠনমূলক মেধা আর সক্ষমতার সাথে যুক্ত হয়েছে প্রচণ্ড আবেগ। ভণ্ডামী, পরস্পরবিরোধিতা ও রাজনৈতিক বিবৃতিতে অসমতা, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতাদের মর্যাদাহীন অবস্থান তাকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। কোন সন্দেহ নেই যুক্তরাষ্ট্রে ফিলিস্তিন স্বার্থের প্রশ্নে সবচেয়ে সোচ্চার মুখপাত্র হলেন সাঈদ।

সাঈদের কর্মতৎপরতা আর আগ্রহের ব্যাপকতা যে কাউকে মুগ্ধ করবে। লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত এই মানুষটি কঠোর নিয়ম মেনে জীবন যাপন করলেও অদম্য আগ্রহ নিয়ে বিরামহীন কাজ করে যাচ্ছেন। দু'হাতে লিখেছেন তিনি। তার সর্বশেষ প্রকাশিত বই '*রিফ্লেকশনস অন এক্সাইল*' ও '*পাওয়ার, পলিটিক্স, এন্ড কালচার*'। তার অধিকাংশ রাজনৈতিক লেখা ফিলিস্তিনিদের সম্পর্কে ভুলে যাওয়া স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনার

www.pathagar.com

পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যে তাদের যৌক্তিক অবস্থানকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। শুধু তাই নয় মধ্যপ্রাচ্যে কিভাবে শান্তি ফিরিয়ে আনা যায় সে সম্পর্কেও ভবিষ্যত নির্দেশনা দিয়েছেন সাঈদ।

বেশ কয়েক বছর ধরে আমাদের মাঝে বহুবার কথোপকথন হয়েছে। তার যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছে সেটা হলো তার অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মশক্তি, এবং, হ্যাঁ, অবশ্যই তার অনর্গল কথা বলার দক্ষতা। তার আশার পরিধি আকাশ সমান। অবস্থান পরিবর্তন, বিবেচনা, সমালোচনা এবং বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির ওপর পছন্দ-অপছন্দের ভার ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি। তিনি এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখেন যেখানে স্বার্থকে পণ্য করে তোলা হবে না এবং যা বাণিজ্যিক লক্ষ্যে পরিচালিত হবে না, বরং যেখানে মানবতার জয় হবে। তার ভাষায়, সেখানে মানুষের বেঁচে থাকা ও এর স্থায়ীত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে মানবিকতার পথ ধরে পরিমিতির মধ্য দিয়ে। এসব লক্ষ্য অর্জনের পথ বন্ধুর হলেও তা অর্জন করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন সাঈদ। ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর টেলিফোনে তার এই সাক্ষাৎকারটি গৃহীত হয়।

প্রশ্ন : ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা অনেক মার্কিনিকে হতবাক করেছে। ঐ হামলার ব্যাপারে আপনার অনুভূতি কি ছিল?

সাঈদ : একজন নিউইয়র্কবাসী হিসেবে আমি নিজেও এই ঘটনায় স্তম্ভিত। আমার মনে হয়েছে এটা রীতিমত বিভীষিকাময় একটি ঘটনা। বিশেষ করে এর ব্যাপকতা ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো। গোড়া থেকে ভাবলে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে নিরাপরাধ মানুষের ক্ষতি করার দুর্দমনীয় আকাঙ্খা থেকে। এখানে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে প্রতীককে, অর্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র যা মার্কিন পুঁজিবাদের হৃৎপিণ্ড এবং পেন্টাগনকে যা মার্কিন সামরিক স্থাপনার প্রধান কার্যালয়। তবে এটা কতোটা যৌক্তিক তা প্রশ্নসাপেক্ষ। এটা কোন ব্যর্থ আলোচনার প্রেক্ষাপটে ঘটেনি। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে কাউকে কোন বার্তাও পৌঁছানো হয়নি। এই ঘটনা নিজেই নিজেকে সংজ্ঞায়িত করেছে যা অস্বাভাবিক। রাজনৈতিক ধ্যানধারণা থেকে উৎসারিত হলেও এর সমাপ্তি ঘটেছে অদ্ভুত এক জটিল দার্শনিকতার মধ্য দিয়ে। এই ঘটনার পেছনে এমন এক দুষ্ট মনোভাব কাজ করেছে যা কোন ধরনের আলোচনা, রাজনৈতিক সংগঠন ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর ব্যাপারে মোটেও আগ্রহী ছিল না। এই ঘটনা ছিল শ্রেফ রক্তপিপাসু মনের ধ্বংসলীলার আকাঙ্খা যার জন্য কোন কারণের প্রয়োজন হয় না। লক্ষ্য করুন কেউ কিন্তু এই হামলার দায়দায়িত্ব স্বীকার করেনি, এ ব্যাপারে কোন দাবি করা হয়নি, কোন বিবৃতিও দেওয়া হয়নি। এটি ছিল সন্ত্রাসবাদের এমনই এক নিরব অংশ। এর সাথে কোন ঘটনারই কোন সম্পর্ক নেই। এই ঘটনা এমন এক বাস্তবতার দিকে আমাদের ধাবিত করে যে বাস্তবতা গোলমেলে বিমূর্ত ধারণা আর পৌরাণিক কাহিনীতে ভরা। ঐ বাস্তবতায় এমনসব লোকজন বসবাস করে যারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ইসলামকে অপহরণ করেছে। ঐ ফাঁদে পা না দেওয়া এবং পাল্টা হামলা চালিয়ে এর প্রত্যুত্তর দেওয়ার চিন্তা থেকে দূরে থাকা জরুরি।

প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্রের এখন কি করা উচিত?

সাঈদ : এই ভয়ঙ্কর ঘটনার যথার্থ জবাব হবে যতো দ্রুত সম্ভব বিশ্ব সম্প্রদায় অর্থাৎ

www.pathagar.com

জাতিসংঘের কাছে যাওয়া। আন্তর্জাতিক আইনের শাসনকে প্রাধান্য দিতে হবে। তবে সম্ভবত ইতোমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে, কারণ যুক্তরাষ্ট্র কখনোই আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনি। দেশটি বরাবরই একক সিদ্ধান্তে কাজ করেছে। আমরা কোনো কোনো দেশকে নিশ্চিহ্ন করে দেব কিংবা সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করবো এবং দীর্ঘ সময় ধরে ও বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করে এই যুদ্ধ চলবে- এসব কথা বলা এমন এক জটিলতর সংঘাতময় পরিস্থিতির ইঙ্গিত দিচ্ছে যার জন্য অধিকাংশ মার্কিনি প্রস্তুত নয় বলে আমি মনে করি। এ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট কোন লক্ষ্য আমার চোখে পড়ছে না। ওসামা বিন লাদেনের সংগঠন তার নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়েছে এবং সম্ভবত এখন তারা তার নির্দেশের অপেক্ষা না করেই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। দৃশ্যপটে আরো অনেকেই এখন উদয়-পুনরোদয় হবে। সে কারণেই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের আরো সুনির্দিষ্ট, আরো সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত, আরো ধৈর্য্যের সাথে পরিকল্পিত প্রচারণা চালাতে হবে। এর পাশাপাশি সন্ত্রাসীদের অবস্থান ও সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ সম্পর্কে জরিপ চালাতে হবে। এসব কারণ খুঁজে বের করা সম্ভব।

প্রশ্ন : সন্ত্রাসবাদের এসব অন্তর্নিহিত কারণ কোনগুলো?

সাঈদ : এসব সমস্যার সূত্রপাত মুসলিম বিশ্বের, তেল উৎপাদনকারী বিশ্বের, আরব বিশ্বের, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের সংশ্লিষ্টতা থেকে। এসব এলাকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ও নিরাপত্তাজনিত কারণে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। ঐ এলাকাগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা খুবই স্পষ্ট যা অধিকাংশ মার্কিনি হয় এড়িয়ে যেতে চায়, নয়তো তারা এসব বিষয় সম্পর্কে মোটেও সচেতন নয়।

মুসলিম বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে দুই বিপরীতধর্মী মনোভাব রয়েছে। একদিকে তাদের ধারণা যুক্তরাষ্ট্র অনন্য সাধারণ একটি দেশ। আমি যতোজন আরব কিংবা মুসলমানকে চিনি তারা প্রত্যেকেই যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে দারুণ আগ্রহী। এদের অনেকেই লেখাপড়ার জন্য সন্তানকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠায়, অনেকেই যায় ছুটি কাটাতে, যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা করে কিংবা এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নিতে আসে অনেকেই। আরেকদিকে যুক্তরাষ্ট্রকে দেখা হয় সামরিক শক্তিসমৃদ্ধ ও আগ্রাসনকারী একটি দেশ হিসেবে যে দেশটি ১৯৫৩ সালে ইরানের জাতীয়তাবাদী মোসাদ্দেক সরকারকে উৎখাত করেছিল, যে দেশটি প্রথমে উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং পরে ইরাকের বেসামরিক নাগরিকদের ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্তকারী নিষেধাজ্ঞা আরোপের সাথে জড়িত ছিল, যে দেশটি ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলকে সমর্থন দিচ্ছে।

ঐ এলাকার অধিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের এই ভূমিকাকে দেখে তাদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরানোর প্রচেষ্টা হিসেবে এবং তাদের আশা-আকাঙ্খার প্রতি এটা এক ধরনের দুষ্পরিবর্তনীয় বিরোধিতাও বটে। অধিকাংশ আরব ও মুসলিম বোঝেন যে যুক্তরাষ্ট্র তাদের আশা-আকাঙ্খার প্রতি সত্যিই মনোযোগ দেয়নি। তারা মনে করে নিজেদের স্বার্থেই যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে নিজস্ব এমন এক নীতি তৈরি করেছে যা গণতন্ত্র, স্বনির্ভরতা, কথা বলার স্বাধীনতা, একত্রিত হওয়ার স্বাধীনতা, আন্তর্জাতিক আইন অর্থাৎ যেসব বিষয়কে যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের নীতির ভিত্তি হিসেবে দাবী করে সেগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা

ইসরায়েল গত ৩৪ বছর ধরে দখল করে রেখেছে। অথচ এই দখলদারিত্বের যুক্তিযুক্ত কোনো ব্যাখ্যা নেই। ঐ এলাকায় ১৪০টি বসতিতে ৪০,০০০ মানুষকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে যথোপযুক্ত কোনো কারণ না দেখিয়েই। ইসরায়েলের এসব তৎপরতা যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ও অর্থে পুষ্ট। তাহলে কিভাবে বলা সম্ভব যে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের প্রস্তাবনাগুলো সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল? এসব ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রকে সিজোফ্রেনিয়া আক্রান্ত রোগী হিসেবে চিত্রিত করছে।

এবার আমরা তাকাই আরব বিশ্বের সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনাবলীর দিকে। আরব শাসকরা আক্ষরিক অর্থেই জনপ্রিয়তাহীন। দেশের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা তাদের ওপর চেপে বসে আছে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন নিয়ে। সহিংসতা চালিয়ে জনসমর্থনহীন নীতি গ্রহণ করে এরা ক্ষমতায় টিকে আছে। এর ফলে বিশেষ করে যারা ধর্মকে ব্যবহার করে, এখানে ইসলামকে, তাদের সামনে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের ডাক দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং তারা বলছে যে যেভাবেই হোক যুক্তরাষ্ট্রকে পর্যুদস্ত করতে হবে।

পরিহাসের ব্যাপার হলো ওসামা বিন লাদেনসহ মুজাহিদিনদের অনেকেই আসলে তৈরি হয়েছে ১৯৮০-এর দশকের প্রথমভাগে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনীকে হটানোর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্রয়ে। ঈশ্বরবিহীন কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে ইসলামকে প্ররোচিত করতে পারলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধাক্কা খাবে এই উদ্দেশ্য থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের এই চাল সফলও হয়েছিল। ১৯৮৫ সালে মুজাহিদিনদের একটি দল ওয়াশিংটনে আসে এবং তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান 'মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে সম্বোধন করে তাদের স্বাগত জানান। এরা কোনোভাবেই ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে না। এরা ইমাম কিংবা শেখ নয়। এরা হলো ইসলামকে রক্ষার নামে স্বপ্রণোদিত ধর্মযোদ্ধা। সৌদি বংশোদ্ভূত ওসামা বিন লাদেন নিজেকে একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে দাবি করে, কারণ সৌদি আরবে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য রয়েছে। নবী মোহাম্মদের জন্মভূমি হিসেবে ঐ এলাকাটি মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র হিসেবে বিবেচিত। এদের মধ্যে আরেকটি বোধ বেশ প্রবল, সেটা হলো আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করেছি, সুতরাং আমরা যুক্তরাষ্ট্রকেও পরাজিত করতে পারবো। অনমনীয়তা ও ধর্মীয় উন্মাদনা থেকে সৃষ্ট এই মনোভাব এদের মধ্যে ক্ষতি ও আঘাত করার সুতীব্র আকাঙ্খার জন্ম দিয়েছে। সেখানে নিরাপরাধ ও সংশ্লিষ্টতাহীন মানুষকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই বলে নিউইয়র্কে এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এই মনোভাবকে বুঝতে হবে এবং অবশ্যই একে অবহেলা করা যাবে না।

যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি ভীত করে সেটা হলো কেউ যদি ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আবেগতাড়িত না হয়ে এসব বিষয়ে কথা বলতে যায় তবে তাকে দেশের প্রতি মমত্বহীন বলে বিবেচনা করা হবে এবং তাকে একঘরে করে ফেলা হবে। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে বৈশ্বিক বাস্তবতা বুঝতে হবে, বুঝতে হবে আমরা কোন ইতিহাসের অংশ এবং কিভাবে আমরা সুপার পাওয়ার হয়ে উঠেছি।

প্রশ্ন : কোনো কোনো পণ্ডিত ও রাজনীতিক তো কুর্টজের মন্তব্যের প্রতিধ্বণি করেছেন।

www.pathagar.com

কুর্টজ তার '*হার্ট অফ ডার্কনেস*' বইয়ে বলেছিলেন 'সব পশুদের বধ করতে হবে'।

সাঈদ : ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পরবর্তী ক'দিন আমি এই ধরনের দুঃখজনক মনোভাব লক্ষ্য করেছি। সব জায়গায় ঐ একই ধরনের বিশ্লেষণ চোখে পড়েছে এবং এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ, বিশ্লেষণ ও প্রতিফলনের কোনো সুযোগই ছিল না। এখানে সবচেয়ে উদ্বেগজনক ব্যাপার হলো ঘটনার বিশ্লেষণ ও ভিন্নমত প্রতিফলনের অনুপস্থিতি। যেমন ধরুন, 'সন্ত্রাসবাদ' শব্দটি এখন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এর সমার্থক হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করা এবং শেষ পর্যন্ত তা দেশের প্রতি মমত্ববোধহীনতার সাথে সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের সমীকরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সন্ত্রাসবাদকে আরো সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে যাতে আমরা সহজেই নির্ধারণ করতে পারি কোনটি সন্ত্রাসবাদ আর কোনটি নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইসরায়েলি আগ্রাসন ও সন্ত্রাসবাদ রুখকে ফিলিস্তিনিরা যা করছে তার সাথে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের ওপর হামলার ঘটনাকে কোনোভাবেই যেন এক কাতারে ফেলা না হয়।

প্রশ্ন : এই দু'টি বিষয়ের মাঝে আপনি কি পার্থক্য দেখতে চাচ্ছেন?

সাঈদ : গাজায় জঘণ্যতম পরিস্থিতির মাঝে বসবাসকারী এক তরুণের কথাই ধরুন যে পরিস্থিতির অনেকটাই ইসরায়েলের সৃষ্টি। ঐ তরুণটি ইসরায়েলিদের ভিড়ে মিশে গিয়ে শরীরে বেঁধে রাখা বোমার বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। আমি কখনোই এ ধরনের ঘটনাকে সমর্থন দেই না। তবে ঐ ঘটনা থেকে এটা অন্তত বোঝা যায় যে তরুণটি নিজের চারপাশে প্রতিনিয়ত অন্য ফিলিস্তিনিদের, নিজের মা-বাবাকে, ভাইকে, বোনকে কষ্ট পেতে, আঘাত পেতে নয়তো মরে যেতে দেখছে নিজের জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হওয়া তার জন্য খুবই স্বাভাবিক এবং এ কারণে মরিয়া হয়ে সে এ ধরনের চরম সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। পাল্টা আঘাত করার জন্য কিছু না কিছু করা তার জন্য জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। অনিয়মতান্ত্রিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত করার মরিয়া প্রচেষ্টা হিসেবে এ ধরনের তৎপরতাতে সহজেই আলাদা করে চেনা যায়। আমি এ ধরনের তৎপরতার সাথে একমত না হলেও অন্তত সেটা বোঝার চেষ্টা করি।

কিন্তু যারা বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে তাদের কথা আলাদা। এরা ঐ ধরনের কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়নি এবং এরা বস্তিবাসী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশ নয়। এরা এসেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে, ইংরেজি বলার মতো শিক্ষা এরা পেয়েছে, এরা বিমান চালনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাওয়ার, যুক্তরাষ্ট্রে আসার ও ফ্লোরিডায় বসবাস করার সামর্থ রাখে।

প্রশ্ন : *কভারিং ইসলাম*-এর সর্বশেষ সংস্করণের 'আমরা বাকি বিশ্বকে কোন চোখে দেখছি তা মিডিয়া ও বিশেষজ্ঞরা কিভাবে নির্ধারণ করছে ' শীর্ষক ভূমিকায় আপনি বলেছেন ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ সমীকরণ পশ্চিমে বিদেশি সংস্কৃতির বিকৃত উপস্থাপনের সর্বশেষ নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এর মাধ্যমে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন?

সাঈদ : মুসলমানদের ধর্মোন্মাদ, সহিংস, কামাসক্ত, বোধহীন বলে ইসলাম ধর্মকে অন্যদের প্রতি হুমকিস্বরূপ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে সেই ঔপনিবেশিক আমল থেকে, আমি যার নাম দিয়েছি ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যনীতি। মুসলিম বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করার জন্য অন্যদের বোঝা ইউরোপ ও পশ্চিমের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এসব ধ্যানধারণা আজো টিকে আছে কারণ এর মূল প্রোথিত রয়েছে ধর্মের মাঝে যেখানে

www.pathagar.com

ইসলামকে দেখা হয় খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। আপনি যদি যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলের পাঠ্যসূচীর দিকে তাকান তবে দেখবেন এগুলো মুসলিম বিশ্বের সাথে আমাদের দীর্ঘদিনের বৈরিতার কথা স্মরণে রেখে প্রণীত হয়েছে এবং ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট জানার মতো তথ্য এগুলোতে নেই। আপনি যদি দর্শক-শ্রোতাপ্রিয় মিডিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখেন তবে দেখবেন তা আপনাকে '*দি শেখ*' বইয়ের নায়ক রুডলফ ভ্যালেন্টিনোর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। টিভি, চলচ্চিত্র এবং সর্বোপরি সংস্কৃতিও আপনাকে শেখাচ্ছে যে মুসলমান মাত্রই খল চরিত্রের। ইসলাম সম্পর্কে অতিসরলীকৃত সমীকরণে পৌঁছানো খুবই সহজ। এর জন্য আপনাকে যা করতে হবে সেটা হলো *দি নিউ রিপাবলিকান*-এর যেকোনো সংখ্যা পড়া যাতে বলা হয় মৌলবাদের দুষ্টচক্র ইসলামের সাথে সম্পর্কিত, আরব সংস্কৃতি হলো লাম্পট্যের সংস্কৃতি ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। যুক্তরাষ্ট্রে বসে অন্য যেকোনো ধর্ম কিংবা গোষ্ঠী সম্পর্কে এ ধরনের অসম্ভব সব সমীকরণ তৈরি করা হয়।

প্রশ্ন : *লন্ডন অবজার্ভার*-এর সম্প্রতি প্রকাশিত এক নিবন্ধে আপনি মার্কিন যুদ্ধ প্রস্তুতিকে *মবি ডিক*-এর ক্যাপ্টেন আহাবের প্রতিশোধস্পৃহার সাথে তুলনা করেছেন। এর মাধ্যমে আপনি আসলে কি বোঝাতে চাইছেন?

সাঈদ : যার কারণে সে একটি পা হারিয়েছিল সেই সাদা তিমিটা সম্পর্কে ক্যাপ্টেন আহাবের অবচেতন মনে সবসময় একটা প্রবল ইচ্ছা কাজ করতো, সেটা হলো যেকোনো মূল্যে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত পর্যন্ত তাড়া করে তিমিটাকে ধরা। ক্যাপ্টেন আহাব সেই তিমিটাকে ঠিকই খুঁজে পেয়েছিল। উপন্যাসটির শেষে দেখা যায় আহাব তিমিটির গায়ে ছুঁড়ে মারা নিজের হারপুনের দড়িতেই আটকা পড়ে এবং তার শেষ পরিণতি হয় মৃত্যু। আহাব শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হয়। জর্জ বুশ ১১ সেপ্টেম্বরের হামলাপরবর্তী সঙ্কটকালীন যে ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেমন 'ওয়ান্টেড, ডেড অর এলাইভ', 'ক্রুসেড' ইত্যাদি, সেগুলো ঐ ঘটনার জন্য দায়ী প্রকৃত ব্যক্তিকে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে বিচারাধীন করার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার সাথে মেলে না। বরং তার এসব কথাবার্তায় দুর্যোগের আভাস পাওয়া যায়, অপরাধীদের যথেচ্ছ তৎপরতার সাথে এর যেন কোথায় মিল পাওয়া যায়। এ ধরনের কথাবার্তা পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করতে পারে, পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে, কারণ সব ঘটনাই কোনো না কোনো পরিণতিতে পৌঁছে। ওসামা বিন লাদেনকে এখানে ঐ সাদা তিমি মবি ডিকের সাথে তুলনীয় এবং সে পৃথিবীর সব অশুভ তৎপরতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে ঘিরে যেন এক ধরনের মিথ তৈরি হয়েছে। আমি মনে করি এই ব্যক্তিকে আমাদের নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে বাস্তব কতোটা কঠিন। তাকে বিবেচনা করতে হবে একজন অপরাধী হিসেবে, একজন অশুভ ব্যক্তি হিসেবে, যে কিনা বেআইনীভাবে যথেচ্ছভাবে নিরাপরাধ মানুষের প্রতি সহিংসতা চালিয়েছে। তাকে তার অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হোক। তার চারপাশের মানুষদের এবং সেইসাথে আমাদের নিজেদেরকেও যেন তার স্তরে নেমে যেতে দেওয়া না হয়।

**ডেভিড বার্সামিয়ান কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের বোল্ডার এলাকার অল্টারনেটিভ রেডিওর পরিচালক।*

'ক্লাস নেয়ার সময়ই আমি জ্ঞানলাভ করেছি'

মূল : দময়ন্তী দত্ত

অনুবাদক : শেখ আবদুর রহমান

নাম তার এডওয়ার্ড এম সাঈদ। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইংরেজী ও তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত আছেন। তিনি আবার বিভিন্ন মতাদর্শেরও ইতিহাসকার হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। প্রাচ্যদেশীয় ভাব, ভাষা ও আদর্শগত ব্যঞ্জনার তিনি নতুন এক ব্যাখ্যার উদ্‌গাতা। তিনি আবার একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীও। জন্মসূত্রে তিনি ফিলিস্তিনী। ইহুদীদের রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ইসরাইলের সঙ্গে ফিলিস্তিনীদের সংঘাত-সংঘর্ষের সঙ্গে রয়েছে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ। সাঈদ বর্তমানে বেটোফেনের একমাত্র অপেরা ফিডেলিও'র নতুন একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপনের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। কাজকর্মের বহুমুখী ধারা তাকে বড় বেশি রহস্যময় এক ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এ জন্য তাঁকে সহজে বোঝা যায় না। আমেরিকার গণমাধ্যমগুলো তাঁকে নিয়ে আদৌ চিন্তা-ভাবনা করে বলে মনে হয় না। তাদের কাছে তিনি ব্রাত্য। কোন কোন গণমাধ্যম যদিওবা তাঁর সম্পর্কে কখনও উৎসাহ দেখায়, সেটাও হয় নঞর্থক। যেমন, তাঁর নামের আগে বিশেষণ জুড়ে দেয়া হয়– 'প্রফেসর অব টেরর'। কেউ কেউ আবার তাঁকে 'দি ডিফেন্ডার অব ইসলাম' বলেও শনাক্ত করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সাঈদ স্বয়ং নিজের সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করেন? গত ডিসেম্বরে ডেইলি টেলিগ্রাফকে শিক্ষক হিসাবে তাঁর দেয়া একটি সাক্ষাতকার থেকেই সে ধারণা পাওয়া যায়। সাক্ষাতকারের নির্বাচিত অংশ পত্রস্থ করা হলো–

প্রশ্ন : আপনি দীর্ঘদিন যাবত শিক্ষকতা করছেন। কিন্তু আপনি তো আবার পুরোদস্তুর একজন লেখকও বটে। কত না বিচিত্র বিষয় নিয়ে আপনি লেখালেখি করেন। আপনার এই দু'সত্তা,দুটি পরিচয়–আপনি কিভাবে এটা লালন করেন? শিক্ষক সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? আপনি কোন্ ভূমিকায় স্বচ্ছন্দবোধ করেন।

উত্তর : আমার মনে হয় শিক্ষকতাই আমাকে সবচেয়ে বেশি টানে। আমি আজ প্রায় ৪০ বছর শিক্ষকতা করছি। সত্যি কথা বলতে কি– আমি পড়াবার সময়ই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেছি। আমি ছাত্রদের মুখোমুখি না হয়ে যখন কিছু ভাবি বা পড়ি, তখন কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যায়। আমার নিজেকে কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হয়। এ কারণেই আমি আমার ক্লাস নেয়াটাকে ধরাবাঁধা একটা নৈমিত্তিক কর্ম বলে গ্রহণ করতে পারিনি। আমি এই ব্যাপারটাকে আত্মানুসন্ধান এবং আবিষ্কারের ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করেছি।

www.pathagar.com

শুরুতে আমি যখন শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছিলাম তখন আমি নিজেকে প্রতিটি ক্লাসের জন্য তৈরি করে নিতাম। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় ক্লাসে পড়া-বার জন্য নিজেকে অতিমাত্রায় তৈরি করে নিতাম। অবস্থা এমন একটা পর্যায়ে গিয়েছিল যে, মিনিট আর সেকেন্ড ধরে পড়ানোর চিন্তা মাথায় নিয়ে ক্লাসরুমে ঢুকতাম। পরে আমি লক্ষ্য করলাম কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যাদের ছাত্র হিসাবে পেয়েছি তারা সবাই অত্যন্ত চৌকস। তাদের মন্তব্য চিন্তার উদ্রেক করে, উদ্দীপনা যোগায়। এটা আমি আদৌ আশা করিনি। এইসব মন্তব্যের প্রেক্ষিতে যেসব চিন্তা আমাকে উদ্দীপ্ত করেছে সেগুলো পরবর্তীতে আমার লেখালেখিতেও চলে এসেছে।

প্রশ্ন : আপনি আপনার বিভিন্ন রচনায় আরব বিশ্বের নানা সমস্যার ওপর আলোকপাত করেছেন। বিশেষত, ফিলিস্তিনীদের প্রসঙ্গটি আপনার লেখায় বার বার ফিরে এসেছে। আপনি বর্তমানে আমেরিকায় নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন। আপনার কি এ জন্য কখনও মনে হয়নি যে আপনি যাই বলুন বা লিখুন না কেন সবই অরণ্যে রোদন হবে? আপনি যেসব ইস্যু নিয়ে এত চিন্তা-ভাবনা করেন, আপনার ছাত্ররা কি তাতে কোন না কোনভাবে অংশগ্রহণ করে?

উত্তর : শুরুতে আমার মনে হতো, আমি যা বলছি তা শুধু আমার ছাত্ররাই শুনছে। পরে আমি যখন রাজনৈতিক ভাষ্যকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলাম, তখন লক্ষ্য করলাম বেশকিছু সজ্জন আমার লেখালেখি সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। কিন্তু আমার ছাত্ররা নয়। তার কারণ, আমি ক্লাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাক্ষাত অংশগ্রহণের ব্যাপারে কখনই কিছু বলিনি। আমি যে কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত সে বিষয়েও ছাত্রদের কখনও কিছু বলিনি। আমি চিরকাল এই ধারণাই পোষণ করে এসেছি যে, ক্লাসরুম, অংশত হলেও একটি পূতপবিত্র জায়গা। আমি লেখালেখি শুরু করার পর বুঝতে পারলাম, মানে যত লিখতে লাগলাম ততই আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল যে, লিখেও একটা মণ্ডলী তৈরি করা যায়। বিশেষত, ফিলিস্তিন প্রশ্নে যাঁদের আগ্রহ রয়েছে তাঁরা আমার লেখা বেশ মনোযোগ দিয়েই পড়ছেন বলে মনে হয়েছিল। খুব বেশি লোক ফিলিস্তিন প্রশ্নে বক্তব্য রাখতেন না। এ কারণে আমার পক্ষে একটি শ্রোতামণ্ডলী তৈরি করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। এই শ্রোতামণ্ডলীর কলেবর দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকে। এ বিষয়ে সর্বশেষ পর্যায়ে যা ঘটেছে তার উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় হবে বলে মনে করি। নব্বই দশকের শেষ পর্ব থেকে আমি একটি আরবী ভাষায় প্রকাশিত কাগজে মাসে দুটি কলাম লিখতে শুরু করি। এই প্রথমবারের মতো আরব বিশ্বের লোকজনের সঙ্গে আমি সরাসরি সংযোগ রক্ষা করতে সক্ষম হলাম। আরবী ভাষী এই পাঠকরা আমাকে দারুণভাবে আলোড়িত করেছেন। এখন আমার রচনা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। এই লেখালেখির সূত্রে কখনও কখনও এমন দেশে আমাকে উপস্থিত থাকতে হয় যেখানে আমার রচনার ব্যাখ্যা বিবৃতি শুনে আমি নিজেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। কিন্তু ঐ যে বললেন, অরণ্যে রোদন, আমি কখনও পুরো ব্যাপারটাকে সেভাবে দেখিনি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে বা শিক্ষায়তনিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যে শ্রোতামণ্ডলীর সন্ধান পেয়েছি তাদের চিন্তাধারা আমাকে দারুণভাবে উদ্দীপ্ত করেছে। আমি আবার বিতর্ক খুবই পছন্দ করি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : প্রাচ্যের শিল্প, ভাষা, সংস্কৃতি সম্পর্কে আপনি যে সব মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন তা ভারতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আপনার রচনা কী আরব বিশ্বে কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম?

উত্তর : দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে, আরব বিশ্বে আমার রচনাগুলোকে তেমন গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়নি, যেমন কিনা অন্যত্র করা হয়েছে। আরব বিশ্বে আমাকে ডিফেন্ডার অব ইসলাম হিসাবে দেখা হয়। আরব বিশ্বের লোকজন মনে করেন আমি পশ্চিমা জগতের শয়তানীর হাত থেকে ইসলামকে বাঁচাবার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এটা আসলে এক ধরনের ক্যারিকেচার। তাত্ত্বিক দিকটা এই মুহূর্তে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই বিষয়টি নিয়ে আমি ভারতীয়, ইউরোপীয় এমনকি জাপানী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে খুব চমৎকার আলোচনা চালিয়ে যেতে পারি। আরব বিশ্বে এই ধরনের আলোচনা পর্যালোচনার মধ্যে অংশগ্রহণের কোন অবকাশ নেই। আরব বিশ্বে জাগতিক সুখের জন্য প্রয়োজনীয় নয় এমন যে কোন উপকরণের ব্যাপারে কোন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না।

আরব বিশ্বের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন নতুন চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটছে। এটা একটা নতুন চেতনা। আমি আমার রচনায় যে সমালোচনা লিখেছি কথিত তরুণ সম্প্রদায়কে তা প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। গত জুলাই মাসে বৈরুতে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আরব বিশ্বে আমার জানা মতে, আমার রচনা নিয়ে এই ধরনের সম্মেলন আগে আর কখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। এই সম্মেলনের নামকরণ করা হয়েছিল 'টুওয়ার্ড এ ক্রিটিক্যাল কালচার।' কিন্তু এটাকে যৎসামান্য একটি উদ্যোগ বলেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। আরব দেশীয়দের ইনটেলেকচুয়াল জীবনে বড় কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। সব কেমন যেন গুটিয়ে গেছে। এছাড়া রাজনীতিতে একটা দমবন্ধভাব এবং বুদ্ধিজীবীদের গা এলিয়ে দেয়া মনোভাবের উল্লেখও এ প্রসঙ্গে করতে হয়। আমার মনে হয় তরুণ বুদ্ধিজীবীরাই পরিবর্তনের আবহ সূচিত করতে পারবেন।

প্রশ্ন : আপনি নিয়মতান্ত্রিক ও গোঁড়া, কিছু অতি সেরা শিক্ষায়তনগুলোতে শিক্ষালাভ করেছেন। এ সত্ত্বেও আপনি কি করে একজন প্রতিষ্ঠানবিরোধী বুদ্ধিজীবী হয়ে উঠলেন?

উত্তর : একটা ব্যাপার বোঝার চেষ্টা করুন। আমার পশ্চাৎপট নিয়ে সব সময়ই এক ধরনের বিতর্ক টিকে রয়েছে। আমি যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হওয়ার আগে ঔপনিবেশিক পরিবেশ পরিস্থিতিতে শিক্ষালাভ করেছি। যুক্তরাষ্ট্রে পৌছার পর আমার মনে হতো আমি একটা খাপছাড়া অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছি। আমি যে শিক্ষালাভ করেছিলাম, তার সঙ্গে আমার জীবনের বাস্তবতার কোন যোগ ছিল না। এ কারণে আমার মনে হতো, আমি দু'ধরনের শিক্ষা পেয়ে যাচ্ছি। একটি হচ্ছে স্কুলের প্রচলিত শিক্ষা আর একটি আত্মশিক্ষা। এই আত্মশিক্ষা আমার সত্তার অন্য আর একটি দিককে উজ্জ্বল করে তোলার কাজে লাগাই। এর ফলে বিদ্রোহী মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। স্কুলে আমাকে অতি চালাক এবং স্মার্ট মনে করা হতো এবং এই দুটি কারণে স্কুল থেকে আমাকে বহিষ্কার করে দিলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না। কিন্তু আমি আবার এত গোঁড়ামিমুক্ত ছিলাম যে, আমাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করার বিষয়টিও বিবেচনার মধ্যে আনা হয়নি। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য পনেরো বছর বয়সে আমাকে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হলো, তখন উপায়ান্তর না দেখে আমাকে আমেরিকার একটি অভিজাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে

www.pathagar.com

দেয়া হলো।

প্রশ্ন : আপনার রাজনৈতিক কর্মসূচীতে শিক্ষার কোন স্থান আছে?

উত্তর : এক সময়ে আমি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। এটা '৭৭ থেকে '৮২ সালের কথা। তখন ফিলিস্তিনে একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আমাকে হিউম্যানিটিজ বিষয়ের ওপর পাঠক্রম তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়। আমি এই পাঠক্রমে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং উদার শিক্ষানীতি প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করি। শেষাবধি আমার পাঠক্রমটির দারুণ সমালোচনা করা হয়।

আমি সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করি। সমালোচনার ক্ষেত্রে চেতনা জাগ্রত হচ্ছে সে বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করি ওয়াল টু ওয়াল টেলিভিশনে। পূর্বে প্যাকেজকৃত সংবাদ এবং অন্য আরও অনেক কিছুর বিরুদ্ধে শিক্ষাকে আমি প্রতিবাদী উপাদান হিসাবে ব্যবহার করতে চাই। এই কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারলেই শুধু আমার মনে হয় যে, আমি শিক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

জনকণ্ঠ, ২৩ জানুয়ারী '৯৮

www.pathagar.com

'পশ্চিমারা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে আরবদের কোণঠাসা করেছে'

মূল : তারিক আলী
অনুবাদক : সারফুদ্দিন আহমেদ

এডওয়ার্ড সাঈদ আমার দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা বন্ধু। সাঈদের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯৭২ সালে নিউ ইয়র্কের একটি সেমিনারে। পাশ্চাত্যের চরম উদ্দামতাপূর্ণ সেই সময়েও তার অনেকগুলো গুণাবলীর মধ্যে একটি ছিল তার সাদাসিদে জীবনাচরণ যা আমাদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিলো। ১৯৯৭ সালে বৈরুতে তার সম্মানে আয়োজিত একটি সেমিনারে আমি যোগ দিয়েছিলাম। সেমিনার শেষে সাঈদ সুইমিংয়ে আমাকে আর ইলিয়াস খৌরিকে আমন্ত্রণ জানালেন। সুইমিংয়ে নামার আগে আমি অনেকটা উন্নাসিকভাবেই সেদিন বলেছিলাম,' তোয়ালেটা ঠিক আপনার পোষাকের সঙ্গে তেমন মানানসই হয়নি বোধ হয়।' কিন্তু রোমের একটা অনুষ্ঠানে তার *আউট অব প্লেস* রচনাটি যেদিন পাঠ করে শোনালেন সেদিন পোষাকের আড়ম্বরতা আমার নেহায়েতই অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। এসবের মধ্য দিয়েই তাকে দীর্ঘদিন মরণব্যাধি লিউকেমিয়ার সঙ্গে লড়াই করে যেতে দেখেছি। দীর্ঘ এগারো বছর লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হয়েও তাকে কখনোই অসুস্থ মনে হয়নি। শুধু জীবনের শেষ বছরটিতে তাকে নিয়মিত হাসপাতালে থাকতে হয়েছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়েছে। শেষ নিঃশ্বাষ ত্যাগের পূর্বমূহুর্ত পর্যন্ত তাঁকে ভেঙে পড়তে দেখিনি। গত বছর খুবই সৌভাগ্যক্রমে নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে এ্যাডওয়ার্ডের চিকিৎসকের সঙ্গে আমার কথা হয়। চিকিৎসক জানালেন লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হয়েও এতদিন কিভাবে তিনি স্বাভাবিক মানুষের মত জীবনাচরণ করেছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে তার কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা নেই। মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামী চেতনা ছিল দুর্দমনীয়। বেঁচে থাকবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই এতদিন তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। সাঈদ যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতেন। তিনি কথা বলতেন ফিলিস্তিনি ঢঙ্গে, কিন্তু কমপক্ষে তিনটি জাতির বৈশিষ্ট্য তাঁর চালচলনের মধ্যে পরিষ্কারভাবেই প্রকাশ পেত। আয়ু গ্রাসী লিউকেমিয়া যখন তাকে ধীরে ধীরে শুষে নিচ্ছিল, বাইরে থেকে তা কেউ বুঝতে পারতো না। খুব কাছের আমরা যারা কতিপয় স্বজন তার শারীরিক কষ্ট অনুভব করতে পারতাম, আমরাও বিষয়টি ভুলে থাকার চেষ্টা করতাম। কিন্তু অভিশপ্ত এই ক্যান্সার তাঁকে চূড়ান্তভাবেই যেদিন নিয়ে গেল আমরা শোকে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। এডওয়ার্ড সাঈদের জীবনের সবচেয়ে আলোচিত অধ্যায়

www.pathagar.com

হলো মার্কিন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন নীতি ও তোষামুদে আরব নেতাদের বিতর্কিত তীর্যক সমালোচনা। ১৯৬৭ সালের ৬ দিন ব্যাপী যুদ্ধের সমালোচনায় মুখর ছিলেন এডওয়ার্ড। সাঈদের পিতা ওয়াদি সাঈদ ছিলেন ফিলিস্তিনি খ্রিষ্টান। ১৬ বছর বয়সে ওয়াদি ১৯১১ সালে আমেরিকায় চলে আসেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেখান থেকে আবার জেরুজালেমে চলে আসেন। ১৯৩৫ সালে জেরুজালেমেই এ্যাডওয়ার্ডের জন্ম হয়। এ্যাডওয়ার্ডের জন্মের পর সাঈদ পরিবার কায়রো চলে আসেন। এখানে এ্যাডওয়ার্ডের পিতা ওয়াদি সাঈদ মুদি দোকানের ব্যবসা শুরু করেন। এডওয়ার্ডকে পাঠানো হয় একটি অভিজাত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। তার কৈশোরের দিনগুলো এখানেই কাটে। ছেলেবেলা থেকে এডওয়ার্ড ছিলেন স্বেচ্ছা নিঃসঙ্গ কিন্তু ভয়ানক মেধাবী। স্কুল জীবনেই ডিফো, স্কট, ম্যান এদের লেখা বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম আয়ত্ত্ব করেন । যদিও ব্রিটেনের 'প্রিন্স অব ওয়েলস' এ্যাডওয়ার্ডের নামানুসারেই তার নাম রাখা হয়েছিল তথাপি তার পিতা ওয়াদি সাঈদ রাজতন্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন বলেই ছেলেকে ব্রিটেনে উচ্চশিক্ষার জন্য না পাঠিয়ে ১৯৫১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালীন এডওয়ার্ড ব্রিটেনের সামন্ততান্ত্রিক ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেন ব্রিটেনের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল মানুষকে নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক অধপতনের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। তিনি ভাবতে শুরু করেন যুক্তরাষ্ট্রেও নতুন একটি রাজনৈতিক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত জরুরি। এডওয়ার্ড ১৯৬৩ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। এর তিন বছর পরেই তার প্রথম বই প্রকাশিত হয়। নিউইয়র্কে ১৯৯৪ সালে 'চ্যানেল ফোরে' একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী দিনে আমি তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করি যাকে ঠিক সাক্ষাতকার বলা যায় না। প্রাসঙ্গিকভাবেই ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কলম্বিয়ায় অধ্যাপনারত সময়ের নানা দিক নিয়ে তার সঙ্গে কথা হয়েছিল আমার।

তারিক আলী ঃ আমরা জানি দীর্ঘদিন আপনি অধ্যাপনা করেছেন, বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা রয়েছে আপনার। অন্যান্য সকল পরিচয়ের বাইরে আপনার একটি রাজনৈতিক পরিচয়ের সঙ্গেও আমরা পরিচিত। আপনি কি মনে করেন আপনার এ রাজনৈতিক পরিচয় অন্যদের থেকে আপনাকে আলাদা করেছে ?

এডওয়ার্ড সাঈদ ঃ রাজনৈতিক সচেতনতাকে এড়িয়ে যাবার উপায় অথবা সামর্থ্য কোনটাই আমার ছিল না। আমি মিশরীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, ফিলিস্তিনও আমার পরিচিতির বাইরে ছিল না। আমার পরিবারের একাংশ বাস করতো ফিলিস্তিনে এবং আরেক অংশ লেবাননে। দুদেশেই আমি ছিলাম বিদেশী। পরিবারের প্রতি আমার তেমন কোন দায়বদ্ধতাও ছিল না। যে কারণে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত আমি যুক্তরাষ্ট্রে থাকি। কাজের বাইরে আমি কখনোই অবসর পাইনি। আমি একটা বিষয়ে চরমভাবে হতাশ এবং মর্মাহত। আমার নেতৃস্থানীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা বিশেষ করে এ্যাডমন্ড উইলসন, ইসাইয়াহ বার্লিন, রেইনহোল্ড রিভার, এরা সবাই ছিলেন ভয়ানকরকম ইহুদিবাদী। ইহুদি গোষ্ঠীর পক্ষ নিয়ে তারা আরব জাতিদের বিষয়ে এমন সব লেখা লিখতে শুরু করলেন যেগুলোতে আরব জাতিকে একটি ভয়ঙ্কর জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হলো । একমাত্র ফিলিস্তিন আমার জন্মভূমি বলে আমার প্রত্যেকটি লেখাকে তারা সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ

www.pathagar.com

করতেন। রাজনৈতিক কোন দলই আমাকে বিশ্বাস করতো না।'সিক্স ডে ওয়ার' শেষ হওয়ার সময় আমি নিউইয়র্কে ছিলাম। এ সময়ে আমি প্রায় একঘরে হয়ে গেলাম। দীর্ঘদিন নিউইয়র্কে থাকা সময়টাতেই আমার আরবদের সঙ্গে একটি আত্মীক যোগাযোগ গড়ে ওঠে। এবং এরই সূত্র ধরে ১৯৭০ সালে আমি ফিলিস্তিন বিদ্রোহের সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে পড়ি। পশ্চিমাদের প্রতি আমার সবচেয়ে বড় অভিযোগ, তারা তাদের প্রাচ্যবিমুখতাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক জায়গায় রূপ দেবার চেষ্টা করে আসছে।

তারিক আলি ঃ ১৯৬৭ সালের যুদ্ধই কি আপনাকে আপনার চিন্তার জগৎকে নাড়া দিয়েছিল এবং ফিলিস্তিনের একজন মুখপাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল?

এডওয়ার্ড সাঈদ ঃ উহু, ফিলিস্তিনেরও আগে আরবদের মুখপাত্র হিসেবে আমার পরিচয়কেই আমি বড় করে দেখি।

তারিক আলি ঃ এবং সম্ভবত তখন থেকেই একটি নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে ওরিয়েন্টালিজম আত্মপ্রকাশ করে –

এডওয়ার্ড সাঈদ ঃ আসলে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে যত বই লেখা হয়েছে প্রথমে আমি তা ধারাবাহিকভাবে পড়া শুরু করি। আমি বইতে যা পড়েছি আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার বেশিরভাগই মেলেনি। এর পরই আস্তে আস্তে আমার এ ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়। পশ্চিমারা সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনা অনুযায়ী আরবদের বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে কোণঠাসা করে আসছে। আমি তখনই সচেতন হয়ে উঠি যখন শুধু নন্দনতত্ত্বের জন্য নয় বরং একটি ঐতিহাসিক সাহিত্যভিত্তির মধ্য দিয়ে পশ্চিমারা আরবদের শোষণ করে আসছে। আমি এখনও নন্দনতত্ত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু সাহিত্যের রাজত্বে যদি সে নন্দনতত্ত্ব কোন নির্দিষ্ট জাতিকে কোণঠাসা করার জন্য ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই তা পরিত্যাজ্য। পশ্চিমা যাজকীয় স্টাইলের সাহিত্যকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাই বলে সেটাকে অভ্রান্ত জ্ঞান করে রীতিমতো পুজা করার যে হিড়িক পড়েছিল আমি সেই প্রবণতাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে এসেছি।

এডওয়ার্ড সাঈদের *কালচার এ্যান্ড ইমপেরিয়ালিজম* প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে। এই বইতে সাঈদ পশ্চিমা দেশগুলোর সীমান্তসংলগ্ন আরব জনগণের সঙ্গে তাদের আচার আচরণের মৌলিক বিষয়গুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিয়েছেন। এ বইটি প্রকাশিত হবার পরপরই সাঈদ তীর্যক সমালোচনার সম্মুখীন হন এবং পাশাপাশি অনেক পশ্চিমা পণ্ডিতরা তাকে নিদেন পক্ষে একটা শুভেচ্ছা বার্তা পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। এডওয়ার্ড সাঈদের ফিলিস্তিন বিষয়ক প্রত্যেকটি বইই তার অন্যান্য লেখা থেকে আলাদা ধরনের, প্রচণ্ড আবেগময়তাকে ঘিরে তার এইসব লেখা। *দি এন্ড অব দ্য পিস প্রসেস, ব্লেমিং দ্য ভিকটিমস*সহ আধ ডজন ফিলিস্তিনের রাজনীতি নিয়ে লেখা বই। *আল আহরাম*-এ তার লেখা নিয়মিত কলাম ৬৭ সালের ফিলিস্তিন বিদ্রোহে দাবানল ছড়িয়ে দিয়েছিল। ফিলিস্তিনের নতুন প্রজন্মকে তাদের স্বদেশের সত্যিকার ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে এ্যাডওয়ার্ডের এসকল বই এখন অপরিহার্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইহুদি নিধনের খেসারত এখন মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের দিতে হচ্ছে। অথচ যে পশ্চিমারা সেই হত্যাযজ্ঞের জন্য ষোল আনা দায়ি তাদের সঙ্গে এখন ইহুদিদের গলাগলি সম্পর্ক। এই সরল সত্য কথাটা বলার জন্যই তিনি পশ্চিমাদের চক্ষুশুল হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

এ্যাডওয়ার্ডের ঘনিষ্ট দুই বন্ধুর মধ্যে ছিলেন ইব্রাহিম আবু লাঘোদ এবং একবাল আহমেদ। এডওয়ার্ড সব সময়ই তাদের পরামর্শকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। এদের একজন মারা গেলেন ১৯৯৯ সালে। আর একজন গেলেন ২০০১ সালে। ফিলিস্তিন বিদ্রোহে এই দুজন সাঈদকে সর্বাত্মক প্রেরণা দিয়ে উজ্জীবিত করে রাখতেন। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পরও সাঈদ দমে যাননি বরং ফিলিস্তিনের শত্রুদের বিরুদ্ধে এডওয়ার্ড দ্বিগুণ শক্তিতে ফেটে পড়েন। এডওয়ার্ড যদিও ১৪ বছর ধরে ফিলিস্তিনের বিপ্লবী সংগঠন পিএনসি'র সদস্য ছিলেন এবং ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত জাতীয় কনভেনশনে ইয়াসির আরাফাতের লিখিত ভাষণের ঘষামাজা ও সম্পাদনা করেছেন। কিন্তু যখনই ফিলিস্তিনের নেতারা ইহুদি গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের আপোষকামিতার দিকে এগিয়েছেন তখনই খোদ আরাফাতের সমালোচনা করতেও এ্যাডওয়ার্ডের বাধেনি। হোয়াইট হাউসে আইজ্যাক রবিনের সঙ্গে ইয়াসির আরাফাতের হ্যান্ডশেক করার দৃশ্যকে তিনি 'ফ্যাশন শো ভালগারিটিজ' বলে অভিহিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইল বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে ফিলিস্তিনকে দাসত্বের শৃংখলে বন্দী করতে চেয়েছে। এ দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যই হামাসের মত বিপ্লবী সংগঠন সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একবার আমি এডওয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম হামাস কি আসলেই একটি গঠনমূলক বিকল্প শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ?

জবাবে এ্যাডওয়ার্ড বলেছিলেন,' আমার মনে হয় ইসলামী রাষ্ট্র কি জিনিস সেই ধারণাই ফিলিস্তিনের জনগণের মধ্যে নেই। তারা ইসলামী জিহাদের কথা বলছে কিন্তু তারা জানে না জিহাদ কি এবং কেন। যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো যেমন আমি পশ্চিম তীরের অসংখ্য লোককে জিজ্ঞেস করেছিলাম,' তোমাদের অর্থনৈতিক পলিসি কি? তোমাদের বসতি বিষয়ক কি সিদ্ধান্ত তোমরা পছন্দ করো ? তারা উত্তর দিয়েছে, আমরা ব্যাপারটা নিয়ে এখনও ভাবছি। তাদের মধ্যে একটাও সামাজিক প্রোগাম হয় না যেটা 'ইসলামী অনুশাসনসিদ্ধ'। তাহলে ওই পশ্চিম তীর বা গাজা এলাকায় ইসলাম কায়েম হলে কার লাভ? আসলে সৌদি আরব অথবা মিশরের মত ফিলিস্তিনও যুক্তরাষ্ট্রের তল্পিবাহক হয়ে যাচ্ছে।

এ্যাডওয়ার্ডের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড তার এমন একজন শুভাকাঙ্খীকে হারাল যে আজীবন ফিলিস্তিনের ভালমন্দের সমালোচনা করে একটি সঠিক দিক নির্দেশনা দেবার আমরণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তার জীবনের শেষ লেখায় ইরাক যুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। অবশ্য সেই বিরোধিতা তিনি 'নো ওয়ার! নো ওয়ার!' বলে চিৎকার করে নয় বরং 'ওয়ার! ওয়ার!' বলেই করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ফিলিস্তিনসহ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে সম্ভব নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ করাই সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার সহজতম পথ।

খবরের কাগজ, '০৪

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

www.pathagar.com

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ : জীবন ও গ্রন্থপঞ্জি

বেনজীন খান

এডওয়ার্ড ওয়াদি সাঈদ (Edward Wadie Said)। বিশ্বের অন্যতম ধ্রুপদী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, রাজনীতিক ও সংস্কৃতিবেত্তা। পাণ্ডিত্য ও মৌলিক চিন্তার জন্য বিশ্বজোড়া খ্যাতি যাঁর। ইংরেজি সাহিত্য, সঙ্গীত, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ে বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। লেবানিজ বংশোদ্ভূত এই আমেরিকান বুদ্ধিজীবী নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন; আর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের মাটির অধিকার তথা মুক্তির সংগ্রামে তিনি ছিলেন অকুতোভয় লেখিয়ে বোদ্ধা ও যোদ্ধা।

সাঈদের বাবার নাম ছিল ওয়াদি ইব্রাহীম, জন্ম জেরুজালেমে ১৮৯৫ সালে। মা হিল্ডা মুসা, তাঁর দেশ ছিল লেবানন এবং জন্ম হয়েছিল নাজারেথ-এ ১৯১৪ সালে। সাঈদের দাদার নাম আবু আসাদ। দাদির নাম হাননে। সাঈদের বাবা ব্রিটিশ শাসিত জেরুজালেম ত্যাগ করে ১৯১১ সালে চলে আসেন যুক্তরাষ্ট্রে। ব্রিটিশদের তিনি দেখতেন ঘৃণার চোখে। যুক্তরাষ্ট্রে তিনি নাগরিকত্বও নিয়ে ছিলেন; ইচ্ছে ছিল যুক্তরাষ্ট্রেই থেকে গিয়ে আইন পেশায় যোগ দেবেন। কিন্তু মায়ের অনুরোধে ১৯২০ সালে তিনি প্যালেস্টাইনে ফিরে আসেন। ১৯২৯ সাল পর্যন্ত যৌথভাবে ব্যবসা চালান। কিন্তু এখানে তাঁর জীবন ছিল অনিশ্চিত, রাজনৈতিক পরিস্থিতি অথবা ইতিহাস ছিল প্রতিকূলে। ভাগ্য উন্নয়নে ইব্রাহীম চলে আসেন মিশর। তিলে তিলে কায়রোতে গড়ে তোলেন গগনচুম্বী ব্যবসায়িক সাফল্য। ১৯৩২ সালে সাঈদের মা হিল্ডাকে যখন তিনি বিয়ে করেন তখন ওয়াদি ইব্রাহীম একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ধনাঢ্য ব্যক্তি। কিন্তু এখানেও পরিবর্তন হতে থাকে রাজনৈতিক পরিস্থিতির। মিশরে যেসব আরব অন্য জায়গা থেকে এসে থাকতেন, বিশেষ করে সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন ও প্যালেস্টাইন থেকে, তাদের বলা হতো শামি। তাদের ভাষাকেও বলা হতো শামি।

ওয়াদির পরিবার ছিল শামি অর্থাৎ বহিরাগত। ১৯৬০ সালে জেনারেল মোহাম্মদ নাগিবের কাছ থেকে যখন গামাল নাসের মিসরের ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিজস্ব ধরনের আরব সমাজতন্ত্রের প্রচলন করেন, কায়রো তখন হঠাৎ খুব বেশি রক্ষণশীল হয়ে পড়ে বিদেশীদের ব্যাপারে। ইউরোপ-আমেরিকা তো ভিন্ন কথা, এই শামিদের ক্ষেত্রেও মনোভাব দ্রুত পাল্টে যায়। ধ্বস নামে ওয়াদি ইব্রাহীমের রমরমা ব্যবসায়, ছাড়তে হয় কায়রো। এ দিকে যে জেরুজালেমে জন্ম হয়েছে তাঁর, সেই জেরুজালেমে থাকেনি আর

www.pathagar.com

ফিরে যাবার মতো একটি স্থায়ী ঠিকানা। ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝিতে ওই শহরের পুরনো অধিবাসীদের সরিয়ে ইহুদি অভিবাসীদের দিয়ে ভরে ফেলা হয়েছে শহরটা। ওয়াদি ইব্রাহীমের জন্মভূমি দখল করে নিয়েছে পোলিশ, জার্মান এবং আমেরিকান অভিবাসীরা, যারা শহরটা জয় করে ফেলে এবং তাদেরকে পরিণত করে দৃষ্টান্তহীন সার্বভৌমত্বে, যাতে প্যালেস্টাইনি জীবনের কোন জায়গা ছিল না। বালক সাঈদ বাবার সাথে ছিলেন এসব ঘটনার সাক্ষি। এমনি হাজারও মর্মস্পর্শি অভিজ্ঞতায় ভরপুর এডওয়ার্ড ওয়াদি সাঈদের জীবন। বাবা প্যালেস্টানিয়ান, মা লেবানিজ, মাতুলালয়ে জন্ম নেয়ার কারণে সাঈদ জন্মসূত্রে লেবানিজ। শৈশব কেটেছে তার মিশরের কায়রোতে। লেখাপড়া শেষে জীবন কাটিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে। কোথাও তিনি স্থির হতে পারেননি। শিকড় গাঁথেনি তার গভীর মাটিতে। তিনি আত্ম জীবনীতে লিখছেন– 'আমি কেবলমাত্র অনেক পরিচিতির একটি অস্থিতিশীল অনুভূতি ধরে রেখেছি মনে।'

১৯৩৫ ১ নভেম্বর ব্রিটিশ-শাসিত ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে অবস্থিত এক সম্ভ্রান্ত খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এডওয়ার্ড ওয়াদি সাঈদ।

১৯৪৮ ১৩ বছর বয়সে সাঈদ তার মোহন মায়াময় জন্মস্থান জেরুজালেম নগরী ত্যাগ করে বাবা-মা'র হাত ধরে চলে আসেন কায়রো। এত অল্প বয়সে তাঁর কোন কিছুই ঠিক বুঝে ওঠার কথা না, তবুও ১৯৪৮ সাল একটা তীব্র বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা হিসেবে তাঁর আত্মজীবনীর অনেকগুলো পৃষ্ঠা অধিকার করে আছে। কেননা, তিনি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন প্যালেস্টাইনের পতন তাঁর পরিবারের জন্য এক নির্মম শোকাবহ ঘটনা। যদিও বাবা-মা পুরো ব্যাপারটাই সাঈদের সামনে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাবার মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়া বাক্য– **'আমাদের আর কিছুই থাকলো না'** জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে ভাবিয়েছে। এই '৪৮ সালে কায়রোরই এক নামকরা ব্রিটিশ স্কুল গেজিরা প্রিপেয়োটারতে ভর্তি হন এডওয়ার্ড সাঈদ। এই স্কুলে পড়ার সময় সাঈদ দুষ্টু প্রকৃতির ছিলেন, ইংরেজ শিক্ষকদের আচার-আচরণ নিয়ে সাঈদ ও তার বন্ধুরা মিলে নানা হাসি-তামাশা করতেন; স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ করার কারণে স্কুল থেকে পরবর্তীতে সাঈদ বহিষ্কৃতও হন।

১৯৪৯ কায়রোর ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হন সাঈদ।

১৯৫১ সাঈদকে পাঠানো হয় আমেরিকাতে, মাউন্ট হার্মন স্কুলে। এরপর থেকে যুক্তরাষ্ট্রই হয়ে ওঠে তাঁর ঠিকানা।

১৯৫৩ মাউন্ট হার্মন থেকে সাঈদ গেলেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর মানস গঠনের একটা পর্যায় পরিপূর্ণতা পায়।

১৯৫৭ আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শেষ করেন স্নাতক; এখানে তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল– 'আন্দ্রে জিদ ও গ্রাহাম গ্রিন'।

১৯৫৮-৬৩ পাঁচ বছর সাঈদ কাটিয়েছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের একজন গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট হিসেবে।

www.pathagar.com